বিভ্রান্তির বেড়াজালে
মুসলমান

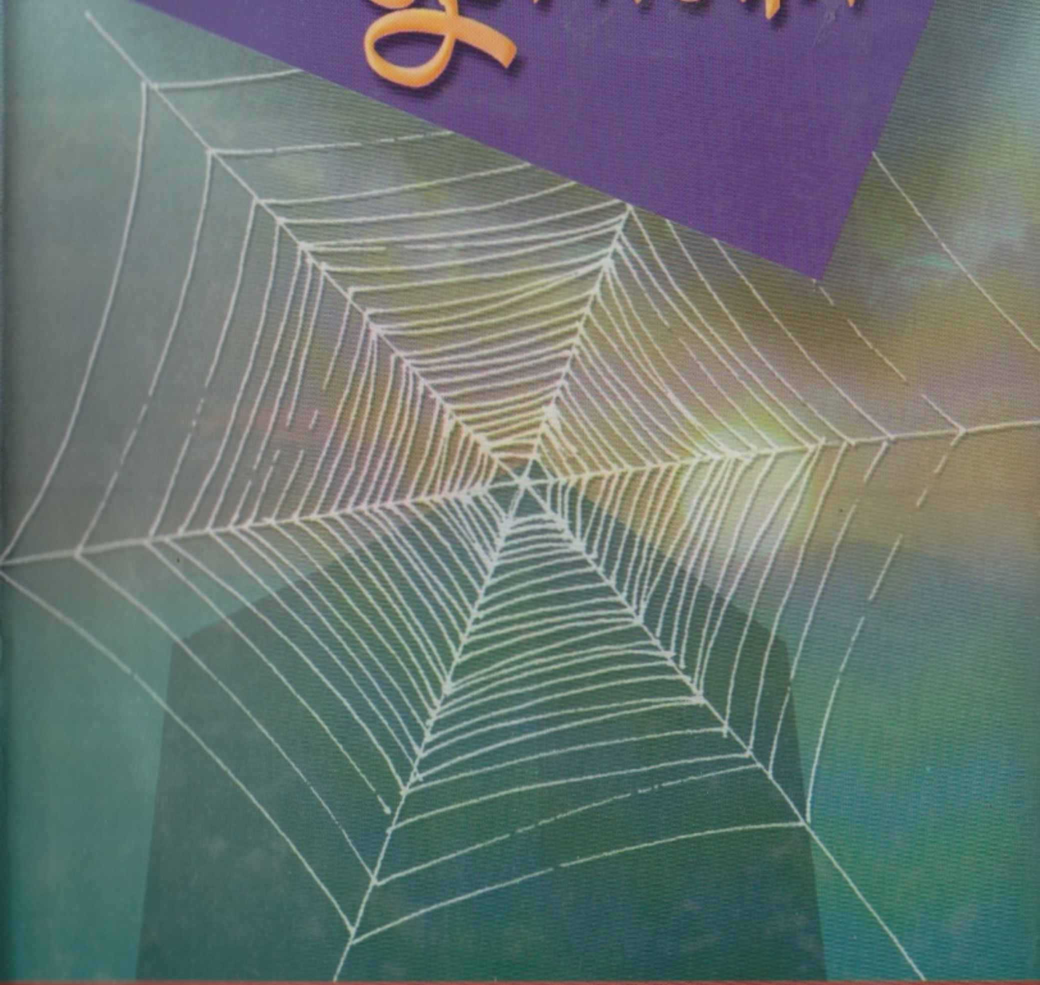

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ

বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ

বন্ধু প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান
সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ

প্রকাশক

কে. এম. মোকতাদার হাসান (চন্দন)
বন্ধু প্রকাশনী
২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৫০১০৭

স্বত্ব ঃ
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ
জুন ২০০১, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ বাং, হিজরী ১৪২২
[নবী দিবস (সাঃ) স্মরণে]

মুদ্রণ ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৭১১০৫৬২

প্রচ্ছদ ঃ
আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য ঃ ২০০/-

পরিবেশক ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৯২০১, ৭১১০৫৬২

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
- বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
  ১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।
- ৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
- ৭২, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- বন্ধু প্রকাশনী, ২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড
  মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। ফোন : ৯৫৫০১০৭

Bibhrantir Berajale Musalman, Written by : Sarker Shahabuddin AhmOd.
Published by : K. M. Moktadar Hassan (Chandan), Bandhu Publication.,
28/C, Toyenbee Circular Road, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Price : Tk. 200, US$ 4/- ISBN— 984-31-1360-8

www.pathagar.com

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার-দিনের স্বামী।
যত গুণগান, হে চির-মহান,
তোমারি অন্তর্যামী॥
দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি
তোমারি করুণা-কামী॥
সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
মোদেরে দাও গো বলি
চালাও সে পথে—যে পথে তোমার
প্রিয়জন যায় চলি।
যে পথে তোমার চির-অভিশাপ
যে পথে ভ্রান্তি, চির-পরিতাপ
হে মহাচালক, মোদেরে কখনো
করো না সে পথগামী॥

গোলাম মোস্তফা

www.pathagar.com

- এ কথা একান্তই সত্য যে, বহু সংখ্যক জ্বীন ও মানুষ আছে যা'দিগকে আমরা জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের দিল আছে, কিন্তু এর সাহায্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের শ্রবণ-শক্তি রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং তা হতেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন। (সূরা : ৭, আরাফ : ১৭৯)

- আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মাওলা, অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হজ্ব)

- যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (ইসলামী ব্লাসফেমী করে) এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে। (মায়িদা ৩৩)। অন্যত্র নির্দেশ আর যারাই আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে না তারাই ফাসেক ও যালেম। (আল কোরআন)

www.pathagar.com

শ্রদ্ধার সঙ্গে নিবেদন–

হৃদয়বান ব্যক্তিত্ব
জনাব মোহাম্মদ বেনাউল ইসলামকে

www.pathagar.com

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র।
যিনি তাঁর সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতম হিসাবে আমাদের ভাবতে,
বলতে ও লিখতে শিখিয়েছেন। দুনিয়াতে আমাদের
তাঁর খলিফা হিসাবে সকল প্রকার কল্যাণকর্ম
সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করেছেন তাঁর প্রিয় রসুল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে। আমরা এ
লক্ষ্য সাধনে নিয়োজিত থাকতে চাই। আর এ
চাওয়াতেই আজ আমি আমার অনুভূতি প্রকাশের মহৎ
সুযোগ পাওয়ায় তওফিক আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের
দরগায়ে লাখো শুকরিয়া আদায় ও
প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর লাখো
দরুদ পেশ করছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, শাহরিয়ার জেড. আর. ইকবাল, ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ, মোহাম্মদ বেনাউল ইসলাম, চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক, আউয়াল ঠাকুর, হোসনেয়ারা বেগম, শাহীনূর আখতার, কোহিনূর আখতার, নীলা সুলতানা, হাসান শাহরিয়ার আহমদ, আলম মাসুদ, কে.এম. মোকতাদার হাসান (চন্দন), আব্দুল মতীন, ইমতিয়াজ মাসুদ, রফিকুল ইসলাম হিরণ, ফরহাদ খাঁ, সেলিম রেজা, মোঃ ফখরুদ্দিন আহমদ, মিরাজ, এম.এ নোমান ও আরো অনেকে।

www.pathagar.com

ভূমিকা

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদের *বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান* গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ পড়ে মুগ্ধ হয়েছি তার অনুসন্ধিৎসা, ভাবনার গভীরতা এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের বৈচিত্র্য অনুধাবন করে। আশা করবো, তার সৃজনমুখী লেখনী যেন চিরকাল এমনি শানিত থাকে। *বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান* গ্রন্থটি বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এটি সময়োপযোগীও।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন সমাজে ধর্ম বলতে যা বোঝায়, ইসলাম তা থেকে স্বতন্ত্র। ইসলাম হলো এক জীবন ব্যবস্থা। এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। অন্য ধর্মের মতো ইসলাম শুধুমাত্র বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বিন্যাসযোগ্য আধ্যাত্মিক চেতনা নয়, ইসলাম হলো সুনির্দিষ্ট নীতিসূত্রের কাঠামোয় স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতি এবং সামাজিক ব্যবস্থার কক্ষপথ। ইসলামের মূলমন্ত্র হলো একত্ববাদ। সমগ্র জীবন ঐক্যবদ্ধ, কারণ তা স্বর্গীয় একত্ব থেকেই উৎসারিত। পার্থিব জীবনে একজন মুসলমান যা সম্পন্ন করে, তার ব্যক্তিত্বের সীমারেখার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এক ঐক্যবোধ– তার ভাবনা-চিন্তায়, কাজ-কর্মে, এমন কি তার সজ্ঞান চেতনার এক ঐক্যানুভূতি।

ইসলামের সৌন্দর্য হলো, জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ব্যক্তিকে পার্থিব জীবন পরিত্যাগ করতে হয় না। সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, পার্থিব জীবন ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব। খ্রিষ্ট ধর্মে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র দৈহিক আকাঙ্ক্ষা দমন করেই এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের মাধ্যমেই ব্যক্তি পরিপূর্ণতা অর্জনে সক্ষম। হিন্দু ধর্মের বিধান হলো, নিচু স্তর থেকে ক্রমাগত পুনর্জন্মের ধারাবাহিক আবর্তনের মধ্য দিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েই ব্যক্তি লাভ করে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মোক্ষ। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে, ব্যক্তি সত্তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্মিলিত হবার আকুতি হলো নির্বাণ লাভের মাধ্যম।

ইসলাম কিন্তু বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত বিধান পালন করেই, গভীর আনুগত্যের সাথে, সচেতনভাবে, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেই একজন মুসলমান পরিপূর্ণ জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারেন। একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো সৃষ্টিকর্তা তাঁর অপার কৃপায় অত্যন্ত মূল্যবান নেয়ামত হিসেবে যে জীবন দান করেছেন তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করা।

মুসলমানরা কোরআন এবং সুন্নাহ্‌র নীতি অনুসরণ করে পরিপূর্ণ জীবনের আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন। অতীতেও তারা বিশেষ করে, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম এবং একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বময় নেতৃত্ব দিয়েছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে, উন্নত চিন্তা-ভাবনায়। বিশ্বের বৃহত্তর অংশও তাদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। আজকে কিন্তু মুসলিম বিশ্বের অবস্থা ভালো নয়। বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো

www.pathagar.com

(৫৬) জাতিসংঘের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের কিছু কম অথবা এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশি হলেও বিশ্ব বাণিজ্যে তাদের অংশ এখনো শতকরা ১০ ভাগের বেশি নয়। অন্যদিকে, বিশ্বের সামগ্রিক সম্পদের শতকরা ১৬ ভাগ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এবং বিশ্বের মোট জনসমষ্টির এক-চতুর্থাংশ এসব রাষ্ট্রে বসবাস করলেও অগ্রগতির সূচকের নিরিখে তারাই হলো বিশ্বের সবচেয়ে অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ জনসমষ্টির অংশ। অথচ বর্তমান সভ্যতার অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত যে ফসিল ফুয়েল বা জ্বালানী শক্তির উৎস পেট্রোল ও গ্যাস তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্যমান। তারপরেও তারা দরিদ্র। তারা নিঃস্ব। তারা অসহায়। তাদের অবস্থা অনেকটা পানিতে সাঁতার কেটেও তৃষ্ণার্ত অথবা বনে জঙ্গলে বসবাস করেও সবুজ দৃশ্যপট থেকে বঞ্চিত।

কেনো এমন হলো? কি কারণে? কোন্ পরিস্থিতিতে? আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এসব প্রশ্নের আলোকেই সমস্যার বিশ্লেষণ প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার উদ্যোগ সফল হোক- এই কামনা করি। তার মতো তরুণের দৃষ্টি এদিকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে- এটি বড়ো আশার কথা। আল্লাহ তার সহায় হোন।

(এমাজউদ্দীন আহমদ)
সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

গ্রন্থ প্রসঙ্গ

বিশিষ্ট গবেষক সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ-এর 'বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান' গ্রন্থের পান্ডুলিপি পড়ে মনে হয়েছে এই পরিশ্রমী লেখক সত্যের অনুসন্ধানী।

গবেষক সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ এই গ্রন্থে ইসলামের দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনাকালে তিনি পবিত্র কোরআন, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ, ঈমান, রোজা, হজ্ব, যাকাত, আজান, ঈদ, শবেবরাত, শবে কৃদর, মিলাদ, পর্দা, মসজিদ, মহরম, তাবলীগ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। লেখক অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন এবং পবিত্র কোরআন ও হাদীস থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। যুক্তির সাহায্যে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বর্তমানকালে সমগ্র পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে, অধিকাংশ মুসলমান পবিত্র কোরআন এবং ইসলামের মূল আদর্শ ও নির্দেশসমূহ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। সেই জন্যই মুসলমান আজ বিভক্ত, দ্বিধাগ্রস্থ ও বিপন্ন। ইসলামের শত্রুরা সেই সুযোগে মুসলমানের অমার্জনীয় ক্ষতি করতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে জন্মলগ্নেও ইসলাম শত্রু কবলিত হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ে ঈমানের দৃঢ়তা ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অসাধারণ সততার প্রভাবে পৃথিবীর মানুষকে একটি অতি আধুনিক বিশ্বনন্দিত সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিয়ে পবিত্র কোরআনের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিলো।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মূল্যায়ন করতে যেয়ে ইহুদি লেখক Maxime Rodinson তার গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ".... there was a power in him which, with the help of circumstances, was to make him one of the rare man who have turned the world upside down." (Reference : Muhammad by Maxime Rodinson. Page-313, Panguin Books, 1977)। (তাঁর মধ্যে এমন ক্ষমতা ছিলো যার বলে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তাঁর মতো একজন অনন্য মানুষ পৃথিবীকে ওলোটপালট করে দিয়েছিলেন)। পরবর্তীকালে মুসলমানেরা প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে যে জনকল্যাণকামী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল তার ভিত্তি ছিলো পবিত্র কোরআনের সঠিক অনুসরণ।

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদের এই গ্রন্থে পাঠক খুঁজে পাবেন ইসলামের মূল আদর্শসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা এবং সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুতির অগণিত উদাহরণ। গ্রন্থটি মুসলমান সমাজকে বিভ্রান্তির কবলমুক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

(শাহ্‌রিয়ার জেড. আর ইকবাল)
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
ও
সাবেক মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

২৬ মে, ২০০১ ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

একদিন এক খৃষ্টান বন্ধু বার্নাড শ'কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, "আপনি ইসলামের প্রতি যখন এতোই অনুরক্ত তখন ইসলাম গ্রহণ করছেন না কেনো? তিনি বলেছিলেন যে, "আমি এই ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি কিন্তু কোথায় সেই মুসলিম সমাজ যেখানে প্রকৃত মুসলমান হয়ে আমি বসবাস করতে পারবো।"

বিশ্বের মুসলমানদের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা বার্নাড শ'য়ের উল্লিখিত বক্তব্যের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করি। এক সময়ে মুসলমানেরা ছিলো অর্ধ-জাহানের শাসক। এরা অসভ্য জংলী জাতিকে সভ্য বানিয়েছেন। প্রতিক্রিয়াশীল থেকে মানুষকে প্রগতিশীল করেছেন। নারী মুক্তি, দাস প্রথা, সতীদাহ প্রথা, বর্ণভেদ রহিত করে 'আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান' ঘোষণা দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন। অথচ বর্তমানে বিশ্বের মুসলমানেরা নির্যাতীত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে মুসলমানদের এই দূরাবস্থার কারণ কি? এর জবাব আমরা কবি ইকবালের ভাষ্যে পাই। তিনি বলেছিলেন– "ওঁরা বিশ্বে সম্মানিত হয়েছিলো খাঁটি মুসলমান হয়ে, আর তোমরা ধ্বংস হচ্ছো কোরআন পরিত্যাগ করে।"

এই কোরআনকে ত্যাগ করার ফলে মুসলমান জাতি আজ দ্বিধাবিভক্ত। বিজাতীয়দের পাতানো ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে মুসলমানেরা নিজ স্বকীয়তা হারিয়ে নানাবিধ কুসংস্কার ও পঙ্কিলতায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রণীত 'বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান' গ্রন্থটিতে চমৎকারভাবে মুসলমানদের দূরাবস্থার কারণগুলো চিত্রিত করেছেন। এই গ্রন্থটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি বলিষ্ঠ ও ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চারণ বলে বিবেচনা করা যায়। লেখক মুসলমানদের দুর্গতির কারণগুলো স্বচ্ছ ভাষায় ইসলামের আলোকে ইতিহাসের গহ্বর থেকে ছেঁকে তুলে অনেক দামী ও দরকারী কথা তিনি বিভ্রান্ত জাতিকে উপহার দিয়েছেন।

সঙ্গত কারণেই বন্ধু প্রকাশনী এই বইটি প্রকাশের আনজাম দিয়েছে। পাঠক মহলে বইটি সমাদৃত হলে আমাদের আয়োজন সার্থক হবে।

কে. এম. মোকতাদার হাসান (চন্দন)
স্বত্বাধিকারী
বন্ধু প্রকাশনী

www.pathagar.com

লেখকের কথা

আলো এবং অন্ধকার প্রকৃতির এই দু'টি দিক আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য ও অনুধাবনযোগ্য। আমরা আলোর পক্ষে। আমরা আলোর অন্বেষণ করি। প্রকৃতপক্ষে কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষই অন্ধকারের পক্ষে হতে পারে না। সত্য, ন্যায়, সুন্দর, স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক ধারাটিকে ইতিবাচক বা আলোকিত দিক বলা হয়। অপরপক্ষে অসত্য, অন্যায়, অসুন্দর, অস্বচ্ছ ও অস্বাভাবিক ধারাকে নেতিবাচক বা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক মনে করা হয়।

ইসলাম এই পৃথিবীতে এসেছে পৃথিবীকে তথা মানব জাতিকে আলোকিত করার আলোকবর্তিকা হয়ে। স্বভাবতই ইসলাম সত্য, ন্যায়, সুন্দর, স্বচ্ছ ও জীবনের স্বাভাবিক ধারাকেই এগিয়ে নেয়ার ধর্ম। এতো সহজ-সরল, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, সবার জন্য কল্যাণময় জীবন পদ্ধতি এই পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। কারণ 'ইসলাম' ধর্মের যে দর্শন, যে জীবন পদ্ধতি, যে জীবনাচার তা মানুষের চিন্তায় সৃষ্ট নয় বরং স্বয়ং আল্লাহতায়ালা প্রণীত জীবন বিধান এবং আল্লাহর প্রেরিত রাসূল দ্বারা (যিনি সর্বজন স্বীকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব) বাস্তব জীবনে প্রয়োগকৃত এবং পরীক্ষিত। ফলে ইসলামের কোনো একটি বিষয়, বক্তব্য, আচার-অনুষ্ঠান মানব জীবনের কল্যাণ পরিপন্থী হয়নি। সব ধর্মেরই কিছু বিষয় আছে, যা অতীতকালের ধারণা প্রসূত বিষয় হিসাবে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসার বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু ইসলামের কোনো ধারণা বা বক্তব্য আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যাচাইয়ে মিথ্যা বা অসার প্রমাণিত হয়নি। বরং ইসলামে নির্দেশিত পাক-পবিত্রতা, অজু, গোসল, নামাজ, রোজাসহ অনেক খুটিনাটি বিষয় আছে, যা মানুষের দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক তথা বিজ্ঞানসম্মত। এ কারণেই বলা যায় ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে যাচাই হওয়া নিখুঁত-নির্ভুল মতবাদ। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে সঠিকভাবে ইতিবাচক ধারায় প্রবাহিত করার গাইড লাইনই হচ্ছে 'ইসলাম'।

অজ্ঞতার কারণে ইসলামের নিয়ম-নীতি, রীতি-প্রথা মুসলমানদের দ্বারাই যখন বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির পথে এগুতে থাকে তখন জন্মসূত্রে মুসলমান হলেও আমরা প্রকৃত 'ইসলাম' থেকে অনেক দূরে সরে যেতে থাকি। জীবনের স্বাভাবিক গতি তখন মন্থর হয়ে আসে। শান্তির বদলে অশান্তি, সমৃদ্ধির স্থলে দারিদ্র, শক্তি ও সামর্থের জায়গায় মুসলমানেরা দুর্বল ও সামর্থহীনদের কাতারে সামিল হতে থাকে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের 'ভুল'কে 'ইসলাম'-এর দুর্বলতা হিসাবে মনে করা হতে থাকে। অথচ মুসলমানদের অজ্ঞতা, জ্ঞান বিমুখতা, আত্মউপলব্ধির অক্ষমতা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দুর্বল করে ফেললেও 'ইসলাম'-এর মৌল দর্শন একবিন্দু গ্রহণযোগ্যতা হারায়নি। হারায়নি ইসলামী আদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠতা।

কয়েক বছর আগে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একজন প্রবাসীর চিঠিতে জানা যায়, প্রবাসী মুসলমান বন্ধুটি পবিত্র কোরআনের এক কপি ইংরেজী অনুবাদ স্থানীয় এক ইংরেজ বন্ধুকে পড়তে দিয়েছিলেন। সপ্তাহ দু'য়েক পর পবিত কোরআন শরীফটি ফেরত আনতে গেলে ইংরেজ বন্ধুটি জানায়– "তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থটি আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি। সমগ্র মানবজাতি তথা সৃষ্টিকূলের জীবন-বিধান হিসাবে গ্রন্থটি চমৎকার। এরপর তোমাদের পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় খন্ডটি আমাকে পড়তে দিও। একথা শুনে মুসলমান বন্ধুটি বলেন, আমি ৩০ পারার সম্পূর্ণ খন্ডটিই তোমাকে দিয়েছি। পবিত্র কোরআনের আর কোনো খন্ড নেই।

খ্রীষ্টান বন্ধুটি বিস্মিত হয়ে বলেন, "তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়সহ মানব কল্যাণে প্রতিটি বিষয় যেভাবে বিধৃত হয়েছে তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনাচারে অনেকাংশেই তা অনুপস্থিত। সঙ্গত কারণেই আমার মনে হয়েছে হয়তো আরেক খন্ড পবিত্র কোরআন তোমাদের রয়েছে।"

www.pathagar.com

বর্তমানে আমাদের জীবন ব্যবস্থায় এই পবিত্র কোরআনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এককালে মুসলমানেরা এই পবিত্র কোরআনকে ইহলৌকিক জীবন-যাপনের এবং পরকালের মুক্তির দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করে বিশ্বে সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলো। মুসলমানেরা স্পেন বিজয়ের পর ইউরোপ ভূ-খন্ডে মানব সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলো। গারো, কুকি, নাগা ও খাসিয়া এবং আমেরিকান বর্বর জংলীদের সভ্য করেছিলো। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজকে মুসলমানেরা পাশ্চাতের কাছ থেকে তথাকথিত সভ্যতার উচ্ছিষ্ট গলধঃকরণ করে জাতে উঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আর পবিত্র কোরআনকে অন্যান্য বিজাতীয়দের ধর্ম গ্রন্থের ন্যায় পবিত্র বিবেচনা করে ছওয়াবের আশায় শুধুমাত্র রিডিং পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখায় এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্বের দুর্ভাগা জাতিতে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের এরূপ দুঃখজনক করুণ পরিণতি দেখে মহাকবি আল্লামা ইকবাল আক্ষেপ করে বলেছিলেন :

"খুব তো কহিছ দুনিয়া হইতে বিদায় নিতেছে মুসলমান।
প্রশ্ন আমার : মুসলিম কোথায়? সে কি আজো আছে বিদ্যমান?
চলন তোমার খৃস্টান, আর হিন্দুয়ানী সে তমুদ্দুন,
ইহুদীও আজি শরম পাইবে দেখিলে তোমার এসব গুণ।
হতে পার তুমি সৈয়দ, মীর্জা, হতে পার তুমি সে আফগান,
সবকিছু হও, কিন্তু শুধাই : বলত তুমি কি মুসলমান?"

(জবাব-ই-শিকওয়া; কাব্যানুবাদ- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ)

ভারত থেকে বৃটিশ শাসন অবসানের ৯৪ বছর আগে কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন, "... বৃটিশরা ভারতীয় গ্রাম্য সমাজের ভিত ভেঙ্গে দিয়েছে, শিল্প-বাণিজ্য উচ্ছেদ করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতায় যা কিছু মহৎ ও গৌরবের বস্তু তা সমস্তই ধ্বংস করেছে। ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো এই ধ্বংসের কাহিনীতে কলংকিত। বিরাট এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজাগরণের আলোক রশ্মি প্রবেশ করতে পারে না। তাহলেও স্বীকার করতেই হবে, ভারতের নবজাগরণে শুরু হয়েছে।"

কার্ল মার্কসের এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৫৩ সালের ৮ আগস্ট নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায়। এর প্রায় ৯৪ বছর পর ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

কার্ল মার্কসের মন্তব্য অনুযায়ী ১৭৫৭ সালের আগে ভারত ছিলো তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বপেক্ষা শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যশালী দেশ। শিক্ষা, চিত্রকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, সংগীত, সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তৎকালীন মুসলিম শাসকেরা। যা তৎকালীন মহাকবি মিল্টনসহ খ্যাতনামা দার্শনিক-নেতা কর্তৃক স্বীকৃত। মহাকবি মিল্টনকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, মোঘলদের নাম উঠলেই তিনি The Great Mugul শব্দটি ব্যবহার করেন কেনো? জবাবে তিনি বলেছিলেন : "ভারতের শাসকেরা মহান, তাদের দেশে যখন বয়স্কদের প্রতি সম্মান, সমবয়সীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তখন আমাদের ভূখন্ডে গির্জায় গির্জায় যুদ্ধ চলছে এবং বয়স্ক রমণীদের ডাইনী বলে অভিযুক্ত করে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে।"

এই সম্পদশালী ভারতবর্ষে সম্পদের লোভে বিদেশী শকুনদের শ্যান দৃষ্টি পড়ে। সম্পদের লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে হওকিন্স জলদস্যুরা এদেশে আসতে শুরু করে এবং তৎকালীন সম্রাটের উদারতার সুযোগ নিয়ে ছলেবলে কৌশলে ব্যবসায়ের ছদ্মাবরণে মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুদের সহায়তায় এদেশের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে।

রাজ ক্ষমতা ছিনিয়ে ইংরেজরা প্রথমেই আঘাত হানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। চির প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদেরকে ইসলামের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইংরেজরা এদেশ দখল করে প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর শিক্ষা বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি।

www.pathagar.com

ইংরেজ সরকার ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে শুধুমাত্র কলকাতায় তাদের মনগড়া ও ইসলাম সম্মত নয় এমন সিলেবাস প্রয়োগে একটি মাদ্রাসা ও ১৭৯২ সালে বেনারসে সংস্কৃতি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। যার উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমান ও হিন্দুদের ধর্মীয় কাজ সমাধা করার জন্যে শাসকদের অনুগত মৌলভী ও পন্ডিত সৃষ্টি করা।

পরবর্তীতে ইংরেজ সরকার ১৮১২ সালে এদেশে একটি শিক্ষানীতি চালু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এই শিক্ষনীতির উদ্দেশ্য ছিলো তৎকালীন বৃটিশের উদারপন্থী দলের মিঃ ম্যালকম এর ভাষায়– "যখন আমাদের শাসন শেষ হবে, এবং তা হতে বাধ্য (যদিও সম্ভবত: বহু পরে) তখন আমাদের শিক্ষার বিকিরণের স্বাভাবিক সূচক স্বরূপ আমাদের জাতি হিসাবে এ গর্ব থাকবে যে, আমরা ভারতের চির পরাধীনতার পরিবর্তে সভ্যতাকেই উচ্চ স্থান দিয়েছিলাম। আমাদের ক্ষমতা শেষ হলেও আমাদের নাম শ্রদ্ধার সাথে কৃতিত্ব হবে, কারণ আমরা একটা এমন মহৎ নীতিবোধের স্মৃতিসৌধ রেখে যাব, যা মানুষের সব নির্মিতের চেয়ে মহত্তর ও অবিনশ্বর।"

উগ্রপন্থী দলের আইন সভার সদস্য মেকলে বলেছিলেন, "বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, সমাজে যারা শাসক-শাসিতের মধ্যে দো-ভাষীর কাজ করবে। তারা রক্তে-মাংসে গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকর হয় ... তাহলে আমাদের তরফ থেকে কোনো রকমের ধর্মান্তরের চেষ্টা না করেও এ ধরনের সামাজিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও প্রয়োজন হবে না। কেবল নতুন শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এ অসাধ্য সাধন হবে।"

১৯০ বছর বৃটিশ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ১৯৪৭ সালে যে চেতনা ও আদর্শ নিয়ে দেশ ভাগ হয়েছিলো, পাকিস্তানের ২৩ বছরে তা বাস্তবায়ন হয়নি। পাকিস্তানের ২৩ বছরে তথাকথিত ইসলাম পছন্দ দলগুলো বলেছে 'ইসলাম চলা গিয়া, ইসলাম চলা গিয়া'; আর সেক্যুলার দলগুলো বলেছে 'ইসলাম কাঁহা চলা গিয়া ইসলাম কাঁহা চলা গিয়া'। অথচ রাষ্ট্রীয় জীবনে তো বটেই পারিবারিক জীবনে ইসলাম পছন্দ নেতাদের ইসলামী অনুশাসন ও শিক্ষা ছিলো অনুপস্থিত। এরা জনগণকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে সভা-সমাবেশে বলেছেন– 'কোরআন-সুন্নাহ্' বিরোধী কোনো আইন পাস করতে দেয়া হবে না। অথচ কোরআন-হাদীসের পক্ষে কোনো আইন পাস না করে বৃটিশ প্রণীত আইনে সাধারণ জনগণকে শোষণ করার মোনাফেকী পন্থা বহাল রেখেছে। সেক্যুলারিজম রাজনৈতিক নেতাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই দু'দলের পারস্পরিক আদর্শিক দ্বন্দ্বে ইসলাম বিষয়ে জনগণ হয়েছে বিভ্রান্ত। আর এই সুযোগটাই ব্যবহার করেছে বা এখনো করছে বিজাতীয় শত্রুরা ও তাদের এদেশীয় দালালেরা।

এইসব বিজাতীয় শত্রু ও তাদের এদেশীয় দালালেরা অত্যন্ত সুসংগঠিত। হরেক রকমের চেতনার নামে তারা জাতিকে করেছে বিভক্ত। তাদের চক্রান্তের ধারা, কর্ম-কৌশল ও পরিকল্পনা অত্যন্ত নিখুঁত, তীব্র ও তীক্ষ্ণ। কিন্তু আমাদের ইসলামী দলগুলো সে তুলনায় খুবই বিশৃংখল। এই বিশৃংখল পরিস্থিতি ও বিভ্রান্তির অবসান করা যাবে না ঈমানী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ না হয়ে। শক্তি প্রয়োগ ছাড়া সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ইতিহাস এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সুতরাং সনাতন পদ্ধতিতে এই সুসংগঠিত ইসলাম-বিদ্বেষী ও ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এদের মোকাবেলা করতে হবে পবিত্র কোরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশিত পথে। নতুবা বর্তমান অসহনীয় অবস্থা ও বিভ্রান্তি থেকে মুসলমানদের উত্তরণের আর কোনো বিকল্প পন্থা নেই।

বৃটিশের এই দু'রকমের কুশিক্ষা নীতির কারণে দু'দু'বার স্বাধীনতার পতাকা বদলিয়েও

www.pathagar.com

কার্ল মার্কসের নবজাগরণের আলোক রশ্মি আমাদের মাঝে প্রজ্বলিত হয়নি। আধুনিক শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষার সমন্বয় না ঘটানোর ফলে একদিকে তৈরি হচ্ছে 'সাহেব' আর অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে 'হুজুর'। এই সাহেবেরা চেহারায় ও রংয়ে এদেশীয় হলেও মন-মানসিকতায় বিজাতীয় গোলাম। আর হুজুরেরা অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানধারী হওয়ার কারণে তাদের কার্যক্রম মসজিদের ইমামতি, জানাজা ও মিলাদ পড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ অনেকেরই ভাগ্যে জোটে না।

এছাড়া সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশই সরকারি অনুদানে পরিচালিত হয়। আর মাদ্রাসাগুলো ছিটেফোটা সরকারি অনুদানে পরিচালিত হলেও অধিকাংশ মাদ্রাসা জনগণের চাঁদায় পরিচালিত হচ্ছে। মাদ্রাসার শিক্ষকেরা ছাত্রদেরকে জনগণের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে উৎসাহিত করে। এর ফলে ছাত্রদের এই চাঁদা আদায়ের প্রবণতা ভিক্ষার মানসিকতায় পরিণত হয়। এই মানসিকতা তাদের মধ্যে কর্মজীবনেও প্রত্যক্ষ করা যায়। এসব কারণে সমাজের অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা তাদের প্রতিভাবান সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় ভর্তি করাতে চায় না। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এইসব অভিজাত শ্রেণীর কারো সন্তান হাবা-গোবা কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধী হলে আল্লাহর ওয়াস্তে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেন। এইসব কারণে এই দু'শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে মুসলমানেরা সঠিক দিক-নির্দেশনা, ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিভ্রান্তির বেড়াজালে হাবুডুবু খাচ্ছে সমগ্র জাতি।

মুসলমানদের এই করুণ পরিনতিতে মহাকবি ইকবাল শুধু আক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হন নি। আশার বাণীও শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "মুসলমানেরা ইসলামকে রক্ষা করেনি। বরং ইসলামই যুগে যুগে ভাগ্য বিড়ম্বিত অধোপতিত মুসলমানদের বার বার রক্ষা করেছে।" ইতিহাসের পাতা উল্টালে এবং সমকালীন বিশ্বের দিকে দৃষ্টি ফেরালে মহাকবি ইকবালের উল্লেখিত উক্তির যথার্থতা দৃশ্যমান হবে।

আমাদের দেশের অনেক প্রখ্যাত আলেম-ওলামা, দার্শনিক, তাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ ও ইসলামী বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও মিডিয়ায় পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে বিশ্লেষণ করে ইসলামী দর্শনের পক্ষে অকাট্য যুক্তি দিয়ে থাকেন। আর যেসব তথ্য ও তত্ত্ব বাতিলের সাথে সংঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে তা সুকৌশলে এড়িয়ে যান। এছাড়া প্রচার মিডিয়ায় যেভাবে কোকিল কণ্ঠে ইসলামের দর্শন তুলে ধরা হয়; সেভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, বিজাতীয় দর্শন ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত নিষ্ক্রিয়তা রহস্যজনক। এদের কথা ও কর্মের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এদের নীতি হলো– 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'। আর লালনের ভাষায় এদের সম্পর্কে বলা যায় :

"আমার যেমন বেনী
তেমনি রবে, চুল ভিজাব না,
জলে নামবো, জল খেলিব
জল তো ছোঁব না।"

জানিনা লালন কাদের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ ইসলাম প্রিয় বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বক্তব্য প্রযোজ্য। তাদের লেখা বই-পুস্তকে যেসব কথা লেখা হয়, প্রচার মিডিয়ায় যেসব বক্তব্য শোনা যায়, সভা-সমাবেশে দেয়া হয় ভিন্নতর বক্তব্য। আবার সভা-সমাবেশে যেসব বক্তব্য শোনা যায় ঘরোয়া বৈঠকে তারা অন্য রূপে আবির্ভূত হন। ঘরোয়া বৈঠকে তারা যেরূপে আবির্ভূত হন, ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মে দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্যরূপে।

এক সময় আমি ছিলাম তথাকথিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সমর্থক। ১৯৬৯ সালের দু'টি ঘটনায় এই রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রের নমুনা এবং ইসলাম

www.pathagar.com

বিষয়ে হীনমন্যতা, কৌশলগত চক্রান্ত ও বিদ্বেষমূলক আচরণ দেখে আমার মনে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হয়। এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে ইসলাম বিষয়ক গবেষণামূলক বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করি। এসব গ্রন্থ পাঠ করে আমার জীবনের বাঁক ঘুরে যায়। আল্লাহর রহমতে অন্ধকার হৃদয়ে আলোক রশ্মি প্রজ্জ্বলিত হয়। এই প্রজ্জ্বলিত আলোক রশ্মির সাহায্যে ব্যাপক পড়াশোনার মাধ্যমে সত্যকে জানবার ও উপলব্ধি করার সৌভাগ্য হয়েছে। 'বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান' গ্রন্থটি প্রণয়ন বলা যায় আমার আত্ম-উপলব্ধির নির্যাস।

ইসলাম একটি বিশাল গবেষণামূলক পূর্ণতম ধর্ম। এই ধর্মকে জানার কোনো শেষ নেই। তবুও সীমিত জ্ঞানে যতটুকু জেনেছি ও বুঝেছি, তাতে মুসলমানদের জীবনযাত্রার বহুক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও বিচ্যুত পরিলক্ষিত হয়েছে যা এই গ্রন্থে বিশ্লেষণমূলকভাবে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। আমার আলোচনায় যেসব বক্তব্য, তথ্য ও তত্ত্ব সংযোজন করা হয়েছে, তা আমার মনগড়া কিছু নয়। সবই নেয়া হয়েছে আল-কোরআন, আল-হাদীস এবং ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের গ্রন্থ থেকে।

প্রিয় নবী হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত ও নবুয়ত পূর্ববর্তী পূণ্যতম জীবন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত, সামাজিক, তথা নবুয়তী দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট নানা ঘটনার ঐতিহাসিক স্থানসমূহের সবিশেষ গুরুত্ব অনুধাবনের তাৎপর্যতায় পুস্তকটিতে চিত্রসমূহ সংযোজিত করা হলো– যা আজো নবীজীবনের নানা ঘটনার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হয়ে আছে।

এছাড়া চিরস্থিত দেদীপ্যমান সত্যতম ইসলামের নির্দেশের সামগ্রিক কর্মপন্থা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবস্থান যে কতো দুর্বল ও অস্থির তা আজ সকলের কাছে স্পষ্ট। ব্যক্তি-সমাজ ও জাতীয় জীবনে এই নেতৃত্ব দুর্বলতর অবস্থানে রয়েছে বলে মুসলমানরা আজ শংকিত। এই গ্রন্থে আমি নেতৃত্বের এই সংকটকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

বইটি প্রণয়নে যাঁরা আমাকে গঠনমূলক পরামর্শ, সহযোগিতা দিয়েছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁদের সবার কাছে আমি চিরঋণী। সম্মানিত পাঠকদের কাছে এই গ্রন্থটিতে কোনো ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে তা কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হবে এবং আগামী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ ও বানান বিভ্রাট রয়ে গেছে। সম্মানিত পাঠক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে বাধিত হবো।

পাঠক মহলে বইটি সমাদৃত হলে আমার মেহনত সার্থক মনে করবো।

পরম করুণাময় আল্লাহপাকের কাছে আমার প্রার্থনা মনের অজান্তে অথবা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো ভুল হয়ে থাকলে আমায় ক্ষমা করবেন। আর যদি সঠিক হয় আমার এই মেহনতকে কবুল এবং মুসলমান জাতিকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে আপনিও কিছু করুন। আমিন!

১২ রবিউল আউয়াল ১৪২২ (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ)

৫ জুন, ২০০১

www.pathagar.com

সূচিপত্র

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

পবিত্র কোরআন এবং সমকালীন প্রেক্ষাপট-১ # পবিত্র কোরআনের আলোকে মুসলমানের শত্রু-মিত্র-১৩ # অমুসলিমদের দৃষ্টিতে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন-১৬ #

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর আদর্শ ও আজকের বিশ্ব-২২ # অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে মহানবী (সাঃ)-২৯ # মদীনা সনদ ঃ ইতিহাসের প্রথম শাসনতন্ত্র-৩৬ # বিদায় হজ্বের বাণী-৪১ # এক নজরে মহানবী (সাঃ)-এর বর্ণাঢ্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী-৪৩ # নবী জীবনের নানা ঘটনার ঐতিহাসিক কিছু ছবি-৫৩ #

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

ঈমান-৭৪ # এবাদত বন্দেগী-৭৭ # নামাজ-৭৮ # রোজা পালন ঃ আত্মশুদ্ধি এবং সংযমের শ্রেষ্ঠতম উপায়-৭৯ # হজ্ব-৮৫ যাকাত ও ইসলামী অর্থনীতি-৮৯ # মিলাদ শরীফ-৯৩ # দান বা সদকাহ্-৯৬ # ভিক্ষাবৃত্তি-৯৭ # আজান-১০১ # ধর্মীয় উৎসব-১০৫ # ঈদুল আজহা-১১৪ # শবে বরাত/ শবেকদ্দর-১১৫ # শবে মেরাজ-১১৭ # কুলখানী/ চেহলাম-১১৭ # কাঙ্গালী ভোজ-১১৮ # শবিনা খতম-১১৮ # আকীকা-১১৯ # জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী-১১৯ # খতনা-১২০ # মানত-১২০ # কদমবুসি-১২২ # সালাম-১২৩ # শহীদ-১২৫ # পর্দা-১২৬ # ফতোয়া-১২৮ # মসজিদ-১৩০ # মহররম-১৩৫ # ধর্মীয় কুসংস্কার-১৪১ # তাবিজ মাদুলী-১৪৮ # ঝাড়-ফুঁক-১৫১ # নাম বিকৃতির সংস্কৃতি-১৫৪ # শিক্ষায় শেরেকীর প্রচলন-১৬৩ # এপ্রিল ফুল শোক দিবস-১৬৬ # কবর পূজা-১৬৭ # পীর পূজা-১৭০ # পীর ব্যবসা-১৮৯ # সূফীবাদ-২১২ # আলেম সমাজের বর্তমান ভূমিকা-২১৫ # প্রসঙ্গ তাবলীগ-২২৮ # কাদিয়ানী ফিৎনা-২৪০ #

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

সভ্যতা-২৪৪ # বাংলা ভাষা সংস্কার ঃ ইসলাম বিরোধী উপাখ্যান-২৫৫ # ধর্ম নিয়ে ব্যবসা-২৬৪ # ওআইসি, না Oh! I See-২৭৫ # আমেরিকান পীসকোর-২৭৭ # উপসংহার-২৮৬ # পরিশিষ্ট-১, 'দি স্যাটানিক ভার্সেস' : সহস্র বৎসরের চক্রান্ত- সৈয়দ আশরাফ আলী- ২৮৮ # পরিশিষ্ট-২, বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা নব্য খ্রিষ্ট রাজ্যের নীল নকশা- মোহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম-২৯২ # পরিশিষ্ট-৩, এক আল্লাহ ছিলো আদি মানবের উপাস্য, মওলানা আবুল কালাম আজাদ- ৩০২ # সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী-৩০৪ ।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
পবিত্র কোরআন এবং সমকালীন প্রেক্ষাপট

মাওলানা রুম বলেছেন–

"কোরআনের মগজ আমি লাভ করিয়াছি
অস্থিসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছি কুকুরের সামনে।"

মহাকবি ইকবাল বলেছেন–

"তুমি সূফী ও মোল্লার ফাঁদে কয়েদ আছ,
কুরআনের জ্ঞানগর্ভ বাণী, হতে তুমি জীবন লওনা।
তাহার প্রবচনে তোমার এ ছাড়া আর কাজ নাই।
যে, তুমি 'ইয়াসীন' সূরা দ্বারা শান্তিতে মরিবে।"

আর কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন–

"আছে সে কোরআন মজিদ আজিও পরম শক্তিভরা
ওরে দুর্ভাগা এক কণা তার পেয়েছিস বল তোরা?"

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, "কোরআন মজিদ কেবলমাত্র নামাজ আর অজুর বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরং তা মানবজাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণের এক পরিপূর্ণ বিধান। মানব জীবনের কোনো দিকই তাতে বাদ পড়েনি। তাই মুসলমানদের সব নীতি ও কাজ কোরআনের উপর ভিত্তি করে যদি প্রচলিত না হয় তাহলে তা তাদের কোনো কল্যাণে আসবে না।"

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "কোরআন শরীফ কোনো বৈজ্ঞানিক পুস্তক না হইলেও ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে। কোরআন আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনের জন্য প্রাসঙ্গিক রূপে এরূপ অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহা আশ্চর্যরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া যায়। যদি দুই-এক স্থানে সামান্য ফাটল দেখা যায়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা।"

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছেন, "কোরআনের অনুশাসনই একমাত্র সত্য এবং একমাত্র কোরআনই মানুষকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অমুসলিম মনীষী টলস্টয় বলেছেন, "কোরআন মানব জাতির একটি শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের নিখুঁত দিক-দর্শন। দুনিয়ার সামনে যদি এই একটিমাত্র গ্রন্থ থাকতো এবং কোনো সংস্কারকই না আসতেন তবু মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এটাই ছিলো যথেষ্ট।"

www.pathagar.com

পবিত্র আল-কোরআন সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের অসংখ্য উক্তি তুলে ধরা যায়। পবিত্র কোরআনের স্বপক্ষে অমুসলিম মনীষী টলস্টয় আর নেপোলিয়ান যে সুস্পষ্ট ও জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এরপর আর কোন মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। অথচ মুসলিম নামধারী এ দেশীয় কতিপয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অত্যন্ত ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ ক্ষমাহীন বক্তব্য রেখেছেন। পবিত্র কোরআনকে সে কালের উপকথা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, এমনকি পবিত্র কোরআনের সূরাকে অবলম্বন করে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতাও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যা কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী কর্তৃক মুক্ত চিন্তার চর্চা নামে অভিহিত হয়েছে। এদেশে পবিত্র কোরআন এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ সমালোচনা করলে হয় মুক্তিবুদ্ধির চর্চা আর এর পক্ষে কথা বললে হয় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক। আর অন্যান্য ধর্মের স্বপক্ষে কথা বললে হয় অসাম্প্রদায়িক।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছে কেউ বুঝে, কেউ না বুঝে। যারা না বুঝে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছে তাদের কাছে পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী সঠিকভাবে তুলে না ধরার ব্যর্থতা তো আছেই। এর জন্য দায়ী আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ এবং বৃটিশ আমলের শিক্ষা পদ্ধতি।

ইসলাম ও পবিত্র কোরআনকে না বুঝে বিরোধিতা করা সমকালীন সময়েই হয়নি। ইসলামের ইতিহাসেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এক সময় ছিলেন ইসলাম ধর্মের চরম বিরোধী। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর ক্রোধের সীমা ছিলো না। তাঁর বংশের যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি তাঁদের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ান।

লবীনা নামে তাঁর এক বাঁদীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সংবাদ জানতে পেরে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে ভীষণ প্রহার করেন। লবীনা ছাড়া অন্য যাদের উপর ক্ষমতা ছিল তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে ওমর নির্মমভাবে উৎপীড়ন করতেন। কিন্তু ইসলামের এমন মোহিনী শান্তি ছিলো যে, যে একবার তা গ্রহণ করতেন জীবন থাকতে তিনি তা পরিত্যাগ করতেন না। এতো অত্যাচার উৎপীড়ন করেও ওমর (রাঃ) যখন একটি লোককেও ইসলাম হতে বিচ্যুৎ করতে পারেননি। তখন তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েন এবং ইসলাম প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেই নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তিনি উন্মুক্ত তরবারি হস্তে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সন্ধানে বের হলেন।

ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে নাঈম ইবনে আবদুল্লাহের সাথে তাঁর দেখা হলো। ওমরের হাবভাব দেখে নাঈম কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটা দফারফা করতে চললাম। নাইম বললেন ঃ প্রথমে নিজের ঘর সামলাও, তোমার ভগ্নী ও ভগ্নিপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছে। ওমর তৎক্ষণাৎ গতি পরিবর্তন করে বোনের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হন। ওমর যখন ভগ্নিপতির

www.pathagar.com

বাড়ীতে পৌঁছলেন তখন তাঁর ভগ্নী ফাতেমা পবিত্র কোরআন পাঠ করছিলেন। ওমরের আভাস পেয়ে তিনি নীরব হয়ে গেলেন এবং কোরআনের পাতাগুলো লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু ওমর কোরআনের বাণী স্পষ্ট শুনে ফেলেছিলেন। তিনি ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পড়ছিলে ফাতেমা? ভগ্নী বললেন, কৈ, কিছুইতো না। রাগান্বিত হয়ে ওমর বললেন, গোপন করলে কি হবে? আমি শুনতে পেয়েছি তোমরা উভয়েই নাকি পিতৃধর্ম ত্যার্গ করেছ। এই বলে তিনি ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে আরম্ভ করলেন। স্বামীকে রক্ষা করতে যেয়ে তাঁর ভগ্নীও আহত হলেন এবং তাঁর দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেল। এই অবস্থাতেই তিনি বলতে থাকেন ঃ 'ভ্রাতা! তোমার যা ইচ্ছে করতে পার। কিন্তু ইসলাম অন্তর হতে কিছুতেই বিদূরিত হবে না।' ভগ্নীর এরূপ তেজোদীপ্ত উক্তিতে ওমরের অন্তরে দাগ কাটে। এ ছাড়া আপন সহোদরার দেহে রক্ত দেখে তাঁর অন্তর স্নেহাসিক্ত হয়ে উঠে। হযরত ওমর (রাঃ) একটু নম্র স্বরে বললেন, ফাতেমা! তুমি একটু আগে যা পড়ছিলে তা আমাকেও শুনাও। ফাতেমা কোরআনের অংশটি হাতে নিলেন। তখন তিনি সূরা-হাদীদে পড়ছিলেন ঃ

"আসমান ও জমিনেঁ যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা কীর্তন করে, তিনি মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী..... ।"

এই আয়াতটি হতে তিনি সম্মুখের দিকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়ে যাচ্ছিলেন আর প্রত্যেকটি কথা ওমরের মর্মে আঘাত করছিলো। পড়তে পড়তে যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন ঃ 'এবং তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।"

তখন হযরত ওমর (রাঃ) এর হৃদয়ে ভাবান্তরের উদয় হয়। ভাবাবেগে তিনি বলে উঠলেন, "আশ্হাদু-আল-লাইলাহা ইল্লাললাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।

ঐ সময় রাসূলে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাফা পাহাড়ের পাদদেশে যায়েদ ইবনে আরক্বামের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহের (সাঃ) সন্ধান করতে করতে তথায় যেয়ে পৌঁছলেন এবং দরজা খুলবার জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলেন। হযরত ওমরের কটিদেশে ঝুলায়মান শাণিত তরবারি দেখে সাহাবীগণ দরজা খুলে দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পিতৃব্য হযরত আমির হামযা (রাঃ) বললেন ঃ আসতে দাও, যদি সৎ ইচ্ছা নিয়ে এসে থাকে, তবে তা মঙ্গল। অন্যথায় তার তরবারি দ্বারাই তার মস্তক দ্বি-খন্ডিত করে দেয়া হবে। দরজা খুলে দেয়া হলো। হযরত ওমর গৃহে পদক্ষেপ করার সাথে সাথেই হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর হাতে হাত রেখে বললেন ঃ "ওমর! কি মনে করে আসলে?"

হযরতের গাম্ভীর্যপূর্ণ সম্বোধনে বীর ওমর একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি অতি নম্রতার সাথে নিবেদন করলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের জন্য। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আনন্দাতিশয্যে বলে উঠলেন– আল্লাহু আকবর (আল্লাহ মহান) সাথে সাথে সাহাবীগণও

www.pathagar.com

সমস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি করে উঠলেন। সাহাবীগণের সম্মিলিত তকবীর ধ্বনিতে মক্কার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে।

বীরশ্রেষ্ঠ ওমরের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। তখন পর্যন্ত মাত্র ৪০/৫০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর হযরত আমীর হামযাও ছিলেন। এরপরও সে সময় মুসলমানদের পক্ষে কাবা গৃহে যেয়ে নামাজ পড়া তো দূরের কথা নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করাও নিরাপদ ছিলো না। হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। তিনি তার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলে কাফেররা প্রথমতঃ স্তম্ভিত হয়। এরা তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে হত্যা করতে (নাউজুবিল্লাহ) রওয়ানা হয়েছিলেন, যিনি ছিলেন উগ্র বদমেজাজী এবং ইসলামের নাম শুনলে ক্রোধের সীমা থাকতো না সেই ব্যক্তির মাঝে মুহূর্তের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ছিলো বিস্ময়কর। এটা সম্ভব হয়েছিলো ভাগ্যক্রমে পবিত্র কোরআনের বাণী শোনা এবং তা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ফলে। পবিত্র কোরআনের বাণী শুনে ও পড়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই বাণী কোন মানুষের বাণী হতে পারে না। এই বাণী ঐশী বাণী। যদি হযরত ওমর (রাঃ) এর কর্ণকুহরে এই পবিত্র কোরআনের বাণী প্রবেশ না করতো তাহলে হয়তো তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিতেই থাকতেন। অথচ পবিত্র কোরআন এবং রসুল (সাঃ) এর সংস্পর্শে এসে তিনি হলেন একজন ইসলামের একনিষ্ঠ সৈনিক। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অন্যতম সাহাবী, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। বিশ্বের সবচেয়ে প্রজাহিতৈষী সুশাসক। এই সুশাসক সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন– এই ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় এর জন্য দায়ী আমি। যা আজ পর্যন্ত বিশ্বে এরূপ ঘোষণা কোন শাসকদের মুখে শোনা যায়নি। যিনি রাতের আঁধারে প্রজাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং নিজ মাথায় বোঝা বয়ে নিয়ে ক্ষুধার্তদের পর্ণ কুটিরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। যা পৃথিবীতে এমন একটি দৃষ্টান্তও কোন শাসকের মাঝে দেখা যায়নি। তাই এককালের উগ্র মেজাজী যুবক পবিত্র কোরআনের সংস্পর্শে এসে হয়ে গেলেন আল ফারুক। যে যুবক ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন এই ধরায় ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলবেন সেই যুবকই এই বিশ্বে একের পর এক রাজ্য জয় করে এক বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। হযরত উমর (রাঃ) এর জীবনে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণ পবিত্র কোরআন এবং রাসূলের সুন্নাত। কাজেই হযরত ওমর (রাঃ) প্রথম জীবনে ইসলামের বিরোধিতা করছিলেন না বুঝে পরবর্তীতে ইসলামের একনিষ্ঠ সৈনিক হয়েছিলেন ইসলামকে বুঝে।

আবার অনেকেই বুঝেও ইসলামের বিরোধিতা করছেন। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আবু জাহেল। শোনা যায়, তৎকালে তিনি ছিলেন একজন মস্তবড় কবি।

www.pathagar.com

কথায় কথায় তিনি কবিতা লিখতে পারতেন। অথচ তিনি আমৃত্যু ইসলাম ধর্মের চরম বিরোধিতা করে গেছেন। পবিত্র কোরআনের মর্ম বাণী এবং রাসূল (সাঃ) এর হেদায়েত তাকে ইসলামের পথে আনতে পারেনি। ঠিক এভাবে যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তা চলে আসছে। সঠিকভাবে পবিত্র কোরআনের বাণী সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে তুলে না ধরার ফলে যুগে যুগে অনেক মুসলমান বিভ্রান্তিতে থেকেছে। পবিত্র কোরআনকে শুধু রিডিং পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। আবার পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হয়েও নিজেরা মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র কোরআন ও রাসূল (সাঃ) এর বিরোধিতা করে আসছেন, এদেরকেই বলা হয় জ্ঞান পাপী। এই জ্ঞান পাপীদের বক্তব্য খন্ডানোর মতো বিদ্যা এবং বুদ্ধি আমার নেই। তবুও পবিত্র কোরআনের আলোকে বর্তমান বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

এই পবিত্র কোরআনের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মুসলমানেরা একদিন বিশ্বের বৃহত্তর ভূ-ভাগ জয় করতে সক্ষম হয়েছিলো। ঘোর অন্ধকারে আলোর মশাল জ্বলে উঠেছিলো। অত্যাচারীকে হৃদয়বান, বর্বরদেরকে ধার্মিক, চরিত্রহীনকে চরিত্রবান, অসভ্য জাতিকে সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেছিলো। আধুনিক বিজ্ঞান যান্ত্রিক সভ্যতা দিলেও পবিত্র কোরআনের আলোকে মুসলমানেরা জ্ঞানের সভ্যতা চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পেয়েছিলো এবং সমগ্র বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়েছিলো।

অত্যন্ত গৌরবের সাথে তারা সারা পৃথিবী শাসন করেছিলো আটশত বছর। মুসলমানেরা সমৃদ্ধশালী জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলো। আর আজকে মুসলমানেরা এই কোরআনকে ত্যাগ করে দুর্দশাগ্রস্থ, নির্যাতিত, শোষিত, লাঞ্ছিত ও পরমুখাপেক্ষী মেরুদন্ডহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে।

১৮৩৬ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৃটেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সে সময়ে ভারতবর্ষের দাখিলকৃত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে কমন্স সভায় ব্যাপক আলোচনা হয়। তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন একটি পবিত্র কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে কমন্স সভায় উঁচু করে ধরে বলেছিলেন, "এটা মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন। বৃটিশরা বর্তমানে অনেকগুলো মুসলিম দেশ দখল করে নিয়েছে। যদি এই দেশগুলোর ওপর বিনা বাধায় বৃটিশদের আধিপত্য বজায় রাখতে হয় তাহলে এই কোরআন শিক্ষা থেকে পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।" ইংরেজদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের শাসনামলে এদেশে কোরআন-হাদীস চর্চা করা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিলো। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালন করার মধ্যেই কোরআন-হাদীসের চর্চা সীমাবদ্ধ রেখেছিলো। ইংরেজদের ১৯০ বছরের কুশাসনে এবং কুশিক্ষা নীতির কারণে পবিত্র কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা হতে মুসলমানেরা দূরে সরে যায়। যুগে যুগে মুসলমানদের মেরুদন্ড ভাঙ্গা জাতিতে পরিণত করে রাখার জন্য এটি ছিলো ইংরেজদের সুদূরপ্রসারী কৌশলগত চক্রান্ত। যে চক্রান্তের বেড়াজাল থেকে আজও

www.pathagar.com

মুসলমানেরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। ইংরেজদের এই চক্রান্তের কুফল আজও বয়ে বেড়াচ্ছে এদেশীয় মুসলমানেরা।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেমন ধর্মগ্রন্থকে পুণ্যের আশায় আবৃত্তি করে, মুসলমানেরাও পবিত্র কোরআন শুধুমাত্র সওয়াব অর্জনের সহায়ক গ্রন্থ মনে করে পাঠ করছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেমন তাদের ধর্মগ্রন্থকে পবিত্র জ্ঞানে চুমু খায়; মুসলমানেরাও সেভাবে চুমু খায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেমন মৃত্যু পথযাত্রী অথবা শবদেহের সামনে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করে; ঠিক সেইভাবেই মুসলমানেরাও পবিত্র কোরআনের ব্যাপকতাকে সংকুচিত করে রেখেছে। অথচ পবিত্র কোরআন শুধু মাত্র সওয়াবের আশায় আবৃত্তি করা, ভক্তিভরে চুমু খাওয়া এবং মৃত্যু পথযাত্রীর পাশে বসে অথবা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আবৃত্তি করার জন্য নাজিল হয়নি। এসবের পাশাপাশি পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছিল মানব জাতির জন্য দিক-নির্দেশক পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে। এই পবিত্র গ্রন্থে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দেয়া হয়েছে জোর তাগিদ। শুধু এবাদত-বন্দেগীর জন্য যদি পবিত্র কোরআন নাজিল হতো তাহলে কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকতো। পবিত্র কোরআন এতো বিশাল আকারে নাজিল হওয়ার প্রয়োজন হতো না।

বৃটিশ আমল থেকে পবিত্র কোরআন শুধুমাত্র রিডিং পড়ার মধ্যেই আবদ্ধ রাখার কারণে মুসলমানেরা ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর পরমুখাপেক্ষী জাতিকে পরিণত হয়েছে। বিধর্মীয়দের কাছে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে বিভিন্নভাবে।

আজ থেকে তিন যুগ আগেও দেখেছি পরকালের কল্যাণের আশায় বয়স্ক ব্যক্তিরা ফজর নামাজ আদায় করে ঘরের দাওয়ায় বসে সুমধুর সুরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতো। সেই সুমধুর সুর শুনে ছোটদের ঘুম ভাঙ্গতো। ঘুম থেকে উঠেই ছোটদের মসজিদে গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা ছিলো বাধ্যতামূলক। বৃটিশ আমলে ব্যাপকভাবে তোতা পাখির মতো পবিত্র কোরআন শিক্ষা ও পাঠ করার প্রচলন থাকলেও এই স্বাধীন দেশে ক্রমান্বয়ে তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

পবিত্র কোরআনের শিক্ষা বর্তমানে শুধু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়ই প্রচলিত রয়েছে। মুসলমানদের একটি বিরাট অংশই পবিত্র কোরআনের প্রকৃত চর্চা থেকে দূরে থাকার কারণে সমাজে বা রাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে ধর্মের নামে বিভ্রান্তি, মতানৈক্য, অনাচার, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি।

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান যতো সামনে অগ্রসর হচ্ছে পবিত্র কোরআনের বাণী মানব সমাজের কাছে ততোই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। সৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে যা পবিত্র কোরআন চৌদ্দশ' বছর আগেই ঘোষণা করেছে। তা সত্ত্বেও এই বিজ্ঞানময় ঐশী গ্রন্থকে একশ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ সে কালের উপকথা বলার স্পর্ধা দেখিয়েছে।

www.pathagar.com

তাদের এরূপ ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। তবে তাদের ধারণা যে ভ্রান্ত, অসার এবং ইসলাম বিদ্বেষপ্রসূত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংক্ষেপে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বাণী ও অন্যান্য ধর্মের অভিমত এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলেই তাদের বক্তব্য যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা পরিষ্কার হবে বলে আমি মনে করি। খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন শ্লোক রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১-২ এ বলা হয়েছে ঃ "আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিলো এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিলো, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করছিলেন।"

এভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে বাইবেলে বেশ কয়েকটি শ্লোক রয়েছে। জাপানীদের প্রাচীন বই কো-জি-কি'তে বর্ণনা রয়েছে যে, ইজানাগি নামে এক দেবতা সারা পৃথিবীব্যাপী জলের মধ্যে তাঁর বর্শার ফলাটা ডুবিয়ে তুলে নিতেই তা থেকে জলের ফোঁটা পড়ে পড়ে জমে যেতে লাগলো। সেগুলোই হলো পৃথিবীর যতো দ্বীপ আর দেশ। হিন্দুদের পুরাণ বলে, পৃথিবীব্যাপী জলরাশির মধ্যে সর্পকুলের রাজা অনন্তনাগ কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিলেন। আর ভগবান বিষ্ণু তাঁর উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম ফুল উঠেছিলো। এর উপর বসেছিলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হঠাৎ দেখলেন যে, বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুটো দৈত্য বেরিয়ে তার দিকে তেড়ে আসছে। ব্রহ্মার ডাকে বিষ্ণুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দৈত্য দুটোকে মেরে ফেলেন। সেই দৈত্য দু'টোর মেদ দিয়ে পৃথিবী তৈরী হয়। মেদ থেকে তৈরী বলে প্রথম দিকে পৃথিবীর নাম ছিলো 'মেদেনী'। পরবর্তীতে তা পৃথিবী নামে অভিহিত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি গল্প রয়েছে।

পৃথ্বী বলে একজন রাজা ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, পৃথিবীটা বড় অসুবিধার জায়গা। তিনি উঁচু নীচু জায়গা সমান করে দিয়ে খানা-খন্দ ভরাট করে খাল-নালা কেটে এটাকে বাসযোগ্য করে তুলেন। এই জন্যে রাজার নামে 'মেদেনী'র নাম হলো 'পৃথ্বী' বা 'পৃথিবী'। অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায়, পৃথিবী ব্রহ্মের অন্ডকোষ থেকে তৈরী। এ জন্যে পৃথিবীকে ব্রহ্মান্ড বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

নরওয়ে দেশের গল্পেও বলে যে পৃথিবীটা একটা দৈত্যেরই মৃতদেহ। তার নাম ছিলো য়ীমির। আবার চীন দেশের লোকেরা অনেক চিন্তা করে বের করেছিলো যে পৃথিবীটা হচ্ছে প'আম্কু নামে একজন দেবতার মৃতদেহ। এই দেবতা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ ও তারকাগুলোকে সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে মারা পড়লেন। আর তার শরীর হলো পৃথিবী। হিন্দু শাস্ত্রমতে পৃথিবীর সাতটি সাগর সৃষ্টি হয়েছে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ দধি, দুগ্ধ ও জল দিয়ে। এমনিভাবে প্রতিটি সৃষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মে প্রচলিত ছিলো ভ্রান্ত মতবাদ, উপকথা বা কুসংস্কার। কিন্তু পবিত্র কোরআনে সৃষ্টি সম্পর্কে যা রয়েছে তা বৈজ্ঞানিক মতেই স্বীকৃত।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "তিনিই যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না। (সূরা বাকারা-২, আয়াত-২২)

অন্যত্র আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, "আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহে আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাদের এবং তার যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে। সূরা বাকারা-২, আয়াত-১৬৪) "কতো মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।" (সূরা ফুরকান ২৫, আয়াত ৬১)। "তোমরা কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমন্ডলী এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে? (সূরা নূহ ৭১, আয়াত ১৫-১৬)। "আমি তোমাদিগকে ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছি এবং প্রোজ্জ্বল দিন সৃষ্টি করেছি। (সূরা নাবা ৭৮, আয়াত ১২-১৩)। "শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার; রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তাদের সম্বন্ধে তুমি কি জান? এরা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।" (সূরা তারিক ৮৬, আয়াত ১-৩)।

এই পৃথিবী ও সৌরজগত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

"এক একটি ছায়াপথে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র; মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা এরূপ লক্ষ কোটি ছায়াপথের একটির এক ক্ষুদ্র সদস্য সূর্য। আর সূর্য নামক নক্ষত্রটিরই একটি গ্রহ আমাদের পৃথিবী। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল। এই গতিতে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে ৮ মিনিট। এর অর্থ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে ১,৮৬,০০০×৬০×৮.৫ মাইল। সূর্যের পর পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম নক্ষত্র হচ্ছে প্রক্সিমা (Proxima) সেন্টারাই। এই নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে ৪ বছর। পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪০০ কোটি বছর। পৃথিবীর দশদিকে মহাকাশে এমন লক্ষ কোটি নক্ষত্র ও ছায়াপথ রয়েছে যাদের আলো এই ৪০০ কোটি বছরেও পৃথিবীতে এসে পৌছায়নি। তাহলে এদের দূরত্ব কতো? মহাকাশের আকৃতিই বা কতো বড়? মানুষের মস্তিষ্ক কোন ধারণাই করতে পারে না। সূর্যের আকৃতি ১৩ লক্ষ পৃথিবীর সমান। মহাকাশে এমন কোটি কোটি নক্ষত্র আছে যাদের আকৃতি কয়েক লক্ষ বা কোটি সূর্যের সমান। তাহলে এইসব নক্ষত্রের আকৃতি কতো বড়? ধারণা করাও অসম্ভব!"

আবার প্রাণী জগতের সৃষ্টি সম্পর্কেও বিভিন্ন মতবাদে ও ধর্মীয় দর্শনে বিভিন্ন মনগড়া বক্তব্য রয়েছে। যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাণী জগত সম্পর্কে পবিত্র

www.pathagar.com

কোরআনে আল্লাহপাক যা বলেছেন বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তা হুবহু মিলে যায়। যেমন পবিত্র কোরআনে মৌমাছি সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দিয়ে নির্দেশ করেছেন, 'পাহাড়ে গাছে আর মানুষ যে ঘর বানায় সেখানে ঘর বাঁধ। এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু খাও। তারপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পথ সহজ করেছেন তা অনুসরণ কর। এর পেট থেকে বের হয় নানা বর্ণের পানীয়। এতে মানুষের জন্য রয়েছে ব্যাধির প্রতিকার। এর মধ্যে তো চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১৬ সূরা নাহল, ৬৮-৬৯ আয়াত)। মৌমাছি এবং মধু সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

মধু মহান স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি। পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে এর গুণাগুণ অনন্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেছে, ২০০ গ্রাম মধুর পুষ্টিদান ক্ষমতা ১.১৩ কিলোগ্রাম দুধ কিংবা ৮টি কমলা অথবা ১০টি প্রমাণ সাইজ ডিমের সমান। দুধ ও মধুর সংমিশ্রণে সর্বোৎকৃষ্ট শক্তিবর্ধক খাদ্য তৈরী হয়। মিনিসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হেডাক নিজে এরূপ খাদ্য গ্রহণ করে এক নাগাড়ে বার সপ্তাহ স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন। রক্তের হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধিতে মধু একটি উৎকৃষ্ট সহায়ক। তদুপরি সরবত, চা, দুধ, কফি প্রভৃতির সঙ্গে মধুকে চিনির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও এ্যালোপ্যাথিক মতে মধু সেবনে সর্দি, কফ, কাশি, বাত, প্রমেহ, আলসার, হৃদরোগ, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ থেকে নিরাময় লাভ করা যায়। এ ছাড়া আমাদের দেশে সামাজিক ও ঐতিহ্যিক ভাবধারার প্রেক্ষিতে নবজাতক শিশুকে প্রথম খাদ্য হিসেবে মধু দেয়া হয়ে থাকে। মধু তৈরী করতে প্রতিটি মৌমাছিকে কতো যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয় তা আমরা সাধারণরা জানি না। নেকটার বা ফুলের মিষ্টিরস মধু তৈরীর প্রধান কাঁচামাল। চিনি জাতীয় পদার্থের একটি মিষ্টি দ্রবণই হলো নেকটার বা ফুলের মিষ্টিরস মধু তৈরীর প্রধান কাঁচামাল। চিনি জাতীয় পদার্থের একটি মিষ্টি দ্রবণই হলো নেকটার। মাঠে-ময়দানে যথাযথ নেকটারের অভাব দেখা দিলে মৌমাছিকে আখের রস কিংবা চিনির দ্রবণের উপর নির্ভর করতে হয়। মৌ-পরিবারে তিন ধরনের মৌমাছি পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো রাণী, পুরুষ ও কর্মী মৌমাছি। নেকটার সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে ঘর ও বাইরের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পাদন করতে হয় কর্মী মৌমাছি বা শ্রমিক মৌমাছিকে। তাই কর্মী মৌমাছিকে বলা হয় মৌ-পরিবারের প্রধান চালিকাশক্তি। একটি মৌ পরিবারে কর্মী মৌমাছির সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার থেকে পঁচাত্তর হাজার। মধু ঋতুতে এদের আয়ুষ্কাল ছয় সপ্তাহ প্রায়। এদের বয়স দুই থেকে তিন সপ্তাহ হলেই এরা বের হয় নেকটার ও পরাগরেণুর সন্ধানে। মধু মিশ্রিত পরাগরেণু এরা রাণী ও বাচ্চাদের খাওয়ায়। এক কিলোগ্রাম মধু প্রস্তুত করতে প্রতিটি কর্মী মৌমাছিকে প্রায় এক কোটি ফুলের সান্নিধ্যে যেতে হয় এবং বয়ে আনতে হয় প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার থেকে দেড় লক্ষ লোড নেকটার। কর্মী মৌমাছি সর্বাধিক বার দশমিক আট কিলোমিটার দূর থেকে নেকটার সংগ্রহ করতে সক্ষম। তবে নেকটারের উৎস ১-২ কিলোমিটারের দূরত্বের মধ্যে থাকে। যদি মৌচাক থেকে নেকটারের দূরত্ব

www.pathagar.com

গড়ে দেড় কিলোমিটার হয় তাহলে প্রতি লোড নেকটার সংগ্রহ করতে কর্মী মৌমাছিকে অতিক্রম করতে হয় প্রায় তিন কিলোমিটার পথ। এ থেকে বলা যায়, এক কিলোগ্রাম মধুর জন্য প্রতিটি কর্মী মৌমাছিকে অতিক্রম করতে হয় তিন লক্ষ ষাট হাজার থেকে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার দূরত্ব। আর এ পথের দূরত্ব পৃথিবীর পরিধির আট থেকে এগার গুণ বেশি। উড্ডয়নকালে এদের বেগ প্রতি ঘন্টায় চব্বিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার। তাই অনেকের মতে মৌমাছি হলো "Master of flight".

জন্ম রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন– "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি; অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি। এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি; অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি; অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি।" (সূরা মুমিনুন ১২-২৪)

জন্মরহস্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

একজন সক্ষম পুরুষের স্ত্রী সহবাসের সময় প্রতিবারের বীর্যপাতে ২০০ থেকে ৫০০ মিলিয়ন স্পার্ম নির্গত হয়। এতো বহুসংখ্যক স্পার্মের মধ্যে মাত্র একটি স্পার্ম জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্ত্রীর ওভামের সাথে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন করে থাকে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় একজন সক্ষম পুরুষের প্রতি মিলিমিটার বীর্যে কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন স্পার্ম থাকতে হয়। যদি কোন পুরুষের প্রতি মিলিলিটার বীর্যে ২০ মিলিয়নের কম স্পার্ম থাকে তাহলে তার পক্ষে সন্তানের পিতা হবার সম্ভাবনা থাকে না। সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এ ব্যাখ্যায় আপত্তি তোলার কোন অবকাশ নেই এবং বিজ্ঞান আমাদেরকে এভাবেই তার সাংস্কৃতিক বিশ্বাসে আবদ্ধ রেখেছে।

মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর বর্ণিত হয়েছে কুরআনের বর্ণনায়। প্রথমতঃ মাটির উপাদান, দ্বিতীয়ঃ শুক্র, তৃতীয়তঃ জমাট রক্ত, চতুর্থতঃ মাংসপিন্ড, পঞ্চমতঃ অস্থি, ষষ্ঠতঃ সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গরূপ। অর্থাৎ জীবন সঞ্চার বা রূহ সঞ্চার। ভ্রুণতাত্ত্বিক বিচারে গর্ভ সঞ্চারের পর ৪০ দিনের মধ্যে (৬ সপ্তাহ) রক্ত, গোস্ত, অস্থির রূপ কাঠামোর গঠন সম্পন্ন হয়ে থাকে। ৪২ দিনের পর অর্থাৎ সপ্তম সপ্তাহে ভ্রুণের শারীরিক গঠনের বৃদ্ধি শুরু। এ সময় ভ্রুণের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপায়ন ঘটে থাকে।

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে মানুষ ও জ্বীন সম্পর্কে এরশাদ করেছেন–

"আর আমিতো বহু জ্বীন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না। এরা পশুর মতো। না, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট। এরাই উদাসীন।" (৭ সূরা আরাফ, ১৭৯)

আমরা যদি পশুর দিকে লক্ষ্য করি আল্লাহর সৃষ্টি হাতী একটি প্রকান্ড জীব। অথচ এ হাতী আল্লাহর হুকুমে ক্ষুদ্র প্রাণী মানুষের খেদমত করে যাচ্ছে। হিংস্র জীব-জন্তু

www.pathagar.com

আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মে আদিকাল থেকে জঙ্গলে বসবাস করছে। একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়ারও জাতীয়তাবোধ রয়েছে। একটি পিঁপড়া পানিতে পড়লে অন্য পিঁপড়াগুলো কুন্ডুলি পাকিয়ে দ্বীপ-এর ন্যায় আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করে ভাসমান পিঁপড়াকে রক্ষা করে। একটি কাক বিপদগ্রস্ত হলে সমস্ত কাক সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। গৃহপালিত কুকুর-এর প্রভু ভক্তের বহু কাহিনী পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। জীব-জন্তু দেহে বলবান, আর মানুষ বুদ্ধিতে বলবান। প্রতিটি জীবন-জন্তু আল্লাহর রীতি-নীতি আদেশ-নিষেধ মেনে চলছে। বৃহৎ বলবান গরু, মহিষ, উট মানুষকে সেবা দিয়ে আল্লাহর হুকুম তামিল করছে। কিন্তু মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহকাম প্রতিনিয়ত পরিত্যাগ করছে। অনেক জীব-জন্তুর জৈবিক চাহিদা পূরণে লাজ-শরম থাকলেও মানুষ আজ আধুনিকতার নামে জৈবিক চাহিদা পূরণে চরম অশ্লীলতা প্রদর্শন করছে। সুতরাং আল্লাহপাক যথার্থই বলেছেন, এরা পশুর মতো, না বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট।

বেশ কয়েক বছর আগে সম্ভবত একটি জার্নালে পড়েছিলাম, উন্নত এক হাজার কম্পিউটারের চেয়ে একজন মানুষের মস্তিষ্ক অধিকতর শক্তিশালী। একটি উন্নত কম্পিউটারের দাম যদি ধরা হয় এক লক্ষ টাকা তবে এক হাজার কম্পিউটারের মূল্য হয় দশ কোটি টাকা। এই দশ কোটি টাকা মূল্যের মস্তিষ্ক আল্লাহপাক গরীব থেকে শুরু করে ধনী পর্যন্ত সব মানুষকে দিয়েছেন। যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক জাতি এই মস্তিষ্কের সঠিক ব্যবহার করছে। অনেকে ভুল প্রশিক্ষণ বা প্রশিক্ষণের অভাবে এই মস্তিষ্ককে সঠিক ব্যবহার করতে পারছে না। কেউ যদি একটি লোককে একটি কম্পিউটার দেয় আর সে যদি কম্পিউটার চালাতে যথার্থ প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে তবে তার পক্ষে কি কম্পিউটার চালানো সম্ভব? সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক এক হাজার কোটি টাকার মূল্যের একটি মস্তিষ্ক নামের কম্পিউটার ধনী-গরীব প্রতিটি মানুষকে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা যথার্থ প্রশিক্ষণের অভাবে মস্তিষ্ক নামের কম্পিউটারকে কাজে লাগাতে পারছি না। এই জন্যই আল্লাহপাক স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ আমার সৃষ্টি জ্ঞানীদের জন্য। বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। আল্লাহর সৃষ্টি তত্ত্ব জানতে হলে একদিকে পবিত্র কোরআনে অন্য দিকে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে হবে। শুধু পবিত্র কোরআন পড়ে যেমন সৃষ্টি রহস্য জানা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি শুধুমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেও আল্লাহ যে কতো মহান স্রষ্টা তা জানা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন পবিত্র কোরআনের আলোকে বিজ্ঞান চর্চা। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে বৈষয়িক উন্নতি এবং যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে বটে কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষ না পাওয়ার কারণে স্রষ্টাকে তারা স্রষ্টার মতো করে জানতে পারছে না। শত শত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআন যা বলেছেন শত শত বছর পর বিজ্ঞান তা ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার গূঢ় রহস্য লুকায়িত রয়েছে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে। যা অনেক সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিজ্ঞান এখনো ব্যর্থ হচ্ছে।

অনেক ডক্টরেট ডিগ্রীধারীকে দেখেছি পরকালে নাজাত পাবার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে। এরা নামাজ শিক্ষা বই হতে কতিপয় সূরা-দোয়া-দরূদ ও রীতি-নীতি মুখস্ত

www.pathagar.com

করে। তাদের পক্ষে কি অনুধাবন করা সম্ভব যে বিষয়ে তারা বিশেষজ্ঞ তা চৌদ্দশ' বছর আগেই আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। অনেক মোল্লা-মৌলভী একটি হরফের দশটি নেকি অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআন তোতা পাখির মতো পাঠ করে। তাদের পক্ষে কি অনুধাবন করা সম্ভব পবিত্র কোরআনে লুকায়িত বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় রহস্য?

সুতরাং পবিত্র কোরআনকে তোতা পাখির মতো আউড়িয়ে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য জানা যাবে না। আর আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য না জানলে আল্লাহ যে কতো মহান স্রষ্টা, প্রভু আমরা জানতে পারবো না। আমরা যদি আল্লাহর সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটাও অবগত হতাম তাহলে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণে মাথা নত করা আমাদের জন্য একটা প্রকৃতিগত ব্যাপার হয়ে যেতো। আজকে আমরা ইবাদত করছি শুধু বেহেস্ত পাওয়ার এবং দোযখ হতে বাঁচার আশায়। এসব এবাদতে আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রকাশ ঘটে বটে কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা ও আনুগত্যের প্রকাশ ঘটে না। আল্লাহ তাঁর অস্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে। পবিত্র কোরআনেও তিনি সুস্পষ্টভাবে বারবার তা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁকে যথার্থভাবে জানতে হলে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করতে হবে সৃষ্টি রহস্য জানতে হবে। পবিত্র কোরআন বুঝে পাঠ করতে হবে এবং এর মর্মবাণী আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা অনুসরণ করে সমাজে বা রাষ্ট্রে এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। একদিন কথা প্রসঙ্গে একজন অধ্যাপক আমাকে বলেছেন- তিনি একদিন ক্লাসে উপস্থিত ছাত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমাদের বাড়ীতে ইসলাম বিষয়ক কি কি বই আছে? জবাবে কেউ বলেছে- মোকছেদুল মুমেনীন, কেউ বলেছেন বারো চাঁদের ফজিলত, কেউ বলেছে- হযরত রহিমা ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব বই পড়ে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য জানা কি সম্ভব? সম্ভব নয়। অথচ এই বইগুলো বাংলার প্রতিটি মুসলমানের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে। এইসব বইয়ের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কোরআন এবং মানবতার ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে কোন গঠনমূলক বিশ্লেষণ নেই। আছে কিছু মৌলিক এবাদত বন্দেগীর কথা এবং কিছু কিচ্ছা-কাহিনী ও তাবিজ তুমারের কথা। ফলে ধর্মের নামে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ডঃ আহমদ শরীফ বলেছেন- "ইসলাম টিকে আছে অজ্ঞ ও মূর্খদের মধ্যে" এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি তিনি বলে থাকেন তবে যথার্থ কিন্তু ব্যাপক অর্থে যদি বলে থাকেন তবে সেটা ক্ষমাহীন ধৃষ্টতা।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় পবিত্র কোরআনের বাণী এবং ইসলামের রীতি-নীতি ও পদ্ধতিই আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত। আর অন্যান্য সমস্ত মতবাদ ভ্রান্ত, কুসংস্কারপূর্ণ, অবৈজ্ঞানিক ও সেকালের উপকথা।

কথিত আছে, কোনো সাহাবী রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন- ইসলাম বুঝবার পথ কি? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "আগে খোঁজ নিয়ে দেখ, এ সম্বন্ধে কোরআনে কি আছে। এরপর খোঁজ নিবে, এ সম্বন্ধে আমি কি বলি, তাতে যদি স্পষ্ট না বুঝতে পার, তবে এ সম্বন্ধে আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করবে।" অর্থাৎ মহানবীর (সঃ) জীবন ছিলো

www.pathagar.com

ইসলামের কার্যগত বাস্তব ভাষ্য। তাঁর জীবনে ইসলাম হয়ে উঠেছিলো রূপায়িত। সাধারণের পক্ষে কোরআন হাদীসে যা স্পষ্ট না হয়ে উঠতো, তাঁর জীবনের দিকে নিরীক্ষণ করলে তা বোঝা সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন পদ্ধতিটা আমাদের জন্য চুম্বক পাথর। চুম্বক পাথর দিয়ে যেমন আগে আসল/ নকল মুদ্রা নিরূপণ করা হতো; ঠিক তেমনি রাসূল (সাঃ)-এর জীবন পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি ফেরালে কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক তা নিরূপণ করা সহজ হবে।

কুরআনের আলোকে মুসলমানের শত্রু-মিত্র

আল্লাহ বর্ণনা করেন, "মুমিনগণ! মুমিনগণের পরিবর্তে কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?" (সূরা নিসা-১৪৪)। আল্লাহ আবার বর্ণনা করছেন, "মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত অবিশ্বাসীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।"

যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না এবং তাদের আশঙ্কা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে; সে আল্লাহর নিকট কিছুই নয় এবং আল্লাহ স্বয়ং তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।" (সূরা আলে ইমরান-২৮)

আল্লাহ আরও বর্ণনা করেন, "হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না।" (সূরা মুমতাহানা ১৩)

তোমরা তাদের (অবিশ্বাসীদের) মোকাবিলার জন্য সাধ্যমতো শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে। এ দিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং অন্যদের যাদের আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না। (৮ সূরা আনফাল ঃ ৬০)

যারা অবিশ্বাস করে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। যদি তোমরা তা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমন বন্ধুত্ব না কর তবে দেশে ফিৎনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে। (৮ সূরা আনফাল ঃ ৭৩)

আল্লাহ মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বর্ণনা করেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কার্যের নির্দেশ দান কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস স্থাপন কর। কিতাবিগণ যদি ঈমান আনতো তবে তাদের জন্য ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভালো আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। সামান্য ক্লেশ দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (সূরা আলে ইমরান, ১১০, ১১১)

আল্লাহ আবার উল্লেখ করেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদেরকে অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তা তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়

www.pathagar.com

এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর। দেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালোবাস; কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না। আর তোমরা সব কিতাবে বিশ্বাস কর। আর যখন তারা তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি'। কিন্তু যখন তারা একা হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে তারা নিজেদের আঙুল দাঁতে কাটতে থাকে। বলো, 'আক্রোশেই তোমরা মর। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।'

যদি তোমাদের কোনো মঙ্গল হয় তারা দুঃখ করে, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা আনন্দ করে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর ও সাবধান হয়ে চলো তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ্ তা তো ঘিরে রয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান ১১৮, ১২০)।

ঐতিহাসিকভাবে দ্বীনের ব্যাপারে যাদের সাথে মুমিনদের শক্রতা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বর্ণনা করেন, "আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্করণে সাহায্য করেছে, ওদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাতো জালিম।" (সূরা মুমতাহানা ৯)

আল্লাহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, "হে মুমিনগণ! আমার শক্র ও তোমাদের শক্রকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছো? তোমরা যা গোপন কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে সে সরল পথ হতে বিচ্যুৎ হয়। তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে ওরা হবে তোমাদের শক্র এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং তোমরা যেন কুফরী কর তা চাইবে।"– সূরা মুমতাহানা, (১, ২)।

মুসলমানদের নিজস্ব সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে, এ সম্বন্ধে আল্লাহ বর্ণনা করেন "যাদের সাথে তোমাদের শক্রতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহতো ন্যায় পরায়ণদিগকে ভালোবাসেন।" সূরা মুমতাহানা (৭, ৮)।

আল্লাহ আরো বলেন, "জেনে রাখ! আল্লাহর বন্ধুদিগের কোনো ভয় নেই এবং তারা

www.pathagar.com

দুঃখিতও হবে না।" সূরা ইউনুস ৬২।

জিহাদের পক্ষে আল্লাহর আহবান– "হে নবী! মুমিনদিগকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ' জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকলে এক সহস্র কাফিরের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।" সূরা আনফাল (৬৫)

হে বিশ্বাসীগণ! ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলে সে তাদের একজন হবে। আল্লাহ তো সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদের তুমি শীঘ্রই দেখবে তারা দৌড়ে যাচ্ছে তাদের (ইহুদী ও খ্রীস্টানদের) কাছে এই বলে, 'আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে।' হয়তো আল্লাহ জয় লাভ করাবেন বা তাঁর কাছ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন। তারপর যে চিন্তা তারা তাদের মনে গোপনে পুষে রেখেছিলো তার জন্যে তারা অনুশোচনা করবে। আর বিশ্বাসীরা বলবে, 'এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদের সঙ্গে আছে?' নিশ্চয়ই তাদের কাজ পন্ড হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। (সূরা মায়িদা ৫১-৫৩)

নিজের অজান্তেই যারা আল্লাহর দ্বীন থেকে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বর্ণনা করেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ দ্বীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে, তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না; এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।"– সূরা মায়িদাহ (৫৪)

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বন্ধু কে? সে সম্পর্কে আল্লাহ বর্ণনা করেন– "তোমাদের বন্ধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ– যাঁরা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। কেহ আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুমিনদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।" সূরা মায়িদাহ (৫৫, ৫৬)

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসিতামাশা ও খেলনা ভাবে তাদের এবং অবিশ্বাসীদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (সূরা মায়িদা ঃ ৫৭)

অবশ্য বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী এবং অংশীবাদীদের তুমি সবচেয়ে উগ্র দেখবে। আর যারা বলে, 'আমরা খ্রীস্টান' (মানুষের মধ্যে) তাদেরই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধু হিসাবে দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসারবিরাগী আছে, আর তারা অহংকারও করে না। (৫ সূরা মায়িদা ঃ ৮২)

বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু... । (৯ সূরা তওবা ঃ ৭১)

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের জন্য আল্লাহ বলেন– "হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি হতে রক্ষা করবে। তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এ তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।" সূরা সাফফ (১০, ১১)

মুমিনদের প্রতি আল্লাহর আদেশ হচ্ছে এই যে, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমপর্ণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায়ই মরো না।" –সূরা আলে ইমরান ১০২।

আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ভালোভাবে জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসাবেও সাহায্যেও আল্লাহই যথেষ্ট। (৪ সূরা নিসা ঃ ৪৫)

তারা চায় তারা যেমন অবিশ্বাস করেছে তোমরাও তেমন অবিশ্বাস কর যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। তাই আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারে যেখানে পাবে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে। তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করে না। (৪ সূরা নিসা ঃ ৮৯)

যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে সম্মানের আশা করে? সব সম্মান তো আল্লাহরই। (৪ সূরা নিসা ঃ ১৩৯)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক মুসলমানদের শত্রু-মিত্র সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা মুসলমানেরা পবিত্র এই কোরআনের বাণীকে উপেক্ষা করে শত্রুদেরকে বন্ধু; আর বন্ধুদেরকে শত্রু হিসাবে বেছে নিয়েছি। ফলে এককালে মুসলমানেরা বিশ্বের সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছে; এখন বিজাতীয়রা মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছে।

অমুসলিমদের দৃষ্টিতে মহাগ্রন্থ আল কোরআন

- লিউ টলস্টয় বলেছেন, "কোরআন মানব জাতির একটি শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের নিখুঁত দিক নিদর্শন। দুনিয়ার সামনে যদি এই একটি মাত্র গ্রন্থ থাকতো এবং কোনো সংস্কারকই না আসতেন তবু মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এটাই ছিলো যথেষ্ট।"
- মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লেখেন ঃ আল কুরআন একটি ঐশী গ্রন্থ। আমি আল-কুরআনের শিক্ষা ও দর্শনের উপর পড়াশোনা করেছি। একে ঐশী গ্রন্থ বলে গ্রহণ করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আমার কাছে এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে এ দিকটাকেই বেশি প্রতীয়মান হয়েছে যে, মানব প্রকৃতির সঙ্গে এর বিধানাবলীর আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

।সে কারলাইল লিখেছেন ঃ আমার নিকট এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কুরআনের মধ্যে সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা গুণাবলী সর্বযুগেই সমভাবে বিদ্যমান এবং এ কথাটি দিবালোকের মতো সত্য যে, পৃথিবীতে যদি সুন্দর এবং কল্যাণকর কিছু সৃষ্টি হয়, তবে তা কুরআন থেকেই হতে পারে।

- ডঃ আরনল্ড টোয়াইন তার প্রিচিং অব ইসলাম গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আল কুরআন পূর্ণাঙ্গ বিধানের সমষ্টি। যে বিধানসমূহ কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে, যেগুলো আপন আপন জায়গায় সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ।
- পাদ্রী রেভারেন্ড জিএম এডওয়েন লিখেছেন ঃ আল কুরআনের শিক্ষা মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করেছে। বস্তুতান্ত্রিকতার রাহু থেকে মানুষকে দিয়েছে মুক্তি। একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত এবং তার দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষকে রেহাই দিয়েছে শিশু হত্যার মতো নৃশংস ও মানবিক প্রথার কালো অধ্যায় থেকে, মাদকদ্রব্যকে করেছে হারাম। চুরি-ডাকাতি, খুন, ব্যভিচার ইত্যাদি দমনে এমন শাস্তির বিধান দিয়েছে যে, কোনো লোক এসব অপরাধ করার মতো সাহসই খুঁজে পায় না।

ছোট বাক্যগুলোতে যেন ছন্দ ও কবিতার বিচিত্র সব উদাহরণের সমাহার। পাশাপাশি রয়েছে গজব বা শাস্তির ভয়াবহ ঘোষণা আর বিস্ময়কর নানা ঘটনার বর্ণনা। মোটকথা কুরআনের সঠিক মর্ম ও তাৎপর্যকে কোনো ভাষার গন্ডিতে ধারণা করা সত্যই কঠিন।

- 'বোনাপার্ট ও ইসলাম' গ্রন্থে নেপোলিয়ন বলেছেন ঃ আল কুরআন অদ্বিতীয় জীবন বিধান আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি পৃথিবীর সকল জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও প্রতিভাধর ব্যক্তিকে একত্র করে কুরআনী শিক্ষার আলোকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো। কারণ শুধুমাত্র এই শিক্ষাই মানবজাতিকে সন্তোষজনক ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।
- কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ঃ আল কুরআন মানব জগতের সংস্কারক, আধ্যাত্মিক নির্দেশনা এবং জ্ঞানগর্ভ তথ্যে সমৃদ্ধ এক মহাগ্রন্থ; মানব সভ্যতায় এক বিস্ময়কর সংস্কার সাধন করেছে। যে সকল মনীষী এর মর্ম এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সন্ধান পেয়েছেন, তারাই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। মানব জীবনের যে কোনো সমস্যাই এর কাছে নিয়ে যাওয়া হোক না কেনো, কুরআন তার সমাধান বের করবেই।
- ফরাসি গবেষক ডঃ মোরেন্স বলেন ঃ আল-কুরআন শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য যে সকল গ্রন্থ এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তার মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা ও তাৎপর্যপূর্ণ হলো আল-কুরআন। মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এর বাণীসমূহ গ্রীক দর্শনের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এর প্রতিটি অক্ষর ও শব্দ মহান আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও স্তুতি বর্ণনায় সত্যিই ব্যঞ্জময়।

www.pathagar.com

কুরআন একদিকে যেমন জ্ঞানীদের জন্য শব্দভান্ডার আর কবিদের জন্য বাক্যলংকারের সমারোহ। তেমনি ঐতিহাসিক, শাসক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে এর গুরুত্ব ও সমাদর এনসাইক্লোপেডিয়ার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি।

- জি এম রাডউইন তার 'দি কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আল কুরআন জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার উৎস। একথা মানতেই হবে যে আল্লাহর একত্ব, শক্তি, জ্ঞান এবং সত্যতার যে বর্ণনা আমরা কুরআনে পাই, এ ছাড়া বেহেশত, দোযখ, আকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কে অনবদ্য ও সুস্পষ্ট আলোচনার জন্য আমরা কুরআনের যে প্রশংসা করি– তা খুবই সামান্য এবং অসম্পূর্ণ। আল কুরআন উন্নত ও উৎকৃষ্ট চরিত্র-শিক্ষার অফুরন্ত ভান্ডার। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলো বিধৃত রয়েছে তাতে একথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায় যে, এগুলোর উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী রাষ্ট্র এমনকি একটি বিশাল সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
- মিসরের আখবারুল ওয়াতান পত্রিকায় কর্মরত একজন খৃষ্টান সাংবাদিক বলেন ঃ আল-কুরআন ইহ ও পরকালীন দিকদর্শন। মুসলমানরা যদি শুধু কুরআন ও হাদীস নিয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করে, তাহলে এতে তারা ইহ ও পরকালীন মুক্তির পথ অবশ্যই খুঁজে পাবে।
- ফরাসি গবেষক মসিয়ে লুমিয়ার বলেছেন ঃ আল কুরআন একটি যুগ-সংস্কারক সাদৃশ্য। যারা ইসলামকে বর্বর ধর্ম বলে থাকে তারা কুরআন মজীদের শিক্ষা ও দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কুরআনের শিক্ষার আলোকেই বর্বর আরবদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। তারা একেকটি সোনালী মানুষে পরিণত হয়েছিল।
- জার্মান কবি ও দার্শনিক গ্যেটে বলেছেন ঃ আল কুরআন বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক। পবিত্র কুরআনের গুণ হলো এই যে, এর আকর্ষণীয় শক্তি পর্যায়ক্রমে চিত্তাকর্ষণ করতে থাকে। এক সময় মানুষকে বিস্মিত করে, এর পর সম্মোহিত করে এবং সব শেষে অদ্ভুত এক মনোতরঙ্গ তাকে সন্তরণ করায়।
- জন জেকরেলিক লিখেছেন ঃ পবিত্র কুরআন একটি সুমহান সভ্যতা ও উন্নত আদর্শবাদের প্রবর্তন করেছে।
- ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর বলেন ঃ কোরআনের সংগ্রহকারীরা কোরআনের কোন অংশ, বাক্য কিংবা শব্দ বাদ দিয়েছে এমনটি কখনো শোনা যায়নি। আবার কোরআনে এমন কোনো বাক্যেরও সন্ধান পাওয়া যায় না, যা বাহির থেকে কোরআনে প্রবেশ করেছে। যদি এমনটি হতো, তাহলে অবশ্যই হাদীসের গ্রন্থে তার উল্লেখ থাকতো, যা থেকে সামান্য বিষয়ও বাদ পড়েনি।
- প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক ফিলিপ কে. হিট্টি বলেন, The Quran is the most widely read book ever written.
- ডঃ মরিস বুকাইলি বলেন, Thanks to its undisputed authenticity the Quran holds a unique place among the books of revelation, shared neither by

www.pathagar.com

the old nor the new testament.

- ডঃ নিকলসন বলেছেন, কোরআন বিজ্ঞানীদের জন্য এক বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য এক শব্দ কোষ, বৈয়াকরণের জন্য এক ব্যাকরণগ্রন্থ এবং আইনের জন্য একটি বিশ্বকোষ।
- এডওয়ার্ড গীবন বলেন, জীবনের প্রতিটি শাখার কার্যকরী বিধান কোরআনে মজুদ রয়েছে।
- প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পন্ডিত স্যার ডায়মন্ডরাস বলেছেন, কোরআনের বিধানাবলী শাহানশাহ্ থেকে আরম্ভ করে পর্ণ কুটিরের অধিবাসী পর্যন্ত সকলের জন্যই সমান উপযোগী ও কল্যাণকর। দুনিয়ার অন্য কোনো ব্যবস্থায় এর বিকল্প খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।
- প্রসিদ্ধ খৃস্টান ঐতিহাসিক মিঃ বাডলে বলেছিলেন, কেবলমাত্র কোরআনই এমন একটি গ্রন্থ যাতে তের শত বছরের ব্যবধানেও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মের এমন কোনো নির্ভরযোগ্য বস্তু নেই, যা আদৌ কোন দিক থেকে কোরআনের সমকক্ষ হতে পারে।
- ডঃ স্যামুয়েল জনসন বলেন, কোরআন নৈতিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানময় আলোচনায় পরিপূর্ণ। মানবতার ব্যাপক সংস্কার সাধনে কোরআনের ভূমিকা অত্যন্ত প্রকট। কোরআনের বিষয়াবলীর উপর লক্ষ্য করলে অনুভব করা যাবে যে, মানব জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা এতে বিদ্যমান। আল কুরআনের মর্ম ও আবেদন এতোই ব্যাপক, সার্বজনীন ও কালজয়ী যে, প্রতি যুগের যাবতীয় শ্লোগান অবলীলায় এর সামনে অনুজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আর বিজন বন, প্রাণহীন মরা, সুসভ্য নগর এবং বিশাল সাম্রাজ্য সর্বত্রই এর আওয়াজ সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষিত হয়।
- মিঃ এডি মারিল বলেন, কোরআনই হলো ইসলামের শক্তি ও বিজয়ের প্রকৃত উৎস। কোরআনে মানবজাতির জন্য যেমন বুনিয়াদী আইন কানুন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি।
- জর্জ বিল বলেছেন, নিঃসন্দেহে কোরআন আরবী ভাষার সর্বোত্তম এবং দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। কোনো মানুষের পক্ষেই এ ধরনের একখানা অলৌকিক গ্রন্থ রচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কোরআন মৃতকে জীবিত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মোজেযা। একজন অশিক্ষিত লোক কি করে এ ধরনের ক্রটিমুক্ত ও নজিরবিহীন বাক্যবলী রচনা করতে পারে তা ভাবতেও অবাক লাগে।
- প্রসিদ্ধ ও পাশ্চাত্য পন্ডিত ইমানুয়েল ডুয়েচ বলেছেন, এই একমাত্র গ্রন্থখানার সাহায্যেই আরবরা আলেকজান্ডার ও রোম অপেক্ষাও বৃহত্তর ভূ-ভাগ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। রোমের যত শত বছর লেগেছিল তাদের বিজয় সম্পূর্ণ করতে, আরবদের লেগেছিল তত দশক। একমাত্র কোরআনের মদদেই সমস্ত সেমিটিক জাতিসমূহের ভিতরে কেবল আরবরাই এসেছিল ইউরোপের রাজারূপে। নতুবা

www.pathagar.com

ইহুদীরা এসেছিল বন্দীরূপে আর ফিনিসীয়রা এসেছিল ব্যবসায়ীরূপে।

- জন ফাস The wisdom of the Quran গ্রন্থে লিখেছেন ঃ প্রাচীন আরবীতে অবতীর্ণ কোরআন শরীফ অত্যন্ত মনোরম ও আকর্ষণীয়। এর বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গী খুবই মনোমুগ্ধকর। কোরআনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগুলোতে যে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা খুবই চমৎকার। কোরআনের ভাবধারা অন্যভাষায় যথাযথ প্রকাশ করা খুবই মুশকিল।
- গর্ড ফ্রে হুগনস বলেছেন ঃ কোরআন গরীবের বন্ধু ও কল্যাণকামী। ধনীদের বাড়াবাড়িকে কোরআন সর্বক্ষেত্রেই নিন্দা করেছে।
- ডঃ মসিজিউন বলেন ঃ পবিত্র কোরআন শুধুমাত্র কতগুলো ধর্মীয় বিধানাবলীর সমষ্টিই নয়, বরং এতে এমন এমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানাবলীও রয়েছে, যা গোটা মানবজাতির জন্যই সমান কল্যাণকর।
- অধ্যাপক মার্গলিউথ বলেন ঃ পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে কোরআন যে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তা স্বীকার করতেই হবে। এ ধরনের যুগান্তকারী সাহিত্যের মধ্যে কোরআন নবকনিষ্ঠ বটে; তবে জনসাধারণের উপর অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারে তা কারো অপেক্ষা কম নয়। কোরআন মানবীয় চিন্তা ধারায় যেমন এক নতুন ভাবের সৃষ্টি করেছে; তেমনি সৃষ্টি করেছে এক নতুন চরিত্রের। এর আরব উপপদ্বীপের মরুচারী কতগুলো পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীকে এক সুমহান বীর জাতিতে পরিণত করেছে।
- চার্লস পুটার বলেছেন দুনিয়ার কোনো গ্রন্থই কোরআনের ন্যায় বেশি পাঠ করা হয় না। বিক্রির দিক দিয়ে হয়তো বাইবেলের সংখ্যা বেশি হবে। কিন্তু মুহম্মদের কোটি কোটি অনুসারীরা যে দিন থেকে কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করে সেদিন থেকেই দৈনিক পাঁচবার কোরআনের দীর্ঘ আয়াতসমূহ পাঠ করা শুরু করে।
- কোন্ট হেনরী বলেছেন ঃ কোরআনের অধ্যয়নে বিবেক হয়রান হয়ে যায় যে, একজন অশিক্ষিত লোকের মুখ হতে এ ধরনের কালাম কি করে বের হলো।
- ডাঃ মোরেনস বলেন ঃ সমস্ত আসমানী গ্রন্থসমূহের মাঝে কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে মানবজাতির উদ্দেশ্যে এই সর্বোৎকৃষ্ট কিতাবটি নাযিল করেছেন। মানুষের কল্যাণ সাধনে এটি প্রাচীন গ্রীক দর্শনের চেয়েও অধিকতর ফলপ্রসূ। কোরআনের প্রতিটি শব্দ হতেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের ঝংকার ধ্বনিত।
- মিঃ বোরথ স্মুথ বলেছেন ঃ মুহম্মদের এ দাবি আমি সর্বান্তকরণে স্বীকার করি যে, কোরআন মুহাম্মদের একটি সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ মোজেযা।
- জার্মান গবেষক আইকম কী বলভ বলেছেন ঃ আল কোরআন পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়। এর উপর আমল করলে যাবতীয় রোগ-ব্যাধি এবং জীবাণু সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

- অধ্যাপক H. A. R. Gibb বলেন ঃ The influence of the Quran on the development of Arabic Literature has been in calculable and exerted in many directions. Its ideas, its language, its rhythms pervade all Subsquent Literary works in greater or lesser measure.
- ফরাসী দার্শনিক লিবার জোন বলেন ঃ আল কোরআন উজ্জ্বল ও বিজ্ঞানময় এক অসাধারণ গ্রন্থ। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের কোনোই অবকাশ নেই। কেননা এটা এমন এক ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি সত্য নবী এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।
- মুহাম্মদ এন্ড কোরআন গ্রন্থকার ডেভিন রপোর্ট বলেন ঃ আল কোরআন মুসলিম জাতির সামগ্রিক জীবন বিধান। পরিবার-সমাজ, রাজনীতি-অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, বিচার ও প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে উপযোগী, উন্নত, সার্বজনীন ও কল্যাণকর, বিধানাবলী এতে বিদ্যমান। পাশাপাশি এটি একটি ধর্মীয় গ্রন্থও বটে।
- ভারতের লালা রাজ পাত রায় বলেন ঃ আমি ইসলামকে পছন্দ করি এবং ইসলামের পয়গম্বরকে দুনিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে স্বীকার করি। আমি কোরআনের সামাজিক, রাজনৈতিক, আত্মিক ও নৈতিক বিধানাবলীকে অন্তরের সহিত পছন্দ করি। হযরত ওমরের খেলাফতকালে ইসলামের যেরূপ ছিলো তাকেই আমি ইসলামের বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গরূপ বলে মনে করি।
- মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বোস বলেন, তের শত বছর পরেও কোরআনের শিক্ষাসমূহ এতোই জীবন্ত যে, আজো একজন ঝাড়ুদার মুসলমান হয়ে যে কোন খানদানী মুসলিমের সাথে সমতার দাবী করতে পারে।
- খ্যাতিমান বাঙালি সাহিত্যিক বাবু চন্দ্রলাল বলেন, আল-কোরআন সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পতাকাবাহী। কোরআনের শিক্ষায় হিন্দুদের মতো জাত-পাতের ব্যবধান নেই। যেখানে কাউকে শুধু কুলীন বা উচ্চ বংশীয় কারণে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

উপরে ৩৭ জন বিশ্বসেরা মনীষীর উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে, যাদের একজনও ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুসারী ছিলেন না। তথাপি দিবালোকের মতোই যে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সত্য, তার যথাযথ স্বীকৃতি দিতে এঁরা কার্পণ্য করেননি। আল কোরআন সম্পর্কে এ সকল অমুসলিম পন্ডিতদের এহেন মূল্যায়নের পাশাপাশি যখন এদেশীয় তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির ধারক, স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম নামধারী তথাকথিত জ্ঞান তাপসদেরকে কোরআনের সংস্কার-সংশোধনের দাবি তুলতে শুনি তখন স্বভাবতই এ সকল জ্ঞান-পাপীদের জ্ঞানের চৌহদ্দীর প্রতি করুণা হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর আদর্শ ও আজকের বিশ্ব

বিশ্বের বিস্ময় নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) এ ধরায় আবির্ভূত হন রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় সোমবার ভোর বেলায়। ইংরেজীতে সে দিন ছিলো ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ, ২০ এপ্রিল। তিনি এসেছিলেন মানব জাতির জন্য রাহমাতাল্লিল আলামিন হিসাবে। কবি নজরুলের ভাষায়–

"নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি
আমার মোহাম্মদ রসূল
কুল-মাখলুকাতের গুলবাগে
যেন একটি ফোটা ফুল।"

এ দিনটি বিশ্বের ১২৫ কোটি মুসলিম মিল্লাতের কাছে স্মরণীয়, বরণীয় এবং মহাগৌরবের পরম আনন্দের দিন। তাই প্রতিটি উম্মতে মোহাম্মদ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করে– "বালাগাল উলা বেকামালিহী কাশাফাদ্ দুজা বেজামালিহী হাসুনাত জামীউ খেলালিহী সাল্লু আলাইয়ে ওয়া আলিহী"। হযরত শেখ সা'দী রচিত এই নাতটির একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। মূল আলোচনায় যাবার আগে এই নাতটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য উল্লেখ করছি।

শেখ সা'দী না'তের তিনটে চরণ সঙ্গে সঙ্গে রচনা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু চতুর্থ চরণ একাধারে তিন রাত, তিন দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যখন তিনি কিছুতেই রচনা করতে সক্ষম হননি। তখন তাঁর অবস্থা ঠিক একটি বদ্ধ পাগলের মতো হয়ে যায়। চিন্তা-ভাবনায় তাঁর চোখে ঘুমের নামটি পর্যন্ত ছিলো না। প্রায় মাথা খারাপ অবস্থার মধ্যে চতুর্থ দিন পেরিয়ে আসতেই হঠাৎ তাঁর চোখে ঘুম নেমে আসে। এবং তিনি গভীর ঘুমের কোলে গা এলিয়ে দেন। আর ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখতে পেলেন সা'দীর সম্মুখে সশরীরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং নবী সম্রাট রাসূলে খোদা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ভাবছো, সা'দী?

ভাবছি... আপনার ওপর একটা না'ত লিখতে গিয়ে শেষ লাইনটিতে আমি আটকা পড়ে গেছি যে, কিছুতেই তার চতুর্থ লাইনটি পূরণ করতে বা মেলাতে পারছি না। আজ চার রাত, চার দিন পেরিয়ে যাচ্ছে।

নবীজী শুনতে চাইলেন।

সা'দী শোনালেন তাঁর নাত-এর তিনটে চরণ।

নবীজী জানালেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ লাইন পূরণ করো– 'সাল্লু আলাইহে আলিহী' দিয়ে।

সা'দীর ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চতুর্থ চরণ লিখে ফেললেন। পূর্ণ হয়ে গেল গোটা বিশ্বের মুসলিম কণ্ঠে ধ্বনিত জগত বিখ্যাত অমর না'ত ঃ 'বালাগাল উলা বেকামালিহী...'

মহানবী (সাঃ) এসেছিলেন মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় নিশ্চিত করতে। জুলুম সরিয়ে ইনসাফ কায়েম করে দেখাতে। শান্তি ও সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে তুলতে। মানবতার সুমহান কল্যাণে আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর বিশাল দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন। আমরা ধন্য। আমরা সৌভাগ্যবান। আমরা কল্যাণের সন্ধান প্রাপ্ত। তাই সারা পৃথিবীর মুসলমানেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে প্রতি মুহূর্তে পাঠ করছে "সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিম"।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় সোমবার প্রত্যুষে, হিজরী দশম সনে। মতান্তরে মহনবী (সাঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল না হয়ে ৮, ৯, ১০ বা ১১ই বরিউল আউয়াল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবুও ১২ই রবিউল আউয়ালই স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ দিনটি মুসলমানদের জন্য একদিকে আনন্দের অন্যদিকে শোকেরও বটে। তাই এ দিনটিকে কেউ ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) হিসাবে পালন করে, আবার কেউ সীরাতুন্নবী (সাঃ) হিসাবে পালন করে। প্রিয় নবী (সাঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে একই সময়ে হওয়ায় জন্মোৎসব করা হবে, না মৃত্যুর শোক পালন করা হবে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। উৎসব বা শোক আমাদের নিকট বড় কথা নয়। আসল কথা হলো তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। সে শিক্ষাটা কি? সে শিক্ষাটা স্পষ্টভাবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে আমার উম্মতগণ, আমি যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক, তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হবে না। সেই গচ্ছিত সম্পদ কি? তাহলো আল্লাহর কোরআন এবং তাঁর রাসূলের আদর্শ।" সেই কোরআন এবং রাসূলের আদর্শ কি তা এক কথায় বলা যাবে না। তবে দু'টি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করছি।

আল্লাহ বর্ণনা করেন "হে মুমিনগণ! ইহুদী ও খৃস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না এবং যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদেরকে সত্বর তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে এই বলে, 'আমাদের আশঙ্কা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে।' হয়তো আল্লাহ বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।" –সূরা মায়েদা (৫১, ৫২);

হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) বর্ণনা, হযরত নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, এমন একটা সময় আসবে যখন তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট লোকদের প্রতিটি পদক্ষেপের অনুসরণ করতে শুরু করবে। এমনকি ওরা যদি পথভ্রষ্ট হয়ে গুইসাপের

www.pathagar.com

গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও অনুরূপ গর্তে প্রবেশ করতে প্ররোচিত হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, পূর্ববর্তী সেই ভ্রান্ত জাতিগুলো কি ইহুদী-খৃস্টানরা? বললেন, এ দু'টো জাতিই তো। এরা ছাড়া আর কারা?

পবিত্র কোরআন এবং রাসূল (সাঃ) এর আদর্শের মাধ্যমে একটা অসভ্য বর্বর জাতিকে একটি সভ্য ও উন্নত জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল। যারা একদিন উটের পানি পান করার মতো একটি সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো, তারাই চরম তৃষ্ণার মুহূর্তে নিজে পানি পান না করে অপর ভাইকে পানি পান করার সুযোগ করে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। ত্যাগের এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজো ইতিহাসে অম্লান। তাই জার্মানের জাতীয় অমুসলিম কবি শেষ নবী (সাঃ) এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে কবিতার একস্থানে লিখেছেন ঃ "তোমরা সকলে দ্যাখো, দ্যাখো মুহাম্মদ এমন শাসক তিনি, ন্যায়ের শাসক সমগ্র জাতিকে রাজকীয় স্রোতের ধাক্কায় যেমন যাচ্ছেন নিয়ে সুউচ্চ সীমায়। তাঁর সেই অগ্রযাত্রা নাম নেয় একটি স্বদেশ নগরের জন্ম, হয় তার পদতলে। অবাধ গতিতে চলে স্রোতধারা দূরে বহু দূরে, জীবনের আলো জ্বলে।"

ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানেরা এককালে প্রায় আটশ' বছর অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছিল। আজ পবিত্র কোরআনকে শুধু রিডিং পড়ার মধ্যে এবং রাসূলের (সাঃ) মৌলিক সুন্নতগুলোকে উপেক্ষ করার ফলে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মুসলমানেরা হতভাগ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইহুদী-খৃস্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম ধর্মকে একটি আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্মে পরিণত করেছে। পবিত্র কোরআন ও রাসূলের আদর্শে সুমহান সত্যের দিক-নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তাঁর যথার্থ অনুসরণ চর্চায় আমরা ব্যর্থ।

পাশ্চাত্য আর সাম্রাজ্যবাদীদেরকে একদিন মুসলমানেরা উন্নয়ন ও সভ্যতার দীক্ষা দিয়েছে। আজকে তারা আমাদেরকে দিচ্ছে। একদিন মুসলমানেরা তাদেরকে প্রযুক্তি ও সংস্কারের কৌশল শিখিয়েছে; আজকে তারা আমাদের শেখাচ্ছে। দারিদ্র্য মোচনের ফরমুলা দেয়ার নামে ধর্মের পথ ছেড়ে মুক্ত সংস্কৃতির অশ্লীল আবহ গড়তে তালিম দিচ্ছে।

এক সময় ইহুদী খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রকাশ্যে মুসলমনদের মোকাবেলা করার সাহস ছিলো না। তাদের চিরশত্রু মুসলমানদের হত্যা করতো চোরাগোপ্তা পথে. বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে। একদিন মুসলমানদেরকে এরা ভয় করতো; এখন তাদেরকে ভয় করছে মুসলমানেরা। কারণ মুসলমানেরা আজ পবিত্র কোরআন ও রাসূলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে একটি নির্জীব ও পরগাছা জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাই মুসলমানদেরকে এ ধরা থেকে চিরতরে নির্মূল করার লক্ষ্যে জাতিগত দ্বন্দ্ব লাগিয়ে এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে আরেক ভাইকে লেলিয়ে দিচ্ছে। এক ভাইয়ের রক্ত দিয়ে আরেক ভাই গোসল করছে। আবার এরাই তাদের দ্বারা সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসার নামে মাতবরের ভূমিকা নিয়ে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

www.pathagar.com

শুধু তাই নয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে এবং দারিদ্র্যতার ভয় দেখিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করছে মায়ের ভ্রূণ নষ্ট করে। নারী জাতির সমঅধিকারের নামে ধর্মীয় অনুশাসনে গড়া আমাদের ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করে তাদের দেশের ন্যায় এ দেশকে নরকে পরিণত করার আয়োজন চলছে।

সোভিয়েট-রাশিয়ার কমিউনিজম পতনের পর এরা দম্ভতার সাথে ঘোষণা করেছিল যে, 'লাল বিপ্লব সফল হতে দেইনি; সবুজ বিপ্লবও সফল হতে দিব না।"

এদেরই চক্রান্তে নতুন বংশধরেরা আজ রাসূলে (সাঃ) এর জীবনী এবং ঐশী দিক নির্দেশনা কোরআনের চর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মৌলবাদের বদনামে জড়িয়ে যাবার ভয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের তরুণ-তরুণীরা এখন ধর্মচর্চাকে ভয় পায়। সাম্প্রদায়িকতার অচ্ছুত গালি শুনতে হবে বলে ওরা এখন অনুশীলন তৎপর মুসলিম হতে দ্বিধান্বিত। ওরা এখন বিভ্রান্তির ঘোরে জড়িয়ে যাচ্ছে যে, ধর্মচর্চা একালের নয়। মধ্যযুগে ধর্মের কিছু কল্যাণ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ধর্মের বিধি-বিধান অধুনা সভ্যতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং বিশ্ব সংস্কৃতির বিচারে পরিত্যাজ্য। ধর্ম নারীকে মর্যাদা দিতে জানে না। ধর্মের কড়াকড়ি মানবতা ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

হাদীসে আছে– "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি হবো তার নিকট তার পিতা-পুত্র যাবতীয় কিছু হতে প্রিয়।" এ থেকে নিশ্চিত যে, রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের পূর্ণতার পূর্বশর্ত। আর এ ভালোবাসার প্রমাণ তাঁর নির্দেশ পালন ও অনুকরণের মাঝেই প্রকাশ পাবে। কিন্তু ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন ছাড়া আমাদের বাস্তব জীবনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শের প্রতিফলন নেই। কাজে ও চিন্তায় বিস্তর ব্যবধান। আমরা তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করছি শুধুমাত্র কতিপয় সুন্নত পালনের মাধ্যমে। যেমন সব সময় টুপি মাথায় রাখা, লম্বা পাঞ্জাবী পরা, মিষ্টি খাওয়া, হাদিয়া গ্রহণ ও দাওয়াত কবুল করা, দুপুরে খেয়ে বিশ্রাম নেয়া, মেছওয়াক করা ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলো জরুরী সুন্নত এড়িয়ে যাচ্ছি। যেমন হাদিয়া দেয়া, দুস্থ ও আর্তের সেবা করা, গরীব-দুঃখীর দেখাশুনা করা, জিহাদ করা, মানব কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা ইত্যাদি।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন, আইন-বিধান, শরীয়ত ও সুন্নত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি ছিলেন ধর্ম প্রবর্তক, সফল রাষ্ট্রনায়ক, আদর্শ সেনাপতি এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি ছিলেন জীবন ও ধর্ম চর্চার আদর্শ মডেল।

সুতরাং ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে আদর্শ মডেল হিসাবে গ্রহণ করলেই ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) অথবা সিরাতুন্নবী (সাঃ) পালন যথার্থ হবে। নতুবা আমরা বাতিলের কাছে পরাভূত হবো বার বার।

রাসূল (সাঃ) এর স্মরণ এবং অনুসরণ চর্চা আজ বড়ই উপেক্ষিত। যা কিছু স্মরণ তা কেবল অনুষ্ঠান সর্বস্ব এবং দায়সারা আত্মপ্রতারণার পর্যায়ভুক্ত। রাসূল (সাঃ) এর দেয়া উন্নয়ন মডেল ভুলে আমরা আজ ইউএনডিপি আর বিশ্ব ব্যাংকের উন্নয়ন তত্ত্ব নিয়ে

www.pathagar.com

গবেষণা করছি। আর তাই দশকের পর দশক কেটে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে না এবং পরনির্ভরশীলতা কাটছে না। অথচ কম্বলের বিনিময়ে খাদ্য ও কুঠার সংগ্রহের উন্নয়ন মডেলকে আত্মস্থ করা গেলে এতোদিনে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া অসম্ভব ছিলো না।

আমাদের বিদ্যুৎ, রাস্তা, বাঁধ, সেতু ইত্যাদি বাড়ছে কিন্তু শিক্ষা ও নৈতিক মান বাড়ছে না। দুর্নীতি আর শোষণে আমরা বিপর্যস্ত। আমাদের নৈতিক উন্নয়ন নেই। মানব উন্নয়ন না করে রাস্তা আর দালানের উন্নয়ন প্রকৃত কোন উন্নয়ন নয়। পতিত সকল সভ্যতার ইতিহাস তার সাক্ষ্য। রাসূল (সাঃ) এর শেখানো নৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে আমরা বিস্মৃত। আমাদের সকল দফা এখন ক্ষমতা দখল, হরতাল আর সন্ত্রাসের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রবিউল আউয়াল মাস আসলে আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিকতার হিড়িক পড়ে যায়। নবী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠনের বর্ণাঢ্য আয়োজন, মিছিল সরকারী বাণী-বিবৃতি, দোয়া-দরূদের অনুষ্ঠান, বই মেলা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম, তবারুক বিতরণ, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদির মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করি প্রতি বছর। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন– "যা দিয়েছেন তোমাদের রাসূল (সাঃ) সুতরাং তা ধারণ কর, আর যা থেকে বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাক।"

অথচ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলে গেছেন তা মুসলমানেরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে পরিহার করছে। আর যা তিনি বলেননি তা উৎসাহের সাথে পালন করা হচ্ছে। এর ফলে মুসলমানেরা তাদের স্বাতন্ত্রতা হারিয়ে বিজাতীয়দের সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমার বক্তব্যকে সহজ করার জন্য এখানে একটি রূপক উদ্ধৃত করছি।

কোন এক জঙ্গলে একটি বাঘ একটি বাচ্চা প্রসব করে মারা যায়। মারা যাবার পর ঐ বাঘের বাচ্চাটি অসহায় অবস্থায় তার মৃত মায়ের পাশেই অবস্থান করতে থাকে। এমন সময় জঙ্গলে একজন কৃষক উপস্থিত হয়ে মৃত বাঘটির পাশে বাচ্চাটিকে দেখতে পেয়ে কোলে তুলে বাড়ী নিয়ে আসে এবং তার পালিত ছাগলের বাচ্চার সাথে রেখে ছাগলের দুধ খাওয়াতে থাকে। এরপর যখন একটু বড় হয় এবং দুধ খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তখনও ঐ ছাগলের বাচ্চাদের সাথে বাঘের বাচ্চাও ঘাস-পাতা ইত্যাদি খেতে থাকে। ছাগলের অনুসরণে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পালনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। এভাবে সহ-অবস্থানের ফলে বাঘের বাচ্চা ছাগলের বাচ্চায় পরিণত হয়। কিন্তু ছাগলের বাচ্চারা ঐ বাঘের বাচ্চাকে নিজ গোত্রীয় ভাবতে পারেনি। তাই সুযোগ পেলেই শিং দিয়ে ছাগলের বাচ্চারা এ বাঘের বাচ্চাকে গুতাতে থাকে। কিন্তু বেচারা বাঘের বাচ্চার শিং না থাকায় পড়ে পড়ে শুধু গুঁতাই খায়। গুঁতা দিতে পারে না। একদিন মনের দুঃখে বাঘের বাচ্চা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায়, ইয়া আল্লাহ, আমাকেও যদি দু'টি শিং দিতে তাহলে আমিও ওদের গুঁতাতে পারতাম। দেখিয়ে দিতাম আমার শক্তি। কিন্তু আসলে যে সে বাঘের বাচ্চা, তার এক হুংকারে বনের, সমস্ত জীব-জানোয়ার থর থর করে কাঁপে। ছাগলের সোহবতে থাকতে থাকতে এবং ঘাস-পাতা খেতে খেতে সেই অনুভূতি তার

www.pathagar.com

লোপ পেয়ে গেছে, এখন আর বাঘের সেই হুংকার তার কণ্ঠে বের হয় না। ছাগলের বাচ্চার মতো শুধু ম্যা-ম্যা করে আর মার খায়। বাঘ হয়েও ছাগলের গুঁতা খেয়ে বাঘের বাচ্চাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। ঠিক তেমনি মুসলমানেরাও একদিন সত্যি সত্যি বাঘের বাচ্চা ছিল, তখন তাদের হুংকারে সারা জাহানে কম্পন শুরু হয়ে যেত। কিতাবে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) যে রাস্তা দিয়ে চলতেন, শয়তান ইবলীস সে রাস্তা দিয়ে না গিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেত। শয়তান তখনকার মুসলমানদেরকে এতোই ভয় করতো। আর এখন শয়তান হচ্ছে মুসলমানদের প্রভু। অবশ্য সব মুসলমানদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। মুসলমানদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদার, মর্দে মুমিন এখনও রয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

আল্লাহ্ বিজাতীয় বিধর্মীয়কে সাহায্য করেন। কিন্তু মোনাফেক মুসলমানদের সাহায্য করেন না। যেমন ফেরাউনকে অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। তার বাদশাহী অনেক দিন টিকে ছিলো। শোনা যায়, এ সম্পর্কে হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর সাথে সওয়াল-জওয়াবের সময় ফেরাউনকে ধ্বংস না করার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে আল্লাহ্পাক বলেছিলেন– "ফেরাউন খোদাদ্রোহী হলেও সে প্রজার প্রতি ন্যায় বিচারক। এ জন্যে তাকে আমি ধ্বংস করিনি। এখানে দেখা যায়, ফেরাউন খোদাদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেননি শুধু প্রজার প্রতি ন্যায় বিচারকের ভূমিকা পালন করায়। এ ছাড়া হযরত মূসা (আঃ)কে ফেরাউনের সাথে অশোভন আচরণ করতে বারণ করেছিলেন। কারণ ফেরাউনের আশ্রয়ে হযরত মূসা (আঃ) লালিত-পালিত হয়েছেন। পরবর্তীতে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় তাকে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল।

এর সত্যতা সমকালীন বিশ্বের দিকে তাকালেই দৃশ্যমান হবে। অনেক অমুসলিম রাষ্ট্রের জনগণের মাঝে যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ রয়েছে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে তা অনুপস্থিত। অনেক অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রতি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার পালন করে থাকে। কিন্তু অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে তা দেখা যায় না।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক না কেন। গত পঁচিশ বছরে এদেশে বহু নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। আবার যারা সমাজে বা রাষ্ট্রের নৈরাজ্য সৃষ্টি করে হত্যা, ধর্ষণ এবং জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করে তাদেরকে যেখানে পাওয়া যায় হত্যার নির্দেশ রয়েছে। প্রতিটি সরকার যদি পবিত্র কোরআন এবং রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী সমাজ বিরোধীদের কঠোর হস্তে দমন করতেন তাহলে এদেশ থেকে চিরতরে হত্যা ও সন্ত্রাস নির্মূল হয়ে যেত। নিরাপরাধ সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের শিকার হতো না। বর্তমানে আমাদের দেশে পিটিয়ে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে মারা হচ্ছে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কায়দায় মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা হত্যা করছে তারাও জানে না কেন হত্যা করছে। যারা হত্যার শিকার হচ্ছে তারাও জানে না তাদের কি অপরাধ। হত্যা শুধু হত্যাই ডেকে

www.pathagar.com

আনে এটা পবিত্র কোরআন এবং রাসূলেরই শিক্ষা। তবুও আল্লাহ পাক এখনো আমাদেরকে টিকিয়ে রেখেছে। জানি না এই অরাজকতার অবসান না হলে কতদিন আল্লাহ টিকিয়ে রাখবেন।

ইসলাম বিদ্বেষী ও বিজাতীয়দের একটা চরিত্র রয়েছে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু আদর্শগত প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তাও নেই। ব্যাঙের মতো এক পাল্লায় রাখা যায় না, শুধু লাফায়। এই লাফালাফির কারণে সবচেয়ে উন্নত আদর্শের এবং মূল্যবান সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের ১২৫ কোটি মুসলমান শুধু মার খাচ্ছে। কিছুই করতে পারছে না। আজকে যদি এই ১২৫ কোটি মুসলমান পবিত্র কোরআন ও রাসূলের (সাঃ) আদর্শে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতো তাহলে বিশ্বের বিরাজমান সমস্যা অনেক সহজেই মীমাংসা হয়ে যেত।

এর জন্য প্রয়োজন মর্দে মুমিন মুসলমানদের অনেক ত্যাগ ও তিতীক্ষা। সত্যের জয় হয় অনেক দেরীতে কিন্তু ফল হয় দীর্ঘস্থায়ী। যেমন পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে সংগ্রাম করতে হয়েছে ২৩টি বছর। দশ বছরে যুদ্ধ করতে হয়েছে ৮০টি তন্মধ্যে ২৭টি যুদ্ধে তিনি সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। বিশ্বে মাত্র ৩২ বছর নিরঙ্কুশ ইসলামী আইন প্রবর্তিত ছিলো। এই ৩২ বছরের সুশাসনের সুফল মুসলমানেরা তো বটেই; অন্যান্য সম্প্রদায়ও পেয়েছিল প্রায় আটশত বছর। যদি এ ধারা এখনো অব্যাহত থাকতো তাহলে তলোয়ারের শক্তিতে নয়; ইসলামী আইনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিশ্ববাসী এক ধর্মে বিলীন হয়ে যেত। অন্যান্য ধর্ম বা ভ্রান্ত মতবাদের কোন অস্তিত্বই থাকতো না এ পৃথিবীতে।

অপরদিকে অসত্যের পক্ষে জয়লাভের সংক্ষিপ্ত পথ রয়েছে বটে কিন্তু এ জয়ের ফল ক্ষণস্থায়ী। যা বিশ্বের ইতিহাসে জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ মানব রচিত ভ্রান্ত মতবাদের পরিণতি। সুতরাং আজকে সময় এসেছে সত্যের পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার। অতীতের সব গ্লানি, ক্লেদ, সংকীর্ণতা ও হীনমন্যতা পরিহার করে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার এবং বাঘের ন্যায় হুংকার দেয়ার।

যে জাতি তার গৌরবময় ইতিহাস বিকৃতিকে নীরবে মেনে নেয় সে জাতির কপালে দুর্ভোগ অবধারিত। ঈমানদার মুসলমান কখনো জাতির জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি হতে দিতে পারে না। তাই আজকের এই পবিত্র দিনে আমাদের সকলের প্রত্যাশা ও দৃঢ় প্রত্যয় হোক বিপ্লবী কবি নজরুলের ভাষায় ঃ

"দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন
ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে খবর,
তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণ
প্রদীপ জ্বাল।"

www.pathagar.com

অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে মহানবী (সঃ)

মহানবীর (সঃ) অসামান্য, অমলিন, মাধুর্যময় চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের প্রখ্যাত নেতা মোহন চাঁদ করমচাঁদ গান্ধী 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় এক মন্তব্যে বলেন ঃ

"I wanted to know the best of one who holds today undisputed away over the hearts of millions of mankind..... I became more than convinced that it was not thw sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the prophet, the scrupulous regard for his pledges his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle."

"When I closed the 2nd volume (of the prophet's biography), I was sorry there was not more for me to read of the great life."

ভাবার্থ ঃ "আমি এমন একজন মহাপুরুষ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম যিনি বর্তমান বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে আছেন।..... আমি সন্দেহাতীতরূপে এই ধারণায় উপনীত হই যে, তৎকালীন সমাজ-জীবনে ইসলামের অনিবার্য প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তলোয়ারের কোনো ভূমিকা ছিলো না। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) অনন্য সাধারণ সহজ-সরল জীবন, নিজেকে একজন অতি সাধারণ মানুষ হিসাবে তুলে ধরবার প্রবণতা, নিজের ওয়াদার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা, সাহাবা ও অনুগামীদের প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ, অমিত সাহস, নির্ভিকতা, আল্লাহ্ ও তাঁর নবুওতী দায়িত্বের প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাস এটিই তৎকালীন মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমে সাহায্য করেছিল। তলোয়ারের সেখানে কোন ভূমিকাই ছিল না।"

"রাসূলুল্লাহর জীবনী গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড যখন আমার পাঠ শেষ হলো তখন এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে আরও অধিক জানবার আগ্রহ্ আমার মনকে উতলা করে তুলল।"

বিশিষ্ট ভারতীয় মনীষী দেওয়ান চাঁদা শর্মা লিখেছেন ঃ "Muhammad was the soul of kindness and his influence, was felt and never forgotten by those around him" (D. C Sharma. 'The Prophets of the East', Calcutta, 1935, p. 12)

অর্থাৎ মুহম্মদ (সঃ) ছিলেন দয়ার্দ্রচিত্তের মহৎ ব্যক্তি, তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকেরা তাঁর দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হতো এবং তাঁকে কখনও বিস্মৃত হয়নি।

মহানবী (সঃ) অতুলনীয় সাফল্য সম্পর্কে খ্যাতনামা ইংরেজ ঐতিহাসিক হিট্টি বলেনঃ "Within a brief span of worldly life Mohammad (sm) called forthout of uncommon promising material a nation never united before in a country that was hither to best a geographical expression."

ভাবার্থ ঃ মুহম্মদ (সাঃ) তাঁর স্বল্পস্থায়ী নশ্বর জীবনে একটি দেশকে এক অসাধারণ ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন, ইতোপূর্বে যার কেবলমাত্র ভৌগোলিক অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুই ছিলো না।

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড গীবন ও সাইমন ওক্‌নী Profession of Islam প্রসঙ্গে বলেন : "I believe in one God, and Mohomet, an apostle of God' is the simple and invariable profession of Islam."

অর্থাৎ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ' এটিই ইসলামের সহজ সরল অনিবার্য মর্মবাণী।

এতে আরো বলা হয়েছে : "The intellectual image of the duty has never been degraded by any visible idol, the honour of the Prophet have never transgressed the meassure of human virtues; and his living precepts have restrained the gratitude of his disciples within the bounds of reason and religion." (History of the saracen Empires, London, 1870, p. 54)

ভাবার্থ : অতি মানবিক আরোপিত গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য নহে, সম্পূর্ণ মানবিক সর্বোচ্চ গুণের অধিকারী হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে যুক্তি ও দ্বীনের শিক্ষা দিতেন।

"Decay and fall of Roman Empire" গ্রন্থে ইংরেজ ঐতিহাসিক গীবন বলেন : "মুহম্মদ (সঃ) তাঁর অনুসারীদের জন্য ছিলেন বিশ্বস্ততম রক্ষাকারী, তাঁকে এক নজর দেখামাত্র দর্শকের মন শ্রদ্ধা-ভক্তিতে পূর্ণ হতো।"

খ্যাতনামা মনীষী অধ্যাপক হারগ্রোনজে বলেন :

"The league of nations founded by the Prophet of Islam put the principle of international unity and human brotherhood on such universal foundations as to show candle to other nations.... the fact is that no nation of the world can show a parallel to what Islam has done towards the realization of the idea of the League of Nations."

ভাবার্থ : বিশ্বজনীন ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামের মহান নবী ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য গোত্র-সম্প্রদায়কে যেভাবে একীভূত করে যে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতি গঠন করেন তা মানব জাতির সামনে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। সত্য বলতে কি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (বর্তমানে জাতিসংঘ) গঠনের ক্ষেত্রে ইসলাম বিশ্ববাসীর সামনে যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে, দুনিয়ার অন্য কোনো জাতি অনুরূপ কোনো দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। মনীষী মেজর এ জি লিওনার্দ তাঁর "Islam Her Moral and Spiritual" গ্রন্থে বলেন : "পৃথিবীতে বসবাস করে যদি কোনো মানুষ আল্লাহকে দেখে থাকেন, বুঝে থাকেন, যদি কোনো মানুষ ভালো ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহর ইবাদতে জীবন উৎসর্গ করে থাকেন তা হলে এটি নিশ্চিত যে, মুহাম্মদ (সঃ) সেই ব্যক্তি। মুহম্মদ যে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন তাই নয়, বরং এ যাবৎ যতো মানুষ মানবতার আদর্শকে সমুন্নত করেছেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানুষ ছিলেন তিনিই।"

ফ্রান্সের জাতীয় বীর বিশ্ববিখ্যাত সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেন : "মুহম্মদ এমন একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সর্বদা সাহচর্য দান করেছেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানরা তাঁর নেতৃত্বে অর্ধেক

www.pathagar.com

পৃথিবী জয় করে ফেলেছিলেন। তাঁর মিথ্যা দেবতার পূজা ও তার প্রতীক পুত্তলিকাসমূহ উৎখাত করেছিলো, বহু মন্দির ধ্বংস করেছিলো এবং এই সকল কাজ মাত্র পনের বছরে তারা সম্পন্ন করে, মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীগণ যা পনের শত বছরেও করতে পারেনি। মুহম্মদ (সাঃ) একজন যথার্থই মহৎ ব্যক্তি ছিলেন।"

নেপোলিয়ন তাই অকপটে স্বীকার করেন ঃ

"J'aime La religion de Mahomet" (অর্থাৎ আমি মুহম্মদের ধর্মকে পছন্দ করি"।) মহানবীর (সঃ) অনুপম চরিত্র-মাধুর্য ও অসাধারণ গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি আরো বলেন ঃ

"আমি আশা করি সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন আমি পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে কুরআনের আদর্শের ভিত্তিতে এক সমন্বিত শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হবো। আমার ধারণায় একমাত্র কুরআনেই শ্বাশত সত্য রয়েছে এবং একমাত্র কুরআনই সমগ্র মানব জাতিকে শান্তির পথ প্রদর্শনে সক্ষম।"

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সেই স্বপ্ন সার্থক না হলেও তাঁর উক্তির সারবত্তা চিরসত্য। একমাত্র মহানবীর (সাঃ) জীবনাদর্শ ও আল-কুরআনই মানব জাতিকে শান্তি ও মুক্তির অভ্রান্ত পথের সন্ধান দিতে পারে।

আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদী অধ্যাপক জুলস ম্যাসারম্যান বলেন ঃ "Perhaps, the greatest leader of all times was Mohammad."

অর্থাৎ "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন মুহম্মদ (সাঃ)।"

প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি বলেন ঃ "মুহম্মদ ইসলামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ ও শ্রেণীগত পার্থক্য সম্পূর্ণ খতম করে দিয়েছেন। অন্য কোনো ধর্মই এতো বড় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়নি, যে সাফল্য মুহম্মদ-এর ধর্ম অর্জন করেছে। বর্তমান বিশ্বে যে অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, তা একমাত্র মুহম্মদী সাম্যনীতির বাস্তবায়নের দ্বারাই পূরণ করা সম্ভব।"

বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলফ্রেড ভিলামার বলেন ঃ "কুড়িটি পার্থিব ও একটি ধর্মীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। যে সকল মানদন্ডে মানবীয় মহত্ত্ব পরিমাপ করা হয়, তার যে কোনো মানদন্ডেই বিচার করা হোক না কেনো, পৃথিবীর কোনো যুগের কোনো একজন মানুষই তাঁর চেয়ে অধিক মহত্তের অধিকারী বলে প্রমাণিত হবে না। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্ম-প্রবর্তক ও প্রতিমাবিহীন উপাসনার উদ্ভাবক।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এক পর্যায়ে অনেক অনুশীলন-বিশ্লেষণের পর এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে ঃ "মুহম্মদ যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেবল সেই যুগেরই যে তিনি শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও মনীষী ছিলেন তাই-ই নয়, বিশ্বের সর্বকালের চিন্তানায়ক ও মনীষীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

বসওয়ার্থ স্মিথ তাঁর Mohammed and Mohammedanism গ্রন্থে বলেন ঃ

www.pathagar.com

"রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মীয় প্রধান হিসাবে তিনি (মহানবী) একাধারে সীজার (জুলিয়াস সীজার) ও পোপের ভূমিকা পালন করেছেন, তবে তাঁর পোপের জলুসপূর্ণ আড়ম্বর যেমন ছিলো না. তেমনই ছিলো না সীজারের মতো সশস্ত্র বাহিনী, সমরাস্ত্র, দেহরক্ষী, পুলিশ বাহিনী কিংবা নির্দিষ্ট রাজস্ব আয়। যদি পৃথিবীতে এই কথা বলবার কারো এরূপে কোনো অধিকার থাকে যে, তিনি ঐশী বলে শাসন করেছেন, তা হলে একমাত্র মুহম্মদই (সাঃ) সেই দাবি করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। কারণ তাঁর সকল ক্ষমতাই ছিলো, ক্ষমতার বাস্তব উপকরণ ব্যতীত ক্ষমতা-প্রদর্শনেচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিলো না। তাঁর ব্যক্তি জীবনের সারল্য ছিলো বাইরের জীবনেরই প্রতিফলন। দু'য়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। সৌভাগ্যবশতঃ মানব-ইতিহাসের এটি এক অনন্য সাধারণ ঘটনা যে, মুহম্মদ (সাঃ) একাধারে ছিলেন এক মহান জাতি, বিশাল সাম্রাজ্য ও একটি বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবর্তক।

মনীষী জুলিস মাসারম্যান বলেন ঃ "নেতা অর্থে যা বুঝায় সে অর্থে পাস্তুর, সাল্‌ক ছিলেন প্রথম, গান্ধী, কনফুসিয়াস সম্ভবতঃ দ্বিতীয় এবং আলেকজান্ডার, সীজার এবং হিটলার সম্ভবতঃ তৃতীয় মানের। যীশু ও বুদ্ধও সম্ভবতঃ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হলেন মুহম্মদ (সাঃ), যাঁর মধ্যে নেতৃত্বের এই তিন ধরনের গুণাবলীরই সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছিলো। কিছুটা কম পরিমাণে হলেও মূসার (আঃ) মধ্যেও অনুরূপ গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিলো।

মনীষী জন অস্টিনের ভাষায় ঃ In little more than a year he was actually the spiritual, National and temporal ruler of Medina, with his hands on the lever that was to shake the world." (John Aushin, 'Muhammad the Prophet of Allah', in T.P.'s and cassel's weekly for 24th September 1927).

অন্য একজন মনীষীর ভাষায় ঃ "It is impossible for anyone who studies the life and character of the greatest Prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty Prophet, one of great messengers of the supreme. And although in what I put to you I shall say many things which may be familiar to many, yet I myself feel whenever I re-read them, a new way of reverence for that mighty Arabian teacher." (Annie Besant. 'The Life and Teachings of Muhammad', Madras 1932, p. 4).

ভাবানুবাদ ঃ আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সাঃ) জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে যিনি পড়াশোনা করেছেন, তাঁর শিক্ষা ও জীবন ধারণ সম্পর্কে যিনি অবগত তিনিই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপ্লুত হবেন। সেই মহান নবী (সাঃ) আল্লাহতায়ালার প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং যদিও আমি যা বলছি বহু লোক বিভিন্নভাবে সেই সম্পর্কে অবগত, তবু বলতে হয়, সেইসব আমি যতবার পাঠ করি, প্রত্যেকবারই মানব জাতির সেই শ্রেষ্ঠতম আরবীয় শিক্ষকের প্রতি আমার চিত্ত পরম শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বস্‌ওয়ার্থ স্মীথ বলেন, "বর্বর শিশু হত্যা বন্ধের পর মহানবী

www.pathagar.com

(সঃ) নারী জাতির জন্য যে সর্বাধিক মঙ্গলজনক কাজটি করেন তা হলো পিতৃ-পুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তিতে তাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা যা পূর্বে কল্পনাতীত ছিল।

দার্শনিক Felix তার প্রখ্যাত গ্রন্থ Spiritual Revolution in Islam গ্রন্থে কন্যা সন্তান জীবন্ত হত্যারোধের প্রশংসা করে বলেন, 'নৈতিক সংস্কারক হিসেবে তিনি আরবের এক প্রতিষ্ঠিত প্রথা যা অত্যন্ত অমানবিক, কন্যা হত্যা রোধ করেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Smith তার লেখা "Muhammad and Muhammadanism" গ্রন্থে নারী জাতির উন্নয়নে মহানবী (সঃ) এর বিবাহের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের প্রশংসা করে বলেন, "একজন পুরুষ যতজন খুশী ততজনকে বিয়ে করতো এবং বিবাহিত স্ত্রীদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিতো। মহানবী (সঃ) এ পদ্ধতি বন্ধ করে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরী করেন, যা ছিল একান্ত প্রয়োজন।

J. G. R. Forlong তাঁর লেখা "Short Studies in the Science Comparative Religions" গ্রন্থে অবাধ বহু বিবাহ বন্ধের মাধ্যমে নারী জাতির উন্নয়নে মহানবীর প্রশংসা করে বলেন ঃ "মুহাম্মদ (সঃ) এর সমসাময়িক অনেক ইহুদী ও পৌত্তলিক ধনী লোকদের একাধিক বা বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু জিহোভা বা ঈশ্বর এ ব্যাপারে তখন কোন বিধি-নিষেধ করেনি। মুহাম্মদ (সঃ) প্রথমে তা করলেন। তিনিই প্রথমে কঠোর নিয়ম চালু করলেন যে, স্ত্রীলোকদের ন্যায্য হক আদায় করতে হবে এবং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে।

প্রখ্যাত মনীষী Leitner তাঁর Muhammadanism গ্রন্থে নারী জাতির উন্নয়নে মহানবী (সঃ) এর অবদানের প্রশংসা করে বলেন, "মুহাম্মদ নারী জাতিকে অন্যের সম্পত্তি হওয়া থেকে রক্ষা করে সম্পত্তির মালিক হবার অধিকার দিয়েছিলেন এবং তিনি নারীদেরকে প্রথমে আইনগত অধিকারী অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাম্মদী আইনে নারী জাতির স্বার্থ তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামে একজন বিবাহিতা নারী বিবাহিতা ইংরেজ নারী অপেক্ষা অধিক আইনগত অধিকার ভোগ করে। সে জন্য মৃত্যু বিয়ের সত্যতা যাচাইয়ের সাক্ষ্য দিতে পারে তা ফরাসী প্রজাতন্ত্রেও এ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি।

মনীষী "Forlong" নারী জাতির উন্নয়নে মহানবীর প্রশংসা করে বলেন ঃ "মহান আইন প্রবর্তক বিবাহকে একটি সামাজিক চুক্তি হিসেবে দেখেছেন দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে যা সম্পন্ন হতে পারে। নৈতিকতা বর্জিত ও দুর্ব্যবহারের কারণ দেখিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতা একমাত্র তিনিই প্রদান করেছেন।"

ভুপালের বেগম মাতা মহানবী করীম (সঃ) উপস্থিত ইসলামের নারীর মর্যাদার প্রশংসা করে বলেন ঃ ইসলাম ধর্মীয়, সামাজিক ও বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষেত্রে নারীদেরকে এক বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছেন যা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কল্পনাও করা যেত না।

স্যার আচার্বাল্ড হ্যামিল্টন মহানবী (সঃ) নারী পুরুষের সাম্যের বিধানের প্রতি আশ্চর্য হয়ে বলেন, নর-নারী যে একই উৎস থেকে উদ্ভুত তাদের আত্মা যে একই প্রকারের এবং বুদ্ধি বৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা ও চরিত্রের দিক থেকে যে উভয়ই সমান মহানবী সর্বপ্রথম এ ঘোষণা দেন।

www.pathagar.com

'মিঃ সরকার' তার "The Muhammadan Law" গ্রন্থে মহানবী (সঃ) বিবাহ নীতির প্রশংসা করে বলেন, ইসলামে একজন প্রাপ্ত বয়স্কা নারী স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে স্বাধীন। অভিভাবকদের জোর করে বিবাহ দেয়ার কোন এখতিয়ার নেই। কাউকে বিবাহ করা বা না করার ব্যাপারে প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর মতই চূড়ান্ত।

জর্জ বার্নাড'শ মহানবী (সঃ) এর নারী সমস্যাসহ সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করার প্রশংসা করে বলেন, "If a man like Muhammad were to assime the dectatorship of the modern world. He would succeed in solving its problems that would bring it the much needed peace and happiness" এমনকি তিনি আবেগ প্রবণ হয়ে বলেন ঃ বিশ্ববাসী তোমরা যদি নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে চাও এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবন ব্যবস্থার আশা কর, তবে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণভার মুহাম্মদ (সঃ) এর হাতে ছেড়ে দাও।

মাইকেল হার্ট বলেন, Muhammad (Sm) only man in history Who was supreamly succesful in both religion and seculer leaves.

জর্জ বার্নাড'শ মহানবী বিশ্বের সকল মানবতাবাদীদের শ্রেষ্ঠ ও মানব সমাজের সকল সমস্যা কাটিয়ে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানে বিস্মিত হয়ে বলে উঠেন, If all the world was united under one leader, than Muhammad would have been the best fitted man to lead the people of the various creeds, domas and ideas to peace and happiness.

মহানবী (সঃ) নারীদের উন্নয়নে তাদের সকল সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করে তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দিয়েছেন একমাত্র অভূতপূর্ব মর্যাদা। নারী সমাজের সকল সমস্যা সমাধানে মহানবী (সঃ) প্রদর্শিত পথই হচ্ছে একমাত্র অনুসরণ যোগ্য। একথা বুঝতে পেরেই প্রখ্যাত বৃটিশ লেখক জর্জ বার্নাড'শ বলেছেন ঃ A time Surely will come, sooner or later, when the world will be forced to admit that the only means to end all its trobles is to follow the perfect teachings and examples of the Holy Prophet (Sm).

'জনসন' মহানবী (সঃ) এর বিধিবদ্ধ বহু বিবাহের সমালোচনাকারীদের জবাবে বলেন ঃ "প্রাচ্যের পুরুষদের বহু বিবাহের দাবী অপ্রতিরোধ্য ছিল। প্রকৃত পক্ষেই তা ছিল সামাজিক অবস্থার ফলমাত্র। এ বিষয়ে মহানবী (সঃ) শর্ত সাপেক্ষ অনুমতি এর প্রসারে কোনরূপ সহায়তা করেননি।

ডঃ গষ্টার্ড উইল জার্মানী মহানবীর অবলা নারী জাতির উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেনঃ তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ক্রীতদাস-দাসীদের কঠোর জীবনকে করেছিলেন নমনীয় এবং দরিদ্র বিধবা ও ইয়াতিমদের দেখিয়েছিলেন পিতৃসুলভ যত্ন।"

"Times" পত্রিকার সম্পাদক ১৮৮৭ সালের অক্টোবর সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেন ঃ মুহাম্মদ (সঃ) বহু বিবাহের অবাধ প্রসার রোধ করেন। বহু বিবাহের প্রথার ফলেই শিশু হত্যা বন্ধ হয়েছিল। নারী জাতিকে আইনগত সমর্থন দিয়ে তাদেরকে

www.pathagar.com

মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর ফলে মুসলিম দেশগুলো পেশাদার বারবনিতা থেকে মুক্ত মুসলমানদের নিয়ন্ত্রিত বহু বিবাহ খ্রীস্টান জাতির বহু বিবাহের চেয়ে অনেক উত্তম।

W. Litner তাঁর লেখা "Muhammadanism" নামক গ্রন্থে মহানবীর (সঃ) অবাধ বহু বিবাহ বন্ধনের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "বহু বিবাহ প্রতিরোধে মুহাম্মদ (সঃ) উদ্যোগী হলেন। তিনি সমান আচরণ সাপেক্ষে এক সাথে দু'তিন বা চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করেন। অন্যথায় কেবল একজন স্ত্রী রাখতে পারবে। বস্তুতঃ কোনো পুরুষই এক সাথে দু'জন স্ত্রীকে সমান আচরণ বা সমান ভালবাসা দেখাতে পারে না। সেহেতু মুহাম্মদী আইন এক বিবাহের পক্ষে।

তিনি বহু বিবাহের পক্ষে মত ব্যক্ত করে আরো বলেন ঃ "যেহেতু মুসলমানদের কোনো মদ্যশালা, জুয়ার আড্ডা বা পতিতালয় নেই তাই বহু বিবাহ (শর্ত সাপেক্ষ) অযৌক্তিক নহে।

প্রখ্যাত মনীষী 'ম্যাক্স মুলার' মহানবীর বহু বিবাহ প্রথার সমালোচনার জবাবে বলেনঃ "মুসলমানদের বহু বিবাহ প্রথাকে অনেকে পাপাচারের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের সে বিবেচনা অসত্য নয়। সেই মহান নেতার সমাজ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদেরকে সেদেশ, মরুবাসীদের জীবন পদ্ধতি ও তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখতে হবে।

প্রখ্যাত মনীষী A. G. Lionard তাঁর "Islam-her Moral and Spritual Value" নামক গ্রন্থে মহানবীর (সঃ) নিয়ন্ত্রিত বহু বিবাহের ফলে নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে– এমন সমালোচনাকারীদের জবাবে বলেন, "মুসলিম সমাজকে ইউরোপীয় সমাজের সাথে অনায়াসেই তুলনা করা যেতে পারে। বহু বিবাহের অনুসারীরা সম-সাময়িক ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মানীদের ন্যায় চরিত্রবান হয়তো বা বেশি।

মনীষী "Furlong" বলেন ঃ মুহাম্মদ (সঃ) বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে যথেচ্ছ বহু বিবাহের প্রসার যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে একজন দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি জীবন্ত হত্যা বন্ধ করেছেন, নারীকে কেবল পণ্য হিসাবে গণ্য করা থেকে মানুষকে বিরত করেছেন, দাস প্রথার সেই যুগে নারীর অবস্থা পশুর চেয়ে ভাল ছিল না, বহু বিবাহ প্রথা তাদেরকে বিশেষ মর্যাদার আসন দিয়েছিল।

তাই জার্মান জাতীয় কবি শেষনবী (সাঃ)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে কবিতার ভাষায় বলেছেন ঃ

তোমরা সকলে দ্যাখো, দ্যাখো মুহাম্মদ,
এমন শাসক তিনি, ন্যায়ের শাসক
সমগ্র জাতিকে
রাজকীয় স্রোতের ধাক্কায়
কেমন যাচ্ছেন নিয়ে সুউচ্চ সীমায়।
তাঁর সেই অগ্রযাত্রা নাম নেয়

www.pathagar.com

একটি স্বদেশ
নগরের জন্ম হয় তার পদতলে।
অবাধ গতিতে চলে স্রোতধারা
দূরে বহু দূরে,
জীবনের আলো জ্বলে
সুউচ্চ চূড়ার পরিসরে।

মদীনা সনদ ঃ ইতিহাসের প্রথম শাসনতন্ত্র

নবী করীম (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেছিলেন ১২ রবিউল আউয়াল। ইংরেজী বর্ষপঞ্জির গণনায় সেদিনটি ছিলো ৬২২ খ্রীস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর।

এক্ষেত্রে গবেষকগণ তিনটি তারিখের উল্লেখ করেছেন ২২, ২৪ ও ২৯ সেপ্টেম্বর। আমরা মধ্যের তারিখটি বেছে নিয়েছি।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) পিতৃভূমি পবিত্র মক্কা নগরী ছেড়ে মাতুলালয় ইয়াসরিবে পৌঁছেন। এটা ১২ রবিউল আউয়াল, ২৪ সেপ্টেম্বর, ৬২২ সালের ঘটনা। সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় তিনি ইয়াসরিবের কুবায় পৌঁছেন। ইয়াসরিবের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে আবেগঘন পরিবেশে স্বাগত জানান, করে নেন আপন। জনাকীর্ণ সম্বর্ধনা সভায় ইয়াসরিববাসী নবী করীম (সাঃ)-এর ঐতিহাসিক আগমনকে স্মৃতিবহ করে রাখার জন্য তাদের লালিত ইয়াসরিবের নামকরণ করেন 'মদীনাতুন্নবী' বা 'মদীনাতুর রসুল'। পরবর্তীতে এ নগরীই 'মদীনা' নাম ধারণ করে, কল্যাণ রাষ্ট্রের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। এর বক্ষেই নির্মিত হয় মসজিদে নববী। এটিই ছিলো এ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ভবন, সংসদ ভবন, সুপ্রীম কোর্ট। নবী করীম (সাঃ) মদীনায় পৌঁছার পর দেখেন এখানে তিন শ্রেণীর লোকের নিবাস রয়েছে। ১. মদীনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়, ২. বিদেশী ইয়াহুদী সম্প্রদায়, ৩. নব বায়আতপ্রাপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়। এদের আদর্শগত মিল ছিলো না। এ ছাড়া ছিলো গোষ্ঠীগত হিংসা-বিদ্বেষ, তাই নবী করীম (সাঃ) একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। চুক্তিপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যেনি পরম করুণাময় এবং পরম দয়ালু।

আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জারিকৃত এটি লিখিত কিতাব বা চুক্তি কুরাইশ এবং ইয়াসরিবের মুমিন, মুসলিম আর যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে।

১. তারা আর সব লোকের থেকে স্বতন্ত্র একটি উম্মাহ বা জাতি।

২. কুরাইশের মুহাজিরগণ পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের পরস্পরের মধ্যকার রক্তপণ প্রদান করবে আর মুমিন-মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম এবং ন্যায়-নীতির নিরিখে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করবে।

৩. বনু আউফ পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে

www.pathagar.com

রক্তপণ আদায় করবে, আর প্রতিটি গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম-নীতি এবং ন্যায় বিচার ও আদল-ইনসাফের ভিত্তিতে মুক্তিপণের সাহায্যে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৪. বনু সা'ইদা পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের পূর্বহারে রক্তপণ প্রদান করবে, আর প্রতিটি গোত্র মুমিনের মধ্যে উত্তম পন্থা এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণের সাহায্যে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৫. বনু হারিস পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্ব হারে রক্তপণ প্রদান করবে, আর প্রতিটি গোত্র মুমিনদের মধ্যে উত্তম পন্থা এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে বন্দীদের মুক্ত করবে মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে।

৬. বনু জুশাম পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তের মূল্য দেবে, আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণকর এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৭. বনু নাজ্জার পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তের মূল্য প্রদান করবে, আর অন্যসব গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণকর এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৮. বনু আমর ইবন আউফ পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের রক্তের মূল্য পূর্বহারে প্রদান করবে, আর প্রতিটি গোত্র মুমিনদের মধ্যে কল্যাণকর এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৯. বনু নবীত (আন্‌নবীত) পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বাহারে রক্তের মূল্য দেবে আর প্রতিটি গোত্র মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণকর এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মূল্য দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করবে।

১০. বনু আউস (আল আউস) পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তপণ আদায় করবে, আর তাদের প্রতিটি দল মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম-নীতি এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে রক্তপণের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করবে।

১১. মুমিনরা নিজেদের ঋণগ্রস্থ/ অভাবগ্রস্থ কাউকেই পরিত্যাগ করবে না এবং মুক্তিপণ ও রক্তপণ আদায়ের জন্য তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে।

১২. কোনো মুমিনই অন্য মুমিনের আশ্রিত ব্যক্তির সাথে (মাওলা) বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না তাকে (আশ্রয়দাতা) বাদ দিয়ে।

১৩. খোদাভীরু (মুত্তাকী) মুমিনগণের মধ্যে থেকে কেউ বিদ্রোহী হলে তার বিপক্ষে থাকবে অথবা কেউ মুমিনদের মধ্য থেকে অত্যাচার, পাপাচার, শত্রুতা বা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে চাইলে সে তাদের মধ্য থেকে কারো সন্তান হলেও তারা সম্মিলিতভাবেই তার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

১৪. এক মুমিন অন্য মুমিনকে কোনো কাফিরের জন্য হত্যা করবে না, আর কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্যও করবে না।

১৫. আল্লাহ প্রদত্ত জিম্মা বা নিরাপত্তা একটিই। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা দুর্বলকেই আশ্রয় দেয়া হবে। অন্যান্য লোক ব্যতীত মুমিনগণ পরস্পর বন্ধু।

১৬. ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে যারা আমাদের অনুসরণ করবে তাদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা হবে, আর তাদের সাথে করা হবে সদাচরণ। তাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন তো হবেই না, অধিকন্তু তাদের শত্রুদেরও সাহায্য করা হবে না।

১৭. মুমিনদের একটিই মাত্র চুক্তি। কোনো মুমিন অন্য মুমিন ব্যতীত আল্লাহর রাহে জিহাদ করার লক্ষ্যে চুক্তি করবে না, ঐ চুক্তি যতক্ষণ না সমতা এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে।

১৮. আমাদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করবে- এমন প্রতিটি সেনা দল পরস্পরানুসারে একে অন্যের পেছনে থাকবে।

১৯. আল্লাহর রাহে দেয়া রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার অদম্য স্পৃহায় মুমিনগণ পরস্পর সাহায্য করবে।

২০. মুত্তাকী বা খোদাভীরু মুমিনগণই সর্বোত্তম এবং সঠিক হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২১. কোনো মুশরিকই কুরাইশদের জান অথবা মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে না বা মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো কুরাইশের পক্ষাবলম্বন করবে না।

২২. কোনো মুমিনকে কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করলে এবং তা প্রমাণিত হলে, প্রতিদানে তাকেও হত্যা করা হবে। তবে হ্যাঁ, নিহত ব্যক্তির ওলী বা উত্তরাধিকারী যদি রক্তপণ গ্রহণে সন্তুষ্ট হয় সেটা ভিন্ন কথা।

২৩. এ সহিফায় সন্নিবেশিত বিষয়ে ঐকমত্যপোষণকারী এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোনো মুমিনের জন্যই কোনো অন্যায়কারীদের সাহায্য করা বা আশ্রয় দেয়া বৈধ হবে না। কেউ এমন লোককে সাহায্য বা আশ্রয় প্রদান করলে তার উপর আল্লাহর লানত এবং গজব আপতিত হবে। তার কাছ থেকে কোনো বিনিময় এবং বদলা গ্রহণ করা হবে।

২৪. তোমাদের মধ্যে কখনো কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে একমাত্র আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দিকে (মীমাংসার) প্রত্যাবর্তন করবে।

২৫. যুদ্ধ চালাকালীন সময়ে ইয়াহুদীরা মুমিনদের সাথে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করবে।

২৬. বনু আউফের ইয়াহুদীরা মুমিনদের সাথে একই উম্মাহ। ইয়াহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম, তাদের মাওয়ালী বা আশ্রিত এবং তারা নিজেরাও। অবশ্য, যে-ই অন্যায় বা অপরাধ করবে, সে নিজের

www.pathagar.com

এবং তার পরিবার-পরিজনের ক্ষতিই করবে।

২৭. বনু নাজ্জারের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

২৮. বনু হারিসের ইয়াহুদীরাও বনু 'আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

২৯. বনু সা'ইদার ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

৩০. বনু জুশামের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

৩১. বনু আউসের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

৩২. বনু সালাবার ইয়াহুদীরা বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই। অবশ্য, যে অত্যাচার করবে আর বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জন্য ক্ষতিসাধন করবে।

৩৩. সালাবার শাখাগোত্র জাফনার ইয়াহুদীরাও সালাবারই অনুরূপ।

৩৪. বনু শুতাইবার ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই। পাপাচার নয়, পুণ্যই কাম্য।

৩৫. সালাবার মাওয়ালী বা আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ তাদেরই মতো।

৩৬. ইয়াহুদীদের বন্ধুরাও (চুক্তিবদ্ধ) তাদের মতোই।

৩৭. মুহম্মদ (সাঃ)-এর অনুমতি ছাড়া তাদের কেউই যুদ্ধের জন্য বেরুবে না।

৩৮. কারও ক্ষতির প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে কাউকেই বাধা দেয়া হবে না। কেউ হঠকারিতা প্রদর্শন করলে, সে নিজে এবং তার পরিবারই হবে দায়ী। তবে হ্যাঁ, কেউ অত্যাচারিত হলে তার জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। এ চুক্তিনামায় যা আছে, তার সর্বাধিক হিফাজতকারী একমাত্র আল্লাহ।

৩৯. ইয়াহুদী এবং মুসলমানগণ নিজ নিজ ব্যয় নির্বাহ করবে।

৪০. এ সহীফা বা দলিল গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে, তাদের বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিতভাবে পরস্পরকে সাহায্য করবে, পরস্পরকে সদুপদেশ এবং কল্যাণকর কাজেই তারা সাহায্য করবে, পাপ কাজে নয়।

৪১. বন্ধুর দুষ্কর্মের জন্য কেউই দায়ী হবে না, আর মজলুম বা অত্যাচারিতকে করা হবে সাহায্য।

৪২. যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইয়াহুদীরা মুমিনদের সাথে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করবে।

৪৩. এ সহীফায় অঙ্গীকারাবদ্ধদের জন্য ইয়াসরিবের উপত্যকা পবিত্র।

৪৪. আশ্রিতরা আশ্রয়দানকারীদের নিজেদের মতোই, যে পর্যন্ত তারা কোনো অন্যায় বা বিশ্বাসঘাতকতা না করে।

৪৫. কোনো নারীকে তার গোত্রের বা পরিবারের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৬. এ সহীফায় অঙ্গীকারাবদ্ধ গোত্রের মধ্যে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে–

www.pathagar.com

এমন কোনো ঘটনা ঘটলে আল্লাহ এবং রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে (মীমাংসার জন্য) সমর্পণ করতে হবে। এ সহীফায় যা আছে তা রক্ষার এবং পূর্ণতাদানের জন্য আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষক।

৪৭. কুরাইশ বা তাদের সাহায্যকারীদের আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৮. ইয়াসরিবের উপর অতর্কিত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তারা একে অন্যকে সাহায্য করবে।

৪৯. তাদেরকে যে কোনো চুক্তি করার আহবান জানানো হলে চুক্তি করবে এবং মেনে চলবে। মুমিনদেরকে চুক্তি করার আহবান জানালে, তারাও অনুরূপই করবে। তবে কেউ যদি ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে।

৫০. প্রতিটি মানুষই সপক্ষের কাছ থেকে তার প্রাপ্য অংশ পাবে।

৫১. বনু আউসের ইয়াহুদীরা তাদের মাওয়ালী এবং তারা নিজেরা এ সহীফার শরীক দলের মতোই হবে, তারা সহীফার শরিক দলের ন্যায় সম্মানজনক আচরণ করবে।

[ইবন হিশাম বলেন ঃ কারো কারো মতে, এই ধারার আল বিররুল মাহজ-এর স্থলে আল বিররুল মুহাম্মদ হবে, এর অর্থ হচ্ছে অধিকতর সম্মানজনক]।

ইবন ইসহাক বলেন ঃ কারো কারো মতে, এ অংশ হবে নিম্নরূপ ঃ "বিশ্বস্ততাই কাম্য, বিশ্বাসঘাতকতা নয়। যে এটা আয়ত্ত করে, সে নিজের জন্যই করে। এ সহীফায় যা রয়েছে, আল্লাহই তার সত্যতার সাক্ষী এবং রক্ষাকারী।

৫২. এ কিতাব বাস্তবায়নে অত্যাচারী এবং পাপী ছাড়া কেউই বাধা প্রদান করবে না। যে-ই যুদ্ধের জন্য বেরুবে আর যে-ই মদীনায় থাকবে, সবাই থাকবে শান্তিতে; যারা অত্যাচার করবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবে একমাত্র তারা ব্যতীত।

৫৩. আল্লাহই সৎ ও ধর্মভীরুদের রক্ষাকারী বা আশ্রয়দাতা, আর মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।

বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম লিখিত চুক্তি এটি। সর্বমোট ৫৩টি ধারাকে ক্রোড়ে করে এ চুক্তিপত্রের পথচলা। বিস্মিল্লাহ এবং সংক্ষিপ্ত ভূমিকা অবশ্য এর বাইরে। প্রতীয়মান হচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত করেই কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। কাংখিত রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি প্রণয়ন করেন ইতিহাস খ্যাত অনন্য সাধারণ এ সংবিধান। এটিই 'মীসাকুল মদীনা' বা 'কিতাবুর রাসূল' অর্থাৎ 'মদীনা সনদ' নামে প্রসিদ্ধ। প্রথমে ইবন ইসহাক এবং পরবর্তীতে ইবন হিশাম নিজ নিজ সীরাত গ্রন্থে সনদের ধারাগুলো সন্নিবেশ করেন।

মূল ঃ ইবন ইসহাক; তরজমা ঃ আবদুল ওয়াহিদ

www.pathagar.com

বিদায় হজ্বের বাণী

"হে আমার প্রিয় বক্তবৃন্দ, আজ যে কথা তোমাদেরকে বলবো, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমাদের সঙ্গে একত্রে হজ্ব করবার সুযোগ আর আমার ঘটবে না।

হে মুসলিম, আঁধার যুগের সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে ভুলে যাও, নব আলোকে পথ চলতে শিখ। আজ হতে অতীতের সমস্ত মিথ্যা-সংস্কার, অনাচার ও পাপ-প্রথা বাতিল হয়ে গেলো।

মনে রেখো– সব মুসলমান ভাই ভাই। কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়, কারো চেয়ে বড় নয়। আল্লাহ্‌র চোখে সকলেই সমান। নারী জাতির কথা ভুলো না। নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের উপর নারীরও সেরূপ অধিকার আছে। তাদের প্রতি অত্যাচার করো না। মনে রেখো– আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করেছ।

সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এই বাড়াবাড়ির ফলেই অতীতে বহু জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

প্রত্যেক মুসলমানের ধন-প্রাণ পবিত্র বলে জানবে। যেমন পবিত্র আজকের এইদিন– ঠিক তেমনিই পবিত্র তোমাদের পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ।

হে মুসলমানগণ, হুঁশিয়ার! নেতৃ-আদেশ কখনও লংঘন করো না। যদি কোনো কর্তিত-নাশা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করে দেয়া হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদেরকে চালনা করে, তবে অবনত মস্তকে তার আদেশ মেনে চলবে। দাস-দাসীদের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করো। তাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করো না। তোমরা যা খাবে, তাদেরকেও তাই খাওয়াবে; যা পরবে, তাই পরবে। ভুলিও না– তারাও তোমাদের মতো মানুষ।

সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদেরকে স্পর্শ না করে। শিরক্ করো না, চুরি করো না, মিথ্যা কথা বলো না, ব্যভিচার করো না। সর্বপ্রকার মলিনতা হতে নিজেকে মুক্ত করে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করো। চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হও।

মনে রেখো– একদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। বংশের গৌরব করো না। যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় মনে করে অপর কোনো বংশের নামে আত্মপরিচয় দেয়, আল্লাহর অভিশাপ তার উপর নেমে আসে।

হে আমার উম্মতগণ, আমি যা রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো, তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হবে না। সে গচ্ছিত সম্পদ কী? তা আল্লাহর কুরআন এবং তাঁর রসূলের আদেশ।

নিশ্চয় জেনো, আমার পর আর কোনোই নবী নেই। আমিই শেষ নবী। যারা

www.pathagar.com

উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিত সকল মুসলমানের কাছে আমার এই সকল বাণী পৌঁছিয়ে দিও।"

হযরতের মুখমন্ডল ক্রমেই জ্যোতির্দীপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। কণ্ঠস্বর ক্রমেই করুণ ও ভাবগম্ভীর হয়ে আসলো। উর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি আবেগভরে বলতে লাগলেন ঃ "হে আল্লাহ্, হে আমার প্রভু, আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিতে পারলাম? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলাম?"

লক্ষ কণ্ঠে নিনাদিত হলো ঃ "নিশ্চয়! নিশ্চয়!!"

তখন হযরত কাতর কণ্ঠে পুনরায় বলতে লাগলেন ঃ "প্রভু হে শ্রবণ করো, সাক্ষী থাকো; এরা বলছে, আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি।" ভাবের আতিশয্যে হযরত নীরব হয়ে রইলেন। বেহেশতের জ্যোতিতে তাঁর মুখ-কমল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

এ সময় কুরআনের শেষ আয়াত নাযিল হলো ঃ

"(হে মুহম্মদ) আজ আমি তোমার দীনকে সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমার উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকেই তোমার ধর্ম বলে মনোনীত করলাম।" (৫:৩)

হযরত ক্ষণকাল ধ্যানমৌন হয়ে রইলেন। বিশাল জনতা তখন নীরব। কিছুক্ষণ পরে তিনি নয়ন মেলে করুণ স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সেই জনসমুদ্রের প্রতি তাকিয়ে বললেন ঃ "বিদায়! বন্ধুগণ, বিদায়!!"

একটা অজানা বিয়োগ-বেদনা সবারই হৃদয়ে ছায়াপাত করে গেলো।

www.pathagar.com

এক নজরে মহানবী (সাঃ)-এর বর্ণাঢ্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী

৩২০০	২৩০০ খ্রীঃ পূঃ	১।	প্রাচীন মিশরীয় ফেরাউনদের রাজত্বকাল
১৯০০	খ্রীঃ পূঃ	২।	মহাপ্লাবন।
১৮০০	খ্রীঃ পূঃ	৩।	হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময়কাল।
১৫৮০	১০৯০ খ্রীঃ পূঃ	৪।	ফেরাউনদের শেষ গৌরবময় যুগ।
১৩০০	১২৫০ খ্রীঃ পূঃ	৫।	হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়কাল।
৯৫০	১৫০ খ্রীঃ পূঃ	৬।	সাবিয়ান রাজাদের রাজত্বকাল।
৮৫০	১৫০ খ্রীঃ পূঃ	৭।	তাওরাতের ৩৯টি পুস্তক প্রণয়নের সময়কাল।
১৮	খ্রীঃ পূঃ	৮।	সৈন্য-সামন্তসহ রোমান সম্রাট মরু সাগরে ধ্বংস হন।
২২৪	খ্রীঃ	৯।	সাসানীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (সম্রাট খসরু পারভেজ ৫৯০-৬২৭ খ্রীঃ)
৪৮০	খ্রীঃ	১০।	কুরাইশ বংশীয় পরাক্রমশালী কুশাই-এর মৃত্যু।
৫২০	খ্রীঃ	১১।	দাদা আব্দুল মুত্তালিবের শাসনভার গ্রহণ।
৫২৫	৫৭৫ খ্রীঃ	১২।	দক্ষিণ আরবে আবিসিনিয়ার (হাবশী) রাজাদের রাজত্ব।
৫৭০	খ্রীঃ	১৩।	হাবশী রাজা আবরাহার মক্কাভিযান।
৫৭০	অক্টোবর	১৪।	পিতা আব্দুল্লাহর ইন্তেকাল (মদীনায়)।
৫৭১ খ্রীঃ ২২ এপ্রিল	১ম জন্মসন ১২ রবিউল আউঃ সোমবার	১।	সাইদিনা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শুভ জন্মদিন।
৫৭১ খ্রীঃ	১ জন্মসন	২।	জন্মের ৭ম দিবসে রবিবার আকিকা ও খাতনা করা হয়। হাওয়াজিন বংশের সা'দ গোত্রের ধাত্রী হালিমার নিকট ৫ বছর বয়স পর্যন্ত লালিত পালিত হন।
৫৭৭ খ্রীঃ	৬ জন্মসন	৩।	৬ বছরের শিশুকে নিয়ে মা আমিনা মদীনায় স্বামীর কবর জিয়ারত করেন এবং ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মারা যান। পরিচারিকা উম্মে আয়মন ইয়াতীম মুহম্মদ (সাঃ)-কে মক্কায় এনে দাদার হাতে দেন।
৫৭৯ খ্রীঃ	৮ জন্মসন	৪।	৮ বছর বয়সে স্নেহময় দাদার ইন্তেকাল। পরে

www.pathagar.com

			চাচা আবু তালিবের স্নেহস্পর্শে লালিত-পালিত। পর্বত ও উপত্যকায় সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মেষ-উট চরাতেন। কাবার তীর্থযাত্রীদের পানি সরবরাহ করতেন। কোনো শিক্ষকের নিকট লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। বিশ্ব প্রকৃতিই ছিলো তার শিক্ষক ও শিক্ষার উপকরণ।
৫৮২ খ্রীঃ	১২ জন্মসন	৫।	১২ বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন। বিশ্বস্ততার জন্য কৈশোরে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত হন। ✯ মহানবী (সাঃ)-এর জন্মের চন্দ্র বছরকে 'জন্মসন' নামে অভিহিত করা হলো।
৫৮৫ খ্রীঃ	১৫ জন্মসন	৬।	আরবের বিখ্যাত উকাস মেলায় জুয়া খেলা, ঘোড়দৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতাকে উপলক্ষ করে কুরাইশ ও কায়েস গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৫ বছর কাল স্থায়ী হয় যা হরব আল ফুজ্জার (অন্যায় সমর) নামে পরিচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীর তিনি চাচার হাতে তুলে দিতেন। যুদ্ধের বিভীষিকা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর কোমল হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে।
৫৯০ খ্রীঃ	২০ জন্মসন	৭।	হিলফ আল ফুদুল নামক আন্তঃগোত্রীয় শান্তি কমিটি গঠনে অংশ নেন, যার উদ্দেশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা, অত্যাচারীর প্রতিরোধ, বিদেশীদের জানমাল রক্ষা ও অসহায়দের সাহায্য করা। শান্তির অগ্রদূতরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন।
		৮।	মক্কার ধণাঢ্য মহিলা খাদিজা তাহিরা বিনতে খুওয়ায়লিদ-এর বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সিরিয়া, ইয়ামেন প্রভৃতি স্থানে যান। ভৃত্য মায়সারা ২ বার সিরিয়ায় সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি বিবি খাদিজার নিকট তাঁর প্রতিনিধির বাণিজ্য কুশলতা ও সততার বর্ণনা দেন।
৫৯৫ খ্রীঃ	২৫ জন্মসন	৯।	আল সাদিক, আল আমীন মুহম্মদ (সাঃ)-এর চারিত্রিক খ্যাতিতে মুগ্ধ খাদিজা তাহিরার প্রস্তাবে ও চাচা আবু তালিকের সম্মতিতে হযরত ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্কা মহিয়সী মহিলা খাদিজার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

www.pathagar.com

৬০৫ খ্রীঃ	৩৫ জন্মসন	১০।	পবিত্র কাবা ঘর সংস্কারের পরকাল পাথর সংস্থাপন নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হলে হযরতের উপস্থিত বুদ্ধির ফলে অহেতুক রক্তপাতের সম্ভাবনা দূর হয়।
		১১।	৩৫ বছর বয়স হতে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মক্কার ৩ মাইল দূরবর্তী হিরা পর্বতের গুহায় স্রষ্টার নির্দেশ ও সৃষ্টির কল্যাণ কামনায় নিভৃত চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি কয়েক দিনের খাদ্য-পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন।
৬১০ খ্রীঃ ২৪ আগস্ট	৪১ জন্মসন ২৭ রমজান (নবুঃ ১ম বর্ষ)	১২।	প্রথম ওহী নাযিল হয় রমজান মাসের লায়লাতুল ক্বদর-এ (২ঃ১৮১, ৯৭ঃ১)
৬১৩ খ্রীঃ	৪৩ জন্মসন (নবুঃ ৩য়)	১৩।	প্রকাশ্যভাবে ধর্মপ্রচারের নির্দেশ লাভ (১৫ঃ৯৪)
৬১৪ খ্রীঃ এপ্রিল	৪৫ জন্মসন রজব (নবুঃ ৫ম)	১৪।	সাহাবীগণকে আবিসিনিয়াতে আশ্রয় গ্রহণের অনুমতি প্রদান। মুহম্মদ (সাঃ)কে পাগল, যাদুকর, কবি বলে অপপ্রচার চালাল/ কোরআন শুনতে নিষেধ করলো (৪১ঃ২৬, ৩১ঃ৬, ৭৪ঃ২৪)।
৬১৫ খ্রীঃ	৪৬ জন্মসন	১৫।	আবু জেহেল কর্তৃক সাফা পাহাড়ে ধ্যানরত হযরতের মস্তকে প্রস্তরাঘাত। বীর কেশরী চাচা হামজা কাবা ঘরে প্রবেশ করে আবু জেহেলকে শাস্তি দেন এবং নিজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।
		১৬।	কাবাঙ্গনে একত্ব প্রচার করার সময় বহু ঈশ্বরবাদের বিরোধিতার অপরাধে তাঁকে আক্রমণ করার জন্য লোকজন ছুটে আসে এতে বিবি খাদিজার পূর্বপক্ষের সন্তান হারিস ইবনে আবী হালা প্রতিবাদ করেন এবং কুরাইশগণ কর্তৃক প্রথম শহীদ হন।
৬১৫ খ্রীঃ	৪৬ জন্মসন (নবুঃ ৬)	১৭।	তেজস্বী বীর উমার (রাঃ) ২৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরতের ২/৩ বছরের বড় হযরত হামজাও ইসলাম গ্রহণ করেন।
৬১৬ খ্রীঃ হতে ৬১৯ খ্রীঃ	৪৭ জন্মসন হতে ৫০ জন্মসন	১৮।	সামাজিক বয়কট ঃ হযরতের প্রচার জয়যুক্ত হলে কুরাইশদের ধর্মমান, প্রতিপত্তি নষ্ট হবে অথচ

www.pathagar.com

			তাঁকে কেউ একাই হত্যা করলে গোত্র-কলহ শুরু হবে এই ভয়ে সকলে লিখিত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রদ্বয়ের মুসলিম অমুসলিম সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক অঙ্গীকারনামা দেব-দেবীর তত্ত্বাবধানে কাবা ঘরে লটকিয়ে দিলো। আবু তালেবের উপত্যাকায় নির্বাচিত জীবন যাপন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৈবাহিক সম্পর্ক ও খাদ্য-দ্রব্য হতে বঞ্চিত।
৬১৯ খ্রীঃ	৫০ জন্মসন (নবুঃ ১০)	১৯।	কুরাইশদের বর্জনশীলতা পরিত্যাগের অব্যবহিত পরে নবুওয়তের ১০ম বর্ষে বিবি খাদিজা (৬৫) ও চাচা আবু তালিব ইহলোক ত্যাগ করেন।
৬১৯ খ্রীঃ ২০ মার্চ	৫০ জন্মসন ২৭ রজব (নবুঃ ১০)	২০।	মেরাজ বা ঊর্ধ্বাকাশে গমন (১৭ঃ১) এ সময় ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ (বাধ্যতামূলক) করা হয়। বিভিন্ন গোত্রে হুযরতের গমন। আবুযার গিফারীর ইসলাম গ্রহণ।
		২১।	তায়েফের নির্যাতন ঃ পালিত পুত্র যায়েদকে নিয়ে মক্কার ৭৫ মাইল দক্ষিণে তায়েফ গমন এবং সেখানে ১০ দিন অবস্থানকালীন সময়ে নির্মম অত্যাচারের শিকার হন।
৬২০ খ্রীঃ	৫১ জন্মসন (নবুঃ ১১)	২২।	হজ্ব মৌসুমে তীর্থ যাত্রীদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার। মদীনার ৬ জন খাজরাজ গোত্রের লোকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ। তাঁরা মূর্তিপূজা, চুরি, পরনিন্দা, শিশুহত্যা অথবা ঘৃণ্য কাজ না করার প্রতিজ্ঞা করেন।
৬২১ খ্রীঃ জুলাই	৫২ জন্মসন (নবুঃ ১২)	২৩।	আকাবার ১ম শপথ ঃ হজ্ব মৌসুমে ১২ জন মদীনাবাসী (১০ জন খায়রাজ, ২ জন আউস) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আকাবা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর মহত্ত্ব প্রচারের অঙ্গীকার করেন।
৬২২ খ্রীঃ জুন	৫৩ জন্মসন যিলহজ্ব (নবুঃ ১৩)	২৪।	হজ্বের সময় মদীনার ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা রাতে গোপনে আকাবায় হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ইসলামের খেদমত করার শপথ করেন– যা আকাবার ২য় শপথ নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

		২৫।	আবিসিনিয়া ফেরত ২০০ জন মুসলমানসহ মক্কার সকল মুসলমান দলে দলে মদীনায় গমন। শুধু হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে মক্কায় ছিলেন।
৬২২ খ্রীঃ ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার	৫৪ জন্মসন ১ম হিজরী ২রা রবিঃ আউঃ	২৬।	গোত্রকলহ এড়ানোর জন্য পুনরায় আবু জেহেলের নেতৃত্বে সকল গোত্রের একজন যুবকসহ 'হত্যাকারী সংঘ' গঠন করে একত্রে তরবারির আঘাতে হযরতকে হত্যার ষড়যন্ত্র (দারুণ নাদওয়াতে)। (২৭ঃ৪৯)।
		২৭।	হযরত আলী (রাঃ) হযরতের বিছানায় হযরতের চাদর গায়ে শুয়ে রইলেন আর মহানবী (সাঃ) সংগোপনে অন্ধকারে বের হয়ে পড়লেন কেউ দেখতে পেলো না (৩৬ঃ৯)। সাওর গিরি গুহায় ৩ রাত থেকে ৪ রবিঃ আউঃ সোমবার গুহা ত্যাগ করে লোহিত সাগরের পার্শ্ব দিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।
৬২২ খ্রীঃ ২০ সেপ্টেম্বর	১ম হিজরী ৮ রবিঃ আউঃ বৃহস্পতিবার	২৮।	মদীনার ৩ মাইল দূরবর্তী কুবা পল্লীতে পৌছেন এবং কুবাতে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।
৬২২ খ্রীঃ ৫ অক্টোবর	১ম হিজরী ২৩ রবিঃ আউঃ শুক্রবার	২৯।	কুবা হতে মদীনা অভিমুখে যাত্রা। বনু সালিম গোত্রে সর্বপ্রথম জুমআ নামাজ সম্পন্ন করেন। নামাযে খুতবা (বক্তৃতা) প্রদান।
		৩০।	মদীনায় আগমন ঃ বিপুল সম্বর্ধনা (ত্বলায়াল বাদরো আলায়না...) হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর দ্বিতল গৃহের নিম্নতলায় ৭ মাস অবস্থান।
৬২৩ খ্রীঃ এপ্রিল	১ম হিজরী শাওয়াল	৩১।	মসজিদে নব্বী ও সংলগ্ন আবাস নির্মাণ সম্পন্ন। কাঁচা ইটের দেয়াল, খেজুর কাঠের খুঁটির উপর ডালপাতার ছাল, মেঝেতে কাঁকর-বালু এই ছিলো তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ। মসজিদে নামাজ ছাড়াও ধর্ম প্রচার, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীও সম্পাদন করা হতো।

www.pathagar.com

৬২৩ খ্রীঃ আগস্ট	২য় হিজরী সফর	৩২।	হযরত স্বয়ং ৬০ জন মুহাজির নিয়ে মদীনার ২০০ মাইল দূরে আবওয়া নামক স্থানে গিয়ে বানু দুমরার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন।
৬২৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর	২য় হিজরী জুমা-সানী	৩৩।	হুরত স্বয়ং ২০০ মুজাহিরসহ মদীনার ৯০ মাইল দূরে বানু মুদলিজ গোত্রের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি সম্পাদন করেন।
৬২৪ খ্রীঃ	২য় হিজরী	৩৪।	ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা/ মদীনার সনদ ঃ ৪৭টি শর্ত সম্বলিত বিখ্যাত এই সনদে সকল গোত্রের সম্মতি ও স্বাক্ষর ছিলো। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান যা- 'মহা সদন' (ম্যাগনা কারটা) নামে পরিচিত।
৬২৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী	২ হিজরী শাবান	৩৫।	আল মসজিদুল আকসার দিক থেকে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন হয়। নামাজে আযান প্রবর্তন।
৬২৪ খ্রীঃ	২ হিজরী	৩৬।	কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়, হযরত বিভিন্ন দিকে সারিয়া বা শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী ছোট ছোট দল পাঠালেন। (২২ঃ৩৯, ৮ঃ৪৩, ৮ঃ৭)।
৬২৪ খ্রীঃ ১৩ মার্চ শনিবার	২ হিজরী ১৭ রমজান	৩৭।	বদর যুদ্ধ ঃ ১২ রমজান রওয়ানা, সঙ্গে ২৫৩ জন আনসার ও ৬০ জন মুহাজির ছিলেন। মদীনার ৮০ মাইল দূরে বদরের উপত্যাকায় কুরাইশদের ১০০০ সৈন্যের মোকাবিলা হয়। ৭০ জন কুরাইশ সৈন্য নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। মুসলিমদের ১৪ জন শহীদ হন। উৎবা ও আবু জেহেল নিহত হয়। বন্দীদের উটে বা ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজেরা হেঁটে যেতেন, নিজেরা না খেয়ে বন্দীদের খাওয়াতেন।
৬২৪ খ্রীঃ জুন	২ হিজরী যিলহজ্ব	৩৮।	বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আবু সুফিয়ান ২০০ অশ্বারোহী নিয়ে মদীনার বানু নদীর গোত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে মক্কায় ফেরার পথে খামারের ২ জনকে হত্যা করে, শস্য ও খড় পোড়ায়ে দেয়। হযরত তাকে ধাওয়া করলে ছাতুর (সাবীক) বস্তা ফেলে পলায়ন করে, ফলে একে গাযওয়া আল সাবীক বলা হয়।

www.pathagar.com

৬২৫ খ্রীঃ	৩ হিজরী	৩৯। বানু কাইনুকার বহিষ্কার ঃ ১৫ দিন নেজদের দূর্গ অবরোধের পর মদীনা হতে বিতাড়িত করা হয়। রোযা, ঈদ-উল-ফিতরের জামাআতের আদেশ নাযিল হয়।
৬২৫ খ্রীঃ ২৩ মার্চ বুধবার	৩ হিজরী ৫ শাওয়াল	৪০। উহুদের যুদ্ধ ঃ আবু সুফিয়ান ৩০০০ সশস্ত্র সৈন্য, ৩০০ উষ্ট্রারোহী ও ২০০ অশ্বারোহী নিয়ে মদীনার ৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। ১০০ বর্মধারী, ৩৫০ জন তীরন্দাজসহ ১০০০ জন কুরাইশদের মোকাবিলায় রওয়ানা হন। মোনাফেক আব্দুল্লাহ বিন-উবাই ৩০০ জনকে নিয়ে পলায়ন করে। চাচা বীর হামজাসহ ৭৩ জন শহীদ হন। ২৩ জন শত্রুসৈন্য নিহত হয়।
৬২৫ খ্রীঃ এপ্রিল	৩ হিজরী শাওয়াল	৪১। আবু সুফিয়ান অবশিষ্ট মুসলিমগণকে আক্রমণের উদ্যোগ করেন, হযরত তা বুঝতে পেরে ৭০ জন আহত মুজাহিদ নিয়ে মদীনার ৮ মাইল দূরে হামরা আল আসাদ পর্যন্ত যান। আবু সুফিয়ান ভয়ে মক্কা প্রস্থান করেন।
৬২৫ খ্রীঃ আগস্ট	৪ হিজরী রবি-আউঃ	৪২। দু'জন মুসলমানকে হত্যা করে ক্ষতিপূরণ দানে অস্বীকৃতি এবং হযরতের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ২১ দিন অবরোধের পর বানু নাদীর গোত্রকে মদীনা হতে খাইবারে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা। শত্রু পলায়ন করে।
১২ জুন আগস্ট	১০ মহররম রবি-আউ	৪৪। দুমাতুল জানদাল গমন ১০০০ সাহাবী সঙ্গে নিয়ে। শত্রু পলায়ন।
৬২৭ জানুঃ ১০	২ সাবান	৪৫। মদীনার প্রায় ২০০ মাইল দূরে বানু আল মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে যাত্রা। গোত্রপতি হারিসের রূপসী কন্যা জুওয়ায়রিয়া যুদ্ধ বন্দিনী হন। (২৪ঃ১১, ৬৩ঃ৭)।
৬২৭ খ্রীঃ	৫ম হিজরী	৪৬। আহযাব (খন্দক)-এর যুদ্ধ ঃ কুরাইশ, ইহুদী ও বেদুঈন ত্রিশক্তির সম্মিলিত বাহিনীর সর্বমোট ১০,০০০ পদাতিক ও ৬০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ আবু সুফিয়ানের মদীনা আক্রমণ। মুসলিম পক্ষে মাত্র ৩,০০০ যোদ্ধা ছিলেন।

www.pathagar.com

৬২৭ খ্রীঃ মার্চ	৫ হিজরী শাওয়াল	(ক)	যুদ্ধ প্রযুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সংবাদ মুসলমানগণ পান শাওয়াল মাসে।
৩১ মার্চ শনিবার	৮ যুলকাদ	(খ)	পরিখা খনন আরম্ভ। কনকনে শীতের মধ্যে শহরের বাইরে ও রাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার দারুণ কষ্টের মধ্যে। মুনাফিকদের অপপ্রচার (৩৩ঃ১২-২০)। ৩,০০০ সাহাবা ও হযরত স্বয়ং অক্লান্ত পরিশ্রমে ২০ দিনে ৯/১০ হাত গভীর, ৭-১০ হাত প্রস্থ ও প্রায় ২৫০০ গজ দীর্ঘ পরিখা খনন করেন। ২৭ দিন অবরোধ করে রাখে ও ৪৭ জন নিহত হয়। মুসলমানগণ ৭ জন শহীদ হন। শত্রুরা ঝড়-বৃষ্টিতে পর্যুদস্ত হয় ও পলায়ন করে (৩৩ঃ৯, ২৫)।
		৪৭।	বানু কুরায়জার শাস্তি ঃ ১ মাস অবরুদ্ধ থাকার পর আত্মসমর্পণ করে (৩৩ঃ২৬)। প্রায় ২৫০ যোদ্ধাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, অন্যরা সিরিয়া যায়।
৬২৭ খ্রীঃ	৫ হিজরী	৪৮।	মেয়েদের পরদা ও শালীন আচরণের নির্দেশ (৩৩ঃ৫৩, ৫৫, ৫৯)।
৬২৭ খ্রীঃ	৬ হিজরী	৪৯।	হযরত সিনাই পাহাড়ের সন্নিকটে সেন্ট ক্যাথারিন মাঠের সন্ন্যাসীদের এবং অন্য খৃষ্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার সনদ প্রদান করেন।
৬২৮ খ্রীঃ মার্চ	৬ হিজরী শাওয়াল	৫০।	হুদায়বিয়ার সন্ধি ঃ আরবদের প্রথানুযায়ী এ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সকলের জন্য উন্মুক্ত কাবা ঘরে উমরা হজ্ব করতে বাধা দেয়া হয়। হযরত হুদায়বিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' সুস্পষ্ট বিজয় বা মহাবিজয় বলা হয়েছে।
		৫১।	বিদেশে দূত প্রেরণ ঃ বিভিন্ন রাজ্যের সম্রাট ও রাজ-পুত্রগণকে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার হতে সত্য ধর্মের জ্যোতিতে আনয়নের জন্য তাদের নিকট আমন্ত্রণলিপিসহ দূত প্রেরিত হয়। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসী, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস,

www.pathagar.com

			পারস্য অধিপতি খসরু পারভেজ, আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মকুকাস, বসরার শাসনকর্তা হারিস বিন আবিসাম এবং ইয়ামামার শাসক হাওজা বিন অলীর নিকট সীলমোহর করা আমন্ত্রণলিপি পাঠান হয়। (৩ঃ৬৩)।
৬২৮ খ্রীঃ মে	৭ হিজরী মহররম	৫২।	খায়বার অভিযান ঃ খন্দকের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে ইহুদীগণ মুসলিম বাহিনীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে বেদুঈন গোত্রের সহযোগিতায় ৪,০০০ সৈন্যের সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। হযরত মহররম মাসে ২০০ অশ্বারোহীসহ ১৪০০ মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে ২০০ মাইল দূরে খাইবারের দিকে যাত্রা করেন। ২০ দিন অবরোধের পর কামুস দুর্গ দখল হয়। নাদীর গোত্রের সর্দারের কন্যা সাফিয়া যুদ্ধ বন্দী হন।
৬২৯ খ্রীঃ মার্চ	৭ হিজরী শাওয়াল	৫৩।	মুলতবী হজ্ব (উমরা আল কাদা) ঃ ২০০০ সাহাবী সঙ্গে নিয়ে উমরা হজ্ব পালন ও ৩ দিন অবস্থান। হজ্বের 'রমল' সহকারে চলার আদেশ।
৬২৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর	৮ হিজরী জুমা-আউঃ	৫৪।	মুতার যুদ্ধঃ লক্ষাধিক সৈন্য সমাবেশের বিপরীতে ৩০০ সাহাবী সিরিয়ার মুতায় প্রেরণ করেন। জায়েদ, জাফর ও আব্দুল্লাহ শহীদ হন। খালিদ বি ওয়ালিদ এই বিপর্যয় হতে রক্ষা করেন ও সায়ফুল্লাহ খেতাব পান।
৬৩০ খ্রীঃ ১৫ জানুয়ারী শুক্রবার	৮ হিজরী ২১ রমজান	৫৫।	মক্কা বিজয় ঃ ১০ রমজান ১০ হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কাভিযানে যাত্রা। ২১ রমজান শুক্রবার মক্কা বিজয়। (১৭ঃ৮১)।
৬৩০ খ্রীঃ ২৭ জানুয়ারী	৮ হিজরী ৬ শাওয়াল	৫৬।	হুনাইনের যুদ্ধ ঃ মক্কায় ৩ মাইল দূরে হুনাইন উপত্যাকায় হাওয়াজীন ও সকীফ গোত্র ২০,০০০ সৈন্য সমাবেশ করে। ৬ শাওয়াল মুসলমান ও কুরাইশ সম্মিলিত বাহিনী মক্কা ত্যাগ করে। খালিদের নেতৃত্বে ১২,০০০ সৈন্য যাত্রা করে। হযরত নিজে কিছু সংখ্যক মোহাজের ও আনসারসহ শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেন।

www.pathagar.com

৬৩০ খ্রীঃ মার্চ	৮ হিজরী যিলকাদ	৫৭।	তায়েফ বিজয় ঃ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।
৬৩০ খ্রীঃ নভেম্বর	৯ হিজরী রজব	৫৮।	তাবুক অভিযান ঃ নভেম্বর মাসে লক্ষাধিক সৈন্যসহ বায়জানটাইন বাহিনী মদীনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মহানবী (সাঃ) ১০,০০০ অশ্বারোহী ও ৩০,০০০ পদাতিক সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন। এই যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রাঃ) সমস্ত সম্পত্তি, হযরত উমর (রাঃ) অর্ধেক সম্পত্তি, হযরত উসমান (রাঃ) ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১০০০ উট এবং ৭০টি অশ্ব যুদ্ধ তহবিলে দান করেন।
		৫৯।	মহানবী (সাঃ) তাবুকসহ ৮টি বড় যুদ্ধ ও প্রায় ১৯টি ছোট যুদ্ধ নিজে পরিচালনা করেন এবং এতো সাফল্য লাভ পৃথিবীর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।
৬৩০-৬৩১ খ্রীঃ	৯ হিজরী	৬০।	প্রতিনিধি প্রেরণের বছর ঃ অসংখ্য প্রতিনিধিকে হযরত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ওমান, হাজরা মাউত, নাজরান, মাহবার, বাহরাইন প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিনিধি মদীনায় আসেন।
৬৩২ খ্রীঃ ৭ জানুয়ারী	১০ হিজরী	৬১।	সূর্য গ্রহণ হয়। হযরতের ছেলে ইব্রাহীম মারা যান।
৬৩২ খ্রীঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার	১০ হিজরী ২৫ যিলকদ	৬২।	বিদায় হজ্ব ঃ ২৫ যিলকদ ১,১৪,০০০ মুসলমানসহ মক্কায় হজ্ব করতে যান। কুরবানীর জন্য ১০০টি উট সঙ্গে নেন। ৪ মার্চ ৫ যিলহজ্ব রবিবার মক্কায় প্রবেশ করেন। ৮ যিলহজ্ব মীনা ও ৯ যিলহজ্ব, ৮ মার্চ বৃহস্পতিবার আরাফাতে পৌঁছে বিদায় হজ্বের ভাষণ দেন।
৬৩২ খ্রীঃ ২৮ মে সোমবার	১১ হিজরী ১২ রবি-আউঃ	৬৩।	হযরতের ওফাত ঃ বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ৬৩ বছর বয়সে ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার হযরত বিবি আয়েশার ঘরে ওফাত প্রাপ্ত হন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

নবী জীবনের নানা ঘটনার ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কিছু ছবি

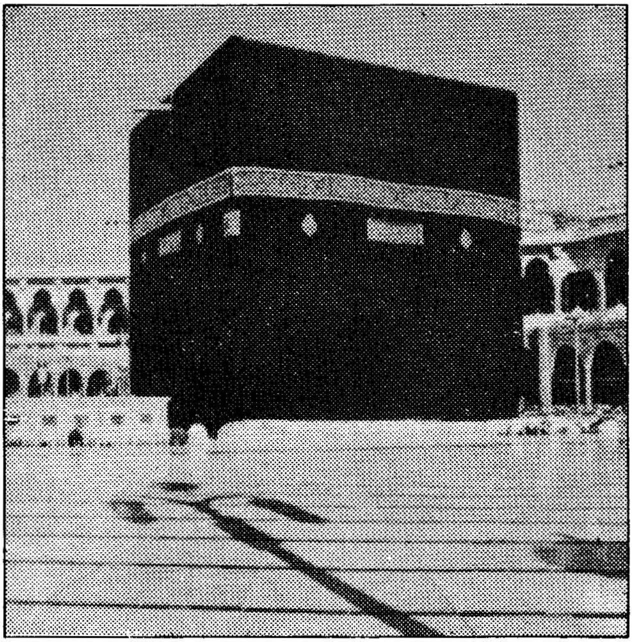

পবিত্র কা'বা শরীফ পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতখানা।

মুসলমানদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসের স্বর্ণখচিত গম্বুজ।

www.pathagar.com

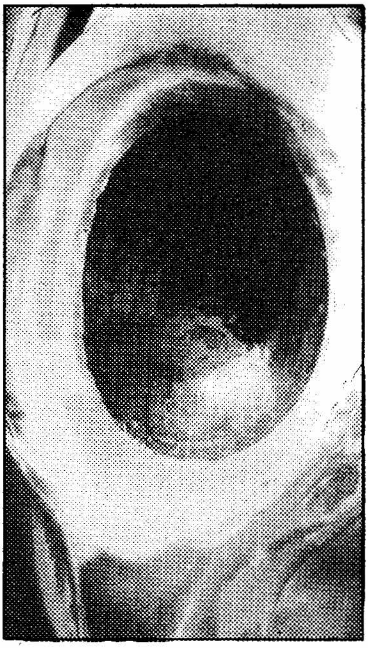

হাজরে আসওয়াদ ঃ কা'বার গাত্রে স্থাপিত এ পাথর হযরত আদম (আঃ) বেহেশত হতে নিয়ে এসেছিলেন।

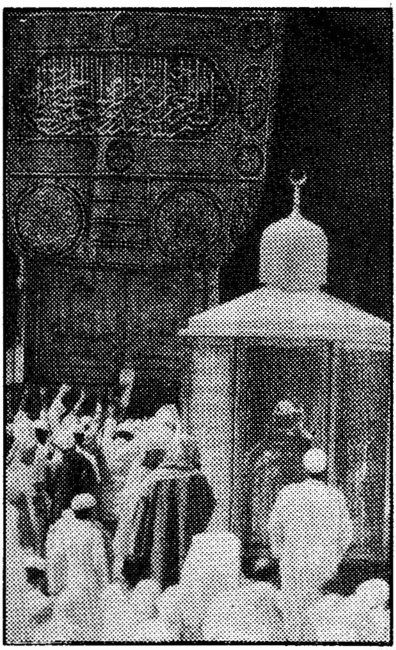

মাকামে ইব্রাহীম ঃ এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের বাড়ী ঃ এই বাড়ীতে মহানবী (সাঃ) ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

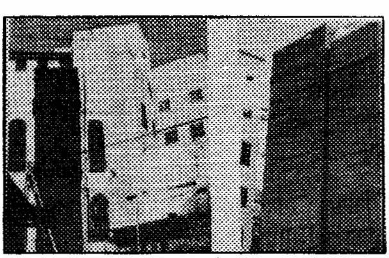

মহানবী (সাঃ)-এর পূর্ব-পুরুষদের বাড়ী।

www.pathagar.com

বিবি হালিমা সাদিয়ার (রাঃ) ঘরের অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্য। এ ঘরেই কেটেছে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর শৈশবকালের প্রায় ছয়টি বছর।

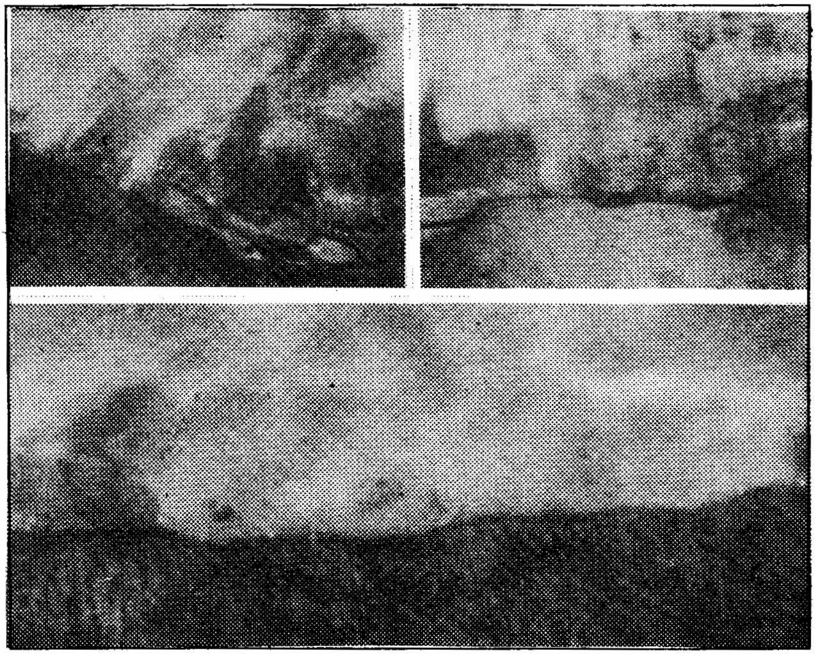

১. যমযম কূপের তলদেশ ঃ তীব্রবেগে পানি বের হয়ে আসার দৃশ্য। ২. কা'বার তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসা যমযমের আরোও একটি উৎস। ৩. সাফা-মারওয়ার তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসা যমযমের তৃতীয় উৎস।

www.pathagar.com

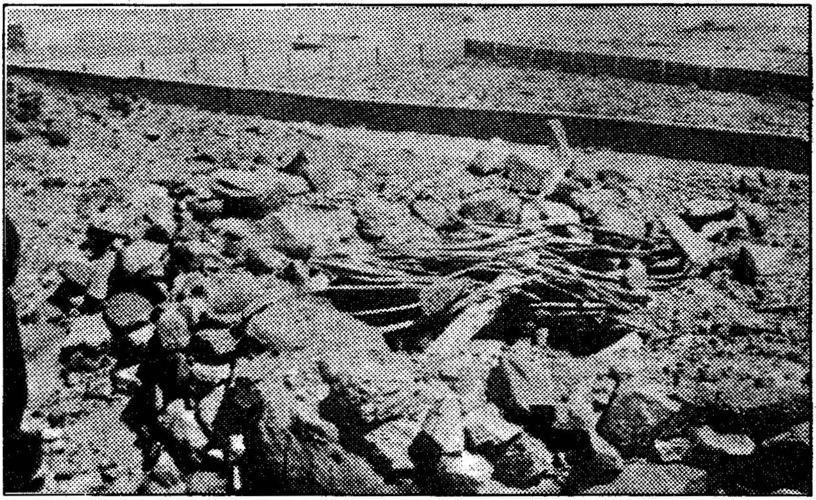

প্রিয় নবীজীর দুধমাতা বিবি হালিমা সাদিয়া (রাঃ)-এর ঘরের সম্মুখস্ত কূপ। এর পানি প্রিয়নবী (সাঃ)সহ সকলে ব্যবহার করতেন।

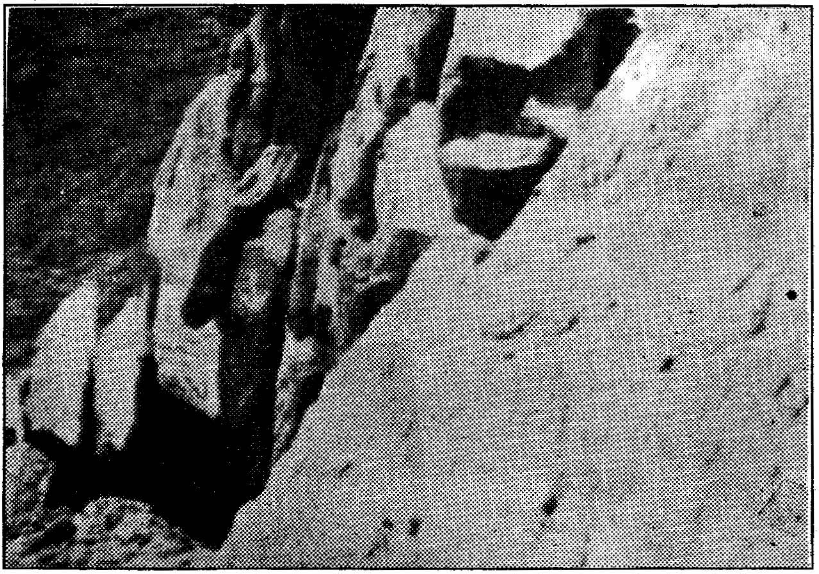

হেরা গুহা ঃ যেখানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানবী (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়েত গ্রন্থ আল-কোরআন।

www.pathagar.com

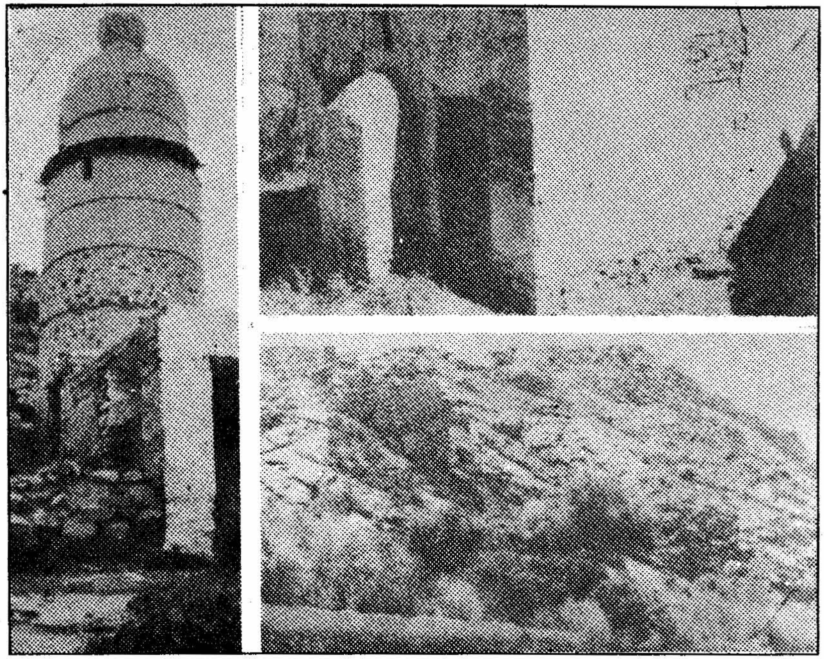

১. উতবার আঙ্গুর বাগান, তায়েফে অবস্থানকালে মহানবী (সাঃ) এখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন

২. উতবার আঙ্গুর বাগানের এ স্থানে বসেই মহানবী (সাঃ) বালক কৃতদাস আদ্দাসকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

৩. তায়েফবাসীদের নিক্ষেপ করা পাথরের আঘাতে আহত হয়ে মহানবী (সাঃ) এই স্থানেই বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন।

সওর পর্বতের শীর্ষপাশে অবস্থিত ঐতিহাসিক গুহামুখ ঃ হিজরতের রাতে প্রিয়নবী (সাঃ) যেখানে প্রিয় সহচর আবুবকর (রাঃ)সহ আশ্রয় নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

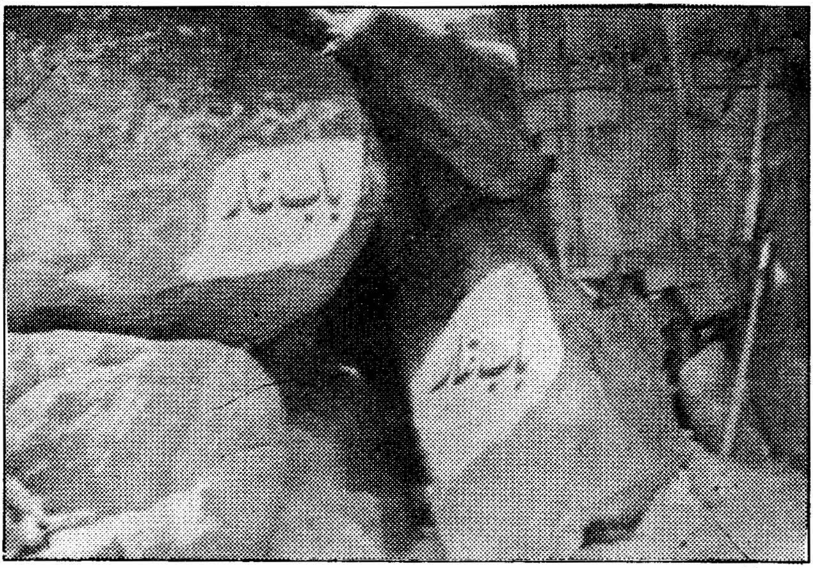

হেরা গুহার প্রবেশ পথের দৃশ্য

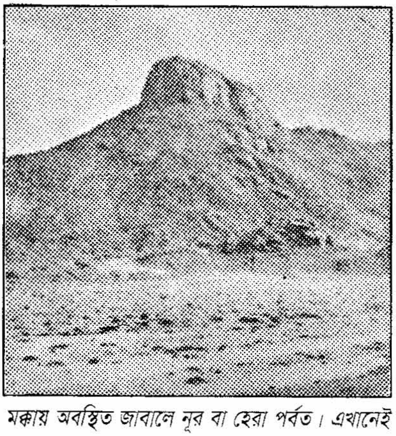

মক্কায় অবস্থিত জাবালে নূর বা হেরা পর্বত। এখানেই ধ্যানরত অবস্থায় হুজুর (সাঃ)-এর উপর নবুয়ত এবং কোরআন নাযিল হয়েছিল।

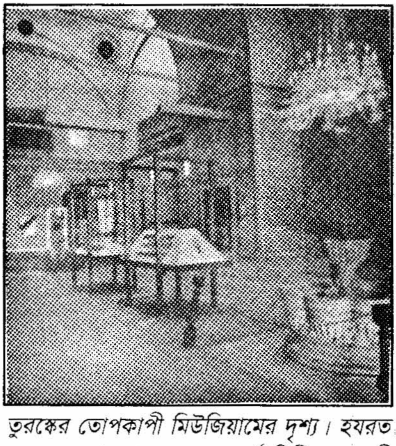

তুরস্কের তোপকাপী মিউজিয়ামের দৃশ্য। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যবহার্য বিভিন্ন সামগ্রী এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

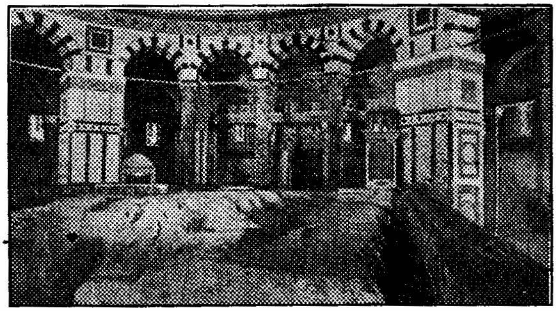

মসজিদুল আকসার ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণ ঃ মেরাজে গমনের পথে এখানে বসে মহানবী (সাঃ) ওজু করেছিলেন বলে বর্ণনা রয়েছে।

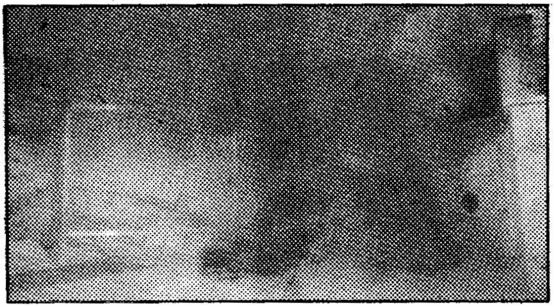

বায়তুল মোকাদ্দাসের অভ্যন্তর ভাগ ঃ মেরাজে গমনের সময় এখানে দাঁড়িয়ে মহানবী (সঃ) দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন।

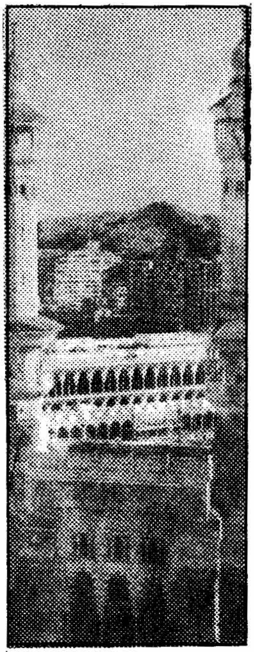

মসজিদুল হারামের মিনার বিশিষ্ট আলফাতহ গেইটের দৃশ্য।

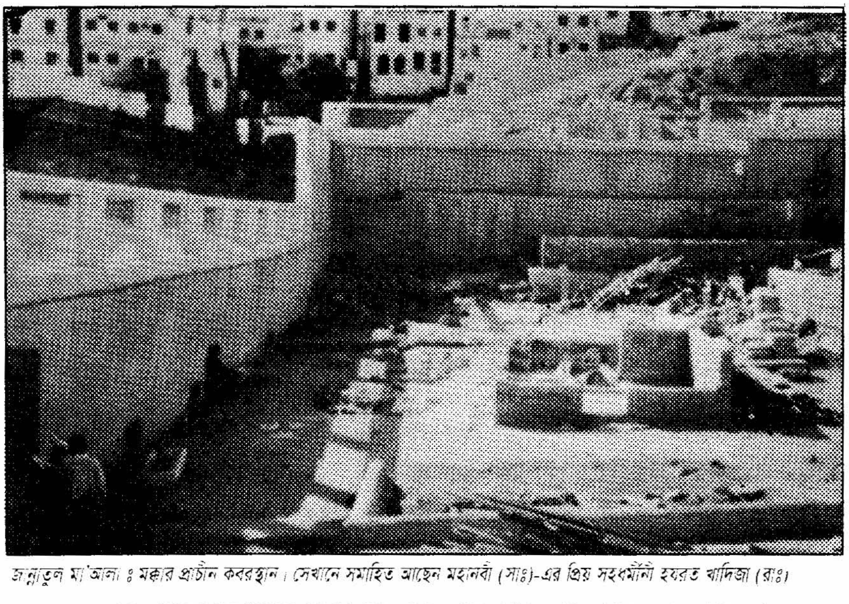

জান্নাতুল মা'আলা ঃ মক্কার প্রাচীন কবরস্থান। সেখানে সমাহিত আছেন মহানবী (সাঃ)-এর প্রিয় সহধর্মীনী হযরত খাদিজা (রাঃ)

www.pathagar.com

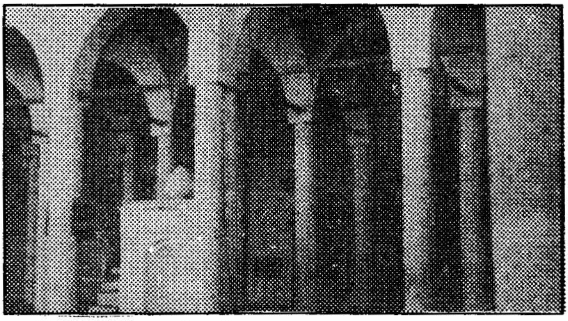

মসজিদে নববীর একটি প্রাচীন দৃশ্য

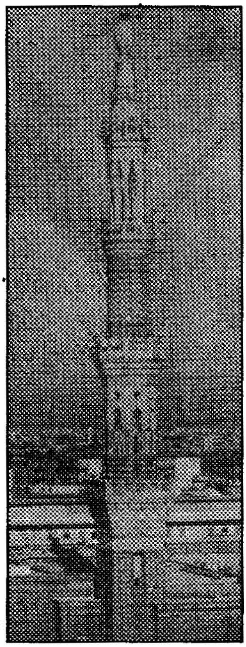

বর্তমান মসজিদে নববীর একটি সুদৃশ্য মিনার

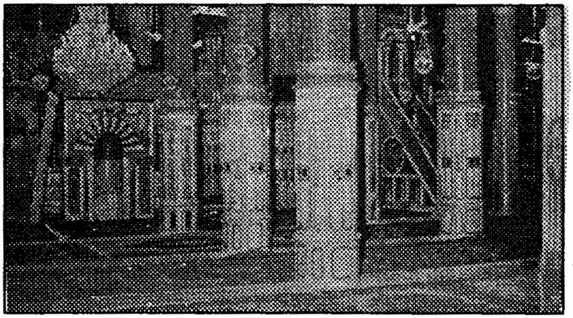

ওসমানীয় সুলতান আবদুল মজিদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ১৮৪৮ সালে নির্মিত মসজিদে নববীর মনোরম ইমারত।

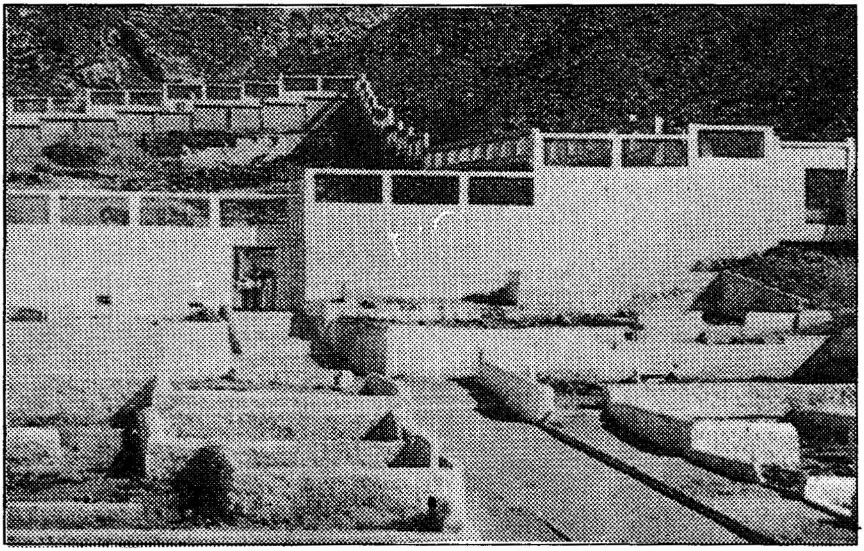

হযরত খাদিজা (রাঃ)সহ মহানবী (সাঃ)-এর চার সন্তানের কবর, যাঁরা সকলে শৈশবেই ইন্তেকাল করেন

www.pathagar.com

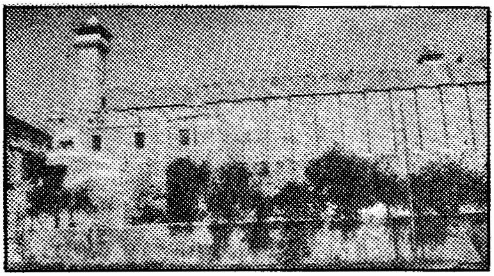

বাইতুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন মসজিদে ইব্রাহীমী ঃ যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁদের পবিত্র সহধর্মিণীগণ সমাহিত আছেন।

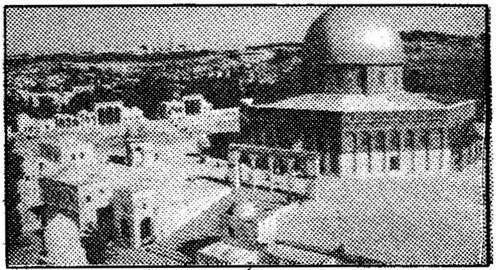

মসজিদে কুব্বাতুস সাখরা ঃ যেখান থেকে মহানবী (সাঃ) মেরাজের রাত্রে দুনিয়া থেকে বোরাক যোগে উর্ধ্বাকাশের ভ্রমণ শুরু করেছিলেন।

মসজিদে আকসার সেই মিম্বর যা ইহুদীরা ১৯৬৯ সালে ধ্বংস করে দেয়

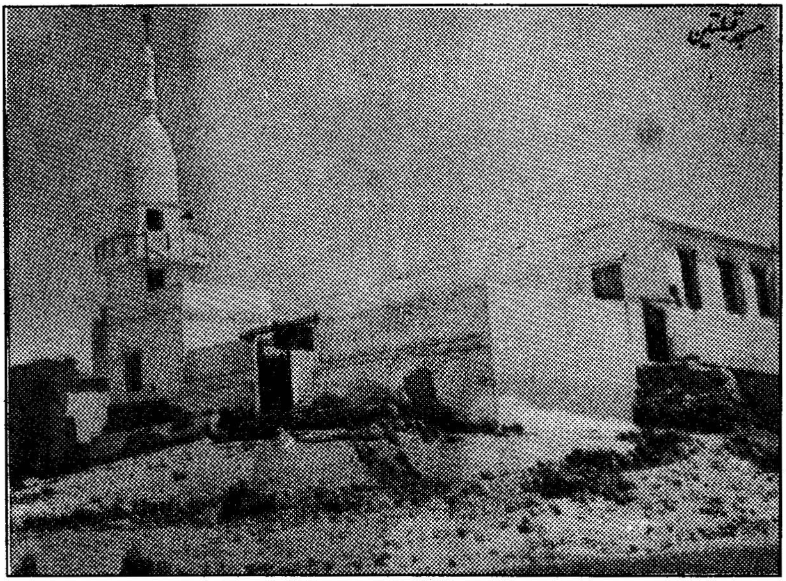

বনুসালামার ঐতিহাসিক মসজিদ ঃ যেখানে মহানবী (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে দ্বিতীয় হিজরীর কোন এক সময় আসরের নামাজ আদায় করাকালীন আল্লাহর হুকুমে মসজিদুল আকসার পরিবর্তে পবিত্র মসজিদুল হারামকে কেবলা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।

www.pathagar.com

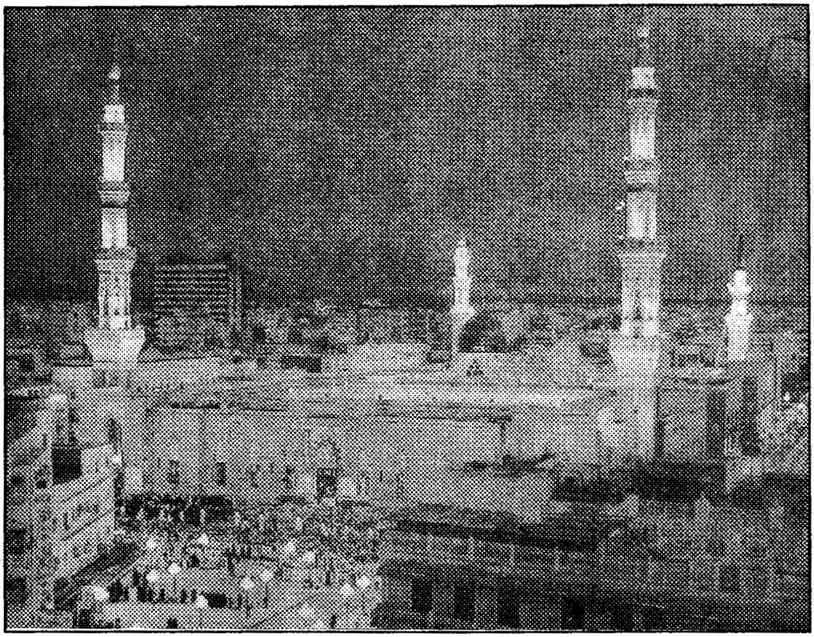

মসজিদে নববী ঃ মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের শেষ দশটি বছরের অধিকাংশ সময় এখানেই তিনি অতিবাহিত করেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত জীবনের শেষ বিশ্রামস্থল হিসেবে এখানেই শায়িত আছেন।

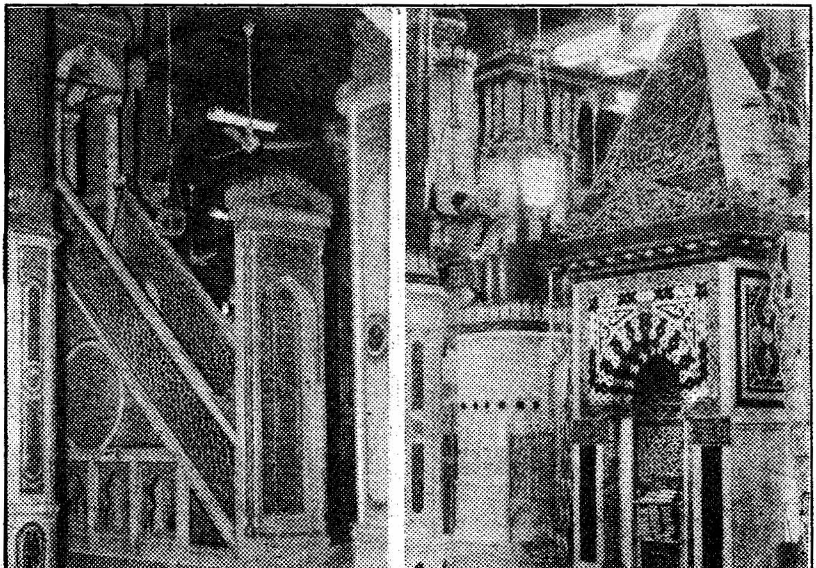

ডানে ঃ মহানবী (সাঃ)-এর মিম্বর শরীফ; যেখানে দাঁড়িয়ে মহানবী (সাঃ) খুতবা দান করতেন।
বায়ে ঃ মহানবী (সাঃ)-এর মেহরাব শরীফ; যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নামাজ পড়াতেন

www.pathagar.com

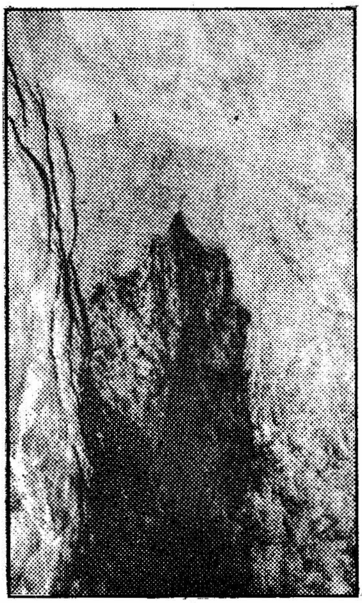

ওহোদ পাহাড়ের এই স্থানে মহানবী (সাঃ)-এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছিলো

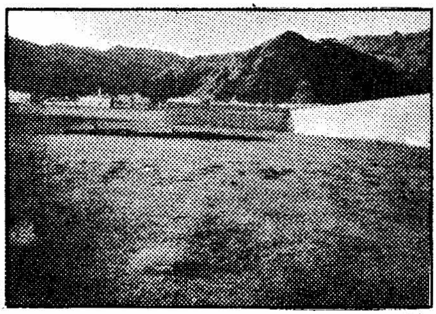

ওহোদ পাহাড়ের ঐতিহাসিক গুহা ঃ এখানে মহানবী (সাঃ) যুদ্ধাহত অবস্থায় বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন।

শোহাদায়ে ওহোদের কবরস্থান ঃ এখানে সমাহিত আছেন শহীদ প্রধান হযরত হামজা ও ওহোদের যুদ্ধে নিহত অন্যান্য শহীদগণ।

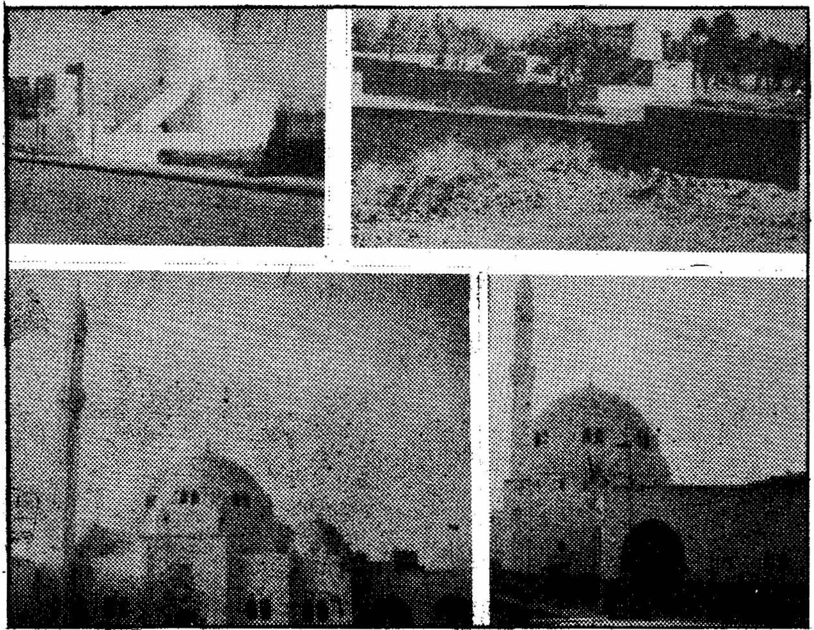

১. ওসমানীয় শাসনামলে নির্মিত মসজিদে জুমুয়া ঃ যে স্থানে মহানবী (সাঃ) সর্বপ্রথম জুমার নামাজ আদায় করেছিলেন। এটি কুবা থেকে মসজিদে নববীর পথে বনী সালেম নামক স্থানে অবস্থিত। ২. মসজিদে জুমুয়ার বর্তমান ইমারত

www.pathagar.com

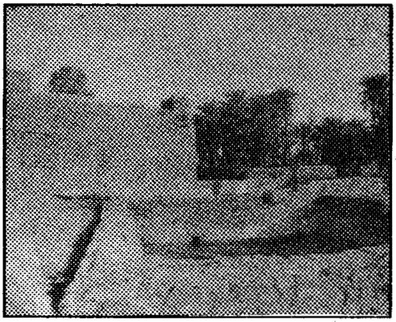

ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী এই হাউজের পানি ব্যবহার করেছিলেন।

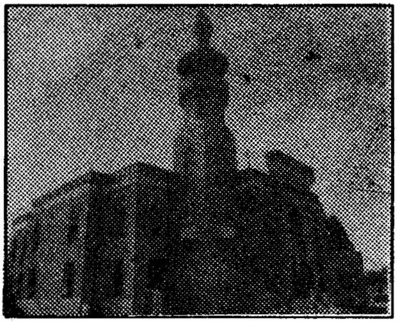

মাদায়েনে সালেহের যে স্থানে তাবুক যুদ্ধের সময় মহানবী (সাঃ)-এর তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমানে স্মৃতি রক্ষার্থে সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

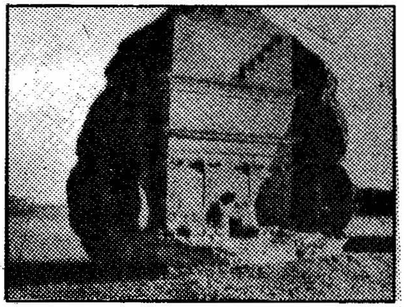

মাদাইয়েনে সালেহের একটি প্রাচীন কবর ঃ যা ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধের ময়দানে অবস্থিত।

তাবুকের একটি মনোরম বাগান।

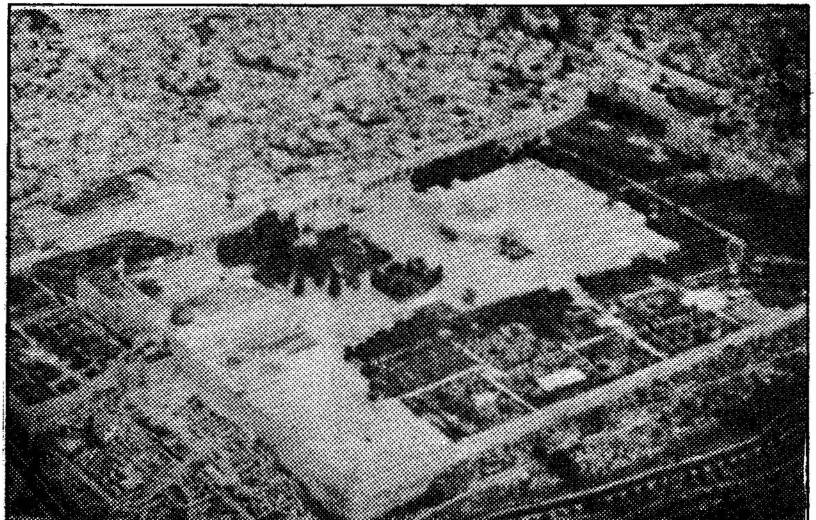

মসজিদুল আকসার সম্পূর্ণ প্রাঙ্গণ এবং সংলগ্ন জেরুজালেম নগরীর দৃশ্য। হুজুর (সাঃ) পবিত্র মেরাজের সফরে এখানে প্রথম যাত্রা বিরতি করেন এবং সকল নবীগণের (আঃ) জামাতে নামাজের ইমামতি করেন।

www.pathagar.com

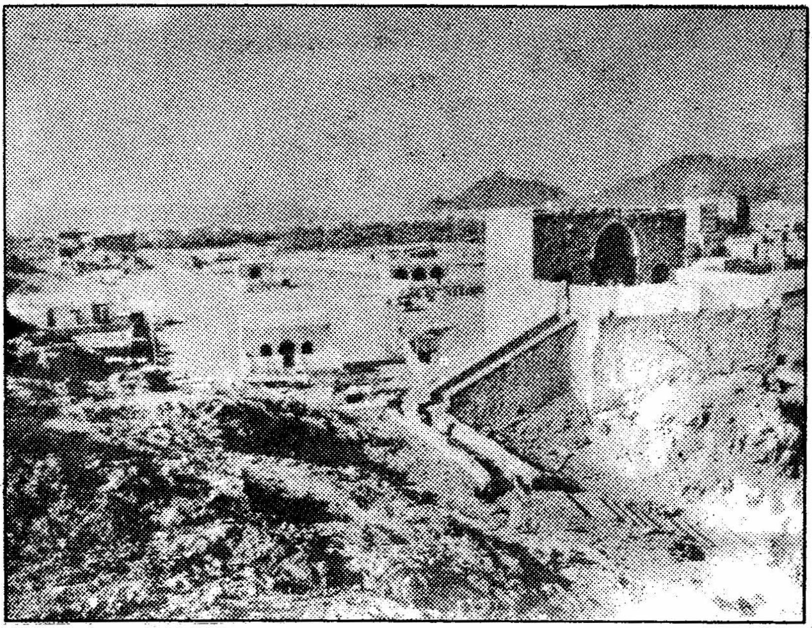

খন্দক যুদ্ধের ময়দান ঃ ছবিতে যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদে খামসা' বা পাঁচটি ঐতিহাসিক মসজিদ দেখা যাচ্ছে।

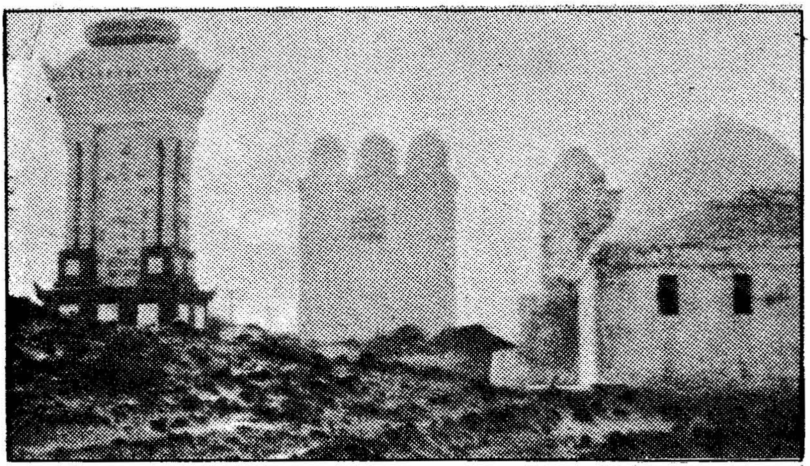

হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধি এবং বাই'আতে রিদওয়ান এই স্থানেই সম্পাদিত হয়েছিলো, যার বর্তমান নাম সুমাইছি।

www.pathagar.com

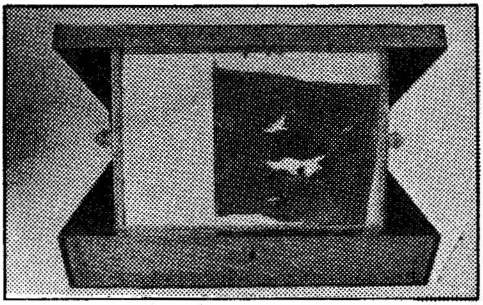

প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর একটি পত্র ঃ এটি মিশরের শাসনকর্তা মুকাওকিসকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে লেখা হয়েছিল। পত্রটি পাতলা চামড়ায় লিখিত। যাতে মহানবী (সাঃ)-এর সীল মোহরের ছাপ রয়েছে।

বায়ে ঃ মহানবী (সাঃ)-এর পত্র। মহানবী (সাঃ) পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজনকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে এই পত্রটি লিখেছিলেন। ডানে ঃ মহানবী (সাঃ)-এর পত্র। মহানবী (সাঃ) হাবশার সম্রাট নাজ্জাশীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে এই পত্রটি লিখেছিলেন।

www.pathagar.com

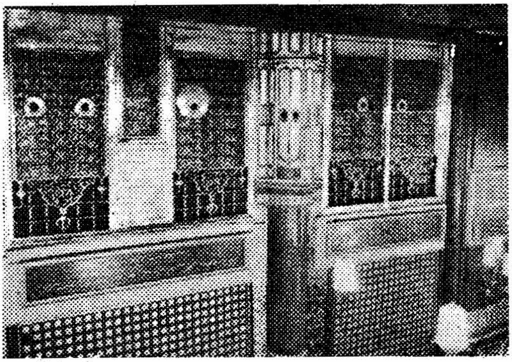

রওজা মোবারকের সম্মুখ ভাগের দৃশ্য

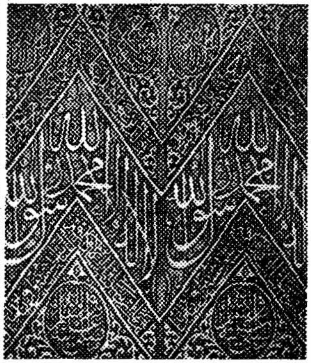

পবিত্র কবর শরীফে ব্যবহৃত গিলাফের নমুনা।

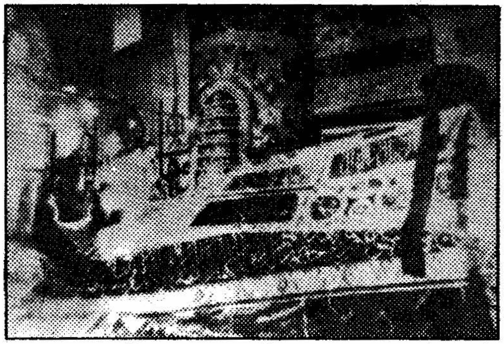

মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র রওজা মোবারক।

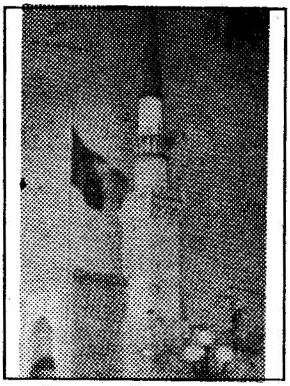

মসজিদে নববীর বাবুস সালাম নামক দরজা।

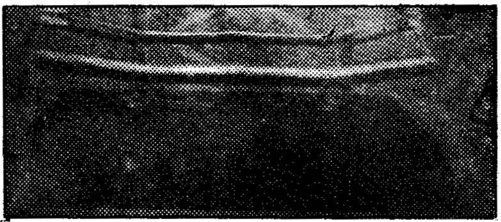

মহানবী (সাঃ)-এর ব্যবহৃত দু'টি লাঠি।

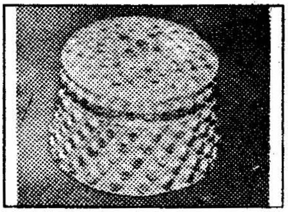

এই সুদৃশ্য পাত্রটিতে মহানবী (সাঃ)-এর কবরের মাটি সংরক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

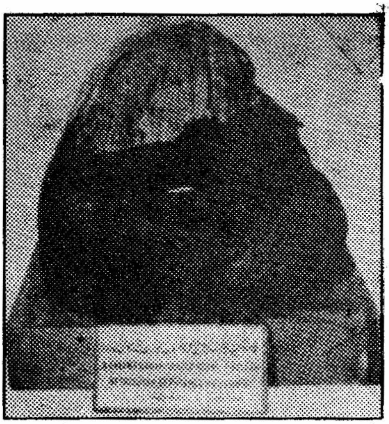

মহানবী (সাঃ)-এর ব্যবহৃত পবিত্র পাগড়ী মোবারক।

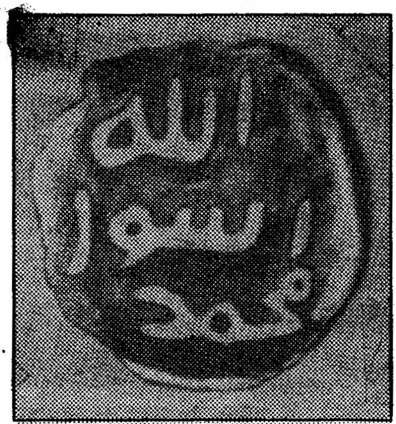

মহানবী (সাঃ)-এর সীলমোহর ঃ যা তিনি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় চিঠি এবং দলিলপত্রে ব্যবহার করতেন।

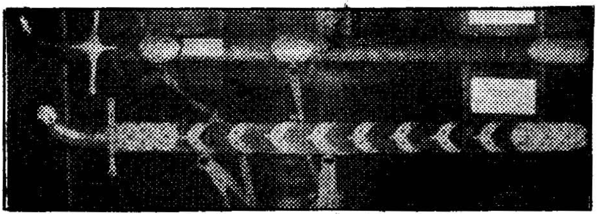

উপরে হযরত আলী (রাঃ)-কে দেয়া মহানবী (সাঃ)-এর একটি তরবারী এবং নিচে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর তরবারী।

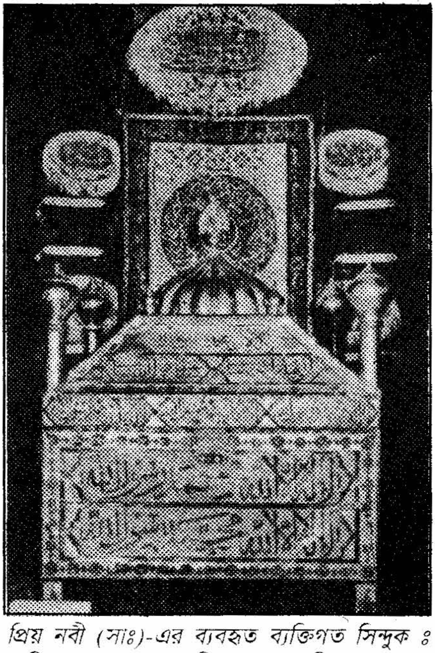

প্রিয় নবী (সাঃ)-এর ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সিন্দুক ঃ এটি তুরস্কের তোপকাপি যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

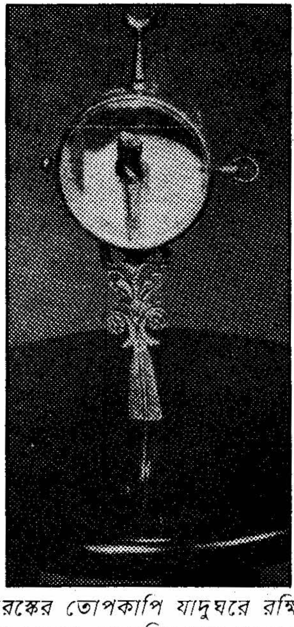

তুরস্কের তোপকাপি যাদুঘরে রক্ষিত হুজুর (সাঃ)-এর পবিত্র কেশ মোবারক

www.pathagar.com

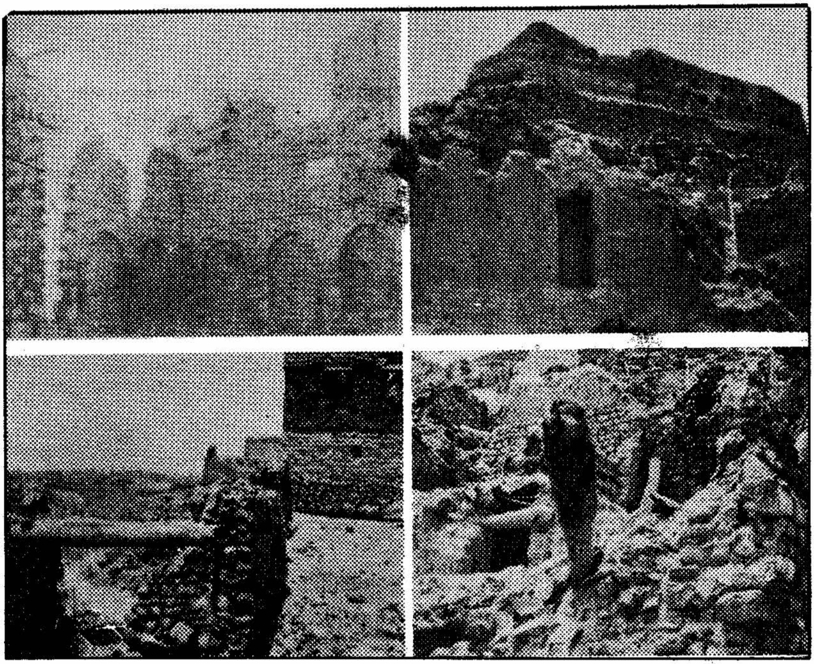

১. ইহুদীগণ কর্তৃক নির্মিত হিসনুরুশ দুর্গ ঃ যা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ঐতিহাসিক খায়বার অভিযানের সময় জয় করেছিলেন। ২. খায়বারে অবস্থিত ইহুদী সরদার কা'আব ইবনে আশরাফের প্রাসাদের ভগ্নাংশ। ৩. খায়বারের বিখ্যাত দুর্গের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য। ৪. সা'ব ইবনে মা'আযের দুর্গ ঃ এটি রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে বিজিত হয়েছিলো।

১. ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে একটি খেজুর বাগান। ২. বদরের শহীদানদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ। ৩. বদর যুদ্ধের ঐতিহাসিক ময়দান। ৪. এই স্থানেই সমাহিত আছেন শোহাদায়ে বদর।

www.pathagar.com

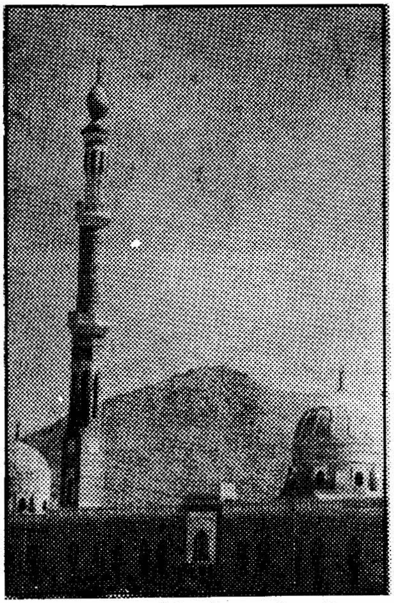

আরাফা ময়দানের ঐতিহাসিক মসজিদে নিমরাহ

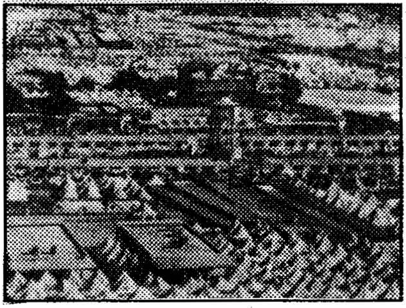

উপরে– জাবালে রহমত ঃ বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণ মহানবী (সাঃ) এই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দান করেছিলেন।
নিচে– হজ্বকালীন আরাফা ময়দানের সাধারণ দৃশ্য।

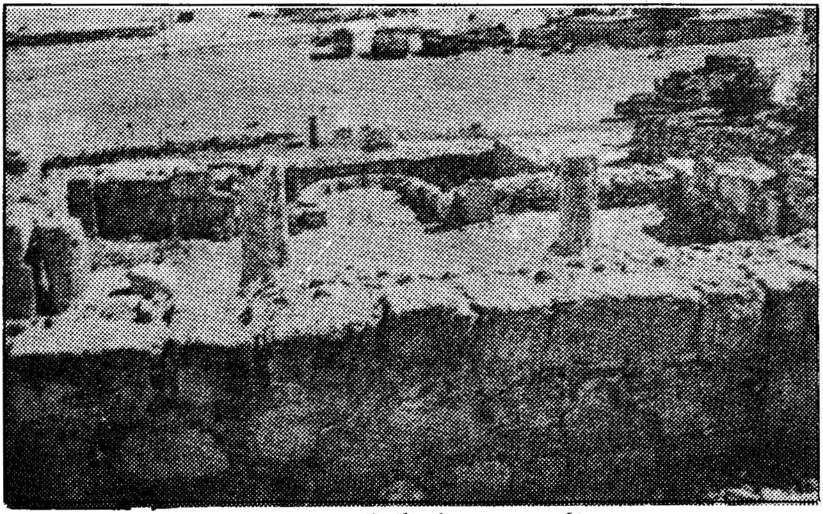

আসহাবে কাহাফের স্মৃতি বিজড়িত স্থানের সার্বিক দৃশ্য।

www.pathagar.com

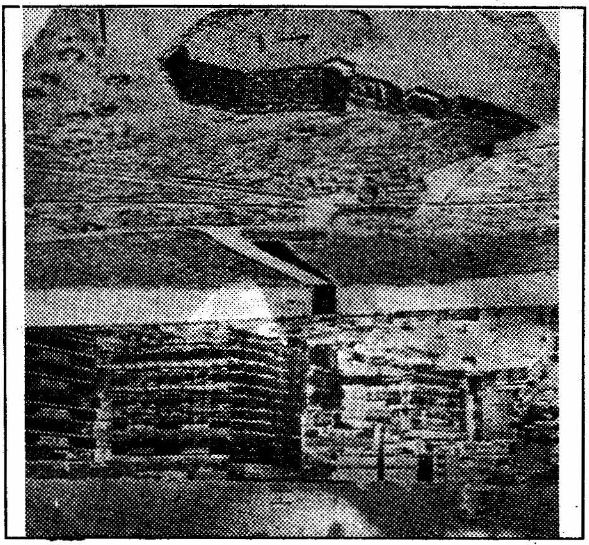

জান্নাতুল বাকী ঃ মদিনা শরীফের ঐতিহাসিক কবরস্থান। এখানে মহানবী (সাঃ)-এর কন্যা এবং পত্নিগণসহ অগণিত সাহাবায়ে কেরাম সমাহিত আছেন।

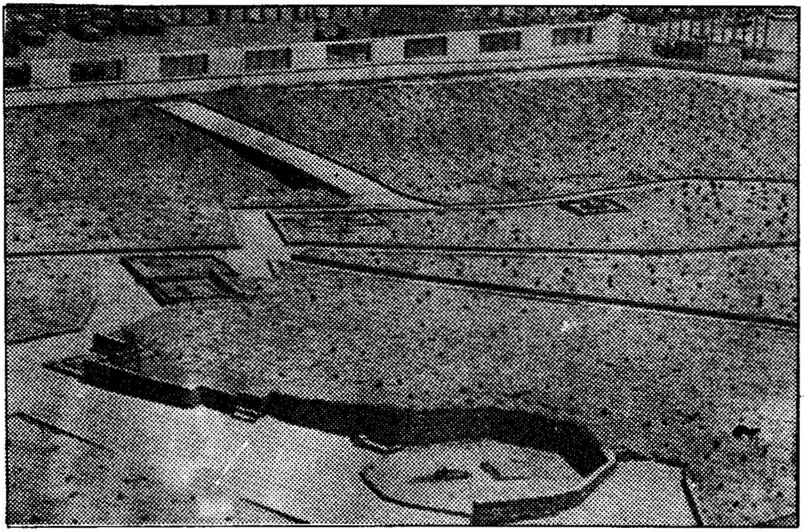

জান্নাতুল বাকী কবর স্থানের সাধারণ দৃশ্য।

www.pathagar.com

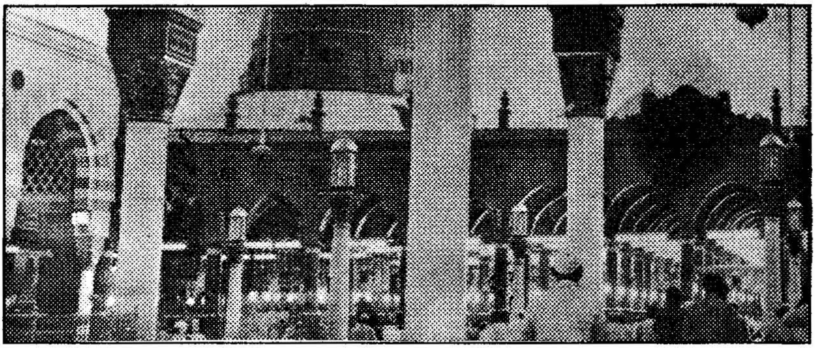

মসজিদে নববীর আভ্যন্তরীণ দৃশ্য।

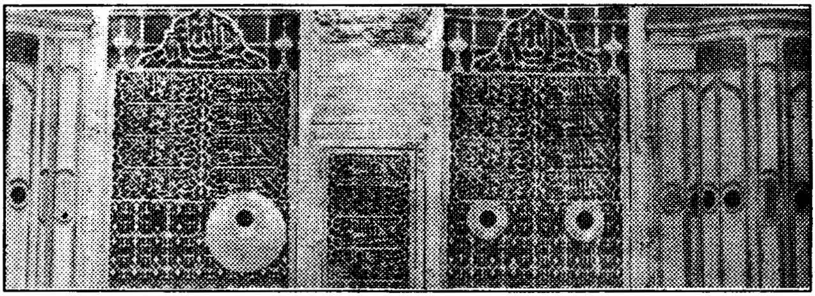

পবিত্র রওজা মোবারক ঃ এখানে প্রিয়তম দুই সাথী হযরত আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)সহ রাহমাতুল্লীল আলামীন মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমাহিত আছে।

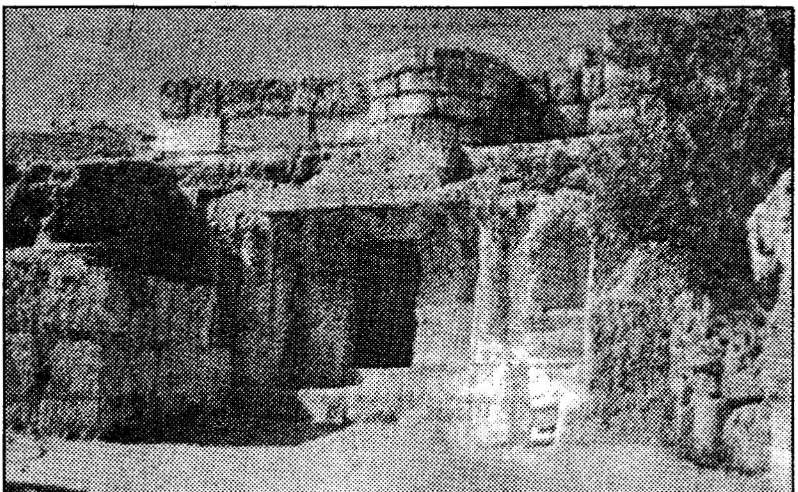

সূরা কাহাফে বর্ণিত আসহাবে কাহাফের অবস্থানস্থলের প্রবেশ মুখ।

www.pathagar.com

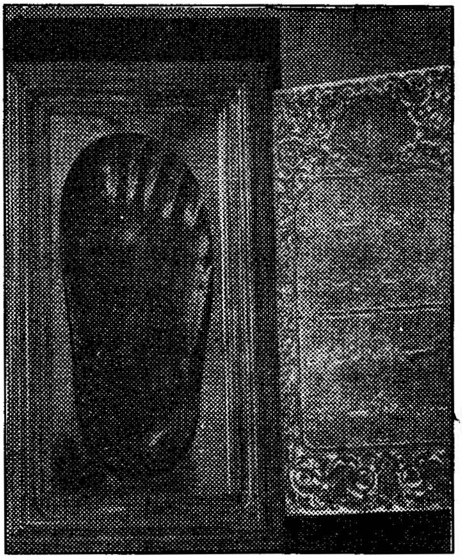

রাসূলে পাক (সাঃ)-এর পদচিহ্ন ঃ হুজুর (সাঃ)-এর ছয়টি পদচিহ্ন সংরক্ষিত আছে। এগুলো ইট, পাথর ও তাঁর নালায়েন শরীফের উপর। এ ছবির পদচিহ্নটি পাথরের উপর। ধারণা করা হয় যে, হুজুর (সাঃ) মেরাজে গমনের সময় এ পাথরে কদম মোবারক রেখে আকাশ বাহনে উঠেছিলেন।

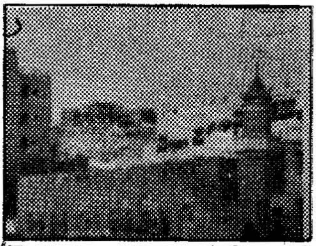

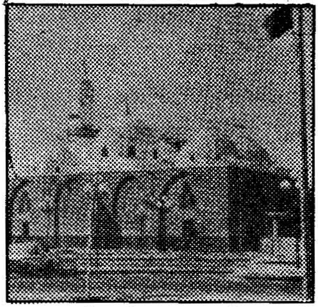

উপরে- মসজিদে জ্বীন ঃ এই স্থানে জ্বীনেরা মহানবী (সাঃ)-এর কণ্ঠে সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআন শ্রবণ করেছিলো। নিচে- মসজিদে গিমামাহ ঃ এই স্থানে মহানবী (সাঃ) এস্তসকার নামাজ আদায় করতেন।

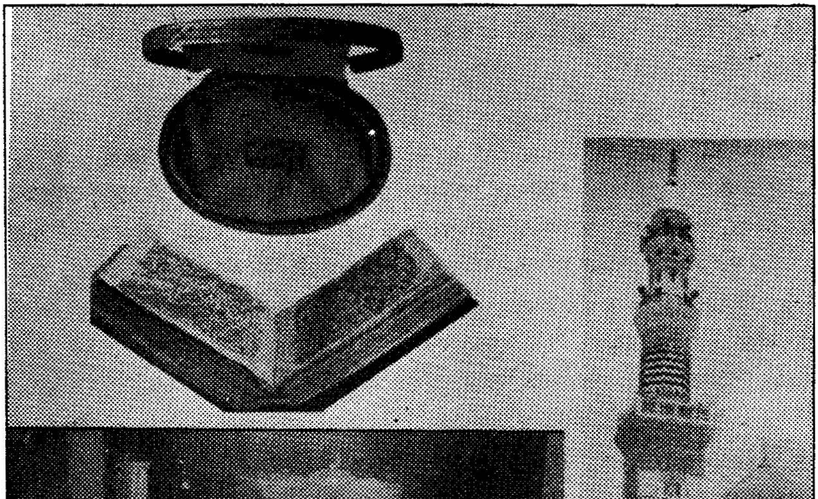

১. প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সীল মোহর ঃ এ সীল মোহরটি প্রথমে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং পরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট তারপর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট হস্তান্তর হয়। ঘটনাক্রমে এটি তাঁর হাত থেকে একটি কূপে পড়ে যায়। বাগদাদের খলিফাদের শাসনামলে এটি উদ্ধার হয়ে মোহাফেজখানায় সংরক্ষিত হয়। তুর্কী খলিফাগণ পরে এটি তুরস্কে আনেন। ২. হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কোরআন ঃ তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এই কোরআন শরীফ তেলাওয়াতরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। এতে তাঁর রক্তের দাগ রয়েছে। ৩. মসজিদে নববীর সুন্দর একটি মিনার

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ঈমান

'ঈমান' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস, দৃঢ়প্রত্যয়। শান্তি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত অর্থে 'মুমেন' অর্থাৎ শান্তিদাতা আল্লাহ্তায়ালার একটি গুণবাচক নাম।

ইসলামী শরীয়তে ঈমান বলা হয় দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির সত্যতা মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং সে বিশ্বাস কার্যে পরিণত করা।

এবাদতের পূর্বশর্ত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা। ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাখা হলো এ ঘোষণা প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো আল্লাহর ভয়ে অথবা আল্লাহকে খুশী করার জন্য রাস্তা থেকে প্রাণীকূলের কষ্টদায়ক কোন জিনিস অপসারণ করা।

আজকে মুসলমানেরা কালেমার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। কিন্তু কতিপয় মৌলিক এবাদত ছাড়া অধিকাংশ আদেশ নিষেধ রীতি-নীতি উপেক্ষা করে বিজাতীয় বিধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে।

"নাই কোন প্রভু আল্লাহ ছাড়া"– এটা যদি মুসলমানেরা আন্তরিকভাবে স্বীকার করে ও ঈমান আনে তাহলে এ পৃথিবীতে বাতিলের সাথে হকের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। এ দ্বন্দ্ব সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসছে, বর্তমানেও রয়েছে, আগামীতেও থাকবে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুম, আইন ও তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এখানেই ঈমানের প্রকৃত পরীক্ষা হয়। তাই আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– "তোমরা আল্লাহর পথে জেহাদ কর জান ও মাল দ্বারা"। আর রাসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কাফিরের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদ জারি থাকবে।"

বোখারী ও মুসলিম শরীফের সুবিখ্যাত হাদীসে জিবরাইল (আঃ) হযরত নবী করীম (সঃ)-এর নিকট সাতটি বিষয় ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গরূপে অভিহিত করেছেন। যথাঃ (১) আল্লাহ্তায়ালার উপর বিশ্বাস পোষণ করা, (২) আল্লাহ্তায়ালার ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা, (৩) আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস রাখা, (৪) আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখা, (৫) কেয়ামত ও শেষ বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস রাখা, (৬) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদিরের উপর ঈমান রাখা। (৭) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান আনা।

শরীয়তে উপরোক্ত বিষয়গুলোর সত্যতা সম্পর্কে মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস

www.pathagar.com

এবং তা কার্যে পরিণত করাকে পরিপূর্ণ ঈমানের শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে কেউ যদি ঈমানের শর্তগুলো মুখে স্বীকার করে এবং অন্তরে এ ব্যাপারে দৃঢ় আস্থা রাখে কিন্তু কার্যে পরিণত না করে তবে এরূপ ব্যক্তিকে ঈমানদার রূপে গণ্য করা যায় না। হযরত ইমাম আবু হানীফার (রাঃ) এর মতে যে ব্যক্তি মৌখিক স্বীকৃতি এবং অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করে তবে সে ব্যক্তি পাপের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জিত হলে, অর্থাৎ মুখের স্বীকৃতি, মনের বিশ্বাস ও কার্যে পরিণত করার সমন্বয় ঘটলে সে ব্যক্তির দোযখে প্রবেশ করতে হবে না। শরীয়তের যে সমস্ত বিষয় পবিত্র কোরআনে এবং সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়ার নাম ঈমান এবং এসবের মধ্যে থেকে কোন একটা বিষয় মুখে অস্বীকার করা কিংবা মনে দ্বিধা-সংশয় পোষণ করার নামই কুফর।

আমরা দেহের সর্ব অঙ্গ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু রূহ দেখিনা। রূহ্ চলে গেলে দেহের সর্বঅঙ্গ পচনশীল হয়ে যায়। সুতরাং অঙ্গের সজীবতা রূহের অস্তিত্বের প্রমাণ করে। ঠিক তেমনি আল্লাহকে দেখি না। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আবার আল্লাহর মনোনীত ইসলাম ধর্মই একমাত্র সঠিক ধর্ম এর প্রমাণ পাই ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতো ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে বা ধর্ম এসেছে পরবর্তীতে দ্বিতীয় কোনো প্রবর্তক একই বাণী নিয়ে এই পৃথিবীতে আসেনি। অথচ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যতো নবী এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের বাণীই ছিলো একত্ববাদের। সুতরাং ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম।

একজন মুসলমান মৌলিক এবাদত করে দোযখ থেকে বাঁচবার এবং বেহেস্ত পাবার উদ্দেশ্যে। এখানে প্রকৃত ঈমানের পরীক্ষা হয় না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। ঈমানের পরীক্ষা হয় আল্লাহর ভয়ে লোভ-লালসা সংবরণে। আল্লাহর আদেশ মান্য করে নিষিদ্ধ কর্ম হতে যে নিজকে বিরত রাখে। যেমন একজন দারোগা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অসৎ উপার্জন থেকে নিজকে বিরত রেখে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। আবার অনেক মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েও অসৎ উপার্জনের ফলে ঈমানের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ ঈমান আনতে হলে মৌলিক এবাদতের পাশাপাশি অন্যান্য রীতি-নীতি-আদেশ নিষেধ প্রতিটি মুসলমানের অবশ্যই পালনীয়।

কবি নজরুল ইসলাম পবিত্র কালেমার মাহাত্ম্য এবং খাঁটি ঈমানদার মুসলমানের চিত্র এঁকেছেন তাঁর কবিতায়। যেমন–

কলেমা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি।
ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি।
ঐ কলেমা জপে যে ঘুমের আগে,
ঐ কলেমা জপিয়া যে প্রভাতে জাগে,

www.pathagar.com

দুখের সংসার সুখময় হয় তার–
মুসিবত আসে না কো, হয় না ক্ষতি ।।
হরদম জপে মনে কলেমা যে জন
খোদায়ী তত্ত্ব তার রহে না গোপন,
দীলের আয়না তার হয়ে যায় পাক সাফ
সদা আল্লার রাহে তার রহে মতি ।।
এসমে আজম হতে কদর ইহার,
পায় ঘরে বসে খোদা আর রসূলের দীদার,
তাহার হৃদয়কাশে সাত বেহেশত ভাসে
খোদার আরশে হয় আখেরে গতি ।।

✯ ✯ ✯

উঠুক তুফান পাপ-দরিয়ায়–
আমি কি তার ভয় করি।
পাক্কা ঈমান তক্তা দিয়ে
গড়া যে আমার তরী ।।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর পাল তুলে
ঘোর তুফানকে জয় করে ভাই,
যাবই কূলে
আমার মোহাম্মদ মোস্তফা নামের,
গুণের রশি ধরি ।।
খোদার রাহে সঁপে দেওয়া ডুববে না মোর তরী,
সওদা করে ফিরবে তীরে সওয়াব মানিক ভরি।
দাঁড় এ তরীর নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত
উঠুক না মেঘ, আসুক বিপদ যত বজ্রপাত
আমি যাব বেহেশত-বন্দরেতে রে
এই সে কিশতিতে চড়ি ।।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামাজ অন্যতম। পবিত্র কোরআনে সমাজে বা রাষ্টে নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায় করতে বলা হয়েছে। তাই নামাজ-যাকাত কোনো ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নিজেও করতে হবে, অন্যকেও বাধ্য করতে হবে। তাই রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের উপর এমন সব লোক শাসনকর্তা হইবে, যাহাদের কোনো কোনো কথাকে তোমরা সংগত (মারূফ) মনে করিবে এবং কোনো কোনো কথাকে মনে করিবে অসঙ্গত (মুনকার); তাহাদের অসঙ্গত কথা বা কাজে যে ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করিবে (মনে করিও যে) তাহার দায়িত্ব পালন হইয়াছে, সেও রেহাই পাইবে; কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইল এবং তাহাদের মানিয়া চলিল, অনুসরণ করিল, তাহারা ধরা পড়িবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এই ধরনের নেতা

www.pathagar.com

ও শাসকদের যুগ যখন আসিবে তখন কি আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব না? রাসূল (সাঃ) উত্তরে বলিলেন ঃ না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা নামাজ পড়িতে থাকিবে।

অর্থাৎ নামাজ তরক করা হইলেই প্রমাণিত হইবে যে, তাহারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছে। তখন তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ন্যায়সঙ্গত হইবে। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ নেতা ও কর্তা হইতেছে তাহারা, যাহারা তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত এবং তোমরা তাহাদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত; তোমরা তাহাদের উপর অভিশাপ দাও। আর তাহারাও তোমাদের উপর অভিশাপ দেয়।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! যখন এইরূপ অবস্থা হইবে, তখন আমরা কি তাহাদের প্রতিরোধ করার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব না?" উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বলিলেন ঃ "না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের মধ্যে নামাজ কায়েম করিতে থাকিবে।"

এই হাদীসে উপরোল্লিখিত শর্তটিকে আরো সুস্পষ্টভাবে পেশ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস হতে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো যে, নেতৃবৃন্দ যদি ব্যক্তিগত জীবনে রীতিমতো নামাজ পড়ে, তবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যাবে না; কিন্তু শেষোক্ত হাদীস প্রমাণ করছে যে, মূলত নামাজ পড়ার অর্থ হচ্ছে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে নামাজ পড়ার পূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করা। অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিগতভাবে নামাজের পাবন্দী করাই যথেষ্ট নহে, বরং সেই সঙ্গে তাদের নেতৃত্বাধীন যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চলছে, তার মাধ্যমে অন্তত নামাজ কায়েমের জন্য পূর্ণরূপে চেষ্টা করতে হবে। এটি প্রমাণ করবে যে, তাদের সরকার আদর্শবাদের দৃষ্টিতে একটি ইসলামী সরকার। এটুকু জিনিসও যদি না হয়, তবে তার অর্থ এই হবে যে, তাদের সরকার ইসলামের পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থায় তাদের উৎখাতের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা মুসলমানদের জন্য জায়েজ হবে। এ কথাই অপর একটি হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে ঃ নবী করীম (সাঃ) অন্যান্য অনেক কথার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটিরও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যে ঃ

আমরা আমাদের নেতা ও শাসকদের বিরুদ্ধতা করিব না– যতক্ষণ না আমরা তাহাদের কাজ-কর্মে একেবারে সুস্পষ্ট কুফরীতে দেখিতে পাইব, যাহা বর্তমান থাকিলে আল্লাহর সম্মুখে তাহাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্য আমাদের নিকট প্রমাণ বর্তমান থাকিবে। (বুখারী, মুসলিম)।

এবাদত বন্দেগী

এবাদত শব্দটি আরবী 'আবদ' হতে উদ্ভূত হয়েছে। আবদ অর্থ দাস ও গোলাম। সুতরাং এবাদত শব্দের অর্থ বন্দেগী ও গোলামী করা। আল্লাহ্তায়ালা জ্বীন ও মানব জাতিকে এবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছে। মূলতঃ এবাদত বলতে নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাতকেই বুঝে থাকি। কিন্তু মুসলমানদের চেতনা লাভের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত খোদার আইন অনুযায়ী চলা এবং তাঁর নির্বাচিত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার নামই হচ্ছে খোদার এবাদত। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট কোন

www.pathagar.com

সময় নেই। এই এবাদত সব সময়ই হওয়া চাই। এবাদতের জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রকাশ্য রূপ নেই। কেবল প্রতিটি রূপের প্রত্যেক কাজেই খোদার এবাদত হতে হবে। কোন মানুষই বলতে পারেন না যে, আমি অমুক সময় খোদার বান্দা আর অমুক সময় খোদার বান্দা নই। এই দুনিয়ায় মানুষ যে কাজেই করুক না কেন তা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের বিধান অনুসারে করার অর্থই হচ্ছে এবাদত। মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার গোলাম বা দাস। এই সার্বক্ষণিক এবাদত করার জন্য যে চরিত্র, যোগ্যতা ও অভ্যাস মানুষের প্রয়োজন তা লাভ করে নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত প্রভৃতি বুনিয়াদী এবাদতগুলোর মাধ্যমে। এ সমস্ত বুনিয়াদী এবাদত ছাড়া মানুষের মধ্যে উপরোক্ত যোগ্যতা ও চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়। এ এবাদতে যেমন পরকালের কল্যাণ রয়েছে ঠিক তেমনি ইহকালেরও কল্যাণ রয়েছে। সামাজিক রীতিতে সৈনিকদের একটি নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ দিতে হয়; সেই প্রশিক্ষণ সৈনিকেরা যুদ্ধে কাজে লাগায়। ঠিক তেমনি নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত মুসলমানদের জন্য প্রশিক্ষণ বিশেষ। সে প্রশিক্ষণ সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সার্বিক কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগাবে এ জন্যই এসব এবাদত মুসলমানদের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

নামাজ

নামাজ মানুষকে পাপ, অন্যায় এবং অশ্লীলতা ও নির্লজ্জ কর্ম হতে বিরত রাখে। শরীর ও মনকে পবিত্র রাখে। নামাজ স্রষ্টার প্রতি বান্দার আত্মসমর্পণের একটি সরল পন্থা স্বরূপ। নামাজের মধ্যেই বান্দা মহান প্রভুর নৈকট্য লাভ করে। সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। জামাতের সাথে নামাজ আদায় সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। সুখে-দুঃখে, দুর্দিনে-দুঃসময়ে একে অপরকে জানার সুযোগ করে দেয়। জামাতের সাথে নামাজ আদায় গণতন্ত্র এবং নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। কিন্তু আমরা নামাজ আদায় করছি শুধু পরকালের কল্যাণের জন্য। আমরা জামাতে নামাজ আদায় করি সাতাশ গুণ ছওয়াবের আশায়। নামাজের বাস্তব যে শিক্ষা তা বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে সমাজে কোন কল্যাণ বয়ে আনছে না। নামাজ পড়েও মানুষের মন ও চরিত্রের সংশোধন হচ্ছে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা সত্ত্বেও অনেকের চরিত্র সংশোধন হয় না বা পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকে না। এর প্রধান কারণ সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য। এ জন্যেই আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বার বার ঘোষণা করেছেন- "তোমরা নামাজ কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর"। অধিকাংশ মানুষ রিজিকের কাছে ঈমানী পরীক্ষায় ব্যর্থ হন। দুর্বল ঈমানদার দারিদ্র্যের কষাঘাতে নামাজ পড়েও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এ জন্য আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বার বার এবাদতের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

['নামাজ' শিরোনামের শেষাংশ ৭৬ নং পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদ থেকে ৭৭নং পৃষ্ঠার 'এবাদত বন্দেগী' শিরোনামের পূর্ব পর্যন্ত পড়তে হবে। অসাবধানতাবশতঃ সংযোগের সময় ভুলক্রমে 'নামাজ' শিরোনামের শেষ অংশটুকু ৭৬ ও ৭৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। -লেখক]

www.pathagar.com

রোজা পালন ঃ আত্মশুদ্ধি এবং সংযমের শ্রেষ্ঠতম উপায়

মুসলিম জীবনে পবিত্র মাহে রমজানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্তবা এতো গভীর এবং ব্যাপক যে ভাষায় তার প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। এ মাসটি হচ্ছে রহমত, বরকত ও পুণ্যের। এ মাসেই নাজিল হয়েছে মানবতার মুক্তি সনদ পবিত্র কোরআনুল করিম। অন্যান্য আসমানী কিতাবও অবতীর্ণ হয়েছে এ অফুরন্ত কল্যাণের মাসেই।

রমজান মাসের রোজা শুধু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের উপরই ফরজ করা হয়নি। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের অনুসারীদের জন্যও রোজা পালন ছিলো অবশ্য কর্তব্য ফরজ। এ থেকেও পবিত্র রোজার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের এটি হচ্ছে অন্যতম একটি। এই রোজা সম্পর্কে আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরজ করা হয়েছিল।"

রোজার সকল আহকাম তথা চোখ, কান, জিহ্বা, হাত, পা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম মেনে চললে তার (রোজাদার) কাছে কোনো প্রকার পাপ আসতে পারে না। সে বেহেশতী আনন্দ ভোগ করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। আল্লাহ প্রতিটি ইবাদতের প্রতিদানের পরিমাণ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু রোজার ক্ষেত্রে তা করেননি। কি দিবেন একমাত্র আল্লাহপাকই জানেন। এ জন্যেই শেষ নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন।

"মানুষের প্রত্যেকটি কাজের ফল খোদার দরবারে কিছু না কিছু বৃদ্ধি পায়; একটি নেক কাজের ফল দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, রোজাকে এর মধ্যে গণ্য করা হবে না। কারণ রোজা খাছ করে কেবল আমারই জন্য রাখা হয়। আর আমিই এর প্রতিফল দান করবো।" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরো বলেছেন, "রোজা পালনকারী দু'টি আনন্দ লাভ করে। একটি আনন্দ হলো ইফতারের সময়, আর অন্যটি হবে রব ও পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের অকল্পনীয় সময়ে।" প্রিয় নবী (সাঃ) আরো বলেছেন, "রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশি প্রিয়।" কাজেই উম্মতে মুহাম্মদীর রোজাতে সামান্য কষ্ট থাকলেও সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে যখন তা পালন করে তখন সে দৃশ্য আনন্দদায়ক তো বটেই; ইহলৌকিক-পারলৌকিক কল্যাণও রয়েছে। কাজেই উম্মতে মুহাম্মদী সবচেয়ে ভাগ্যবান। অথচ পূর্ববর্তী জাতির রোজাতে আনন্দ তো এক প্রকার নেইই, সেই সাথে কল্যাণও নেই। সাম্যও নেই। ইতিহাস থেকে জানা যায়, "প্রাচীন মিসরীয়দের ধর্মীয় বিধানেও রোজার উল্লেখ রয়েছে। গ্রীকদের মধ্যে শুধু মেয়েদের জন্যই রোজা পালনের হুকুম ছিলো। গ্রীক বর্ষপঞ্জির থিসামো ফেরিয়া মাসের তৃতীয় দিন এ রোজা রাখা হতো। পারসিক ধর্মেও এই রোজার বিধান ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তা সাধারণ অনুসারীদের জন্য ফরজ বা অবশ্য পালনীয় ছিলো না। পারসিকদের ধর্মগ্রন্থের কোনো কোনো বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, "ধর্মীয় নেতাদের জন্য পাঁচসালা উপবাসব্রত পালন ছিলো আবশ্যিক।" (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বিট্রেনিকা)

ইহুদীদের রোজা ছিলো আত্মাকে (অনিয়মতান্ত্রিকভাবে) শুধু দমন ও শাস্তিদানের

www.pathagar.com

একটা পন্থা মাত্র, যা তাদের ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন– "তোমাদের জন্য এটা একটা স্থায়ী বিধান যে, সপ্তম মাসের দশম দিনে তোমরা স্বীয় আত্মাকে কষ্ট দেবে। সেদিন তোমরা কেউ কোনো প্রকার কাজ করতে পারবে না। কারণ, ঐদিন তোমাদের পবিত্র করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত দেয়া হবে এবং প্রভুর দৃষ্টিতে তোমরা সকল পাপ থেকে রেহাই পাবে।" অপর এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, "প্রভু মূসাকে বললেন, সপ্তম মাসের দশম দিন হচ্ছে কাফফারার দিন। এদিন তোমরা ধর্মীয় সমাবেশে মিলিত হবে এবং আত্মাকে নিগ্রহ করবে এবং ঐদিন তোমরা কোনো কাজ করবে না। কেননা, সেটি কাফফারার দিন।" এ ছাড়া ইহুদীরা রোজা শুরু করতো সূর্য বেশ কিছু উপরে উঠার পর এবং শেষ হতো রাতের প্রথম তারা উদয়ের পর। কাফফারার রোজা আবার এক সন্ধ্যা থেকে আরেক সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিলো। আর রোজার সময় দিনের বেলায় তারা দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য বিতরণও করতো এ জন্য মহা পুরস্কারের ঘোষণাও ছিলো। 'আব' মাসের প্রথম নয় দিন এবং তামুজের সতের তারিখে তারা আংশিক রোজা রাখতো। ঐ ক'দিন শুধু মদ আর গোশত ছাড়া সবকিছু খাওয়াই তাদের জন্য বৈধ ছিলো। (জিউইশ এনসাইক্লোপিডিয়া)

শোকের স্মৃতিতে ইহুদীরা রোজা রাখতো। অঞ্চলভেদে আঞ্চলিক রোজাও রাখতো। এমনিভাবে তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো রোজা পালন করতো না, যার জন্য কাঙ্ক্ষিত ফল আশা করা যায় না। অথচ ইসলামের রোজাতে কোনো প্রকার অনিয়মতান্ত্রিক রোজার বিধান নেই এবং বাড়াবাড়িও নেই। ইসলামী বিধানে সেহরীকে সুন্নত করা হয়েছে। অযথা বিলম্বে ইফতার করতে নিষেধ করা হয়েছে। সংসার জীবনের বৈধ কার্যাবলীর অনুমতিও ইসলামের রোজার বিধানে রয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্মের রোজার দিকে দৃষ্টিপাত করলে লক্ষ্য করা যায় যে, তাদের রোজার সঠিক কোনোরূপই আজ আর বর্তমানে নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম নেতা বাহবা কুড়ানোর জন্য এবং ব্যক্তি স্বার্থে খেয়ালখুশি মতো মনগড়া কিছু রোজার বিধি-বিধান চালু করেছিলো। তা কখনো এমন কঠোর ছিলো যে মানুষ ধ্বংস হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট ছিলো। আজকে যেমন সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রভাবশালী কতিপয় ব্যক্তি রোজার মাসকে ব্যবসায়িক এবং ইফতার অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে ঠিক তেমনি এককালে খ্রীষ্টানেরা অনেক সময় রোজাকে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। খ্রীষ্টানদের রোজার সময় কখনো মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিলো, কখনো ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ ছিলো, কখনো আবার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ছিলো। ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, প্রথম জেমস ও এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে আইন পাস করেছিলো যে, রোজার দিনে গোশত খাওয়া যাবে না। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মৎস্য শিল্পকে উন্নত করা। হিন্দুরা আবার একেক গোত্র একেক সময়ে একেকভাবে উপবাস তথা রোজা পালন করতো। এমনিভাবে ইসলাম ছাড়া সকল জাতির রোজার দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে, তাদের রোজা ঐশ্বরিক বিধানমতো বা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর ছিলো না। তাদের রোজা গুটি কয়েক প্রভাবশালী নেতাশ্রেণীর ব্যক্তির ইচ্ছা বা মর্জির উপর বন্দী হয়ে পড়েছিলো। তা পালন করাও লোকদের পক্ষে ভীষণ অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। পরিশেষে সে সমস্ত রোজা এক প্রকার

www.pathagar.com

রিক্তহস্তে বিদায় নিয়েছে। কারণ সে সব রোজার ছিলো না কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম। এরফলে নেতাদের মর্জির উপর নির্ভরশীল রোজা কাঙ্খিত ফল লাভেও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। অথচ ইসলাম ধর্মের রোজা ঐ সকল প্রাচীন জাতির রোজা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এতে নেই অসাধ্য কোনো নিয়ম-কানুন, নেই অক্ষম মানুষের প্রতি কঠোরতা। ইসলামের রোজা হলো সম্পূর্ণ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক। এতে অমানবিকতার কোন লেশ নেই। যারা রোজা রাখতে অক্ষম, তাদেরকে কিছুটা অথবা পূর্ণভাবে তা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহপাক বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ কিংবা মুসাফির হয়, তাহলে অন্য সময় দিন গণনা করে রোজা পালন করতে হবে।" (সূরা বাকারা) আবার আল্লাহপাক একথাও বলেছেন, "যারা রোজা পালনে সক্ষম নয়, তারা (প্রতিটি রোজার পরিবর্তে) একজন মিসকীনকে আহার দান করবে।" (সূরা বাকারা) ইসলামী রোজাতে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত উদারতা দু'টোই নিষিদ্ধ। যা পূর্ববর্তী জাতির রোজাতে ছিলো না। (তথ্য সূত্র ঃ মাসিক মদিনা, মার্চ '৯৩)

ইহুদীরা ইফতারের সময় কোনো পানীয় স্পর্শ করতে পারতো না। শুধু খাদ্য গ্রহণের হুকুম ছিলো। তাতে রোজাদেরকে রাতেও পানাহার ও ঐ জাতীয় বৈধ কাজ থেকে বিরত থাকতে হতো। কিন্তু ইসলাম ঐ জাতীয় অমানবিক নিয়মকে স্বীকৃতি না দিয়ে ভারসাম্যমূলক বিধান দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়– "পানাহার চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না ভোরের সাদা রশ্মি রেখা অন্ধকারের কালো রেখা ভেদ করে।" (সূরা বাকারা)

পূর্ববর্তী সকল জাতিই রোজা রাখতো সৌর বছরের হিসাবে। ফলে প্রতি বছর একই সময়ে রোজা ঘুরে ঘুরে আসতো। তাতে মানুষের একঘেয়েমী ধরে যেতো। কিন্তু ইসলামী রোজার বিধান চন্দ্র মাস হিসাবে করা হয়েছে। এতে করে সময়ের গতির সাথে বছরের পর বছর বিভিন্ন ঋতুতে রোজা ঘুরে আসতো। যেহেতু চন্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে ১১ দিন কম, তাই প্রতি বছর ১১, ১২ অথবা ১৩ দিন রোজা এগিয়ে আসে। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, চাঁদ দেখে রোজা শুরু করো এবং চাঁদ দেখে তা শেষ করো। যদি মেঘ থাকে এবং চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হয়; তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও।" (তিরমিযী)

মহানবী (সাঃ) আরো বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ না দেখবে, ততক্ষণ রোজা রাখা শুরু করবে না এবং যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে ততক্ষণ রোজার মাস শেষ হয়েছে বলে মনে করবে না। আর যদি উদয়স্থল স্বচ্ছ না হয়, তাহলে অনুমান করে নাও।" (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী) এখানে প্রকৃত ব্যাপার উদয় নয়, বরং চাঁদ দেখাই আসল। মূলতঃ পূর্ববর্তী জাতির রোজাকে রোজা বলাও সব সময় ঠিক হবে না। অথচ ইসলামী রোজার বিধান কতো প্রজ্ঞাময়, কতো কল্যাণকর। ইসলামী রোজার বিধানে সৌর বছরের সাথে তাল না রেখে চন্দ্র বছরের সাথে সম্পর্ক রেখে যে সুবিধা হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর ফলে পৃথিবীর সকল স্থানের তথা গভীর অরণ্যে, গুহায় ও

www.pathagar.com

দ্বীপে বসবাসকারী সকলেরই রোজা রাখতে সুবিধা হয়। কারণ চাঁদের ব্যাপারটা যতো সহজ, সূর্যের ব্যাপারটা ততো সহজ নয়। তাই ইসলামী রোজার বিধানকে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবী সংস্কার বলা যায়।

তাই অনেক অমুসলিম মনীষী রোজার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। যেমন ডাঃ আব্রাহাম জে হেনরী বলেছেন– "রোজা পালন করলে মনের মধ্যে কোন অসৎ উদ্দেশ্যের উদয় হতে পারে না, কাজেই চিন্তা-ভাবনা থাকে পবিত্র। রোজা আত্মার একটা পবিত্র ওষুধ।" ডাঃ এফ. এম. গ্রিমী বলেন, "রোজার সামগ্রিক প্রভাব মানব স্বাস্থ্যের উপর অনড়, অটল, অটুটভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে এবং রোজার মাধ্যমে কেবল শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর ক্লান্তিই বৃদ্ধি পায় না, বরং দেখা গেছে যে, এগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে।" ডাঃ আর ক্যামফাউ বলেন, "রোজা হচ্ছে পরিপাক শক্তির শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী কিংবা পরিপাক শক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু।" অধ্যক্ষ ডি. এস ফোর্ড বলেন, "রোজা পালন আত্মশুদ্ধি এবং সংযমের শ্রেষ্ঠতম একটা উপায়। যার মাধ্যমে স্রষ্টাকে লাভ করা যায়, স্বাস্থ্যকে রক্ষা করা যায়, হিংসা-দ্বেষ এবং নৃশংস স্বভাব থেকে দূরে সরে থাকা যায় এবং খুব সহজে কুপ্রবৃত্তির ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখা যায়।" এমনিভাবে বহু অমুসলিম মনীষী রোজার পক্ষে তাঁদের গঠনমূলক মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন।

আমাদের এ দেশেও আবহমান কাল থেকে মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে রোজা পালন করে আসছে। বর্তমানে একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী পবিত্র রোজা সম্পর্কে সুযোগ পেলেই নানাভাবে কটাক্ষ ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন। তা সত্ত্বেও এদেশের অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে রোজা পালন এবং রোজার মর্যাদা রক্ষায় উৎসাহের কোন কমতি নেই। অথচ এক সময় বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম করারও অধিকার ছিলো না। তাদেরকে ঠেলে দেয়া হয়েছিলো গভীর অন্ধকারে। বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ তখন ছিলো নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলমানদের জীবন থেকে আলোর প্রদীপ নিভে গিয়েছিলো। অজ্ঞ ও মূর্খ মুসলমানেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিলো। যাদের মধ্যে রোজা-নামাজ কিছুটা অবশিষ্ট ছিলো সেই রোজা-নামাজের মধ্যেও বিভিন্ন বিধর্মীয় বিধি-বিধান সুকৌশলে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এ সম্পর্কে মরহুম আবুল মনসুর আহমেদ লিখেছেন–

"তৎকালে নামাজ-রোজা খুব চালু ছিলো না। ওয়াক্তিয়া ও জুম্মার নামাজ কেউ পড়তো না। এ অঞ্চলে কোন মসজিদ বা জুম্মার ঘর ছিলো না। বছরে দুই বার ঈদের জামাত হইত বটে; কিন্তু তাতে বড়রাই সামিল হইত।... সাধ্যমত নতুন জামাকাপড় পরিয়া লোকেরা বেদম গান বাজনা করিত। ... তরুণদের তো কথাই নেই, বয়স্করাও সকলে রোজা রাখিত না । যারা রোজা রাখিত তারাও দিনের বেলায় পানি ও তামাক খাইত। শুধু ভাত খাওয়া থেকে বিরত থাকিত। পানি ও তামাম খেয়ে রোজা নষ্ট হতো না এই বিশ্বাস তাদের ছিলো। কারণ পানি তামাক খাবার সময় তারা রোজা একটা

www.pathagar.com

চোঙ্গার মধ্যে ভরে রাখতো। খুব ধার্মিক ভালো মানুষ দু'একজন এমন করাটা পছন্দ করতেন না বটে, কিন্তু সাধারণভাবে এটা চালু ছিলো।" এই অবস্থা পঞ্চাশ দশকেও গ্রাম-বাংলার অশিক্ষিত সমাজে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সে সময়ে আমাদের অঞ্চলে অনেকে রোজার নিয়ত করতো এভাবে-

"হর্দ রোজা বর্ধমান
এই নিয়তে রোজা রাখলাম।

ইফতারের নিয়ত করতো এভাবে-

"আখের কোডরা, বেহেস্তের পানি
এই নিয়তে মুখখানি খুলি।"

বর্তমানে এইসব কুসংস্কার আমাদের মধ্যে নেই বটে; কিন্তু রমজানের প্রকৃত শিক্ষা থেকে আজো আমরা অনেক দূরে আছি। রমজানে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ। কিন্তু রোজাকে শুধু পরকালের কল্যাণের আশায় পালন করার ফলে এই রমজানের প্রকৃত শিক্ষা সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হচ্ছে না।

আজ থেকে তিন যুগ আগে গ্রাম-গঞ্জে ও শহরাঞ্চলে পবিত্র রোজার মাসে উৎসব উৎসব ভাব বিরাজ করতো। মহল্লার দলবদ্ধ যুবকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাতে কাশিদা গেয়ে রোজাদারদের সেহরী খাওয়ানোর জন্য জাগাতো। যেমন ঃ

"ওঠো মুমিন 'হয় গাই' (সেহেরী) খাও
হাসতে হাসতে বেহেশতে যাও।
রোজা নামাজ না করিলে জাহান্নামে ঠাঁই
ওঠো মুমিন রোজা রাখ বেহেশতের কামাই।"

এসব কাশিদার অধিকাংশই থাকতো উর্দু ভাষায়। এখনো মহল্লায় বাংলায় কাশিদা গাওয়া হয় বটে। কিন্তু এদের সওয়াবের চেয়ে চাঁদা আদায় করাই মুখ্য। পনেরো রোজার পর এদের চাঁদা আদায়ের যন্ত্রণায় রোজাদাররা অতিষ্ঠ।

সিয়াম সাধনা কৃচ্ছ্রতা ও তাকওয়া অর্জনের সঠিক প্রশিক্ষণ। কিন্তু সাধারণ কিছু লোক এ মাসে কৃচ্ছ্রতা পালন করলেও অধিকাংশ লোকই এ মাসে কৃচ্ছ্রতা সাধন করে না। বরং এই মাসে চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। উপচে পড়ে ভোগের পেয়ালা। ফলে সমাজে বা রাষ্ট্রে এ মাসেই দেখা যায় সবচেয়ে সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিযোগিতা। আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এ মাসে বিভিন্ন ইফতার মাহফিল অথবা সভা-সমাবেশের আত্ম-সংযম ও আত্মশুদ্ধির জন্য শ্রোতাদেরকে নসিয়ত করে। যারা এই আপ্তবাক্যগুলো জনগণকে শোনায় তাদের মধ্যে অনেকেই অসংযমী ও অশুদ্ধ। হিংসা-বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা ও হীনমন্যতায় তাদের বিবেক আচ্ছন্ন। তাই দেখা যায় সন্ত্রাসীদের হাত থেকে এ মাসেও কেউ রেহাই পায় না। গুলি করে জীব-জন্তুর মতো মানুষ হত্যা করা হয়। মধ্যযুগীয় নারকীয় কায়দায় জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়। এমনকি এমন সংবাদও পত্রিকায় কয়েক বছর আগে ছাপা হয়েছে যে, রোজার দিনে প্রকাশ্যে রাস্তায় সিগারেট ফুঁকতে নিষেধ করায় এক যুবকের শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের ছেঁকা দিয়েই

www.pathagar.com

নিরস্ত হয়নি, যুবকটির গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এইসব বর্বরতার কাহিনী অনেক রয়েছে। পবিত্র রোজাকে অশ্রদ্ধা জানিয়ে অনেক উক্তি এবং অনেক কর্মকান্ড পত্রিকায় দেখেছি।

যারা আজকে পবিত্র রমজানকে উপলক্ষ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে ঘটা করে ইফতার পার্টির আয়োজন করেন এবং আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির পরামর্শ দেন তারাই এর জন্য দায়ী। তাদের জন্যেই আজকে সারাদেশে বিরাজ করছে নারকীয় কান্ড। গোটা জাতি আজ বিষাক্ত ও দূষিত পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সকলেই মোটামুটি দুর্নীতি নামক সংক্রামক ব্যাধির শিকার। এ থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই। তাই যারা জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আপ্তবাক্য বর্ষণ করে তাদেরই উচিত প্রথমে আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংযমের অনুশীলন করা। নতুবা এইসব আপ্তবাক্য বর্ষণ হবে অর্থহীন। এই আপ্তবাক্য বলে বিষাক্ত পানিতে ডুবন্ত জাতিকে কোন দিন রক্ষা করা যাবে না।

এই মাস জেহাদের মাস। আমরা জেহাদ বলতে অনেকে শুধু তলোয়ার নিয়ে জেহাদ করাকেই বুঝি। কিন্তু এই জেহাদ এর অর্থ ব্যাপক। সব অনাচার, অবিচার এর বিরুদ্ধে এবং ন্যায়-ইনসাফের পক্ষে বিভিন্নভাবে কাজ করা এবং ভয়-ভীতিকে লোভ-লালসা উপেক্ষা করে নিজকে সত্যের প্রতি অবিচল রাখাই জেহাদ। তাই আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– "আল্লাহর পথে জেহাদ কর যেমন জেহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চালিয়ে দেন নাই। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন, আর এই কুরআনেও তোমাদের এই নাম যেন রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়, আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকের জন্য। অতএব নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মওলা-মুনীব। তিনি বড়ই উত্তম মওলা, বড়ই উত্তম সাহায্যকারী" (সূরা হজ্ব, আয়াত ৭৮)। সুতরাং পবিত্র কোরআনের বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে মাহে রমজানের বিরল শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে কাজে লাগিয়ে অশিক্ষা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, হীনমন্যতা, অরাজকতা, বিশৃংখলা, দুর্নীতি, সংঘাত-সংঘর্ষ ও হত্যা দূর করতে হবে। ধ্বংসের রাজনীতি পরিহার করতে হবে। অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে শত্রু-মিত্র চিনে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন ও জাগ্রত করতে হবে। তাহলেই জাতি পবিত্র রমজানের এক মাসের প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে ইনশায়াল্লাহ।

সুতরাং রোজা শুধুমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পবিত্র রোজার গুরুত্ব রয়েছে অপরিসীম। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রোজা হোক বিপ্লবী সংস্কারের পাথেয়, এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা ও প্রত্যয়।

www.pathagar.com

হজ্ব

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানব সভ্যতার ইতিহাসের নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ ধরনের প্রলয়ঙ্করী মানব নিধনযজ্ঞ অতীতে কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। যুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীময় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রোউইলসনের ১৪ দফার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল লীগ অব নেশনস। কিন্তু লীগ অব নেশনসের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বিশ্বময় সংঘটিত হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পারমাণবিক ও বিভিন্ন ভয়ানক মারণাস্ত্রের ব্যবহার মানব জাতিকে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কিত করে তুললো। আর তাই বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৫ অক্টোবর আত্মপ্রকাশ করলো জাতিসংঘ নামক সংস্থাটি। প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের কার্যক্রমে বিভিন্ন পরাশক্তিই মূল। মানব নিয়ন্ত্রিত এই সংগঠন ব্যর্থ হয়েছে পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠায়। আজারবাইজান, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা নিরসনে জাতিসংঘের ব্যর্থতা। প্যালেস্টাইন ও কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের একচোখা নীতি, বসনিয়ায় জাতিসংঘের অসহায় দর্শকের ভূমিকা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ ধরনের মানবীয় সংগঠন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ। জাতিসংঘের এই ব্যর্থতার দিকে লক্ষ্য রেখেই দার্শনিক কবি ইকবাল বলেছেন–

মন আঁখি বেশ ন দানম কে কাফন দু'জদে চান্দ
বহরে তাকসীমে কুবুর আঞ্জুমানে আখতা খান্দ।

অর্থাৎ

জন কয়েক কাফন চোর জুটে
কবরগুলো ভাগ করে নিতে
গড়েছে সমিতি এক
জাতিসংঘ এর বেশি নয় কিছু মোটে।

বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠা যা মুসলিম মিল্লাতের মূল দায়িত্ব তা সম্ভব হতে পারে এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন হজ্বের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আমরা ইতিহাস থেকে দেখতে পাই হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলকে কাবা শরীফে হাজিরা দিয়ে বিশ্ব মানবতাকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি প্রদান করার আহবান জানিয়ে বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করতে। শান্তি প্রতিষ্ঠার নবুয়তী ধারায় শেষ সংযোজন রাসূল (সাঃ)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণ। এ ভাষণ বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল রহস্য মানবকূলের সামনে উন্মোচন করে দেয়। আল্লাহর রাসূল বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন, "সমবেত জনগণ! অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং অবৈধ পন্থায় কারো সম্পদ হস্তগত করা তোমাদের জন্য হারাম। এটা ঠিক ঐ রূপ হারাম যেমন আজকার দিন এবং এ মাস তোমাদের জন্যে হারাম (এবং তোমরা হারাম মনে কর)।

ভালো করে বুঝে নাও যে, জাহেলিয়াতের যুগের সবকিছুই আমার পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট করা হলো এবং জাহেলিয়াতের যুগের খুন মাফ করা হলো। সকলের আগে

www.pathagar.com

আমার বংশের খুন অর্থাৎ বিন হারিস বিন আব্দুল মোত্তালিবের পুত্রের খুন মাফ করার ঘোষণা করছি। রাবিয়ার পুত্র বনী সাদ কবিলায় দুধ পানের জন্য থাকতো। তাকে ফযিল কবিলার লোক খুন করে...।" রাসূল (সাঃ) এর এ ভাষণকে অনুসরণ করে তৌহিদবাদী সব মুসলমান আজও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। অল্প সময়ের জন্যে হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে আগত মুমীন দল বায়তুল্লাহকে কেন্দ্র করে এক মজবুত ঐক্য গড়ে তোলে। এই ঐক্যকে পুঁজি করে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে গোটা দুনিয়াকে কিভাবে হেদায়েতের পথে চালাবে, কিভাবে বা মুসলিম উম্মাহ একত্রিত হয়ে খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বের অশান্তির মূল কারণসমূহ দূর করতে পারে। এ সিদ্ধান্ত প্রতিটি বছরই নিতে পারে হজ্বের পবিত্র অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ। মুরুব্বীর ভূমিকায় থাকতে পারেন মক্কা-মদীনার হেফাজতকারী রাষ্ট্রপ্রধান আলেম ও বুদ্ধিজীবীগণ। যারা লাব্বাইক ধ্বনি মুখে বুকে নিয়ে হাজির হয় আল্লাহর দরগায়, তারাই পারে সমস্ত চক্রান্ত ভেদ করে নূরে ইলাহীর তরফে দোল খেতে খেতে অশান্তময় পৃথিবীতে শান্তির স্রোত বইয়ে দিতে। হজ্ব মানুষকে বুজদিল অবস্থা থেকে শেরে দিল অবস্থায় পৌঁছে দিতে তাকে যোগ্য করে তোলে পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য। হজ্ব শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ইবাদতই নয়, বরং গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর মিলনের এক সুন্দর সুযোগ। এই সুযোগের সঠিক ব্যবহারেই পৃথিবীময় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

হজ্ব যেমন আধ্যাত্মিক সংস্কার সাধন করে তেমনি ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম যা অন্য কোনো এবাদতের পক্ষে সম্ভব নয়।

.... হজ্বের ইবাদত অনুষ্ঠানকালের প্রবাহে বার বার মানুষের সামনে এভাবে উপস্থিত হয় শান্তির বাণী নিয়ে পরিবারে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে।

হজ্বের পবিত্র ইবাদতের মধ্য দিয়ে আজ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা। হজ্ব মুসলিম জাতির আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন। গোটা বিশ্বের নানা বর্ণের ভাষার বিচিত্র মানুষেরা একই প্রভু প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে একই উপাস্যকে ঐক্য কণ্ঠে ঘোষণা দেয়, 'প্রভু হে আমরা হাজির'। পৃথিবীর কোনো ধর্মে এ ধরনের বিশ্ব মানবের মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা নেই। বিশ্ব মানব সমাজের এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন মানবকূলকে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে প্রধানত আল্লাহর প্রেম বারিতে অবগাহনের সুযোগ করে দেয়। সাথে সাথে তারা অন্তরে অনুভব করে একের প্রতি অন্যের নিবিড় আকর্ষণ। মহব্বতের বন্ধনে মুসলিম সমাজ একটি সীসাঢালা প্রাচীরের মজবুতি গ্রহণ করে খোদাদ্রোহী জাতির অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে। গোটা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরাফাত সম্মেলন কাবার তওয়াফ বহুকাল ধরে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ভবিষ্যতের কালস্রোতে দৃষ্টান্তহীন ভূমিকা পালন করবে এই অফুরন্ত শক্তির আধার আরাফার সহ-অবস্থান, কাবার তওয়াফ, হাজরে আসওয়াদের নিবিড় চুম্বন। নিরহঙ্কার, ভোগহীন স্বার্থ বিবর্জিত মানবকূলের এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের নজিরবিহীন অনুষ্ঠানই উত্তপ্ত ধরণীর রাজনৈতিক বিদ্বেষ, অর্থনৈতিক স্বার্থপরতা, সমাজ-সংস্কৃতির অস্থিরতাকে দূর করে পৃথিবীময় একটি শান্তির প্রবাহ বহাবার যোগ্যতা রাখে।

www.pathagar.com

বিশ্বের স্বচ্ছল মুসলমানদের সবচেয়ে বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ হজ্ব। হজ্বকে ইসলামের পঞ্চম রোকন হিসাবে গণ্য করা হয়। হজ্ব ফরজ হয়েছিল নবম হিজরীতে। হজ্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোথাও যাবার জন্যে সংকল্প বা ইচ্ছা করা। ইসলামের পরিভাষায় এই ভূপৃষ্টে আল্লাহর এবাদতের জন্যে মক্কায় সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত বায়তুল্লাহ বা কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাতের মাঠে অবস্থান, সাফা-মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী মীনায় অবস্থানসহ অন্যান্য যেসব এবাদত কর্ম মহানবী (সাঃ) নিজে সম্পাদন করে গেছেন, সে সব কাজকে হজ্ব বলা হয়। আগেই বলেছি হজ্ব মুসলমানদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বা মিলন ক্ষেত্রও বলা যায়। এবাদতের সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করার এটি একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যমও বটে। যা প্রিয় নবীর বিদায় হজ্বের বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই যে কোন মুসলমান বসবাস করুক না কেন তারা পরস্পরের ভাই। এভাবে সাদা-কালোতে কোন পার্থক্য নেই। তাই আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "দুনিয়ার সব মুসলমান একটি মাত্র দেহের ন্যায়। দেহের একাংশে ব্যথা দেখা দিলে সর্বাঙ্গে সে ব্যথা অনুভূত হয়।"

পৃথিবীর যে কোন মুসলমানের উপর আঘাত আসলে তা পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম সত্ত্বার বিরুদ্ধে আঘাত হানার শামিল। কিন্তু মুসলমানেরা নানা দুর্বিপাকে পড়ে হজ্বের প্রকৃত শিক্ষা হতে অনেক দূরে সরে গেছে। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) এর মহান আদর্শ থেকে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম সম্প্রদায় আজ বিচ্যুত। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে বসনিয়া, চেচনিয়া, আলজেরিয়া, ইরান, লিবিয়া, কাশ্মীরসহ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানেরা বিধর্মীয়দের কাছে নির্যাতিত হচ্ছে, মর্মান্তিকভাবে মার খাচ্ছে। অথচ অর্ধ শতাধিক মুসলমান রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও ২/১টি রাষ্ট্র ব্যতিত কোন মুসলিম রাষ্ট্র বিধর্মীয়দের হাতে নির্যাতীত মুসলমানদের সাহায্য করা তো দূরে থাক নৈতিক সমর্থন দিতেও এগিয়ে আসছে না। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যদি বিজাতীয় রাষ্ট্রগুলোর অপকর্মের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হতো তাহলে পৃথিবীর যে কোন সমস্যা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মীমাংসা করা সম্ভব হতো। আল্লাহ মুসলমানদেরকে যে তেল সম্পদ দিয়েছেন তা এতোই মূল্যবান ও অপরিহার্য যা ছাড়া পৃথিবী অচল। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এই তৈলকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে তাহলে অনেক আগেই বিজাতীয় রাষ্ট্রগুলোর লম্ফঝম্ফ বন্ধ হয়ে যেত।

হজ্ব পালনে মুসলিম উম্মাহর জন্য যেমন ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে ঠিক তেমনি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। হজ্বের মাধ্যমে শুধু মাত্র সৌদি আরবের অর্থনৈতিক কল্যাণ বয়ে আনলেও মুসলিম বিশ্বের কোন কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না। রাজতন্ত্র ইসলাম সমর্থন করে না। সেই রাজতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে সৌদি আরব হজ্বকে শুধুমাত্র ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। এ ছাড়া সৌদি রাজ পরিবার হারামাইন শরীফের খাদেম হিসাবে দাবী করে। কিন্তু তাদের কাজকর্মে মনে হয় এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদেম ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

ইরাকের সাথে যুদ্ধের সময় রাজতন্ত্র চিরস্থায়ী করবার জন্য তারা খরচ করেছে ৬৭ লাখ মিলিয়ন ডলার। আর বসনিয়ার মুসলমানদের জন্য এরা ব্যয় করেছেন মাত্র ৩

www.pathagar.com

মিলিয়ন ডলার। এটা ভিক্ষা না অনুগ্রহ তারাই জানেন। কয়েক বছর আগে একটি পত্রিকার তথ্যে জানা যায়, কুয়েতের আমীর লন্ডন চিড়িয়াখানার জীবজন্তুর জন্য এক মিলিয়ন ডলার ও বসনিয়ার মুসলমানদের জন্য এক মিলিয়ন ডলার দান করেছেন। তবে কি শেখদের দৃষ্টিতে বসনিয়ার মুসলমানেরা জীব-জন্তুর সমতুল্য? হায় মুসলমান! হায় ইসলামী উম্মাহ!!

হজ্ব ছিলো মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করার ফরজ এবাদত। আজকে এই তাৎপর্যপূর্ণ এবাদতকে পরিণত করা হয়েছে আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব। বিশ্বের মুসলমানরা পবিত্র হজ্বের প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে সরে যাবার কারণে মুসলিম উম্মাহ আজ আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ না করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ ধরেছে রাশিয়ার রশি, কেউ ধরেছে আমেরিকার রশি, কেউ ধরেছে বৃটিশের রশি, কেউ ধরেছে ভারতের রশি। অথচ এদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক সুস্পষ্টভাবে হুঁশিয়ার করে এরশাদ করেছেনঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা যদি তোমাদের প্রাপ্ত হয়, তবে তারা তোমাদের জন্য শত্রু হবে এবং তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে হস্তসমূহ (অস্ত্র) দ্বারা এবং রসনা (কূটনীতি কটুবাক্য ইত্যাদি) সম্প্রসারিত করবে। (২৮ ঃ ১-২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না যাদের উপর আল্লাহ কোপ (রোষ) প্রকাশ করেছেন। (২৮ঃ৬০ঃ১৩) সত্য বিশ্বাসী মুসলমানগণ কখনই অবিশ্বাসী অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে না, যদিও তারা পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন হয়। (২৮ঃ৫৮ঃ২২)

উপরোক্ত অকাট্য নির্দেশ মোতাবেক কোন অমুসলিম রাষ্ট্র, তাদের প্রভাবান্বিত জাতি সংঘ, আন্তর্জাতিক মদদপুষ্ট চরম ক্ষতিকর এনজিও ইত্যাদির সাথে বন্ধুত্ব, একাত্মতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়েছে। আত্মরক্ষা ও সার্বিক সাহায্য লাভের আশায় তাদের সাথে একাত্মতার ফলে চরম অশান্তি, অশুভ পরিণাম হয়েছে, হচ্ছে ও আগামীতেও হতে থাকবে।

সম্পদে সমৃদ্ধশালী বিশ্বের অনেক ইসলামী দেশ ও ওআইসি নামক সংগঠনের মাধ্যমে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বিজাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় সদস্যভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক চক্র ও খোদ জাতিসংঘ বিশ্ব মুসলিম ক্ষুদ্র শক্তিদেরকে নানা বাহানায় ধ্বংস সাধনে মরণ ছোবল হানছে তা আজ সুস্পষ্ট। তাদের উপর ভরসা করা অংশীবাদিতার শামিল। 'যে আল্লাহর উপর ভরসা (নির্ভর) করলো, তাঁর জন্য এটাই যথেষ্ট।' সর্বশক্তিমান আল্লাহর এ সুদৃঢ় আশ্বাস বাণীই আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ– যদ্বারা নিরস্ত্র মুসলিমগণ শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে টিকে রয়েছে ও থাকবে। কিন্তু যেসব দেশ অংশীবাদীদের উপর নির্ভর করে আছে হয়তো এমন দিন আসবে সম্পদ ফুরিয়ে গেলে তারা ভিক্ষেও পাবে না। আল্লাহপাক ন্যায়পরায়ণ অমুসলিম রাষ্ট্রনায়ককেও সাহায্য করে থাকেন, কিন্তু জালিম ও অংশীবাদী মুসলমান রাষ্ট্রনায়কদের সাহায্য করেন না।

মালয়েশিয়ার বিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মোহাম্মদ 'মুসলিম জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠার আহবানের প্রতি মুসলিম বিশ্ব যত শীঘ্র সাড়া দিবেন ততো শীঘ্র হবে মুসলিম

www.pathagar.com

রাষ্ট্রসমূহের সার্বিক কল্যাণ। যা দ্বারা জাতিসংঘের সুদৃঢ় আর্থিক মানসিকপর্ব বিচূর্ণ করতে সক্ষম হবে। বিশ্ব মোড়লরা চক্রান্তের হাত গুটাতে বাধ্য হবে। সুতরাং বিশ্বের দুর্দশাগ্রস্থ মুসলমানদের রক্ষা করতে হলে হজ্বের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মুসলমানদের চেতনাকে জাগ্রত এবং পবিত্র কোরআন হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করতে হবে।

যাকাত ও ইসলামী অর্থনীতি

মুসলমানদের তিনটি ক্ষেত্রে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সবচেয়ে কঠিন। এ তিনটির মধ্যে প্রথমটি জিহাদ, দ্বিতীয়টি নারী বিষয়ক, তৃতীয়টি রিজিক বা অর্থনৈতিক। প্রথম ও দ্বিতীয়টি এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তাই এই দু'টি বিষয় বাদ দিয়ে তৃতীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি।

ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সবচেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় রিজিকের ক্ষেত্রে। জিহাদ ও নারী বিষয়ে ঈমানী পরীক্ষা দেয়ার সব মানুষ সব সময় সম্মুখীন হয় না বটে; কিন্তু রিজিকের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষকে প্রতিনিয়ত কঠিন ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। হালাল-হারাম এর বাছ-বিচার করতে হয়। তাই অনেকে কঠিন দারিদ্র্যের কষাঘাতে অথবা অতি লোভের কারণে রিজিকের ক্ষেত্রে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হন। যা আমরা বাস্তব জীবনে লক্ষ্য করছি। অনেক মুসলমান নামাজ পড়ছে। আবার ঘুষও খাচ্ছে। রোজা রাখছে, চুরিও করছে। মুখে নীতি-আদর্শের কথা বলছে, আবার অন্যের সম্পদ বা তহবিল তছরুপও করছে। এক কথায় এমন অনেক মুসলমান আমাদের সমাজে রয়েছে যারা এবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি নানাবিধ কুকর্মে লিপ্ত রয়েছে। এর প্রধান কারণ সমাজে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে পাহাড় সমান অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণেই আজ দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হানাহানি, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ বিভিন্ন অশান্তি বিরাজ করছে। অনেক রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এসবের বিরুদ্ধে সভা-

আত্মপ্রচারে নিমগ্ন ধনীদের যাকাত প্রদানের বলি মহিলা ও শিশু

www.pathagar.com

সমাবেশে চটকদার বক্তৃতা-বিবৃতি দেন, পত্র-পত্রিকায় কলম চালিয়ে অন্যকে সৎ পথের নসিয়ত করেন; অথচ ব্যক্তিগত জীবনে এদের কর্মকান্ড, চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থনৈতিক প্রশ্নে অনেকেই হলফ করে বলতে পারবেন না যে, তারা ধোয়া তুলসী পাতা। এ জন্যই আল্লাহপাক এবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে যতোবার সালাতের কথা বলা হয়েছে ততোবারই যাকাতের কথা বলা হয়েছে। অন্য কোন এবাদতের কথা এতো অধিকবার এতো গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেননি।

অর্থনীতির ইতিহাসে যাকাতই পৃথিবীর সর্বপ্রথম নিয়মিত কর। এর আগে যে কর ধার্য করা হতো তা শাসকদের খেয়াল ও খুশী মোতাবেক এবং তা আদায় করা হতো তাদের ভোগ বিলাস চরিতার্থ করার জন্য। ধনীদের চেয়ে গরীবদের ওপরই বেশির ভাগ করের বোঝা চাপানো হতো এবং অনেক সময় শুধু গরীবরাই বহন করতো তার ভার। যা আমরা বর্তমানে পাশ্চাত্যের কর ব্যবস্থার অনুকরণে আমাদের দেশের কর ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করছি।

ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকদের মতে, ইংরেজরা তাদের দেশে প্রবর্তিত আয়কর আইনের ধারণা নিয়েছিলো ইসলামের যাকাত প্রথা থেকে। এই ভারতবর্ষে ইংরেজরা সর্বপ্রথম আয়কর আরোপ করে ১৮৬০ সালে। ১৮৫৭ সালে সূচিত সিপাহী বিপ্লবকালীন যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি মেটানোর উদ্দেশ্যে; যা প্রতিকূল সমালোচনার কারণে ১৮৬৫ সালে প্রত্যাহার করা হয়। ১৮৬৭ সালে পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই কর প্রথা বর্তমান পর্যায়ে আমাদের দেশে বহাল রয়েছে। কাজেই যাকাত প্রথার ধারণা থেকেই কর প্রথার প্রবর্তন হয়। কিন্তু ইসলামী কর বা যাকাত প্রথা সুসংগঠিত ছিলো। ইসলামই সর্বপ্রথম কর ধার্য ও আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম প্রণালী প্রচলন করে। সমাজের মধ্যে যারা বিত্তশালী ও মধ্যবিত্ত তাদের ওপরই করের বোঝা চাপানো হয়। যারা গরীব তাদের নিষ্কৃতি দেয়া হয় করের হাত থেকে।

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরিশোধক বা পরিবর্ধক, শুদ্ধিকরণ, উন্নয়ন বা উৎকর্ষ সাধন, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য, পবিত্রতা ও প্রশংসা। ইমাম ইবনে তাইমিরা বলেছেন, "যাকাত প্রদানকারীর মন ও আত্মা পবিত্রও হয়। তার ধন-মাল বৃদ্ধি পায় ও পরিচ্ছন্ন হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তা পরিমাণে বেশি হয়।"

ইসলামী দার্শনিক আলাউদ্দীন আল-আজহারীর মতে, যাকাত দরিদ্রকে প্রবৃদ্ধি দান করে, সে দান ধনশালীর ধন ও সম্পদেও প্রবৃদ্ধি সাধন করে। বস্তুতঃ যাকাতে ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন-মালের মধ্যেই সাধিত হয় না; বরং যাকাত দানকারীর মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "হে নবী! আপনি তাদের ধন-মাল থেকে সাদাকাহ (যাকাত) গ্রহণ করুন, এর দ্বারা আপনি তাদের পবিত্র করুন এবং (নেকীর পথে) তাদেরকে অগ্রসর করুন। আর তাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন। কেননা আপনার দোয়া তাদের জন্য শান্তির বাহক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা আত তাওবাহ, ১০৩)

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে "ইসলামী ফিকাহ্ ও শরীয়ত অনুসারে যে সমস্ত সামগ্রীর উপর যাকাত ধার্য করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ (ক) সঞ্চিত বা জমাকৃত অর্থ, (খ) সোনা, রূপা ও সোনা-রূপা দ্বারা তৈরী অলংকার, (গ) ব্যবসায়ের পণ্য সামগ্রী, (ঘ) কৃষি উৎপন্ন, (ঙ) খনিজ উৎপাদন (চ) সব ধরনের গবাদিপশু।

উপরোক্ত দ্রব্য সামগ্রীর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যখন কোন মুসলমান অর্জন করে তখন তাকে যাকাত দিতে হয়। এই পরিমাণকে 'নিসাব' বলে। যাকাতের হার সর্বনিম্ন ২.৫০% থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। আটটি উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ ব্যবহারের নির্দেশ পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে ঃ (ক) দরিদ্র জনসাধারণ, (খ) অভাবী ব্যক্তি, (গ) যে সকল কর্মচারী যাকাত আদায়ে নিযুক্ত রয়েছে, (ঘ) নও-মুসলিম (ঙ) ক্রীতদাস বা গোলাম, (চ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, (ছ) আল্লাহর পথে মুজাহিদ ও (জ) মুসাফির।

গরীবরা সুদ দেয় ধনীদেরকে। এ জন্য আল্লাহপাক সুদকে হারাম করেছেন। অন্যদিকে ধনীদের যাকাত দিতে হয়, গরীবরা তা পায়। এ জন্য যাকাত প্রদানকে আল্লাহপাক উৎসাহিত করেছেন এবং গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত এই ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে বা রাষ্ট্রে নিরন্ন, ক্ষুধার্ত, বুভুক্ষু মানুষের মিছিল থাকতে পারে না। বহাল থাকতে পারে না দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাত। যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে ইসলামের সোনালী যুগে সমাজ পুরোপুরি দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছিলো। তখন সমাজের প্রতিটি মানুষ বিপুল সম্পদের মালিক না হলেও অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন কেউই ছিলো না।

ইয়াহিয়া বিন সাদ বলেন, আমাকে ওমর বিন আবদুল আজিজ আফ্রিকায় যাকাত-ছাদাকাই আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন। আমি আদায় করলাম। আদায়কৃত অর্থ বন্টন করার জন্য গরীবদের খোঁজ নিলাম। কোন গরীব পেলাম না। এমন কাউকেই পেলাম না– যিনি আমার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করেন। ওমর বিন আবদুল আজিজের যাকাত আদায়ের কঠোর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সকলে অভাবমুক্ত হয়েছিল।"

হযরত আবু বকর (রাঃ) যাকে আল্লাহতায়ালা নবুওয়াতের কাছাকাছি সম্মান দান করেছিলেন তিনি সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন ঃ "আল্লাহর শপথ, রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবনে যারা যাকাত দিতো, আজ যদি কেউ তার উট বাঁধার একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, তবে তার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ করবো।"

শেষ পর্যন্ত সকল সাহাবীই এ কথার যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সকলে একমত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, যারা যাকাত দিবে না তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা অপরিহার্য।

কোরআন শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "যে সব মুশরিক যাকাত দেয় না, যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য (আস সিজদা, ৬-৭)।

আল্লাহপাক আরো এরশাদ করেছেন ঃ "বস্তুত এরাই খোদা প্রদত্ত হেদায়েত লাভ

www.pathagar.com

করেছে এবং এরাই মুসলমান। অর্থাৎ যাদের ঈমান নেই এবং নামাজ ও যাকাত আদায় করে না তারা শুধু আল্লাহর হেদায়েত হতেই বঞ্চিত নহে কল্যাণ ও সাফল্যও তাদের ভাগ্যে জুটবে না।" (বাকারা-৫)।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র। অথচ ১৯৮২ সালে এই মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে নামকাওয়াস্তে সরকারীভাবে যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়েছে বটে; কিন্তু যাকাত আদায়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে অর্থনৈতিক কল্যাণ বা সাফল্য এদেশের জনগণের ভাগ্যে জুটেনি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে যে পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে আমানত আছে তা থেকে সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা হলে প্রতি বছর দুই হাজার কোটি টাকা পাওয়া যাবে। এই হিসাবে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যায়, যাকাত বোর্ড গঠন হবার পর গত ১৫ বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা আদায় হবার কথা। অথচ সেখানে আদায় হয়েছে গত বছর পর্যন্ত মাত্র এক কোটি ৭১ লাখ ২৫ হাজার টাকা।

গত নির্বাচনের সময় একটি রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্রে বেকার ভাতা প্রদানের বিষয়টিকে নিয়ে আমাদের দেশের এক অর্থনীতিবিদ টিভিতে অনুষ্ঠিত 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, রাষ্ট্র থেকে বেকার ভাতা প্রদান করলে এর জন্যে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। এ টাকা আসবে কোত্থেকে?

যারা আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করার নামে ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী খুলে পাশ্চাত্য স্টাইলে পেট ভরে সুদ খেতে বিশ্বাসী তাদের অবাক হবারই কথা। ব্যাঙের কাছে কুয়োকে পৃথিবী বলে মনে হতে পারে। মূষিকদের কাছে হাতির পা থামের মতো মনে হতে পারে। জলাশয়কে সাগর বলে ভ্রম হতে পারে কিন্তু সাগর অনেক বড়।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট থাকাকালে দারিদ্র্য দূরীকরণে এক হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন বলে সরকারের এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিলো। সমীক্ষায় আরো বলা হয়, যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা গেলে যাকাতের এ অর্থ দিয়ে দেশের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের নিরিখে যদি গত ৩০ বছরে যাকাত আদায় হতো তাহলে বর্তমানে যাকাত আদায়ের পরিমাণ হতো ষাট হাজার কোটি টাকা। এ আদায়কৃত অর্থ যথাযথভাবে গরীবদের মাঝে বিতরণ অথবা বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ দেশের মানুষ দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে রেহাই পেতো। এ ছাড়া বাংলাদেশে ১৩ কোটি লোকের বাস। এই তেরো কোটি লোকের চাহিদাও রয়েছে অনেক। বিলাস দ্রব্যাদি পরিহার করে মৌলিক চাহিদাগুলো যদি আভ্যন্তরীণভাবে মিটানোর পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয়ভাবে নেয়া হতো তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এদেশে যাকাতের টাকায় বছর বছর নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হতো। অধিক হারে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ হতো। তখন মানুষের বেকার থাকার তো কোন প্রশ্নই আসতো না। আর কেউ বেকার না থাকলে বেকার ভাতা দেয়ার কোন প্রয়োজনও হতো

www.pathagar.com

না।

এই শিক্ষা আমরা মালয়েশিয়া থেকে নিতে পারি। মালয়েশিয়া একদিন আমাদের চেয়েও দরিদ্র ছিলো। আমাদের চেয়েও তাদের মাথা পিছু গড় আয় ছিলো কম। আজ তারা তাদের বেকারত্ব ঘুচিয়েও বাইরে থেকে জনশক্তি আমদানী করছে। বাংলাদেশে প্রায় দু'লাখ মসজিদ আছে। যাকাত প্রথাকে (শহরাঞ্চলে নগদ অর্থ এবং গ্রামাঞ্চলে ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ) বাধ্যতামূলক করে তা আদায়ের দায়িত্ব মসজিদ কমিটির উপর ন্যস্ত করা হলে বিপুল পরিমাণ যাকাতের অর্থ আদায় হবে যা দিয়ে লাখ লাখ লোক উপকৃত হতে পারে। আমাদের দেশে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যয়িত মোট অর্থের ১০-২০% এর বেশি সেবায় রূপান্তরিত হয় না। ৮০% অর্থ ব্যয় হয় তাদের বিলাসিতায় এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে। এ ছাড়া এদের মানব সেবার চেয়ে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকে। মসজিদ ভিত্তি যাকাত বোর্ড গঠন করে এসব চক্রান্তের মোকাবেলা করা সম্ভব। এনজিও প্রতিষ্ঠান (শতকরা হিসেবে) একশত কোটি টাকার মধ্যে দশ কোটি টাকা খরচ করে সেবাখাতে আর বিলাসিতা ও প্রশাসনিক খাতে খরচ করে নব্বই কোটি টাকা। অন্যদিকে মসজিদ ভিত্তিক সারাদেশে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে শতকরা হিসেবে একশ' কোটি টাকার মধ্যে প্রাশসনিক খাতে দশ কোটি টাকা এবং সেবা খাতে নব্বই কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব। দারিদ্র্য বিমোচনে এ বিপুল কর্মকান্ড স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠলে পর্যায়ক্রমে অভিজ্ঞতা বিনিময়, সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় ভিত্তিক সংগঠিত করাও সম্ভব। তাহলে শুধুমাত্র মসজিদভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমেও ১৫/২০ বছরের মধ্যে এ দেশ দারিদ্রমুক্ত হতে সক্ষম।

আমাদের দেশে কতিপয় অর্থশালী লোক নিজ উদ্যোগে যাকাত আদায় করে। এরা কম মূল্যের শাড়ী অথবা লুঙ্গি বিতরণ করে যাকাত আদায় করার আগে অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে তা প্রচার করে থাকেন। নির্দিষ্ট দিনে গরীব মিসকিনরা অর্থশালী ব্যক্তির বাড়ীতে হাজির হয়। এতে যাকাত প্রার্থীদের প্রচুর ভীড় হয়। যাকাতদাতারা এ ভীড় সামাল দিতে পারে না। শুরু হয় মারপিট, ধাক্কাধাক্কি। যাকাত নিতে এসে ভীড়ের কারণে অনেক দুর্বল লোক ও শিশুর মৃত্যুবরণ করার মতো ঘটনা অতীতে আমরা দেখেছি। এসব যাকাতদাতাদের সওয়াবের চেয়ে সুনাম অর্জন করাই থাকে মুখ্য। এছাড়া অনেক বিত্তশালী অবৈধ উপার্জন হতে সুনাম অর্জনের লক্ষ্যে যাকাত দিয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, "সে বলে বহু অর্থ ব্যয় করেছে। সে কি মনে করে তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না।" (সূরা বালাদ ঃ ৬-৭)।

মিলাদ শরীফ

আমাদের দেশে 'মিলাদ শরীফ' আজকাল অবশ্যই করণীয় ও পালনীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একশ্রেণীর লোক ইসলামের মৌলিক এবাদতের ধার ধারে না কিন্তু বছরে একবার মিলাদ পড়ানো চাই-ই। নতুবা মনে করে অকল্যাণ হবে। কোন শুভ কাজ আরম্ভ করার আগে, কোন বিপদে পড়লে বা বিপদ থেকে মুক্তি পেলে এবং অফিস-

www.pathagar.com

আদালত, কল-কারখানা, দোকান-পাট উদ্বোধনকালে মিলাদ পড়ানো বাধ্যতামূলক এবাদতে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে রাষ্ট্রীয়ভাবে মিলাদ পড়ানোও একটি জাতীয় কালচারে পরিণত হয়েছে। 'মিলাদ'-এর আভিধানিক অর্থ জন্মোৎসব। এই জন্মোৎসব ধর্মীয় যে কোন বিশেষ দিনগুলোতে জুড়ে দেয়া হয়। আবার অনেক ইসলাম বিদ্বেষীকেও এ অনুষ্ঠানটি বেশ উৎসাহের সাথে পালন করতে দেখা যায়। এই মিলাদ পড়ানো অনুষ্ঠানটি এই উপমহাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে প্রচলন আছে বলে শোনা যায় না। সুতরাং সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক; এই উপমহাদেশের জন্য ইসলামের রীতি-নীতি, পদ্ধতি এক রকম, অন্যান্য দেশের মুসলমানদের জন্য ভিন্ন রকম? এ ভিন্নতা শুধু মিলাদের ক্ষেত্রে নয়; অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে বা এবাদতের রীতি-নীতিতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন পীর পূজা, কবর পূজা, কুলখানী, চেহলাম প্রভৃতি। এগুলো যদি ইসলাম ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা পালন করে থাকি কিন্তু অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা তা করেন না কেন?

পবিত্র কোরআনে এবং রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ রয়েছে দরূদ পাঠ করার। আমরা তা এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে পাঠ করতে পারি যা আমাদের জন্য রয়েছে অশেষ রহমত ও কল্যাণ। অথচ মিলাদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও রাসূল (সাঃ) এর কোন নির্দেশ নেই। বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতে প্রচলিত মিলাদের কোন রেওয়াজ রাসূল করীম (সাঃ) এর জীবনে ছিলো না। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তাঁর পরবর্তীকালে মুজাহিদদের সময়েও এর প্রচলন ছিলো না। মিলাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম তাঁর 'সুন্নাত ও বিদয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

নবী করীম (সাঃ)-এর প্রায় দু'শ' বছর পরে এমন এক বাদশা এর প্রচলন করে যাকে ইতিহাসে একজন ফাসিক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জামে আজহার এর শিক্ষক ডঃ আহমাদ শারবাকী লিখেছেন ঃ চতুর্থ হিজরীতে ফাতিমীয় শাসকরা মিসরে এর প্রচলন করেন। এ কথাও বলা হয় যে, শায়খ উমর ইবনে মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি ইরাকের মুসল শহরে এর প্রথম প্রচলন করেছেন। পরে আল-মুজাফফর আবু সাঈদ বাদশাহ ইরাকের এরকেল শহরে মিলাদ চালু করেন। ইবনে দাহইয়া এই বিষয়ে একখানি কিতাব লিখে তাকে দেন। বাদশাহ তাকে এক হাজার দিনার পুরস্কার দেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বর্তমান মিলাদ সুন্নতের বিষয় নয়, সুন্নত মুতাবিক ব্যবস্থাও এটি নয়। বরং তা সুস্পষ্টরূপে বিদয়াত। এ সম্পর্কে বহু ইসলামী চিন্তাবিদ মিলাদ এর বিরুদ্ধে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া মিলাদ পাঠ করার সময়ে অনেকে দাঁড়িয়ে যান। এদের বিশ্বাস হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রূহ তশরীফ এনেছে এবং উপস্থিত আছে। ইমামগণ এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেছেন। শামী চরিত গ্রন্থ প্রণেতা লিখেছেন–

রাসূল (সাঃ) এর প্রেমিকদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তাঁরা যখন নবী করীম (সাঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত শুনতে পায় তখন তাঁরা তাঁর তাজীমের জন্যে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ

www.pathagar.com

এই দাঁড়ান বিদয়াত, এর কোন ভিত্তি নেই। নবী করীম (সাঃ) নিজে মোটেই পছন্দ করতেন না বা চাইতেন না যে, তাঁর তাজীমের জন্যে লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। তার প্রমাণ হযরত আবু ইমামের বর্ণনা। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) লাঠির উপর ভর দিয়ে আমাদের সামনে আসলেন। তখন আমরা তাঁর তাজীমের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন, অমুসলিম লোকেরা যেমন পরস্পরের তাজীমের জন্যে দাঁড়ায়, তোমরা তেমনি করে দাঁড়াবে না।

অথচ আমাদের দেশে মিলাদের মাহফিলে নবী করীমের 'রূপ' হাজির হয় এ বিশ্বাসে সকলে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করে ঃ

"ইয়া নবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা
সালাওয়া তুল্লাহ আলাইকা।"

রাসূলে করীমের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা ঈমানদার ব্যক্তির ইসলামের পথে চলার জন্য সবচেয়ে বড় পাথেয়। সে ভালোবাসা নিশ্চয়ই এতো বেশি মাত্রাতিরিক্ত হবে না যা কেবল আল্লাহর প্রতি হওয়া উচিত। রাসূলে (সাঃ)কে সে মর্যাদা, সে গুরুত্ব এবং সে ভালোবাসাই দিতে হবে যা দিতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূলে (সাঃ) যা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। (তথ্য সূত্র ঃ মাওলানা আবদুর রহীম, সুন্নাত ও বিদয়াত)

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে রাসূলে করীম (সাঃ)কে অনুসরণ করা। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "বলে দাও হে নবী, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে তোমরা হে মুসলমানেরা আমায় অনুসরণ করে চলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল দয়াবান।"

এ আয়াতের মূল কথা আল্লাহকে ভালোবাসলে নবীকে অনুসরণ করতে হবে। নবীকে অনুসরণ করলে আল্লাহর কৃপা ক্ষমা লাভ সহজতর হবে। রাসূল (সাঃ) এর প্রতি উম্মতের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে দরূদ ও সালাম পাঠাও।"

নবীর প্রতি এই দরূদ পাঠানো এবং মহৎ কর্তব্য এবং অতি সওয়াবের কাজ। আল্লাহ নিজে যে নবীর প্রতি দরূদ পাঠান, পাঠান ফেরেশতাগণ, সে নবীর প্রতি দরূদ পাঠানো যে কতো বড় মুবারক কাজ, কতো বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে এ থেকে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নবীর জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনা এবং নবীর জননীর প্রসব বেদনা কালীন ঘটনাবলীর উল্লেখের মধ্যে কি মাহাত্ম্য এবং তাঁকে স্মরণ করার এ কেমন রীতি তা যেমন প্রমাণিত নয় উপরন্তু এটি একটি কুপ্রভাব বলা যেতে পারে।

অনেকের মতে, এসব অনেকটা হিন্দুদের এক ধরনের পূজা অনুষ্ঠানের মতোই

www.pathagar.com

একটি ব্যাপার। আর ইবাদত পর্যায়ের কোন কাজেই অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাদৃশ্য থাকা মুসলমানদের জন্যে একেবারেই বর্জনীয়। কেননা নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

"যে লোক অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করে চলবে, কিয়ামতের দিন সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। আজকে আমাদের দেশে এ মিলাদ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে অবশ্যই পালনীয় বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় দিনগুলোতে মিলাদই যেন একমাত্র ইবাদতের ভূমিকা পালন করছে। রেডিও-টিভিতেও এ বিদয়াত ও শেরকী কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে অত্যন্ত উৎসাহের মধ্য দিয়ে। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় দিনগুলোতে মৌলভীরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন মিলাদ পড়াতে। কিন্তু নিজেদের বাড়ীতে তারা মিলাদের আয়োজন করেছেন এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। মিলাদ যদি তাদের কাছে সওয়াবের কাজ বলে মনে হতো তবে তারা কেন তা করেন না। এটি ভেবে দেখার মতো বিষয় বটে।"

এছাড়া অনেকেই মিলাদ মাহফিলে শিরনী-মিঠাই বন্টন করাকে একান্তই জরুরী মনে করে। আর মিলাদ-মাহফিলকে ওয়াজিবের পর্যায়ে গণ্য করে। এভাবে কোন না-জায়েজ কাজকে ওয়াজেব বা জরুরী মনে করা হলে ইসলামের দৃষ্টিতে তা মাকরূহ হয়ে যাবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মঞ্চে আলোকসজ্জা করা হয়। ঠিক সেই স্টাইলে আজকাল মিলাদ ও ওয়াজ মাহফিলের প্যান্ডেলে আলোকসজ্জার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। মোমবাতি আর আগরবাতি কেনার ধুম পড়ে যায়। এ থেকে ইসলামী ফাউন্ডেশনও মুক্ত নয়। প্রতি বছর প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জা খাতে কোটি কোটি টাকা বাহুল্য খরচ বাদ দিয়ে তা সেবামূলক কাজে ব্যয় করলে সেটা হতো ইসলাম সম্মত। এরূপ বাহুল্য খরচ প্রসঙ্গে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"আর তোমরা অপচয় করো না, কারণ তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না" (সূরা আনাম)। অথচ আলেম সম্প্রদায় পবিত্র কোরআনের পরিপন্থী কাজ ধর্মের নামে অহরহ করে যাচ্ছে।

সুতরাং সব বিভ্রান্তি থেকে আমাদের রেহাই পেতে হলে আমাদের উচিত যে সব আলেম-ওলামা পবিত্র কোরআন ও রাসূলের (সাঃ) আদর্শের আলোকে যা বলবেন তা অনুসরণ করা। এর বাইরে যে সব আলেম-ওলামা বা পীর সাহেব যত চিত্তাকর্ষক কথাই বলুক না কেন তা বর্জন করা।

দান বা সদকাহ

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– "তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভালো, আর যদি তা গোপনে কর ও অভাবীদের দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল।" হাদীসে রয়েছে– "তোমরা কাউকে ডান হাত দিয়ে দান করলে যেন বাম হাত না জানে।" অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপনে দান করাকে বেশি পছন্দ করেছেন এ জন্যে যে, যাতে চরম বিপদগ্রস্ত মুসলমান দুর্দিনের সময় দান গ্রহণ করে বিপদমুক্ত হতে পারে। কিন্তু বিত্তশালী মুসলমানেরা গোপনে

www.pathagar.com

দানের চেয়ে প্রকাশ্য দানকে অধিক পছন্দ করেন। ফলে চরম বিপদগ্রস্ত মানুষ লোক-লজ্জার কারণে নিজ পরিবারকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েও দান গ্রহণে বিরত থাকেন।

রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হলো দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো মিটিং, মিছিল, সভা-সমাবেশের নামে প্রচুর অর্থ খরচ করেন। শোনা যায়, এসব খাতে রাজনৈতিক দলগুলো প্রকারভেদে পাঁচ হাজার থেকে শুরু করে কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করেন। দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা মানব কল্যাণে তাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত হয় না।

১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস হয়েছিলো। দশ লক্ষাধিক বনি আদম মারা গিয়েছিলো। পশু আর মানুষের লাশ পাশাপাশি ভাসছিলো বা গাদাগাদিভাবে পড়েছিলো। যারা সৌভাগ্যক্রমে কোনোমতে বেঁচেছিলো এরা খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে তীব্র শীতের মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করছিলো। সারি সারি লাশ এবং বেঁচে যাওয়া নগ্ন, ক্ষুধার্ত মানুষের আহাজারি দেখে বিশ্ব বিবেক সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমাদের চাপাবাজ, শঠতায় চ্যাম্পিয়ন ও ধাপ্পাবাজ নেতারা এটাকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কাজে লাগিয়েছে। শোকার্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষগুলো যখন খাদ্য ও কাপড়ের অভাবে আহাজারি করছিলো, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা তখন কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সভা-সমাবেশ ও বহু রঙা কাপড়ের গেইট সাজিয়ে নির্বাচনী প্রচার এবং শুধুমাত্র বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে শোক প্রকাশ করছিলো। '৯৫ সালে উত্তরাঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যায় একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করেছিল। নিজেদের আত্মপ্রচারের জন্য তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশ করেছিল। এসব দান মানব কল্যাণের চেয়ে দলের কৃতিত্ব জাহির এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিলো মুখ্য। আরেকটি বৃহৎ ইসলামী দল রয়েছে। এ দলের নিজস্ব পরিচালনায় বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান হতে দলের নিজস্ব কর্মী ছাড়া কেউ আর্থিক বা মানবিক সেবা পায়না। আর্তপীড়িত মানুষের জন্য এদের কোন ফান্ড নেই। অথচ হরতাল, মিটিং, সভা-সমাবেশ করা এবং মানুষকে মারার জন্যে লাখ লাখ টাকার বাজেট আছে কিন্তু মানুষকে বাঁচানোর জন্য কোন বাজেট নেই। হায়রে মানব কল্যাণের রাজনীতি!

ভিক্ষাবৃত্তি

ইসলামে যাকাত, ফিৎরা বা দান প্রথা দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তিকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অভাবগ্রস্ত না হয়ে কোন কিছু ভিক্ষা করা অবৈধ। আল্লাহ ব্যতীত মানবের নিকট ভিক্ষা চাওয়া ধর্মভীরুতা নষ্ট, লোকদিগকে অনর্থক কষ্ট দেয়া এবং এতে ব্যক্তির আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হয়। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নিম্ন হস্ত হতে ঊর্ধ্ব উত্তম। ঊর্ধ্ব হস্ত ঐ হস্ত যে হস্ত দান করে এবং নিম্ন হস্ত ঐ হস্ত যে হস্ত ভিক্ষা করে।" (বোখারী শরীফ)

www.pathagar.com

ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে হাদীসে আরো বর্ণনা রয়েছে যে, (১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের নিকট থেকে ভিক্ষা চায় সে অগ্নি স্ফুলিঙ্গই ভিক্ষা করে। (২) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ ভিক্ষুক আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। (৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যে মানুষ, মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, সে এমন অবস্থায় শেষ বিচারের দিন উপস্থাপিত হবে যে, তার মুখে মাংস, থাকবে না। (৪) হযরত যাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তথায় তিনি বলেছেন যে, "বেহেস্ত ভিন্ন অন্য কিছু আল্লাহর নিকট ভিক্ষা করা উচিত নয়"। (৫) জনৈক ভিক্ষুককে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, তার একমাত্র সম্বল কম্বলখানি বিক্রি করে অর্ধেক টাকা দিয়ে খাদ্য আর বাকি অর্ধেক টাকা দিয়ে কুঠার কিনে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করতে।

আবার অপরদিকে হাদীস শরীফে দেখা যায় (১) দয়াল নবী বলেছেন যে, "সত্য কথা বলার পরেও যে ব্যক্তি কোন ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দেন, তার মুক্তি নাই। (২) হযরত ওমর (রাঃ)-এর দোয়া ছিল যে, হে আল্লাহ! এমন লোকদেরকে ধন-সম্পদ দান কর, যাদের দ্বারা অভাবীদের দুঃখ মোচন হয়। (৩) যে সব মুসলিম লজ্জায় অভাবকে গোপন রাখে, তাদেরকে উপযাচক হয়ে দান করার জন্য রাসূল (সাঃ) বারংবার তাগিদ দিয়েছেন। (৪) যারা এতিম, মিছকিন ও বন্দীদেরকে সাহায্য করেন তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। (৫) হযরত লোকমান বিন বশির বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, শরীরের একটি অংশ ব্যথা পেলে সর্বাঙ্গে যেমন তা অনুভূত হয়, তেমনিভাবে মুসলিম সমাজেও একে অন্যের দুঃখ-দুর্দশার সমঅংশীদার হবে। সাহায্য করবে এবং পরস্পরকে ভালবাসবে।"

উপরোক্ত হাদীসগুলোর সমাধান হযরত খাবিসা বিন মাখরেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। তাহলো, নবী করীম (সঃ) বলেছেন যে, তিনটি অবস্থা ব্যতীত ভিক্ষা করা হারাম এবং তা হচ্ছে ঃ (১) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশাধ করা পর্যন্ত, (২) আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তি তার পূর্বাবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত ভিক্ষা করতে পারবে এবং (৩) সত্যিকার অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যার অভাব সম্পর্কে সমাজের সৎ ও চরিত্রবান তিন ব্যক্তি সাক্ষী দেন, তখন তার অভাব মোচন না হওয়া পর্যন্ত ভিক্ষা করা বৈধ। অতএব দেখা যায়ে যে, কখন ভিক্ষা করা যাবে এবং কখন ভিক্ষা করা যাবে না। এরপরেও অন্ধ, পঙ্গু ও কাজ-কর্মে সম্পূর্ণ অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যাপারে ভিক্ষা করা বৈধ বলে কোন কোন মনীষী মন্তব্য করেছেন, হাদীস শরীফে এও আছে যে, ভিক্ষার উপযুক্ত লোক ভিক্ষা চাইলে তাকে সামর্থানুযায়ী দান করা, তা সম্ভব না হলে সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় অপারগতার কথা প্রকাশ করা।"

ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে আল-কোরআনে কোন আয়াত নেই? আল কোরআনে যাকাত, ফেৎরা ও সাদকা ইত্যাদি আদায়ের কথা বলা হয়েছে এবং ব্যয়ের খাতও বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে বিত্তবানদের অর্জিত সম্পদে গরীবের হক আছে। কিন্তু বিত্তবানদের

www.pathagar.com

দ্বারস্থ হওয়ার জন্য গরীবদেরকে বলা হয়নি। ধনীদের কাছে দরিদ্রের হাত বাড়ানো আল কোরআনের কোথাও নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তির অনুমোদন নেই। ভিক্ষাবৃত্তি মানুষের মনুষ্যত্ব ও স্বাধীন চিন্তা এবং নৈতিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে না; বরং প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। ভিক্ষাবৃত্তি কিভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানে সর্বক্ষেত্রে এর প্রমাণ দেশে বিরাজ করছে।

ইসলামে যতগুলো ঘৃণিত কাজ আছে তন্মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তিও একটি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। রাসূলের কাছে অভুক্ত, দরিদ্র প্রার্থী আসলে তিনি তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা করতেন। সক্ষম প্রার্থীকে ভিক্ষুকে পরিণত না করে স্বনির্ভর করার পথ দেখিয়েছেন। ভিক্ষুকের সম্বল কম্বল বিক্রির অর্থ দিয়ে কুঠার ক্রয় এবং তা দিয়ে উপার্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলার ঘটনা আমরা সবাই জানি। ভিক্ষাবৃত্তি ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছেন। শ্রমের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হবার শিক্ষা একমাত্র ইসলাম ধর্মই দিয়েছে। একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের ও ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। অথচ আমাদের দেশে ভিক্ষুকেরা ধর্মকে পুঁজি করে আল্লাহ ও রাসূলের নামে সুর করে গান গেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়।

দীনের নবী মোস্তফায়
রাস্তা দিয়ে হাইটা যায়
হরিণ একটি বাঁধা ছিল
গাছেরই তলায় গো

★ ★ ★

শোনো মোমিন মুসলমানও
করি আমি নিবেদনো
এই দুনিয়া ফানা হবে
জেনেও জানো না।

এসব গান শুনে অনেকেই ভাবে ইসলাম ভিক্ষুকের ধর্ম। এ নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীরা নাটক-সাহিত্যে উপহাস-বিদ্রূপ করে। শুধু বিধর্মীয়রা নয় মুসলিম নামধারী কতিপয় লেখক বুদ্ধিজীবীও উপহাস-বিদ্রূপ করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৯৪ সালে হুমায়ূন আহমেদ রচিত ঈদের দিনের বিশেষ নাটক 'হিমু'তে হাসি-তামাশার ছলে ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। 'হিমু' নাটকের সংলাপে বলা হয়েছে– "পৃথিবীর অনেক মানবই ভিক্ষা করতেন।" কোন ধর্ম মানব ভিক্ষা করেছেন তার নাম অবশ্য উল্লেখ করেননি নাট্যকার। কিন্তু পরোক্ষভাবে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে কৌতুক-গানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে। একটি ভিক্ষার দৃশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নাম ব্যবহার করে ভিক্ষুকদের মুখ দিয়ে কৌতুক গানের সুরে বলা হয়ঃ

www.pathagar.com

"দ্বীনের নবী মোস্তফা
রাস্তা দিয়া হাইটা যায়
অপরাধের শাস্তি হবে
অন্য দুনিয়ায়।
দ্বীনের নবী মোস্তফা
কানতে কানতে চইলা যায়,
একটা পাখি বইসাছিল
গাছেরও শাখায়।

বাস্তবে ভিক্ষুকেরা আল্লাহ রাসূলের নাম নিয়ে গানের সুরে ভিক্ষা করে বটে; কিন্তু নাট্যকারের উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কৃত এরূপ বিকৃত গানে কোন ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে কিনা আমার জানা নেই।

কিন্তু মানবতার একমাত্র নেতা মুহাম্মদ (সাঃ)কে হেয় করে কৌতুকগান প্রচার করলেও হুমায়ূন সাহেব কিন্তু বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যথার্থ ঠাকুরের আসনে বসাতে কার্পণ্য করেনি। ঐ নাটকের সংলাপে বলা হয়েছে– "রবীন্দ্রনাথ নব্বই বৎসর বয়সেও পরিশ্রম করতেন।" এ সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের অসৎ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করে নাট্যকার ক্ষমাহীন ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তুলনা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সাথে তুলনা করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে আমি খাটো করতে চাইনে। তবে নাট্যকারের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে এখানে কিছু বক্তব্য উল্লেখ করছি।

বিবি খাদিজার অগাধ ধন সম্পদ ছিল। খাদিজার সাথে বিয়ের পর তিনি সেই সমস্ত সম্পদের প্রকৃত অধিকারী হয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর জীবনে হাদিয়া ও উপহার হিসেবে প্রচুর অর্থ এসেছে। তিনি তা দুঃস্থ-নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে মুক্ত হস্তে দান করেছেন। অথচ পারিবারিক জীবনে তিনি অর্থ কষ্টে ছিলেন। তিন দিনের বেশি অর্থ তিনি গৃহে সঞ্চিত করে রাখেননি। এমনকি নবী (সাঃ) কোন দিন অনাহারে পেটে পাথর বেঁধে বা দু'টি খোরমা অথবা শুকনো রুটি খেয়ে জীবন যাপন করেছেন। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চাইলে প্রচুর সম্পদ ও প্রাচুর্যের মাঝে ডুবে থাকতে পারতেন।

একবার প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দরবারে জিবরাঈল (আঃ) হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহপাক আপনাকে সালাম দিয়ে বলেছেন ঃ আমার হাবীবকে বল– যদি তিনি অর্থ-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তবে ওহোদ পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা হবে এবং তিনি যেখানে যাবেন, স্বর্ণের এ পাহাড়টি তাঁর সাথে যাবে। কিন্তু প্রিয় নবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, আমি অর্থ-সম্পদ চাই না, আমি একদিন খেয়ে আল্লাহপাকের শোকর আদায় করতে চাই, আর একদিন না খেয়ে সবর অবলম্বন করতে চাই। অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে এ ছিল প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দৃষ্টভঙ্গি।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শ্রমের যে মর্যাদা দিয়েছেন ইতিহাসে তা বিরল। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া কোন কাজকেই ঘৃণা করতেন না। তিনি রাখাল সেজে বকরী চড়িয়েছেন, মজুর সেজে মাটি কেটেছেন, খেজুরের বিনিময়ে এক ইহুদীর কূয়ো থেকে পানি তুলেছেন, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেছেন, পানি টেনেছেন, দর্জি সেজে জামা সেলাই করেছেন, মেথর সেজে মলমূত্র পরিষ্কার করেছেন। এই রূপে তিনি সকল শ্রমকেই মর্যাদা দান করেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তো দূরের কথা অন্য কোন ধর্ম নেতার জীবনেও দেখা বা কল্পনাও করা যায় না। অন্যান্য ধর্ম প্রবর্তক বা ধর্মনেতা, বুদ্ধিজীবী, জমিদারগণ ভক্ত অথবা দরিদ্র প্রজাদের অর্থ দিয়ে উদর পূর্তি করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের কায়িক পরিশ্রমে জীবন নির্বাহ করেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অতি নগণ্য লোকও হযরতের জীবন হতে প্রেরণা লাভ করতে পারে; হযরত যে তাদের মতো শ্রমিক ছিলেন এই জ্ঞান তাদেরকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কোন ধর্মনেতা বা জমিদার লেখকের জীবন থেকে তা কি সম্ভব?

হুমায়ূন আহমেদ 'হিমু' নাটকে যে সমস্ত সংলাপ ব্যবহার করেছেন এর অর্থ সর্বশ্রেণীর দর্শকের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এসব সংলাপ শুনে অনেক দর্শক হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ করে হেসে মজা কুড়িয়েছেন। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেনি। এ ছাড়া প্রতিবাদ করেও লাভ নেই। কারণ এসব নাট্যকাররা এ দেশে এতো বেশি হিঃ হিঃ, হাঃ হাঃ মার্কা দর্শক ও সমর্থক তৈরী করেছেন যে, কেউ সাহস করে এর প্রতিবাদ করলে হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ এর উচ্চ হাসির শব্দে প্রতিবাদী কণ্ঠের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়।

আমাদের দেশে আল্লাহপাক যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন তা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিপুল জনশক্তিকে কাজে লাগানো যায় তাহলে এদেশে বেকার বা ভিক্ষুক থাকার কথা নয়। বৃটিশেরা ১৯০ বছর আমাদেরকে শোষণ করে দরিদ্র জাতিতে পরিণত করেছিলো। আর বর্তমানে আমাদের স্বজাতীয় শাসকেরা পাশ্চাত্যের দাতাগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করেছে।

আযান

কথিত আছে পূর্বে নামাজের সময় নির্ধারিত ছিল। সেই নির্ধারিত সময় অনুযায়ী মদীনায় মুসলমানগণ একত্র হতো। সে সময় আযান দেয়ার কোন প্রথা ছিলো না। এ ছাড়া হযরত উমর (রাঃ)-এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানেরা প্রকাশ্যে ধর্মচর্চা করার কোন সুযোগ ছিল না। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরেই মুসলমানেরা প্রকাশ্যে ধর্মচর্চা শুরু করে। হাদীস থেকে জানা যায়, একদিন সাহাবীদের মধ্যে এই বিষয়ে কথা হলো একজন বললো, খ্রীস্টানদের ঘন্টা ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি কর। অন্যজন বললো, ইহুদীদের শিঙ্গায় ফুঁকের ন্যায় ফুঁক দাও। হযরত উমর বললেন ঃ তোমাদের নামাজে ডাকবার জন্য কোন লোককে ঘোষণা করতে বলবে না? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে বেলাল! উঠ এবং নামাজের জন্য আযান দাও (বর্ণনায় হযরত ইবনে উমর, বোখারী, মোসলেম)।

www.pathagar.com

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, ইহুদী এবং খ্রীস্টানদের অনুকরণে অগ্নি ও ঘন্টার প্রস্তাব করা হলে রাসূলুল্লাহ বেলালকে সমান সংখ্যায় আযান এবং বেজোড় সংখ্যায় ইকামত বলতে আদেশ করলেন। (বোখারী শরীফ)

অন্য একটি তথ্যে জানা যায়, হাদীস শরীফ অনুযায়ী হিজরতের এক বছর পর (কোনো কোনো ঐতিহাসিকের অভিমতে হিজরতের দুই বছর পর) সালাত বা নামাজের সময় ঘোষণা করার সর্বোত্তম উপায় বা পন্থা কি হতে পারে সে বিষয়ে সাহাবায়ে কারামের সঙ্গে মদীনাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আলোচনায় বসেন।

সাহাবীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব পেশ করা হয়। কেউ কেউ প্রস্তাব করেন যে, নামাজের সময় সন্নিকটবর্তী হলে অনেক উঁচুতে একটি পতাকা উত্তোলন করা যেতে পারে, যা দেখে মুসলমানগণ একে অন্যকে আহবান জানাবে। রাসূল (সাঃ) এই প্রস্তাব পছন্দ করেননি।

দ্বিতীয় একটি প্রস্তাবে শিঙ্গা ফুঁকবার বা বিউগল বাজাবার কথা বলা হয়– এভাবে তদানীন্তন ইহুদীরা তাঁদের গির্জায় আসার জন্য আহবান জানাতেন। নবী করিম (সাঃ) এই প্রস্তাবও গ্রহণ করেননি।

তৃতীয় প্রস্তাবে 'নাক্যুস' বাজিয়ে অর্থাৎ একটি লম্বা কাঠ দিয়ে আর এটি কাঠে আঘাত করে যে আওয়াজ হয়, সেই শব্দের মাধ্যমে তদানীন্তন খৃষ্টানদের মতো মুসলমানদেরও নামাজে আসার আহবানের কথা বলা হয়। কিন্তু ইসলামের প্রিয় নবী (সাঃ) এই প্রস্তাবও বাতিল করে দেন।

নামাজের আগে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করে আহবান জানানোর প্রস্তাবও রাখা হয়। বলা বাহুল্য, ইসলামের নবী (সাঃ) এই অবাস্তব ও কষ্টসাধ্য পন্থা আদৌ পছন্দ করেননি।

নবী (সাঃ) এর বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য এসব প্রস্তাব উপস্থাপনের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) নামে জনৈক সাহাবী বলেন যে, তিনি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে মসজিদের ছাদে উঠে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে মুসলমানদের নামাজের জন্য আহবান করতে দেখেছেন। তাঁর এই স্বপ্নের কথা শুনে রসুল আল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, 'ইনশাআল্লাহ এটি একটি উত্তম স্বপ্ন'।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এই একই স্বপ্ন দেখেছিলেন বলে হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাছাড়া হযরত ওমরই (রাঃ) এই পন্থা গ্রহণ করার জন্য নবী (সাঃ)কে পরামর্শ দেন বলে অনেকেই অভিমত পোষণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় নবী করিম (সাঃ) এর নির্দেশে এভাবে মদীনা শরীফে আযান প্রবর্তিত হয়।

হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ আবদুল্লাহ বিন যায়েদকে প্রিয় নবী (সাঃ) নির্দেশ দেন, "তুমি এবার বেলালকে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও এবং যে বাক্যগুলো তোমাকে 'উত্তম স্বপ্নে' শেখানো হয়েছে সেগুলো বেলালকে শিখিয়ে দাও। সে উচ্চস্বরে পাঠ করতে থাকুক– তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে উচ্চতর।"

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) এর ঐতিহাসিক উক্ত নির্দেশানুযায়ী হযরত বেলাল (রাঃ)কে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাক্যগুলো শিখিয়ে দেন এবং হযরত বেলাল (রাঃ) এর সুললিত কণ্ঠে সেদিন প্রথম উৎসারিত হয় পৃথিবীর বুকে আযানের পবিত্র ধ্বনি।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময় থেকেই নামাজের পূর্বে আযান দেয়ার প্রচলন হয়ে আসছে। ইহা তওহীদের বিজয় ঘোষণা। আযানের সাহায্যে বিশ্ববাসীকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য ডাকা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, মোহাম্মদ তাঁর রাসূল, নামাজে আস, মুক্তির পথে আস, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই। নিদ্রা হতে নামাজ উত্তম।'

শিশু জন্ম নেয়ার পর সুন্নত আমল হচ্ছে, প্রথমে গোসল দেয়া এবং ডান কানে আযান ও বাম কানে একামত দেয়া। আযানের সময় হাইয়া আলাস্ সালাহ হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার সময় মুখ ডানে-বামে ফিরানোও সুন্নত। হাদীস গ্রন্থ তিবরানী শরীফের এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত হাসানের (রাঃ) জন্মের পর তাঁর ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত বলেছিলেন। সে মতে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নয়, শিশুর কানের কাছে আযান একামত দেয়া সুন্নত। জামে সগীরের এক বর্ণনা অনুযায়ী আযান ও একামতের বরকতে আল্লাহপাক শিশুকে আঁতুর ঘরের সম্ভাব্য রোগ-বালাই থেকে মুক্ত রাখেন। তাছাড়া জন্মের পরই শিশুর কানে আযান-একামতের শব্দগুলো উচ্চারিত হয়ে এগুলো তার অবচেতন মনে সংরক্ষিত থাকে এবং এর দ্বারা আল্লাহর পথে আহবানের প্রতি তার মনের মধ্যে একটা আগ্রহবোধ সুপ্ত থাকে।

প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের জন্য মাথা আবৃত করে রাখা ফরয। যাঁরা এই অবশ্য পালনীয় ফরজটি সম্পর্কে গাফেল থাকেন, আল্লাহর নামে আহবান শোনার সাথে সাথে কিছুক্ষণের জন্য হলেও হয়তো তাঁদের সেই গাফেল অবস্থায় কিছুটা চেতনা আসে। এজন্যে মাথায় কাপড় টেনে দেন যাদের হৃদয়-মন থেকে ঈমানের অনুভূতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আল্লাহর ঘরের আহবান শুনেও তাদের মধ্যে কোন প্রকার সচেতনতা সৃষ্টি হয় না। তাছাড়া আযানের শব্দ শোনার সাথে সাথে শয়তান দিশাহারা অবস্থায় দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করে। এ ধরনের একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, অশরীরি দুষ্ট আত্মা বা শয়তানের চেলারা দিশেহারা অবস্থায় মহিলাদের নগ্ন মাথায় আশ্রয় খুঁজতে শুরু করে। সে অশুভ শক্তি যাতে আশ্রয় খুঁজে না পায় সে কারণে সচেতন মহিলাগণ তাড়াতাড়ি নগ্ন মাথা ঢেকে ফেলেন। সুতরাং নামাজের 'আযান' পড়লে মুসলমান মেয়েদের মাথায় কাপড় দেয়ার ঐতিহ্য রয়েছে। আমাদের দেশে একজন বুদ্ধিজীবী ছিলেন (বর্তমানে মৃত)– তাকে কেউ সালাম দিলে বিরক্তবোধ করতেন। একইভাবে নামাজের 'আযান' পড়লে মেয়েরা মাথায় কাপড় দিলে তিনি বলতেন, 'আল্লাহ কি তোমাদের ভাসুর (নাউযুবিল্লাহ) হন! তোমরা মাথায় কাপড় দিচ্ছ কেন?

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সুন্দর সুর হলো আযান। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ বলে কথিত প্রতিবেশী

www.pathagar.com

দেশ ভারতে শব্দ দূষণের বাহানায় আজানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ পূজায় ঢাক-ঢোল বাজানোতে শব্দ দূষণ হয়না। কি অদ্ভুদ তাদের যুক্তি! আর আমাদের দেশের এক বুদ্ধিজীবীর আযান শুনলে বিরক্তিবোধ হয়। আরেক কবি আযানকে নিয়ে অশ্লীল কবিতা লিখেছেন ঃ

"একটানা অলজ্জিত বৈশ্যাবৃত্তি অলিতে-গলিতে
গলিতে কারা যেন বাস্তবিক কুলকুচি করে
ফেলে দেয় স্বপ্ন, স্মৃতি মেদ সুন্দরের।"

অথচ কবি নজরুল ইসলাম আযানের আহবানকে ব্যাপক অর্থে উপলব্ধি করছেন তাঁর কবিতায়। যেমন–

বাজ্‌ল কি রে ভোরের সানাই
নিঁদ-মহলার আঁধার-পুরে।
শুনছি আজান গগন-তলে
অতীত-রাতের মিনার চূড়ে।।
সরাই-খানার যাত্রীরা কি
"বন্ধু জাগো" উঠল হাঁকি?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখী
গুলিস্তানে চল্‌ল উড়ে।।
আজ কি আবার কাবার পথে
ভিড় জমেছে প্রভাত হতে,
নামল কি ফের হাজার স্রোতে
'হেরা'র জ্যোতি জগৎ জুড়ে।।
আবার খালিদ তারিক মুসা
আন্‌ল কি খুন-রঙিন ভূষা,
আসল্‌ ছুটে হাসীন্‌ উষা
নও-বেলালের শিরীন্‌ সুরে।।
তীর্থ-পথিক দেশ-বিদেশের
আরাফাতে আজ জুটল কি ফের,
"লা শরীক্‌ আল্লাহ্‌" মন্ত্রের
নামল্‌ কি বান পাহাড় তুরে।।
আঁজলা ভ'রে আনল কি প্রাণ
কারবালাতে বীর শহীদান,
আজকে রওশন জমীন-আসমান
নওজোয়ানীর সুর্‌খ নূরে।।

www.pathagar.com

ধর্মীয় উৎসব

মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দু'টি। একটি ঈদুল ফিতর অন্যটি ঈদুল আজহা।

ঈদুল ফিতর ঃ ঈদুল ফিতর হচ্ছে ইফতারের আনন্দোসব আর পবিত্র মাহে রমজানের একটানা সিয়াম সাধনার কঠোর কৃচ্ছ্রতা ও তাকওয়া অর্জনের পর সুনির্ধারিত সমাপনী আনন্দ উৎসব। আরেক অর্থে ঈদুল ফিতর মানে ফিতরা দানের উৎসব। রমজান মাসের পর ঈদের দিনে স্বচ্ছল মুসলমানগণ দরিদ্র মুসলমানগণকে যে দান করতে বাধ্য তাকে ফিৎরা বলে। শরীয়ত নির্ধারিত মালের অধিকারী প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমানের উপর এই দান ওয়াজেব বা অবশ্য দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমজানের শেষে বলেছেন, "তোমরা রোজার সদকা বাহির কর।" তিনি প্রত্যেক স্বাধীন বা অধীন, পুরুষ বা স্ত্রীলোক ছোট বড় প্রত্যেকের উপর খেজুর বা গমের এক সায়া (প্রায় চার সের) এবং ময়দার অর্ধ সায়া (প্রায় দু'সের) বাধ্যতামূলক করেছেন। বস্তুতঃ ফিতরাদাতার দানের মধ্যেও এক অনাবিল আনন্দ রয়েছে। এ ছাড়া ফিতরা সিয়াম সাধনার যাবতীয় ভুল-ক্রটি বিদীর্ণ বা বিনাশ করে সিয়ামকে পূত পবিত্র করে তোলে। পাশাপাশি নিঃস্ব গরীবদেরকে অর্থাভাব ও নিরানন্দ দূর করে অর্থ ও আনন্দের স্তরে পৌঁছে দেয়। সুতরাং ঈদ উৎসব শুধু আনন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ঈদের উৎসব ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই কবি নজরুল বলেছেন–

"ঈদুল ফিতর আনিয়াছে
তাই নব বিধান
ওগো সঞ্চয়ী উদ্বৃত্ত
যা করিবে দান
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার।
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে
পড়ে তব হাতে
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে
ও পেয়ালেতে
দিয়া ভোগ কর বীর দেদার।।

এটাই হলো ঈদুল ফিতরের মূল কথা। ঈদুল ফিতর ভোগের হলেও প্রকারান্তরে এটিও ত্যাগের উৎসব। বস্তুতঃ ত্যাগের মাধ্যমেই ভোগের আশা করা যায়।

এ পবিত্র উৎসবের দিনে মুসলমানেরা প্রত্যুষ্যে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে। সাধ্য অনুযায়ী নতুন জামা-কাপড় পরে, শরীরে সুগন্ধি আতর মাখিয়ে ঈদগাহে যায়। সেখানে জামাতের সাথে দু'রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করে। নামাজ শেষে খুতবা পাঠ করা হয়। খুতবা পাঠ ও দোয়া করার সাথে সাথেই একজনের সাথে আরেকজন কোলাকুলি

www.pathagar.com

করে। অনেকের ধারণা ঈদের নামাজ বা খুতবা শোনার মতোই একটি জরুরি এবাদত। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, কোলাকুলিকে ঈদের নামাজ বা খুতবা শোনার মতোই কোলাকুলি একটি জরুরী এবাদত মনে করা নিঃসন্দেহে বেদাত। কেননা, যা এবাদতের অংশ নয়, সেটাকে এবাদতের জরুরী অংশ মনে করা বেদাত। প্রথম সাক্ষাতে একজন আর একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে পরস্পরের মনের সকল কালিমা মুছে ফেলার চেষ্টা করা একটি উত্তম কাজ। কেউ যদি নামাজান্তে এই নিয়তে পরস্পর পরস্পরের সাথে বুক মিলায় তাহলে এটা নেক কাজ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

এখানে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় বৃহত্তর উৎসব ঈদ উদ্‌যাপনের সেকাল-একাল সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত লেখক ও অভিনেতা জনাব আরিফুল হকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ১৭৫৭-এর পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার মুসলমানরা শুধু রাজ্যহারা হয়ে ভিখারির জাতে পরিণত হয়নি– সাংস্কৃতিক দিক থেকে এমনকি আনন্দ উৎসবের দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। ইংরেজদের জুলুমবাজির বিরুদ্ধে দু'শ' বছর ধরে তাদের যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল তার ফলে তারা পিউরিটান সাজতে বাধ্য হয়েছিল। নেতৃবৃন্দ বলেছিলেন, আনন্দ-উল্লাস বর্জন কর, সংগীত, থিয়েটার, কৌতুক, খেলাধুলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ বা হারাম জ্ঞানে পরিত্যাগ কর। ঈদের দিনের উৎসব শুধু এবাদত বা মোনাজাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সংক্ষিপ্ত কর। সময়ের পরিবর্তন হলো কিন্তু বাংলার মুসলমানদের সেই পিউরিটানিস্ট মনোভাবের আর পরিবর্তন হলো না। যে মুসলমানরা তওহীদের অমিয় বাণীর সাথে বয়ে এনেছিলো সুমধুর সুররাজি, নানান বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ঝংকার, উন্নত ফ্যাশনের পোশাক-পরিচ্ছদ, নানান মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, কুস্তি, বল খেলা, বাঘের সাথে যুদ্ধ, সাঁতার, লাঠিখেলা, অসি চালনা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি সাহসিকতাপূর্ণ খেলাধুলা তাদের জীবন থেকে সব আনন্দ উৎসব মুছে গিয়ে পড়ে থাকলো শুধু কৃচ্ছ্র সাধনের কথা, ইবাদতের আর পরকালের সুখের কথা। তারা ভুলে গেলো, মানুষ আনন্দ করতে পারলে, হাসতে পারলে, মন ছুটি পায়, নতুন চিন্তা করতে পারে। তারা ভুলে গেলো যে জাতির আনন্দ নেই, সে জাতি সুস্থ-সবল হয়ে গড়ে উঠতে পারে না।

ইসলাম অত্যন্ত বাস্তববাদী জীবন বিধান। ইসলাম মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের ভাবধারার প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই জীবন বিধান তৈরী করেছে। আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে যেমন তার পানাহারের চাহিদা দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন আনন্দ-ফূর্তি, উৎফুল্ল চিন্তা-হাসি-তামাশা, খেলাধুলা করার প্রকৃতিগত ভাবধারা। ইসলাম মনুষ্য ভাবধারার এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেনি। ইসলাম মানুষকে ফেরেশতা মনে করে কর্ম বিধান দেয়নি, মানুষকে পৃথিবীর হাটে, মাঠে, ঘাটে বিচরণকারী মানুষ হিসেবেই দেখতে চেয়েছে। আমাদের প্রিয় নবীজী (সাঃ) ফুল ভালোবাসতেন, সুঘ্রাণ পছন্দ করতেন, হাসতেন, হাসাতেন, ঠাট্টা-মশকরা-রসিকতা করতেন, আনন্দ-ফূর্তি, হাসি-খুশি থাকা পছন্দ করতেন, কষ্ট-দুঃখ অপছন্দ করতেন। সকল খারাবী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। বলতেন– হে আল্লাহ! আমি

www.pathagar.com

তোমার কাছে পানাহ চাই দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখানুভূতি থেকে।

দেখা যাচ্ছে, ইসলাম আনন্দ-ফূর্তির পরিপন্থী কোনো ধর্ম নয়। আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়নি। ইসলাম যৌবন ধর্মে বিশ্বাসী। তাহলে আমাদের ঈদের উৎসব শুধু দান-খয়রাত, দু'রাকাত নামাজ-খুতবা, কিছু যাকাতের কাপড় বিলানো, নতুন কাপড় পরে শুধু পুরুষদের বিভিন্ন মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে যাওয়া, ঘরে ফিরে সেমাই ফিরনি পোলাও গোশত খেয়ে আইঢাই করে ঘুমিয়ে পড়া অথবা টেলিভিশন নামক যন্ত্রের সামনে বসে ইসলামী ভাবধারার পরিপন্থী কিছু অনুষ্ঠান উপভোগ করাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো কেনো? এর নামই কি ঈদ উৎসব? এটাই কি আমাদের ঈদ সংস্কৃতি? ঈদ উৎসবে পেটের ক্ষুধা মিটলেও মনের ক্ষুধা মিটানোর মতো কোনো ব্যবস্থাই নেই কেনো? ঈদ উৎসবে দেহে আনন্দের শিহরণ সৃষ্টিকারী, মনের স্পন্দন সৃষ্টিকারী, হৃদয়ে গভীর রেখাপাতকারী কোনো অনুষ্ঠানাদি নেই কেনো? মুসলমানদের ঈদ উৎসবে দেহে আনন্দের এমন গতানুগতিক প্রাণহীন উৎসব কেনো?

ঈদ কি চিরকালই এমন প্রাণহীন উৎসব ছিলো? চলুন না অতীতের ঈদ উৎসবের দিকে এক নজর দেখা যাক। বাহারী স্তান-ই গায়বীর লেখক মির্জা সে যুগের ঈদ উৎসব সম্বন্ধে লিখেছেন– "খুব আমোদ-ফূর্তির সঙ্গে ঈদের নতুন চাঁদকে স্বাগত জানানো হয়। দিনের শেষে সন্ধ্যা সমাগমে নতুন চাঁদ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় নাকারা বেজে ওঠে এবং গোলন্দাজ সেনাদলের সকল আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ক্রমাগত তোপ দাগানো হয়। রাত্রির শেষভাগে কামানের অগ্নুদ্গীরণ শেষ হয় এরপর শোনা যায় ভারি কামানের আওয়াজ। এটা ছিলো দস্তুর মতো ভূমিকম্প।" বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের লেখক ডঃ এম এ রহিম লিখেছেন, "ঈদের দিনে সমস্ত মুসলমান আনন্দ-ফূর্তিতে মশগুল থাকতো। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, নির্বিশেষে প্রত্যেকে নতুন এবং উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করতো। মুসলমাগণ প্রভাতে ঈদগাহ ময়দান বা ঈদের নামাজের স্থানে শোভাযাত্রা করে গমন করতো।" 'নওবাহারী মুর্শিদকুলী খান' গ্রন্থের লেখক আজাদ হোসেন বিলগ্রামীর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, "নবাব সুজাউদ্দীনের অধীনে ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা ঈদগাহ ময়দানের দিকে শোভাযাত্রা করে যাওয়ার সময় দুর্গ থেকে এক ক্রোশ পথে প্রচুর পরিমাণে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে যেতেন।" মির্জা নাথান লিখেছেন, "দু'তিনদিন উৎসবাদি চলতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থাও থাকে।

এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অতীতের ঈদ উৎসব আজকের মতো নিষ্প্রাণ ছিলো না। সেদিন উৎসবের আয়োজন করতো মুষ্টিমেয় ধনী লোকে কিন্তু সেই আনন্দ উপভোগ করতো ধনী-গরীব, অন্য ধর্মের লোক নির্বিশেষে সকলেই। এভাবেই সেদিনের ঈদ উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়ে যেত। মুসলমানরা জীবন্ত ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির অধিকারী। কোনো পৌরাণিক কল্পকাহিনী তাদের ঐতিহ্য নয়।

মুসলমানদের খাওয়ার কথাই ধরা যাক। এই উপমহাদেশে মুসলমানরাই উৎকৃষ্ট আহার্য প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়েছে। আজকের কাচ্চি বিরিয়ানী, মোরগ পোলাও, তেহারী

www.pathagar.com

পোলাও, কাশ্মিরী পোলাও, ভুনা খিচুড়ি, হালিম, চৌকো পরটা, মোগলাই পরটা, খাস্তা পরটা, কিমার পাসতা, নেহারি, শাহী রেজালা, গোশতের কোপ্তা, গরুর ভুনা চাপ, কলিজা কারিমুধী কাবাব, মগজ কাবাব, বোটি কাবাব, কোফতা কোরমা, তন্দুরী মোরগ, মোরগ মেসোল্লাম, চিকেন কাটলেট, দুধের নামাস, বাখরখানি, পনির তেককা, গ্লাসি, নুনিয়া, বোরহানি, বউখুদী, দুধ চিতই, ফিরনী, ভাঁপা পিঠা, চৈপিঠা, নানান রকম চাটনী, সালাদসহ আরও বহু সুস্বাদু খাবার যার নাম শুনলেই জিভে পানি আসে, মুসলমানদেরই অবদান। এইসব উৎকৃষ্ট রন্ধন প্রণালী আমাদের সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ঈদ উপলক্ষে এই ধরনের খাদ্য মেলার প্রচলন করা যেতে পারে।

মুসলমানরা আসার আগে এই উপমহাদেশের মানুষ সেলাই করা কাপড় পরতে জানতো না। মুসলমানরাই এদেশে উৎকৃষ্ট পোশাক প্রস্তুত প্রণালী আমদানী করেছিল। কাজিম, কুর্তা, চোগা, চাপকান, আচকান, শেরওয়ানী পাজামা, চুস্ত পাজামা, সালোয়ার, পিয়ান, টুপি, পাগড়ী, ব্লাউজ, চোলি, খিলকা, পেশওয়াজ, আলখাল্লা, বোরখা, দোপাটা, খাগরা, ঝুলা, চোলিকা, লুঙ্গি, তফন শার্ট, বেনিয়ান ফতুয়া, মেরজাই, দস্তানা কতো রকমের বাহারী পোশাক। ঈদ সংস্কৃতিতে মুসলমানী পোশাকের ফ্যাশন শো করা যেতে পারে।

মুসলমানরাই এদেশে উৎকৃষ্ট সংগীতের প্রচলন করেছিল। খেয়াল, ঠুংরী, তারানা, দাদরা, সাদ্রো, টপ্পা, কাওয়ালী, হামদ, নাত, গজল, তবলা, ঢোল, ভেরি, নাকাড়া, সুরবাহার, সেতার, সারেঙ্গী এস্রাজ, শানাই প্রভৃতি গান এবং বাদ্যযন্ত্র মুসলমানদেরই সৃষ্টি। ঈদ সংস্কৃতিতে এ ধরনের মুসলমানদের সৃষ্ট সংগীত ধারা, রাগ-রাগিনী এবং যন্ত্র সংগীতের আসর বাড়ীতে, পাড়ায়, মহল্লায় আয়োজন করলে আজও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠতে পারে।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে বাঙালী মুসলমানদের ঈদ উৎসব পালনের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক, সাংবাদিক ও ইতিহাস গবেষক জনাব ফারুক মাহমুদ। তিনি তৎকালীন ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর উদ্ধৃতি দিয়ে (যা তৎকালীন কাগজপত্রে নথিভুক্ত আছে) আমাকে বলেছেন- মুঘল আমলে ঢাকা জেলার বারদী থানা ছিল ইসলামী শিক্ষার আন্তর্জাতিক প্রাণকেন্দ্র। বিদেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী এখানে এসে অধ্যয়ন করতো। সেই বারদী অঞ্চলে ১৮৮১ সালে ইংরেজরা শিক্ষা ব্যবস্থার কোন অস্তিত্বই রাখেননি। ফারুক মাহমুদ বলেন, ১৮৮১ সালে বারদী থানার কয়েক গ্রামের মুসলমানেরা ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য ঈদগাহে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু ঈদের নামাজ পড়াবার জন্য কোন ইমাম খুঁজে পাননি। অবশেষে গ্রামবাসীরা ঈদের নামাজ না পড়েই ঈদগাহ থেকে ফিরে আসে। এ থেকেও অনুমান করা যায় বৃটিশেরা সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে ঈদ উৎসব হতেও বঞ্চিত করেছিল। অথচ হিন্দু ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজাকে সার্বজনীন উৎসব হিসেবে মুসলমানদেরকে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। পূজার সময় সাধারণ মুসলমানেরাও ধুতি পরে হিন্দুদের সাথে ঢোলের বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করে আনন্দ উৎসব পালন করতো।

আরেকজন ইতিহাস অধ্যাপক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় গত শতকের প্রথম দিকের

www.pathagar.com

বাঙালী মুসলমানদের ঈদ উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

ঈদের দিন, বিশেষ করে গ্রামে, জামাত যেখানে হতো তার চারদিকের সীমানা সাজানো হতো রঙিন কাগজের নিশান দিয়ে। মফস্বলে বা গ্রামাঞ্চলে এ রেওয়াজ এখনো বর্তমান। ঈদের প্রধান আনন্দ খাওয়া– একটু বিশেষ ধরনের। চাকরিজীবী পরিবারে মফস্বল বা গ্রামাঞ্চলে খাবারের মধ্যে থাকতো কোরমা-পোলাও, ঘরে প্রস্তুত নানা রকমের পিঠা, সেমাই ও শিউলি বোঁটার রঙে মাখানো জরদা। এখানে লক্ষণীয়, মুঘল খাবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশীয় (লোকায়ত) উপাদান। অবিবাহিত মেয়েরা পিঠার ওপর প্রজাপতি আঁকতেন। এই প্রজাপতি, বহুকাল ধরে বাঙালীদের কাছে বিয়ের প্রতীক, একেবারে লোকজ উপাদান। তবে শহরে এই দেশীয় উপাদানের ছিল অভাব। বলে রাখা ভালো, গ্রামাঞ্চলে একেবারে সাধারণ মানুষ কোরমা পোলাওর কথা তখনো চিন্তা করেনি, এখনো করে না। তাদের ঈদের খাওয়ার তালিকায় প্রধান ছিল ঘরে তৈরি মিষ্টান্ন। আসলে ঈদের পুরো ব্যাপারটার একদিকে ছিল খাওয়া-দাওয়া, অন্যদিকে নতুন কাপড়-চোপড়। ঈদের দিন পরার জন্য মা-চাচীরাই প্রধানত ঘরে বসে বাচ্চাদের নতুন কাপড় সেলাই করে দিতেন। ঈদের দিন সম্পন্ন ঘরের লোকজন পরতেন আচকান, পাজামা ও জড়োয়া টুপি– যার শুরু এ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। এ ধরনের পোশাক প্রচলিত হয়েছিল সেসব পরিবারে যেসব পরিবারের কর্তারা চাকরি উপলক্ষে বসবাস করতেন মফস্বল বা শহরে। গ্রামাঞ্চলে প্রথমে ধুতি, পরে লুঙ্গির ছিল ব্যাপক প্রচলন। ঈদের দিন জামাতে যাবার আগে বা জামাত থেকে ফিরে গুরুজনদের কদমবুসি করাটাও ছিল রীতি। এছাড়া শহরে ও গ্রামে ঈদ উপলক্ষে হতো মেলা। গ্রামে কোথাও কোথাও ঢোকঢাল বাজিয়ে গান। ঢাকায় হতো খটক নাচ, রেস। বর্ষায় নৌকা বাইচ, জ্যৈষ্ঠে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব। উপরে যেসব বিবরণ দিলাম তা এখনো কম-বেশি প্রযোজ্য।" (যায় যায় দিন, ঈদ সংখ্যা '৯৪)।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বর্তমানে ঈদ পরিণত হয়েছে কিছু লোকের জন্য আনন্দ উৎসবের দিন হিসেবে। অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি রোজা না রেখেই শুধু মাত্র ঈদ উদ্‌যাপনের জন্য বাজার করতে বিদেশে চলে যায়। অমুসলিম অনেক দেশে উৎসবাদিতে দ্রব্যাদির দাম বিশেষ করে পোশাক পরিচ্ছদের দাম কমিয়ে দেয়। কারণ সে সময়ে বিক্রি বেশি থাকে। লাভও বেশি হয়। ধনী গরীব সবাই যেন পোশাক-পরিচ্ছদ কিনতে পারে এ দিকে লক্ষ্য রেখে পোশাক-পরিচ্ছদের দাম কম রাখা হয়। এ ছাড়া শিশুদের পোশাক পরিচ্ছদের দামও সে দেশে কম থাকে। কারণ সে দেশের ব্যবসায়ীরা মনে করেন শিশুদের কোন উপার্জন নেই। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টো দিকটা বিদ্যমান। উৎসবাদিতে দ্রব্যাদির দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। শিশুদের পোশাকের কথা তো বলাই বাহুল্য। এর বৃদ্ধিটা অন্ততঃ চারগুণ। কারণ ব্যবসায়ীরা মনে করে শিশুদের পোশাক কিনতেই হবে। মধ্যবিত্তের বড়রা নতুন পোশাক না নিলেও ছোটদের জন্য পোশাক কেনাটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ জন্যে ছোটদের কাপড় বেশি বিক্রি হয়। অতি মুনাফার লোভে এদেশীয় ব্যবসায়ীরা এর দামও চারগুণ বৃদ্ধি করে।

গরীব ধনী নির্বিশেষে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার বিধি-বিধান ইসলামে রয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু সীমিত আয়ের লোকদের জন্য ঈদ উৎসব হয়ে পড়েছে বিষাদের। এদের সাধ থাকলেও সাধ্যের অভাবে ছেলে-মেয়েদেরকে নতুন জামা-কাপড় দিতে পারে না। তাই যাদের অসৎ উপার্জনের সুযোগ আছে তারা সে সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে। আর এ ভাবেই পবিত্র রমজান মাস চরিত্র, আত্মশুদ্ধি কৃচ্ছ্রতা ও তাকওয়া অর্জন না করে মানুষকে ঠেলে দেয় দুর্নীতিতে। আর যাদের অসৎ উপার্জনের সুযোগ নেই তারা ঈদের আনন্দ হতে বঞ্চিত থাকে। এ ছাড়া আজকে পবিত্র ঈদ খুশীর না হয়ে অনেকটা চক্রান্তের ঈদ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

ঈদ একটি ধর্মীয় উৎসব। পবিত্র রমজানের ৩০ দিন সংযম সাধনার পর ঈদ আসে অনাবিল আনন্দ নিয়ে। তাই ঈদের আনন্দের জন্য অপেক্ষা করে বিশ্বের মুসলমানরা আগ্রহচিত্তে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎসবের মধ্যে ঈদ ও বড়দিন অন্যতম। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারের বাইরে দুর্গাপূজার আনন্দোৎসব নেই বললেই চলে।

ইসলামের সহনশীলতা আর সার্বজনীন চরিত্রের কারণেই ঈদের দিন ঈদের আনন্দে মেতে উঠে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, বৃদ্ধ-শিশু সকলেই। যে ভিক্ষুক একবেলা পেট ভরে খেতে পারে না সেও চায় ঈদের দিন ভালো খেতে। সেও চায় ঈদের আনন্দে শামিল হতে। যদিও ঈদের উৎসব পবিত্র ইসলাম ধর্ম হতে উৎসারিত তবুও এ দিনে ধর্ম নিরপেক্ষ কম্যুনিস্ট, নাস্তিক, মোনাফেক, রামপন্থী-বামপন্থী কেউই ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চান না।

দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পবিত্র ঈদের আনন্দেও রাম আর বামপন্থীরা তাদের কালচারকে প্রবিষ্ট করার জন্য কতোইনা কোশেশ করেন। কয়েক বছর আগে একটি বহুল প্রচারিত রম্য পত্রিকায় এই গ্রুপের কয়েকজন বুদ্ধিজীবী সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। বিষয় ছিল– ঈদের দিন কি করেন? একজন বললেন, "সারা বছর নামাজ না পড়ে, একদিন নামাজ পড়াকে আমি মোনাফেকী মনে করি। তাই এইদিন নামাজে যাই না।" আরেকজন বিখ্যাত লেখক বললেন, "গরীব-দুঃখীদের কথা চিন্তা করে করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি এবং ঘুমিয়েই দিনটা কাটিয়ে দেই।" আরেকজন বললেন, "মৌলবাদী মুক্ত দেশেই আমি ঈদ করবো", 'ঈদে কোনো নান্দনিকতা নেই" ইত্যাদি ইত্যাদি। যাক এগুলো তাদের ব্যক্তিগত অভিমত।

কিন্তু ঈদের কালচারকে নিজেদের কব্জায় রাখতে বা ঈদের প্রকৃত আবেদনকে পানসে করার জন্য তাদের কিন্তু চেষ্টার অন্ত নেই। রমজানের শুরুতেই তারা "ঈদের ফ্যাশন" নামে বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা বের করে। এসব সংখ্যায় সার্বিক ব্যবস্থাপনা, মডেল, ডিজাইন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রায় সবাই ধর্ম বিরোধী গোষ্ঠীর। এদেশের পাঠকরা তাই কেনে, এসব পত্রিকায় এমনও ডিজাইন দেয়া হয়েছে যা আমাদের জাতিসত্ত্বা ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। সম্ভবতঃ বছর তিনেক আগে এই মহল পরিকল্পিতভাবে ধুতিকে ঈদ ফ্যাশন হিসেবে চালু করে। ঐ বছর রাস্তাঘাটে যুবক-শিশুরা ধুতি পরে নেমেছিল ঈদ করতে। যদিও এই ফ্যাশন বেশিদিন টেকেনি।

www.pathagar.com

ঈদ কালচারকে ধর্মনিরপেক্ষ করার আরেকটি উদ্যোগ হচ্ছে ঈদ সংখ্যা। সাধারণত কিছু বাছাইকৃত সাহিত্য এ সংখ্যায় ছাপা হয়। কিন্তু দেশের অধিকাংশ পত্রিকায় এ সংখ্যা পড়লে মনে হবে ঈদ বোধ হয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হয়েছে। ঈদ উৎসব একটি ধর্মীয় উৎসব হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ধর্মের লেশমাত্র নেই। যা আছে তা কিভাবে ধর্মকে কটাক্ষ করে নিচে নামানো যায় তারই প্রচেষ্টা। দুর্গাপূজার সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করে। এসব পত্রিকা লক্ষ্য করে দেখা যায়, এদের শতকরা ৯৯ ভাগ পত্রিকার প্রচ্ছদে থাকে দুর্গার ছবি। প্রচ্ছদ উল্টালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে থাকে চাররঙ্গা দুর্গার ছবি। ফ্রিজের বিজ্ঞানে দুর্গা ফ্রিজ খুলছেন, চকলেটের বিজ্ঞাপনে দুর্গা চকলেট খাচ্ছেন। বইয়ের বিজ্ঞাপনে দুর্গা বই পড়ছেন, শাড়ীর বিজ্ঞাপনে দুর্গা শাড়ী কিনছেন, টিভির বিজ্ঞাপনে দুর্গার মুখ টিভিতে দেখা যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ দুর্গাকে যে কোনভাবে আনতেই হবে। শোনা যায়, আমাদের সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা কলকাতাকে অনুসরণ করেন। কলকাতা নাকি বাঙালী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র(?) যদি তাই হয়ে থাকে তবে ঈদ সংখ্যার বেলায় বাম-রামপন্থীরা কলকাতাকে অনুসরণ করেন না কেন? কলকাতার প্রতিটি পূজা সংখ্যায়ই দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কিছু না কিছু লেখাতো থাকবেই। কিন্তু কই আমাদের দাদারা ঈদের মাহাত্ম্যের উপর কোন লেখাই দেন না। আর ঈদ সংখ্যায় কোন মসজিদ, ইসলামী শিল্পকলা বা ইসলামী কালচারের ছবি ছাপিয়ে 'আনকালচার্ড' হতেও ওনারা রাজী নন। এরকম কোন প্রস্তাব ওনারা হেসেই উড়িয়ে দিবেন। তবে হ্যাঁ, টুপিঅলা কিছু লোকের ছবি ছাপা হবে কার্টুন বিভাগে। এদের মধ্যে থাকবে ঘুষখোর বিরাট ভূঁড়িওয়ালা কোন ভদ্রলোক, লুঙ্গীপরা টুপিঅলা কোন মজুতদার অথবা দেশদ্রোহী কোন রাজনৈতিক চরিত্রে। আর ঈদ সংখ্যার কোন বিজ্ঞাপনে মুসলিম কালচারের কোন ছবি ছাপিয়ে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেদের গায়ে 'মুসলমানিত্বের' ছোঁয়া লাগাতে চান না। যদিও এসব পণ্যের ক্রেতারা প্রায় সবাই মুসলমান।

রাম আর বাম বাবুদের আরেকটি আলোচিত সেক্টর হচ্ছে টেলিভিশন। নামে না হলেও কাজে একটা স্বায়ত্বশাসিত(?) প্রতিষ্ঠান। জবাবদিহিতা বলতে কিছুই নেই সরকারী প্রতিষ্ঠানে। সেই যে দেশের স্বাধীনতার পর থেকে কুমিরের ছানার মতো বরকত উল্লাহ, মোস্তাফিজ, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, ফেরদৌসী মজুমদার, সূচনা, আসাদুজ্জামান নূর, মমতাজউদ্দিন, কেরামত মতলবরা তাদের পবিত্র বন্দন(?) দেখিয়ে যাচ্ছেন, আজও সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। মধ্যে রামপুরার খাল দিয়ে কতো পানি গড়িয়ে গেছে। এই খালের উপর বাঁশের সাঁকো থেকে আরম্ভ করে আজ ৮০ ফুট চওড়া মোটা ব্রীজ হয়েছে। কতো মুজিব-জিয়া-এরশাদ-খালেদা এলেন গেলেন। দেশে ১৬টি জেলা ৬৪টি জেলায় পরিণত হলো। সংবিধানে ১৩টি সংশোধনী পাস হলো। কিন্তু টিভির চেনামুখদের মাথার একটি চুলও পাকলো না। পোশাক বদলে গেছে অনেক কিন্তু তাদের ক্ষমতাও বদলায়নি, আদর্শও বদলায়নি।

ঈদের আগের দিন রাতে শুরু হয়- 'ও মন, রমজানেরই রোজার শেষে' গান দিয়ে। বছরের পর বছর এই গান শুনছি। মনে হয় নজরুল ঈদ নিয়ে আর কিছু লিখেননি। ঈদ

www.pathagar.com

নিয়েই নজরুলের আরও কমপক্ষে ৫টি কালজয়ী গান রয়েছে। কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসী রহমান বেশ কয়েক বছর আগে দেখেছি শিশুদের এক অনুষ্ঠানে ঈদের এসব গান শিখাচ্ছেন। তিনি যদি টিভির প্রযোজকদের একটু শিখাতেন জাতি বিরাট উপহার পেতো।

তারপর ঈদের দিনে শুরু হয় বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। আমাদের নাট্যকারগণ ঈদের নাটক লেখার প্লট খুঁজে পান না বলে ঈদের বিশেষ নাটকে দেখা যাবে কিশোর-কিশোরীর প্রেম উপাখ্যান, ধর্মব্যবসায়ী, কালোবাজারী, আদম ব্যাপারীরা টুপি পরে বসে আছেন। ধর্মের কোন জয়গান আজ পর্যন্ত কোন ঈদের কোন নাটকে দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ হযরত ইব্রাহীমের স্বপ্ন, রাসূলে খোদার নবুয়ত, হিজরত, মেয়ারাজ, মক্কা বিজয়, বদরের যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনাকে রূপক আকারে ব্যবহার করে অনেক উন্নত শিল্প সমৃদ্ধ ঈদের উপযোগী নাটক রচনা করা যায়। হযরত ওমরের ন্যায়পরায়ণতা, হযরত আলীর বিচক্ষণ বিচার বুদ্ধি হাসান-হোসায়েনের ত্যাগ, মা ফাতেমার সাহিত্যানুরাগ, কারবালার আত্মোৎসর্গকে উপজীব্য করেও অনেক উন্নতমানের নাট্য রচনা ঈদের অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। এরপর শুরু হয় ঈদের আনন্দ মেলা। এর ব্যবস্থাপনায় বেশির ভাগই বামপন্থীরা। তারা আনন্দ মেলায় বসান জুয়া আর হাউজির আসর।

আমাদের দেশের ইসলামপন্থীরা ঈদের দিনে মুখ গোমরা করে ঈদের তাৎপর্য আর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতেই পছন্দ করেন। অথচ বিশ্বে সবকটি দেশে তাদের সবচেয়ে বড় উৎসবে নির্মল আনন্দে সকলেই মেতে উঠে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ); যিনি এই উৎসবের প্রবক্তা, তার আমলেও মদীনায় ঈদ উপলক্ষে ক্রীড়া অনুষ্ঠান হতো বলে হাদীসে পাওয়া যায়। ইদানীং আমাদের দেশে পুরাতন ঢাকার একটি সংগঠন ঢাকা ভিত্তিক একটি ঈদ মিছিলের আয়োজন করছে। এতে পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটছে। তেমনি গ্রামে-গঞ্জেও মেলা, নাটক, বয়াতীদের গানের আসরের মাধ্যমে ঈদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা চলছে। এসব হচ্ছে স্বতস্ফূর্তভাবে। কেননা এদেশে আরও বহু বড় বড় দিবস আছে– বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস ও বাংলা নববর্ষ। কিন্তু কোন দিবসকে নিয়েই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এতদিন ধরে মেতে উঠে না। রমজানের আগে থেকেই মার্কেটে ভীড় লেগে যায়। কিশোরী, যুবতীরা ঈদের পোশাক বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রত্যেকেই কর্মমুখর হন ঈদ উৎসবকে সফল করে নেবার জন্য। এছাড়া দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছে ঈদ ছাড়া অন্য কোন উৎসবই গুরুত্ব পায় না। তাই অনুরোধ করবো– এদেশের ইসলামপন্থীরা যেন দেশের জনগণের মন-মানসিকতা, কালচার বুঝে ঈদ উপলক্ষে যুগোপযোগী সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

কয়েক বছর আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত ছোটদের পত্রিকা 'আনন্দ মেলা'র শারদীয় সংখ্যার প্রচ্ছদে ছিল শিশুরা কম্পিউটার নিয়ে খেলছে। কম্পিউটারের স্ক্রীনে খেলাচ্ছলে শিশুরা একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। ছবিটি হচ্ছে দুর্গার

www.pathagar.com

ছবি। এ থেকে আমাদের দেশের রামপন্থী আর ইসলামপন্থী– উভয়েরই বোঝার অনেক কিছু আছে।

'৯৬-এর ঈদুল ফিতর উপলক্ষে 'শুভেচ্ছা' নামক একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এ অনুষ্ঠানের উপস্থাপক তথাকথিত প্রগতিবাদী সমর্থক তুষার নামক এক যুবক। এ যুবকের ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলো একেবারেই অসহ্য। (এর প্রমাণ টিভিতে প্রচারিত বহু অনুষ্ঠানে রেখেছেন) ঈদের শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকেরা কে কিভাবে ঈদ উৎসব পালন করলো এর বিবরণ দেখায়। এক দর্শক যখন বললেন, সকালে নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন। নামাজ শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে টিভির ক্যামেরা সরিয়ে নেয়। মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদ। ঈদের সাথে সম্পর্কহীন এবং ইসলাম ধর্ম বিরোধী লটারী, ফ্যাশন শো, ব্রেক ড্যান্স ইত্যাদি করা যাবে, বলা যাবে। কিন্তু করা যাবে না ইসলামের সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট ঈদের গভীরতম সামাজিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য বিষয়ে কোন অনুষ্ঠান। বলা যাবে না আল্লাহ, রসূল, ফেরেশতা, নামাজ, রোজা প্রভৃতি শব্দ। প্রতিবছর গতানুগতিক স্টাইলে ঈদের সময় 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'– এ গানটি প্রচারিত হয়। এ গানটি আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয়। পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে এ গানটির বিষয়বস্তুতে ঈদ সম্পর্কে যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। টিভিতে প্রচারিত বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে এর কোন প্রতিফলন নেই।

গত ঈদ-উল-ফিতর (২০০০) উপলক্ষে ইটিভি'র এক অনুষ্ঠানে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ঈদের সম্ভাষণ নিয়ে ধৃষ্টতাপূর্ণ ফাজলামো করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক 'ঈদ মোবারক'-এর পরিবর্তে 'ঈদ মোশাররফ' বলতে চেয়ে এই ফাজলামো করেছেন। আবার ঈদের কোলাকুলি নিয়ে ফাজলামো করেছে দেবাশীষ বিশ্বাস নামধারী উপস্থাপক। কোলাকুলিকে সে প্রথমে কাঁধাকাঁধি' এবং পরে 'বুকাবুকি' বলতে চেয়েছে।

ওদিকে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিটিভিও ধৃষ্টতা ও ফাজলামোর নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের দিন বিটিভি হিন্দু ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে এবং যৌথ প্রযোজনার নামে ভারতে নির্মিত এমন একটি সিনেমা দেখিয়েছে, যার সম্পূর্ণটুকুতেই রয়েছে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্য। সিনেমার চরিত্র হিন্দুদের, সংলাপও হিন্দুদের। শুধু তাই নয়, এই সিনেমায় এসেছে কলকাতার হিন্দুদের বিয়ে-শাদীসহ বিভিন্ন বিষয়, এসেছে গড়ের মাঠ, হাওড়া ও লেক সার্কাসের দৃশ্যাবলী। সিনেমার কোথাও বাংলাদেশের চিহ্নমাত্র নেই, মুসলমান চরিত্র বা মুসলমানদের প্রাধান্য থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, যৌথ প্রযোজনার নাম নিয়ে লাখ লাখ বাংলাদেশী টাকার বিনিয়োগ করা হলেও এর সম্পূর্ণ চিত্রায়ন হয়েছে কলকাতায় এবং পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনটিতেই যাতে এটা বিটিভিতে দেখানো হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছেন একজন ঊর্ধ্বতন মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা। তথ্যাভিজ্ঞরা বলেছেন, বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়েই হিন্দু ধর্মভিত্তিক সিনেমাটি নির্মাণ ও প্রচার করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে সুকৌশলে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়েছে। তাছাড়া ঈদ উপলক্ষে প্রচারিত বিটিভি'র অন্য অনুষ্ঠানগুলোতেও যথোচিতভাবে ইসলামী সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করা হয়নি। ইসলামী মূল্যবোধ ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে চরমভাবে।

ঈদুল ফিতরের প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিধৃত করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। যেমন ঃ

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।
তুই আপ্‌নাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ।।
তোর সোনাদানা বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ্
দে জাকাত, মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাতে নিঁদ।।
তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।।
আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত-দুশমন হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরীদ।
ঢাল্ হৃদয়ের তোর তশ্‌তরীতে শিরনী তৌহিদের,
তোর দাওত্ কবুল করবেন হযরত, হয় মনের উমীদ।।
শহীদী ঈদ্‌গাহে দেখ্ আজ জমায়েত ভারি।।
তবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফর্‌মান জারি।।
তুরান ইরান হেজাজ মেসের হিন্দু মোরোক্ক ইরাক
হাতে হাত মিলিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে সারি সারি।।
ছিল বেহোশ যারা আঁসু ও আফসোস ল'য়ে।
চাহে ফিরদৌস্ তারা জেগেছে নও জোশ্ লয়ে।
তুইও আয় এই জমাতে ভু'লে যা দুনিয়াদারী।।
ছিল জিন্দানে যারা আজকে তারা জিন্দা হ'য়ে
ছোটে ময়দানে দারাজ-দিল্ আজি শমশের লয়ে।
তকদীর বদলেছে আজ উঠিয়ে তকবীর তারি।

ঈদুল আজহা

প্রতিবছর আমাদের মাঝে আসে পবিত্র ঈদুল আজহা বা কুরবানীর ঈদ। এ দিনটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় আমাদের জাতীয় সত্তার কথা। আমাদের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা। এ দিন প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে জেগে উঠে আত্মত্যাগের প্রত্যয়।

কুরবানীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন– "প্রত্যেক উম্মতের জন্যই আমি কুরবানী নির্দিষ্ট করেছিলাম– যেন তারা মহান আল্লাহর দেয়া পশুসমূহের

www.pathagar.com

(কুরবানী) মাধ্যমে মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করে (ও তার নৈকট্য লাভ করে) তোমাদের মাবুদ তো একই মাবুদ। তাঁরই প্রতি নিজেদেরকে সোপর্দ কর। আর হে নবী (সঃ) আপনি আত্মনিবেদনকারীদের সুসংবাদ দিন। (সূরা হজ্ব)

সুতরাং "আল্লাহকে পাবার জন্যে সর্বোত্তম ত্যাগ" এই হচ্ছে কোরবানীর শিক্ষা। সকালে ঈদগাহে জামাতের সাথে দু'রাকাত নামাজ শেষে কুরবানীতে পশু জবাই করা একটি প্রতীকী ব্যাপার মাত্র। এর মূল তাৎপর্য হচ্ছে নিজের অন্তরের পশুত্বকে কোরবানী করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের সমাজে কুরবানী যতটা ধর্মীয় ও মানবিক তার চেয়ে বেশি বিচার্য হচ্ছে সামাজিকতায়। কে কতো টাকায় কতো বড় গরু কোরবানী দিল তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফলে অন্তরের পশুত্ব কোরবানী করার পরিবর্তে বরং পশুত্বকে লালন এবং চর্চার মাধ্যম বানিয়ে তুলেছে অনেকে এই কোরবানীকে।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন– "তোমাদের কুরবানীর রক্ত-গোস্ত আমার নিকট পৌঁছায় না পৌঁছায় তোমাদের অন্তরের নিয়তটুকু।"

প্রতিবছর ঈদুল আজহা আমাদের দ্বারে আসে নতুন শপথের বাণী নিয়ে। আল্লাহ মানুষকে পশু কোরবানীর মাধ্যমে মানুষের অন্তরের পশু প্রবৃত্তি কোরবানীর তাগিদ দিয়েছেন। কোরবানীর উদ্দেশ্য হলো ভোগের নয়; ত্যাগের। কিন্তু কোরবানীর এ শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চলছে ভোগের প্রতিযোগিতা। এই ভোগের প্রতিযোগিতার কারণে সমাজে বা রাষ্ট্রে লোভ-লালসা, হিংসা, বিরোধ-সংঘাত, হানাহানি লেগেই আছে। কোরবানীর প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে থাকার কারণে এটি হয়েছে আমাদের জন্য আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব। তাই কবি নজরুল ইসলাম কোরবানীর সেই মূল মর্মবাণী তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। কবি বলেন ঃ

"ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
দুর্বল! ভীরু! চুপ রহো, ওহো খাম্‌খা ক্ষুব্ধ মন।
ওরে শক্তি হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন্‌।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন।
আজ আল্লাহর নামে জান্‌ কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

শবে বরাত/ শবে কদর

১৫ই শাবান অর্থাৎ ১৪ তারিখের দিবাগত রাত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ রজনীতে আল্লাহপাক তাঁর অসংখ্য বান্দাকে ক্ষমা এবং রিজিক বন্টন করে থাকেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তাই মুসলমানগণ এ রাতে সারারাত নফল ইবাদত করে থাকেন। এ রাতে এবাদত বন্দেগী করে পূর্ণ রাত জাগলে বৈষয়িক ভাগ্যের পরিবর্তন হয়ে যায় এ দৃঢ় বিশ্বাসে যারা সারা বছর নামাজ পড়ে না তারাও টুপি মাথায়

www.pathagar.com

মসজিদে যায়। মোমবাতি আগরবাতি জ্বালিয়ে নফল এবাদত করে। আবার অনেকে নফল নামাজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে ফজর নামাজই কাযা করে ফেলে। শবে বরাতে গরীবদের মধ্যে হালুয়া রুটি বিতরণ একটি অবশ্যই করণীয় প্রথায় পরিণত হয়েছে।

শবে বরাতের রাতে অন্যায়ের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। এই রাতে আতশবাজি ও পটকার শব্দে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়ে। এই কুপ্রথাটি হিন্দুদের দেওয়ালী উৎসবের অনুকরণে করা হয়। এ ছাড়া বেকারীতে তৈরি বিভিন্ন জীব-জন্তুর আকার সম্বলিত রুটি মুসলমানরা ক্রয় করে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে। যা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ।

শবে বরাত রাতে পাঞ্জামী টুপি পরিহিত অসংখ্য তরুণ-যুবক এবাদতের চেয়ে গল্প-গুজব ও পায়চারীতে মশগুল থাকে। এ দৃশ্য দেখা যায় শহরের অলিতে-গলিতে রাস্তার বাঁকে বাঁকে। এছাড়া এ রাতে এতো ভিক্ষুক দেখা যায় যেন মনে হয় ভিক্ষুকদের মহাসমাবেশ। শোনা যায়, এ রাতে একজন ভিক্ষুকের মাথা পিছু আয় ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা। এই বার্ষিক ভিক্ষুক মহাসমাবেশে বিত্তশালীরা দান করাকে সৌভাগ্যবান মনে করে।

শবে বরাতের রজনী হতে শবে কদর অত্যন্ত মহিমান্বিত রজনী। এ রাত সম্পর্কে আল্লাহপাক নিজেই বলেছেন এ রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে নফল এবাদত করলে হাজার মাসের সওয়াব লাভ করা যায়।

(১) কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল কদর ঃ আরবীতে 'লাইলুন' অর্থ রাত আর 'কদর' অর্থ ভাগ্য। সুতরাং 'লায়লাতুল কদর' অর্থ ভাগ্যরজনী। এ ছাড়াও মুফাসসিরিনে কিরামগণ এর দু'টি মর্যাদাসহ বিশেষ অর্থ করেছেন।

(ক) একটি হলো ভাগ্য তথা পরিমাণ নির্ধারণ, (খ) দ্বিতীয়টি হলো মর্যাদা বা মহিমা। (ইবনে কাসির, তাফহীম)

লাইলাতুল কদরে এ উভয় অর্থেই শামীল। কেননা একদিকে মহান রাব্বুল আলামীন এ রাতে তার বান্দাদের জন্য আগামী এক বছরের ভাগ্যলিপি পঞ্জিকা আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখেন, অন্যদিকে এ পবিত্র রজনীতে আল্লাহপাক তার প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে মানব জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দান করেছেন। ফলে এ রাতের মর্তবা ও গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আল্লাহপাক সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানব জাতিকে বছরের যে ছয়টি মর্যাদাপূর্ণ ও মাহাত্মপূর্ণ রাত দান করেছেন তন্মধ্যে লাইলাতুল কদরই সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ যার সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো। (১) এ রজনীতে হযরত আদম-(আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২) হযরত ঈসা (আঃ)কে ঊর্ধ্বাকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। (৩) ফেরেশতাকূলকে সৃজন করা হয়েছে। (৪) জান্নাত তথা স্বর্গের বৃক্ষরাজি রোপণ করা হয়েছে। (৫) বনী ইসরাঈলদের তাওবা কবুল করা হয়েছে। (৬) সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে কারীম লাওহে মাহফুজ থেকে পার্থিব আসমানে এ রজনীতেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। অথচ এ মহিমান্বিত রাতের গুরুত্ব আমাদের মাঝে তেমন একটা নেই বললেই

www.pathagar.com

চলে। শবে বরাতের রাতের নামাজীদের শবে কদরে দেখা যায় না।

শবে মেরাজ

২৭শে রজব-এর রজনীতে মহানবী (সঃ)-এর মেরাজ সংগঠিত হয়েছিল। এ রাতে মুসলমান্গণ নফল এবাদত বন্দেগী করে থাকে।

নবুয়তের দশম বছরে অর্থাৎ হযরতের পঞ্চাশ বছর বয়সে ২৭শে রজব-এর রজনীতে আল্লাহর সাথে দিদারের উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মেরাজ সংগঠিত হয়েছিল। সাথী ছিলেন জিব্রাইল (আঃ) বাহন ছিল ডানা বিশিষ্ট অশ্বের মতো। জ্যোতির্ময় ও ক্ষীপ্র গতিবেগ বাহনে চড়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রথমে জেরুজালেমে যান এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ভক্তি ভরে দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন। এখান হতে জিব্রাঈল (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে নিয়ে উর্ধ্ব আকাশ পানে আল্লাহর দীদারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। অপূর্ব জ্যোতিতে চিরসুন্দর, চির মনোরম 'বায়তুল মামুর'-এ এসে হযরত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। একটা পর্দার আড়াল টেনে আল্লাহ তাঁকে আত্মরূপ দর্শন করালেন। উভয়ের মধ্যে অনেক গোপন কথা হয়। সৃষ্টি লীলার রহস্য সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অবগত হন। স্রষ্টার এবং সৃষ্টিকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে চিনেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নিয়ে কাবাগৃহে ফিরে আসেন। তাই এ রাতকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে মুসলমানেরা নফল এবাদত বন্দেগী করে থাকে।

মনুষ্য প্রকৃতি নারীমুখ বিশিষ্ট পাখাওয়ালা অশ্বের মতো বোরাকের ছবি হিন্দু দেব-দেবীদের ছবির ন্যায় অনেক মুসলমান পুণ্যের আশায় ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখতে দেখা যায়। বোরাক-এর মুখ যে মনুষ্য প্রকৃতি ছিল এর কোন প্রমাণ নেই। এটি একটি কাল্পনিক ছবি। ইসলামী চিন্তাবিদেরা বাহনটির স্বরূপ বর্ণনায় বলেছেন– এটি খচ্চরের তুলনায় কিঞ্চিৎ ছোট এবং গাধার চাইতে বড়। খুবই উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ বিশিষ্ট একটি বাহন। বিদ্যুৎতুল্য ক্ষীপ্র গতি সম্পন্ন ছিল বলে এটিকে 'বুরাক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে 'বুরাক' শব্দ বিদ্যুৎ চমকিত করে দেয়ার মতো বস্তু। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মতো ব্যাপার। ইবনে হিশাম-এর বর্ণনায় বাহনটি পাখা বিশিষ্ট। কিন্তু নারী মুখের প্রতিকৃতি ছিল এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। এছাড়া একমাত্র নবী করীম (সাঃ) ছাড়া এ অলৌকিক বাহনটি পৃথিবীর অন্য আর কেউ দেখেননি।

কুলখানী/ চেহলাম

মৃত্যুর তিনদিন পর কুলখানি এবং চল্লিশ দিন পর চেহলাম ইদানিং অবশ্যই পালনীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ দুটো অনুষ্ঠানই অন্যান্য ধর্ম থেকে আসা। মৃতের নামে কোরআন খতম করানো বা দান খয়রাতের মধ্যে ইসলামে কোন বিধি-নিষেধ নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে তা পালন করারও কোন বিধান ইসলামে নেই। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের দোয়া আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য। মৃত ব্যক্তিরা আত্মীয়-

www.pathagar.com

স্বজনদের এ দোয়ার জন্য উন্মুখ থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য অনেকেই জীবিতকালে ছেলে-মেয়েদেরকে আলহামদু ছুরাটি পর্যন্ত শিখিয়ে যান না। যা পড়ে হাত তুলে আল্লাহর নিকট সেই মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্য দোয়া জানাবে। প্রতি বছর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনেরা ভাড়া করে মৌলভী-মাওলানা এনে মিলাদ শরীফ অথবা কোরআন খতম করান। এ ছাড়াও কোন কোন পরিবারে মৃত্যু দিবসে হিন্দুদের ন্যায় মৃত ব্যক্তির ছবিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মহান ব্যক্তিদের জন্য শোক পালনে বিধর্মীয় রীতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন, মাজারে ফুল ও লতাপাতা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো এখন স্থায়ী রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

কাঙ্গালী ভোজ

ইদানিং মৃত ব্যক্তির মৃত্যু দিবসে কাঙ্গালী ভোজের আধিক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই কাঙ্গালী ভোজের অনুষ্ঠান হতো হিন্দু সমাজে। পূর্বে সমৃদ্ধ হিন্দু গৃহস্থেরা মৃত্যু দিবস উপলক্ষে কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন করতো। বর্তমানে মুসলমানদের মৃত্যুবার্ষিকীতে কাঙ্গালী ভোজের অনুষ্ঠান হচ্ছে। বিধর্মীয় সাদৃশ্যে যে কোন ধর্মীয় রীতি-নীতি মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। কাঙ্গালী ভোজ না করে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে গরীবের মধ্যে দান-খয়রাত অথবা খাদ্য বিতরণ করা যায়। ইসলামে দান-খয়রাত করার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। ইসলামে যেহেতু কাঙ্গালী ভোজের উল্লেখ নেই। সেহেতু মৃত ব্যক্তির কল্যাণের উদ্দেশ্যে সময় ও সুযোগ মতো মাঝে-মাঝেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে দু'একজন করে খাওয়ানো যায়। এতে যেমন সমাজের দরিদ্র জনগণের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালন হয় তেমনি মৃত ব্যক্তির জন্যে কল্যাণ হয়।

আরেকটি কু-প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। অনেকে বিশ্বাস করে মৃত ব্যক্তিকে যেখানে গোসল করানো হয় সেখানে ৪০ দিন ধরে সকালে ও সন্ধ্যায় আগরবাতি জ্বালানো অবশ্য করণীয় পুণ্য কাজ। যা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। অথচ এসব অবৈধ রীতি-নীতিগুলো আমাদের বিশ্বাসে স্থায়ী আসন গেঁড়ে অহরহ তার প্রকাশ ঘটাচ্ছে।

শবিনা খতম

পবিত্র কোরআন খতম বা শবিনা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। পবিত্র কোরআনের বাণী কর্ণগোচর হলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ওয়াজেব। কিন্তু কেউ যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উক্ত তেলাওয়াত কোন ব্যক্তির পক্ষে শ্রবণ করা সম্ভব না হয় তবে অবস্থা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিই এ জন্যে দায়ী হবেন। যে সব হাফেজ, সাহেবান পবিত্র কোরআনের হক পুরাপুরি আদায় করে চলেন, তাঁরা হাশরের ময়দানে অন্যান্য বারোজন লোকের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারবেন বলে হাদীসে আছে। তবে হাদীসে একথাও আছে যে, যে আলেম তার এলেম অনুযায়ী আমল

www.pathagar.com

করে না, যে ক্বারী বা হাফেজ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতকে লোকের নিকট সম্মান বা অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে করেছে বা অন্য যে কোনভাবে কোরআনের অবমাননা করেছে, ওরা নিজেরাই বেহেশতে যেতে পারবে না এবং এদের উপর সর্বাধিক আযাব হবে।

এছাড়াও এবাদতকারীর এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, রোগীর কষ্ট হয় বা মানুষের স্বাভাবিক নিদ্রায় ব্যাঘাত হয় এমন শব্দে রাতের বেলায় তেলাওয়াত বা জিকির করা জায়েজ নয়। অথচ অনেক হাফেজ সাহেব মাইকে উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করেন অথচ যখন শ্রবণকারী কোন লোকই থাকে না। অনেকেই রাতে মসজিদে বা বাড়ীতে অধিক ছওয়াবের আশায় মধ্য রাতে উচ্চস্বরে জিকির করে অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে নিজের অজান্তেই ছওয়াবের বদলে পাপ করছেন।

আকীকা

ইসলাম ধর্মের মতে, সন্তান জন্মের সাত দিনের মাথায় আকীকা করা সুন্নত। কোন কারণে দেরী হলে চৌদ্দ দিন বা একুশ দিনের মাথায়ও করা যেতে পারে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে যখন সুবিধা হয় তখন করলেও আকীকা আদায় হয়ে যাবে। আকীকার কাঁচা গোস্ত বন্টন করে দেয়া উত্তম। পাক করে খাওয়ালেও আকীকা আদায় হবে। অনুষ্ঠান করা এবং উপহার আদায় করার লক্ষ্যে ফাঁদ পাতা শরীয়ত অনুমোদিত নয়।

আমাদের দেশে কুসংস্কার রয়েছে সন্তানের নামে আকীকার গোস্ত পিতা-মাতার জন্য খাওয়া যায় না। এটা নাকি সন্তানের গোশ্‌ত খাওয়ার শামীল – এ ধরনের কোন বিধি-নিষেধ ইসলামে নেই। এছাড়া আকীকাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মীয় অনুকরণে অন্ন প্রাসন্ন অনুষ্ঠানের মতো করে থাকে যা ইসলামের রীতি বহির্ভূত।

জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী

আমাদের দেশে এককালে কেউ জন্মদিন পালন করতে জানতেন না। এটা ছিলো ইউরোপীয় নীতি। এ দেশে ইউরোপীয়দের অনুসরণে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এই নীতির প্রচলন করেন জ্ঞানদানন্দিনী, নিজের জন্মদিন পালন করে।

ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, জন্ম অথবা মৃত্যুবার্ষিকী যদি কেউ জরুরী এবাদত বা পুণ্য কর্ম মনে করে পালন করতে চায়, সেটা বেদআত এবং গোনাহের কাজ বলে গণ্য হবে। তবে কেউ যদি সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে সন্তানাদি বা কোন প্রিয়জনের জন্ম দিনে নির্দোষ আমোদ-আহলাদ করতে চায়, তবে সেটা ইসলাম অনুমোদন করে। এই আমোদ প্রমোদের সাথে যদি কেউ শেরকী অথবা বিদআতী কর্মকান্ডের সংমিশ্রণ ঘটায় তাহলে তা অবশ্যই গুনাহের কাজ বলে গণ্য হবে। আজ জন্মবার্ষিকীর নামে যে অপকর্মটি আমাদের মুসলিম সমাজে চলে আসছে তা ইসলাম বহির্ভূত। খ্রীস্টান সম্প্রদায় যীশু খ্রীস্টের জন্মবার্ষিকী বড়দিন পালন করে মোমবাতি জ্বালিয়ে, কেক কেটে। আমরা তা পালন করছি সন্তানদের জন্মবার্ষিকীতে।

কয়েক বছর আগে শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনির চৌধুরীর ৭০তম জন্মবার্ষিকী এবং বাংলা

www.pathagar.com

মঞ্চ নাটকের দু'শ' বছর পূর্তি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ছিলেন একজন প্রথিতযশা নাট্যকার, অধ্যাপকসহ রাম ও বামপন্থীরা। এ ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ঢোলক-বাদ্য বাজিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এতে সভাপতিত্ব (পৌরহিত্য) করেন কবীর চৌধুরী। মঞ্চে শিবের নৃত্য ভঙ্গিমায় তৈরী প্রতিকৃতি গাঁদাফুল দিয়ে সাজানো হয়। সেখানে তিনটি মেয়ে মঙ্গল প্রদীপ নিয়ে নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে আসে। প্রদীপগুলো রাখা হয় দেবীমূলে। অতঃপর একজন আমন্ত্রিত অতিথির হাত দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়। এভাবেই এরা একজন মুসলমান ব্যক্তির জন্মবার্ষিকী বিধর্মীয় স্টাইলে সম্পন্ন করেছে।

শয়তানকে হুজুর (সাঃ) একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন- "তোমার শত্রু কে? শয়তান বলেছিলো হুজুর আপনি আমার এক নম্বর শত্রু। এরপর আপনার অনুসারীরা।" অর্থাৎ মুসলমানেরা। মুসলমানের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের আলামত প্রমাণ করে শয়তান মুসলমানদের ঈমান আদিকা বিনষ্ট করার জন্যে কিভাবে তৎপর রয়েছে। খ্রীস্টান, ইহুদী, হিন্দু কিংবা অন্যান্য ধর্মালম্বীরা তাদের আত্মীয় স্বজনদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী স্ব-স্ব ধর্মীয় রীতিনীতিতে পালন করে। অন্য কোন বিধর্মীয় রীতিতে পালন করে না। কারণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট শয়তানের ডিউটি করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু শয়তান তাদেরকে শত্রু মনে করে না। শয়তান মুসলমানদের শত্রু মনে করে। তাই শয়তানের সঠিক দায়িত্ব পালনের কারণেই কতিপয় মুসলিম নামধারী আজ নিজ ধর্মীয় রীতিতে জন্মবার্ষিকী পালন না করে বিধর্মীয় স্টাইলে পালন করছে।

খতনা

আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি বিধি-বিধান পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং মানব জাতির শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের অনুকল্য বলে আজকের বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন। এর মধ্যে খৎনা একটি। মুসলমানদের খাৎনা করার ফলে পুরুষাঙ্গে ক্যান্সার হয় না। খতনাকে বলা হয় সুন্নতে ইবরাহিমী। অর্থাৎ আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এ প্রথার প্রচলন করেন। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে দশখানা সুন্নত বা উত্তম কর্মধারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর লেখা থেকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে খতনা তন্মধ্যে একটি। যদি পাক-ছাফ এবং সাধারণ পরিচ্ছন্নতার বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় তবুও খতনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। যদি শরীর পাক করার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে খতনা করা ওয়াজেব হয়ে যায়। সর্বাবস্থাতেই খতনার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। নাবালেগ থাকা অবস্থায় অর্থাৎ যে বয়স পর্যন্ত গুপ্তাঙ্গ অন্যকে দেখানো হারাম বিবেচিত হয় না, সে বয়সের মধ্যে খতনা সম্পন্ন করার নিয়ম।

এ খতনা উপলক্ষে বিধর্মীয় রীতি-নীতিতে অনেক বেহুদা লোকাচার পালন করা হয়।

মানত

কুরআন হাদীস ও ফিকাহর দৃষ্টিতে মানত মানার ব্যাপারে বুনিয়াদী শর্ত হলো এই

www.pathagar.com

যে, তা মানতে হবে একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে। যে মানত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে করা হয়নি, তা মূলতঃ মানত নয়। তা পূরণ করাও ওয়াজিব নয়। উপরন্তু সে মানত হতে হবে এমন কাজ যে কাজ আল্লাহর আনুগত্যমূলক। কোন অবস্থাতেই যাতে আল্লাহর নাফরমানী করা না হয়।

আল্লাহপাক কোরআন মজীদে বলেছেন– "তোমরা যা কিছু খরচ কর বা মানত মান, আল্লাহ তার সবকিছুই জানেন। আর জালিমদের জন্যে সাহায্যকারী কেউ নেই।" (সূরা বাকারা)

হাদীসে একথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে , আবু দাউদের কিতাবে যার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। হযরত ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন– "রাসূলে করীম (সঃ)কে বলতে শুনেছি যে, মানত দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে চাওয়া হয়নি, তা মূলতই মানত নয়।"

আল্লাহ এবং রাসূলের সুস্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে 'মানত' কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে। ইবনুল আরাবী লিখেছেন– "মানত মানা দোয়ার সাদৃশ্য, তাতে তকদীর ফিরে যায় না।" এ-ই হচ্ছে তকদীর। অথচ দোয়া করাকে পছন্দ করা হয়েছে, কিন্তু মানত মানতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা দোয়া উপস্থিত ইবাদত। তাতে সোজাসুজি বান্দার মন মগজ আল্লাহর দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তা হয় বিনয়াবনত, কাতর, উৎসর্গিত আল্লাহরই সমীপে। কিন্তু মানত মানার জন্যে উপস্থিত কোন ইবাদত দেখা যায় না; বরং তাতে সরাসরি আল্লাহর পরিবর্তে সেই মানবের উপরই নির্ভরতা দেখা যায় এ জন্যে কোন কোন মানত শিরকের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়।

এই প্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, বর্তমানকালে সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে এবং বিশেষভাবে এক শ্রেণীর জাহেল পীরের মুরীদদের মধ্যে কথায় কথায় মানত মানার হিড়িক পড়ে গেছে এবং ওয়াজ-নসীয়তে মানত মানার যে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে তা পুরোপুরি বিদআত। এই বিদআতই কোন কোন ক্ষেত্রে শিরক-এ পরিণত হয়ে যায়। শিরক হয় তখন, যখন মানত মানা হয় কোন মৃত পীরের কবরের নামে। কেননা এসব ক্ষেত্রে 'আল্লাহর ওয়াস্তে' যতই মানত মানা হোক না কেন, আসলে তা 'আল্লাহর ওয়াস্তে' থাকে না। তার সামনে পীর, মাদ্রাসা ইত্যাদি-ই থাকে মুখ্য এবং মনে করা হয়, এদের এমন কিছু বিশেষত্ব অলৌকিক ক্ষমতার কারণে সে এ মানতের দরুন উপকৃত ও বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারবে। আর ইসলামের দৃষ্টিতে এ-ই হচ্ছে সুস্পষ্ট শিরক। কাজেই আল্লাহর বাণী– "কাউকেই আল্লাহর সমতুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী বানিও না"–এর বিপরীত হয়ে যায়।

এ ধরনের মানত মানা যে হারাম তাতে কোন মুসলমানেরই বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু আজকে আমাদের দেশে মানতের আধিক্য ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। চাকরি, সন্তানের প্রত্যাশা, রোগ মুক্তি– এরকম বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধি লাভের জন্য অনেকেই মৃত পীরের নামে মানত করে থাকে। এই মানতের দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে নগদ টাকা থেকে শুরু করে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি স্থান পায়। আবার এক শ্রেণীর

www.pathagar.com

মাজার কমিটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অথবা তাদের এজেন্ট দিয়ে মানত আদায় করে। অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা অথবা তাদের মুরীদেরা এ মোহময় জালে অতি সহজেই জড়িয়ে পড়ে এবং নিমজ্জিত হয় কঠিন শিরক-এর অন্ধকারে। যদি কোন বিশেষ জায়গার বিশেষ লোকদের জন্যে টাকা পয়সা বা কোন দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময়ে মানত মানা হয়, তবে সে টাকা কিংবা ঐ দ্রব্য সামগ্রী সেখানেই যে খরচ করতে হবে ইসলামে এমন কোন জরুরী শর্ত নেই। হানাফী ফিকহের কিতাবে লিখিত রয়েছে-

"কেউ যদি বলে, 'অমুক দিন আল্লাহর নামে কিছু দান করা আমার উপর ওয়াজিব' কিংবা বলে 'অমুক স্থানের মিসকীনদের জন্যে কিছু সদকা দেয়া ওয়াজিব' তাহলে দিন ও স্থানের কয়েদ পালন করা জরুরী হবে না।

অর্থাৎ যে কোন দিন ও যে কোন স্থানের গরীবদের মধ্যে দান করলেই মানত পূরণ হয়ে যাবে। (তথ্য ঃ মাসিক মদীনা, মাওলানা মুহিউদ্দীন, প্রশ্ন বিভাগ এবং সুন্নাত ও বিদআত ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম-এর গ্রন্থ থেকে)।

কদমবুসি

আমাদের দেশে গ্রামে-গঞ্জে শহরে সবখানেই পীর, আলেম ও মুরুব্বীদেরকে কদমবুসি করার প্রথা বহুদিন থেকেই বিদ্যমান। বর্তমানে এর আধিক্য কিছুটা হলেও কমে এসেছে। তবুও সমাজে অনেকের মাঝে এ কুসংস্কার লোকাচারে এখনো টিকে আছে। মুরীদ পীরকে কদমবুসি করবে, পারিবারিকভাবে ছোটরা বড়দেরকে কদমবুসি না করলে বেয়াদব হয়ে যাবে, এরকম একটা অযাচিত পরিবেশ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অনেকে ভক্তির আতিশয্যেও কদমবুসি করেন। আবার অনেকে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণের মতো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কদমবুসি করে থাকেন।

সাহাবীদের কেউ কেউ নবী করীমের হাত ও কপালে হালকাভাবে চুমু দিয়েছিলেন। এই চুমুকে ভক্তির চেয়ে ভালবাসাই প্রকাশ পেতো সমধিক। তাঁদের কেউ কোনদিন রাসূল করীমের পা হাত দিয়ে স্পর্শ করে সে হাত দ্বারা নিজেদের মুখমন্ডল মছেহ করার যে কদমবুসি, তা করেছেন বলে হাদীস বা জীবন চরিতে কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। হুজুর (সঃ) যা করতেন না অথচ আজকে আমাদের সমাজে তা নিয়মে পরিণত হয়েছে। এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের দেখা হলে উভয়ে হাত মিলিয়ে মুসহাবা করার বিধান রয়েছে। অথচ একজন মুসলমানের হাত, আরেকজন মুসলমানের পা স্পর্শ করার বিধান ইসলামে নেই।

ইসলামে সিজদা করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি রুকুর ধরনে কারো সামনে মাথা নত করাও নিষিদ্ধ। মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) লিখেছেন-

"কারো সামনে মাথা নোয়ান কুফরীর কাছাকাছি। আর ফিকাহবিদের মতে- রাজা বাদশাহ বা অন্য কারো জন্যে মাথা নোয়ানো মাকরুহ। আর মাকরুহ মানে মাকরুহ তাহরীম।" এসব কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পীর, মস্তান বা অন্য কোন মুরুব্বী তিনি যেই হোক না কেন, তাঁকে যে কদমবুসি করতে হবে শরীয়াতে এমন কোন বিধান নেই।

www.pathagar.com

আর এ কাজ রাসূলে করীমের সুন্নতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এক ধরনের বিদআত।

"কদমবুসির রেওয়াজ কেবল এই উপমহাদেশে আলেম ও পীরের দরগাতেই দেখা যায়। অন্যান্য মুসলমান প্রধান দেশগুলোতে এর প্রচলন নেই। এ কারণে অনেকেই মনে করেন যে, এই কদমবুসির প্রথা হিন্দু সমাজ থেকে মুসলমান সমাজে এসে তা মুসলমানী রূপ পরিগ্রহ করেছে। মুসলিম সমাজের বর্তমান কদমবুসি প্রথাটি আসলে ছিল 'ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণিপাত'। এখনো তা দেখা যায় এখানে সেখানে। যজমান ব্রাহ্মণের সামনে আসলেই ব্রাহ্মণ তার বাঁ পায়ের বুড়ো অঙ্গুলি উঁচু করে ধরতেন আর যজমান তার কপালে সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্থাপন করতেন। অতঃপর যখন ইচ্ছে ব্রাহ্মণ তার পা টেনে নিতেন। ব্রাহ্মণ ধর্মের এ রীতি আদিম কালের কেননা ব্রাহ্মণ ধর্ম-দর্শনে শুধু ব্রাহ্মণরাই মানুষ আর অন্যান্যরা ব্রাহ্মণের দাসানুদাস। অতএব ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণিপাত করাই তাদের কর্তব্য।

পরবর্তীকালে এ দেশের হিন্দুরা মুসলমান হয়ে এ হিন্দুয়ানী ব্রাহ্মণ্য প্রথা 'পদপ্রান্তে প্রণিপাতকেই' মুসলিম সমাজে কদমবুসি রূপে বৈধতা পেয়েছে। এক কথায় সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ্য প্রথাকে মুসলিম সমাজে বিশেষ করে পীর সাহেবান ও আলিম ওস্তাদের দরবারে অধিক সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য হয়ে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এ সম্পর্কে আল্লামা শামী তাঁর সময়কার অবস্থা অনুযায়ী এ ধরনের কাজকে 'সিজদা' বলেই অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন–

এমনিভাবে লোকেরা যে আলিম ও বড় লোকদের যমীন বুসি করে, এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম। আর যে এ কাজ করে এবং যে তাতে রাজী থাকে, খুশী হয় উভয়ই গুণাহগার হয়। কেননা এ কাজ ঠিক মূর্তি পূজা সাদৃশ্য। আর এ কুকাজটি আমাদের সমাজে টিকে আছে ধারাবাহিকভাবে।

সালাম

ইসলাম ধর্মে একজন মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের প্রথম সাক্ষাতে সালাম দেয়ার বিধান রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ নির্দেশ দেন– "আর যখন কেউ তোমাদের শরীয়তী বিধান মোতাবেক সালাম দেয় তোমরাও ভাল কথায় তাদেরকে সালাম দাও অথবা সেই কথাগুলোই বলে দাও (৮৬ ঃ নিসা) 'অবশ্যই তোমরা যখন ঘরে প্রবেশ করবে তখন নিজেদের লোকজনকে সালাম করবে। কল্যাণের দোয়া আল্লাহর নিকট হতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা খুবই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র (৬১ ঃ নূর)।

মহানবী (সাঃ) বলেন, "তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর পরস্পরকে ভাল না বাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলবো, যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? সে কাজটি হচ্ছে তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপক সালামের প্রচলন কর। (মুসলিম) শরীয়তের বিধান হচ্ছে– "সালাম দেয়া সুন্নত, কিন্তু জবাব দেয়া ওয়াজিব।"

মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষা হলো পরস্পর দেখা হলে বলবে, "আস্‌সালামু আলাইকুম

www.pathagar.com

ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু (তোমাদের সবার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)"। এবং জবাবে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, মাগফেরাতুহু (তোমাদের সবার উপরও আল্লাহর শান্তি, রহমত, বরকত ও ক্ষমা বর্ষিত হোক)।"

এ সালাম দেবার জন্য আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ) কে বলেন, "আর যখন তারা তোমার নিকট আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহকে (আদেশ নিষেধের এ আয়াত) বিশ্বাস করে তখন তুমি বল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (৫৪ ঃ আনয়াম)

প্রবাসী একজন বাংলাদেশী আক্ষেপ করে বলেছেন, সৌদি আরবের লোকেরা গরীব দেশের মুসলমানদের মিসকীন বলে অবজ্ঞা করে। এ জন্য দরিদ্র দেশের পরিচিত কাউকে দেখলেও তারা সালাম দেয় না। এটি সত্য হলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কেননা, নবী (সাঃ) সালামের প্রসারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে প্রশ্ন করলেন, ইসলামে কোন্ কাজ শ্রেষ্ঠ? উত্তরে নবী (সাঃ) বললেন, অপরকে আহার করানো এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান।

সূরা নূরে আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন, "তোমরা যখন নিজেদের ঘরে, নিকট আত্মীয়দের ঘরে অথবা বন্ধুদের ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দিবে। ইহা আল্লাহর নিকট হইতে কল্যাণময় ও পবিত্র।" পবিত্র কোরআনের সূরা নিসায় বলা হয়েছে, "তোমাদের যখন অভিবাদন করা হয়, তখন উত্তরে তোমরা উহা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন প্রদান করো। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।"

এছাড়া সালাম দিবার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর হাত মিলিয়ে করমর্দন করা সুন্নত। হযরত (সাঃ) বলেছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে করমর্দন কর, তাহলে শঠতা দূরীভূত হবে। করমর্দন করলে পাপ ক্ষমা হবার সম্ভাবনা থাকে। ইসলামে যুবক-যুবতীর পক্ষে করমর্দন করা বৈধ নয়, হারাম।

বাংলাদেশের মানুষ সালামের গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন ঃ আপনি নিরাপদে থাকুন, আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক.... একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে দেখলেই এভাবে দোয়া করবে। সেজন্য বলতে হবে, "আস্‌সালামু আলাইকুম, ওয়া রাহমাতউল্লাহে, ওয়া বারাকাতাহু"। সংক্ষেপে আস্‌সালামু আলাইকুম বললেও চলবে। প্রতিউত্তরে "ওয়া আলাইকুম সালাম, ওয়ারাহমাতউল্লাহে, ওয়া বারকাতাহু" বলবার নিময়। অর্থাৎ সালামদাতার জন্যও আল্লাহর রহমত কামনা করতে হয়। এতো বড় বাক্য বলতে না চাইলে অন্তত সালামদাতার চেয়ে সামান্য কিছু হলেও বেশি বলতে হবে। এভাবে বলা উত্তম। যে আগে সালাম দেয়, আল্লাহর নিকট সেই বেশি প্রিয়। অথচ আমাদের দেশে ধনীরা গরীবকে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তার অধীনস্থ কাউকে প্রায় কখনোই সালাম দেয় না।

ইসলামের এই সুন্দর প্রথাটিকে আমাদের দেশে বিকৃতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

অফিসের বড় কর্তা মনে করেন তার অধীনস্থ কর্মচারীরা তাকে সালাম দেবে। সমাজের নেতারা মনে করেন জনগণ তাদেরকে সালাম দেবে। ইমাম/মৌলভী সাহেবেরা মনে করেন সালাম তাদেরই প্রাপ্য। অর্থাৎ সালামকে অনেকেই পদমর্যাদার প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য করেন। ইসলাম ধর্মের এই সালাম প্রথার যথার্থতা অমুসলিম মনীষী কর্তৃকও স্বীকৃত। সালামে যে শব্দগুলো রয়েছে এর অর্থ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। কিন্তু অন্যান্য ধর্মালম্বীর সম্ভাষণ তা নয়। তবুও আমরা বিধর্মীয় প্রথাকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে অনুসরণ করছি।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানেরা ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত স্ব-স্ব ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পরস্পরকে সম্ভাষণ জানায়, করমর্দন করেন। ব্যতিক্রম শুধু দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বাংলাদেশে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী প্রথা অনুযায়ী সম্ভাষণ জানানো হয় না। আবার ব্যক্তি পর্যায়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা সালামের পরিবর্তে 'শুভেচ্ছা', 'শুভ রাত্রি', 'গুড মর্নিং', 'গুড ইভিনিং', 'শুভাশীষ' ইত্যাদি বলে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানায়। অথচ এ শব্দগুলোর একটিও ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় বহন করে না।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ব্যতীত অন্যের অনুকরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অনুকরণ করিও না। ইহুদীগণের সম্ভাষণ অঙ্গুলীর সংকেত দ্বারা এবং খ্রীষ্টানদের সম্ভাষণ হাততালির সংকেত দ্বারা। (তিরমিযী)

সালাম অর্থ আল্লাহর অভিভাবকত্ব, তাঁর আমানত ও সার্বিক নিরাপত্তা; সালাম মানে শান্তি, রহমত, মাগফিরাত, সৌভাগ্য, কামিয়াবী, নাজাত ও পূর্ণ নিরাপত্তা। সালামের পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আল্লাহর, প্রকৃত বান্দা তার পক্ষ থেকে মানুষসহ তামাম সৃষ্টি জগতের সবকিছুর জন্য সালামের প্রতিনিধি। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ মানুষ তা সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, সে ইবলিসের সাক্ষাত দোসর। সে জাহান্নামী। তার পদচারণা সর্বত্র জাহান্নামকে উজ্জীবিত করে। সে সার্থক, যে সালামের হক আদায় করে। সেইতো আল্লাহর যথার্থ প্রতিনিধি ও বন্ধু। তাই আল্লাহ পাক বলেন, "কল্যাণের দোয়া আল্লাহর নিকট হতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা খুবই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র।" শান্তিকামী মানুষকে যথার্থ সালাম দাতা হতে হবে।

শহীদ

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– "সকল মৃত্যুর মধ্যে শহীদী মৃত্যুই সর্বাপেক্ষা উত্তম। শহীদকে তোমরা মৃত্যু বলো না।" হাদীসে বলা হয়েছে– "যে ব্যক্তি ধর্ম রক্ষার্থে প্রাণদান করে সে শহীদ বলে অভিহিত হয়। যে ব্যক্তি আপন বিত্ত-সম্পত্তি রক্ষার্থে নিহত হয় সেও শহীদ এবং আপন পরিবার রক্ষার্থে নিহত হয় তাকেও শহীদ বলে গণ্য করা হবে আর যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থে নিহত হয় সেও একজন শহীদ।"

www.pathagar.com

অথচ আমাদের দেশে আজকাল এ পবিত্র 'শহীদ' শব্দটির অপব্যবহার হচ্ছে। যাকে-তাকে শহীদ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। নেতা-নেত্রীদের ক্ষমতার লড়াইয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে যারা নিহত হয় তারাও শহীদ নামে অভিহিত হয়। ছিনতাই, ডাকাতির মাল ভাগাভাগি নিয়ে প্রতিপক্ষের আঘাতে মারা গেলে সেও শহীদ হয়। দেশ, জাতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে চক্রান্ত অথবা আকাম-কুকাম করে মারা গেলেও এরা আমাদের দেশে শহীদ বলে অভিহিত হয়। এসব তথাকথিত শহীদেরা যে সব কারণে মারা যায় সে মৃত্যুকে কি সর্বাপেক্ষা উত্তম মৃত্যু বলা যায়? এদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড তা প্রমাণ করে না। এরা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে। পবিত্র কোরআনে এদের সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে– "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা উল্টো দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এই তাদের লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি, তবে তোমাদের আয়ত্তে আসার পূর্বে যারা তওবা করে তাদের জন্য নয়। সুতরাং জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (৯৫ সূরা মায়িদা ৩৩-৩৪)

পর্দা

আল্লাহপাক নারীর মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, জীবন ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে পর্দা প্রথা নাযিল করেছেন। পর্দা প্রথা নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হেফাজত করে। নর-নারীর অবাধ মেলামেশার ফলে সমাজে যে সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতির উদ্ভব হয় তা প্রতিহত করে। পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সংরক্ষিত করে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থার মূল বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে।

আমাদের দেশের কতিপয় নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী পাশ্চাত্য ভাব-ধারায় আচ্ছন্ন তারা মনে করে যে, পর্দা প্রথা নারী প্রগতির মারাত্মক অন্তরায়। তারা প্রচার করে থাকে ইসলাম নারীকে ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়। সুতরাং নারীর অধিকার ও মুক্তির জন্য পর্দা প্রথা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে।

আবার দেখা যায়, যে বয়সে পুরুষের কুদৃষ্টি থেকে নারীকে রক্ষা করা সবচেয়ে বেশি জরুরী সে সময়ে পর্দা করে না। পর্দা করেন শেষ বয়সে যখন পুরুষের কুদৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা নেই। তবে ইসলামে কিশোরী থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত পর্দা করার বিধান রয়েছে।

আমাদের দেশে কতিপয় অল্প শিক্ষিত (সবাই নয়) আলেম রয়েছে তারা উল্টোপাল্টা ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া চলবে না, বাইরে লেখাপড়া করতে যেতে পারবে না। অথচ রাসূলের (সাঃ) যুগে নারীরা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতেন। মহানবী (সাঃ) একজন মহিলা সাহাবীকে মদীনার বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) অত্যন্ত উঁচু দরের পন্ডিত ও

www.pathagar.com

হাদীসবেত্তা ছিলেন। বহু লোক দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষার জন্য মদীনায় আসতেন।

কয়েক বছর আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেখলাম ঢাকার বেইলী রোড অফিসার্স কোয়ার্টার মসজিদে এক আলেম জুম্মার দিন খুতবা-পূর্ব আলোচনায় বলেছেন, মেয়েরা ঘরের বাইরে যাবে না, যদি একান্তই যেতে হয় তবে ময়লা কাপড় পড়ে বেরুবে। তিনি আরো বলেছেন, মেয়েরা এমন বোরখা পড়বে যে, শুধু এক চোখে দেখার জন্য একটা ছিদ্র রাখবে।

এসব তথাকথিত অশিক্ষিত আলেমধারীর কারণেই আজকে ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামী রীতি-নীতিকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস করার সুযোগ পাচ্ছে। ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধান ও রীতি-নীতিতে মানব জাতির কল্যাণ ও সৌন্দর্যবোধ রয়েছে (যা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত)। ঠিক তেমনি পর্দা প্রথায়ও রয়েছে কল্যাণ ও সৌন্দর্যবোধ। আমরা এর দৃষ্টান্ত নিতে পারি, পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইরান, লিবিয়া, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের মেয়েদের বোরখার ব্যবহার থেকে। সে দেশের নারীরা এখন ময়লা ও একচোখা কিম্ভুতকিমাকার বোরখা পরে রাস্তায় বের হয় না। এদের বোরখা বা পর্দা ব্যবহারের রুচিশীলতা লক্ষ্য করা যায়।

ইমাম সাহেবের ফতোয়া অনুযায়ী বোরখা পরে মেয়েরা রাস্তায় বের হলে স্বাভাবিকভাবেই পাগল বলে উপহাস করবে। ইসলামের নামে এসব বাজে কথা চালিয়ে দেয়ায় এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচার আমাদের দেশের মেয়েরা পর্দা ব্যবহারে নিরুৎসায়িত হন। ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে গুরুত্ব দেয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তথা পবিত্রতাকে ঈমানের অঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ মেয়েরা ময়লা-নোংরা কাপড় পরে বাইরে বেরোবে এরূপ ফতোয়া ইমাম সাহেব কোথায় পেয়েছেন তিনিই জানেন। পর্দা সম্পর্কে ইসলামের মূল কথা হচ্ছে–

(১) মুখমন্ডল, হাত ও পা বাদে সমস্ত দেহকে আবৃত্ত করা, (২) দেহের অন্যান্য অংশের সাথে মুখমন্ডল, হাত ও পা আবৃত্ত করা, (৩) সমস্ত দেহসহ মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদের উপরও যেন কোন বেগানা পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে সে জন্য পোশাককেও আবৃত করা। তবে মেয়েরা অবশ্যই ময়লা-নোংরা কাপড় পরবে না। তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরবে। তবে তা জাঁকজমকপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হবে না যা পুরুষদের প্রলুব্ধ করতে পারে। শরীরের রূপকে আচ্ছাদিত করে রাখতে হবে। সে ক্ষেত্রেও হাত ও মুখমন্ডল খোলা রাখার বিধান রয়েছে। আবার হিযাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সহ-ধর্মিনীদের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজ্য অন্যান্য সবার জন্য তা নয়।

বাংলাদেশে লক্ষ কোটি নারী ছিন্নমূল। যাদের ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য নেই বাসস্থান বা কাপড়-চোপড়। অসংখ্য নারীকে সাধারণ দিন মুজুরের কাজ করতে হয় পুরুষদের সাথে। আবার এরা অশিক্ষিত মূর্খ। বেঁচে থাকার সংগ্রামই যাদের জীবনের একমাত্র পন্থা। তাদের ধর্ম-কর্মের মূল্যই বা কতোটুকু। তাই ইসলাম প্রথমে অগ্রাধিকার দেয় প্রতিকারের। প্রতিকারের পর ইসলাম তাগিদ দেয় প্রতিরোধের। প্রতিরোধের পর

www.pathagar.com

প্রতিবাদের শিক্ষা দেয় ইসলাম। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতিকার বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কতিপয় আলেম শুধু প্রতিবাদ জানায়। ফলে ইসলামের সুন্দর ও যুক্তিনির্ভর বিধি-বিধান নিয়ে জনমনে নানারূপ বিভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে।

ফতোয়া

মুসলিম বিদ্বেষী কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও আন্তর্জাতিক দালালেরা ইসলাম ধর্মের ফতোয়া ও তালাক প্রথাকে নিয়ে প্রচার মিডিয়াগুলোতে বিভিন্ন কৌশলে অপপ্রচার করছে। ফলে মুসলিম জনমনে বিশেষ করে বর্তমান বংশধরদের মধ্যে এ নিয়ে নানারূপ বিভ্রান্তির জন্ম

সম্প্রতি হাইকোর্ট কর্তৃক ফতোয়াবাজি নিষিদ্ধ করার পর একটি দৈনিকে এই কার্টুনটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমরা জানি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মানবিকতার লালন ও প্রোজ্জ্বলতম বিকাশের স্বাভাবিক নির্ধারিত বিধি-বিধানই ফতোয়া। স্বাভাবিকতার প্রবাহমান জীবন বৈচিত্র্যে ফতোয়া মানব জীবনের আদি-অন্ত অস্তিত্বে চিরদীপ্ত আইনী-নীতি। তাই মানবতার জীবন প্রবাহের সচলতার অস্তিত্বে কখনও সমাপ্তি নেই ফতোয়ার। ফতোয়া সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতম মানুষের জীবনের সহজাত কল্যাণে স্রষ্টা কর্তৃক বিধি-বিধানের আলোকে প্রাজ্ঞদের সর্বোচ্চ উপলব্ধি ও চেতনা। আর এ উপলব্ধি ও চেতনাই যুগে যুগে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মানবতা উজ্জ্বলতর থেকে গোটা বিশ্বের জনগোষ্ঠীর সঙ্গত অধিকার রক্ষণে দেদীপ্য। মূর্খতার পাশবিকতার অন্ধত্বে এর মূল্যায়নে এ পন্থা রুদ্ধকরণে যারা সোচ্চার হতে চায়, এরা আঁধারের আঘাতে চির অন্ধ গহ্বরে নিপতিত হবে– সন্দেহ নেই।

নারী-পুরুষের যুগল একক অবস্থানে নিজ নিজ অধিকার সংরক্ষণে ফতোয়া-ই একমাত্র রক্ষণ-নীতি। পরিপূরক যুগল এ শক্তিই সৃষ্টির স্বাভাবিক গতি প্রবাহে বহমান। চিত্রে এরূপ গতি প্রবাহে ব্যাহতকরণে ফতোয়ার প্রতীকে শেল বিদ্ধকরণের দৃষ্টতর চিত্রায়নে চির সত্য নির্দেশনার ব্যাহতকরণের অলীক ধৃষ্টতা অবশ্যই অযৌক্তিক ও হাস্যকর নিশ্চয়ই।

www.pathagar.com

দিচ্ছে।

এদেশের ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের নামে বিভিন্ন দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন। যেমন ব্রাহ্মণ ভোজন, দক্ষিণা, কন্যাদান, দেবদাসী ইত্যাদির মাধ্যমে পাপ মোচনের নামে অর্থ কামিয়েছেন এবং নিজেদের জৈবিক ক্ষুধা মিটিয়েছেন; ঠিক তেমনিভাবে ব্রাহ্মণদের অনুকরণে কতিপয় অপূর্ণাঙ্গ ইসলামী জ্ঞানধারী মোল্লা-মৌলভী বিভিন্ন মাছলা-মাছায়েলের নামে বৃটিশ আমল থেকে জীবিকা অর্জন করছেন। যা ইসলামের প্রকৃত বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

উদাহরণ স্বরূপ ব্যাভিচার ও ব্যাভিচারের অপবাদ রটনা সংক্রান্ত দন্ডবিধির কথাই ধরা যাক। বিয়ে, তালাক ও পর্দা সংক্রান্ত ইসলামী আইনবিধি এবং নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ সংক্রান্ত ইসলামের নৈতিক শিক্ষার সাথে এই দন্ডবিধির অত্যন্ত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। আল্লাহতায়ালা ব্যাভিচারকারী ও ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর জন্য এমন কঠোর সাজা নির্ধারণ করেছেন একটা বিশেষ সমাজে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে যে সমাজে মহিলারা সেজেগুজে অবাধে ও খোলাখুলিভাবে বিচরণ করে না, নগ্ন, অর্ধ নগ্ন ছবি, প্রেম-ভালোবাসা সম্বলিত কিচ্ছা-কাহিনী, যৌন আবেগে ক্রমাগত সুড়সুড়ি দেয়া অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির প্রচলন থাকে না, যে সমাজে বিয়ে করা সহজসাধ্য এবং বিয়ে বিচ্ছেদের ইসলামী বিধিসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় কেবলমাত্র সেই সমাজেই এই দন্ডবিধি প্রযোজ্য। এ ধরনের সমাজ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ দাবী জানাতে থাকে যে, সামাজিক আচরণের জন্য যে ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা সে ধারণ করছে, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কঠোর দন্ড প্রবর্তন করা হোক। বস্তুত যেখানে বৈধ উপায়ে যৌন লালসা চরিতার্থ করার সহজ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সামাজিক পরিবেশকে ব্যাভিচারের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টির উপকরণাদি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করা হয়েছে, সেখানে এ ধরনের কঠোর সাজা প্রবর্তন মোটেই অন্যায় নয়। এ ধরনের নির্মল পরিবেশেও যৌন অপরাধে লিপ্ত হওয়া কেবলমাত্র জঘণ্যতম অসচ্চরিত্রের লোকদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের অনাচার থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে রক্ষা করার জন্য ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু যে সমাজে এ ধরনের পবিত্র পরিবেশ বিরাজ করে না, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা রীতিসম্মত, যেখানে বিদ্যালয়ে, অফিস-আদালতে, ক্লাবে ও প্রমোদ কেন্দ্রে, গোপন ও প্রকাশ্য অঙ্গনে সর্বত্র এসব উদ্দাম ও উচ্ছৃংখল স্বভাবের পুরুষ ও বিচিত্র সাজে সজ্জিত নারীদের লাগামহীন মেলামেশা ও একত্রে ওঠা-বসার সুযোগ রয়েছে, যেখানে চারদিকে অগণিত কামোদ্দীপক উপকরণ ছড়ানো রয়েছে এবং বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে কামবাসনা চরিতার্থ করার সব রকমের ব্যবস্থা রয়েছে এবং যেখানে মানুষের নৈতিক মানের এতো অধোপতন ঘটেছে যে, অবৈধ সম্পর্ক মোটেই দূষণীয় মনে করা হয় না। এ ধরনের সমাজে ব্যাভিচার ও ব্যাভিচারের অপবাদ রটানোর শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুমের শামিল হবে। কেননা এ ধরনের পরিবেশে একজন

www.pathagar.com

সাধারণ মানের মধ্যম স্বভাবের ও সুস্থ মানসিকতার অধিকারী মানুষের পক্ষেও ব্যাভিচার থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কারো পাপে লিপ্ত হওয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, ঐ লোকটা অস্বাভাবিক ধরনের নৈতিক অপরাধী। প্রকৃতপক্ষে পাথর মেরে হত্যা ও বেত মারা শাস্তি এমন নোংরা ও ঘৃণ্য পরিস্থিতির জন্য আল্লাহ নির্ধারণই করেননি।"

আমাদের এ দেশে পরাধীন বৃটিশ আমলে প্রণীত নীতিমালা এবং অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহারের ফলে সাধারণ জনগণ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রতিকারহীনভাবে দৈহিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়– আমাদের দেশে যে হারে ভুল চিকিৎসায় প্রতি বছর লোক মারা যাচ্ছে এর নজির পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই। এর যদি বিচার হতো তাহলে দৈনিক ৭ থেকে ১০ জন ডাক্তারকে ফাঁসিতে ঝুলতে হতো। এতে এ দেশে ডাক্তারের অস্তিত্ব থাকতো না।

দেশের প্রচলিত আইনের ফাঁক দিয়ে কতো দাগী অপরাধী যে রেহাই পেয়ে যায় এবং কতো নির্দোষ ব্যক্তি ফেঁসে যায় এর কোনো ইয়ত্তা নেই। বিজ্ঞ বিচারক চর্ম চোখে অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারলেও আইনের বেড়াজালে প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারে না।

সরকারী প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা, আমলাসহ সমাজের উঁচু স্তরের ব্যক্তিদের ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ প্রায়ই হয়রানির শিকার হচ্ছে। অথচ এ নিয়ে কোনো সোচ্চার প্রতিবাদ নেই। যেমন প্রতিবাদ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত আইন 'ফতোয়া'কে নিয়ে।

'ফতোয়া' পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে মুসলমানদের আইনের উৎস। এই আইন অত্যন্ত নিখুঁত ও নির্ভুল। তাই 'ফতোয়া'কে নিষিদ্ধ করা যায় না। যারা ফতোয়ার অপব্যবহার করছে তাদের খুঁজে শাস্তি দেয়া যায়। অথচ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে বাহানা করে অথবা ঠুনকো অজুহাতে এই ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করার আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

মসজিদ

মসজিদ আল্লাহর পবিত্র ঘর। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববীতে বসেই পার্থিব ও পরকালের সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন। মদীনার তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ড মসজিদে নববীতে বসেই সম্পাদিত হতো। মুসলমানদের জন্য মসজিদ শুধু এবাদত-বন্দেগীর স্থানই নয়, গণসংযোগ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্র হিসেবেও বিবেচিত হতো। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি বিস্তারের কেন্দ্ররূপে মসজিদের ভূমিকা ছিলো মুখ্য। মসজিদ ছিলো মুসলমানদের শিক্ষাগার, বিচারালয়, পার্লামেন্ট, প্রেসিডেন্ট ভবন ও ক্যান্টনমেন্ট। মুসলমান সেনাবাহিনী এখানেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। মসজিদে সামরিক কুচকাওয়াজ ও মহড়া কার্য পরিচালিত হতো। রাসূল (সাঃ) আহতদের চিকিৎসার জন্য মসজিদে নববীতে হাসপাতালের

www.pathagar.com

ব্যবস্থাও করেছিলেন। এখানে বসেই তিনি বিদেশী কূটনীতিকদের সাথে সাক্ষাৎ প্রদান করতেন। কথিত আছে একবার বিদেশী ভিন্নধর্মী কতিপয় কূটনৈতিক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে সান্ধ্য প্রার্থনার সময় তাদেরকে মসজিদের একটি অংশে প্রার্থনার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে কল্পনাও করা যায় না।

এখানে উল্লেখ্য, ইসলামে নামাজের গুরুত্ব অত্যধিক কিন্তু আল-কোরআনে নামাজের উদ্দেশ্যে কোনো খাস সূরা নাযিল হয়নি যদিও ৮২ বা ৮৫ জায়গায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র জিহাদের উদ্দেশ্যে আল-কোরআনে সূরা আনফাল, সূরা তাওবা, সূরা আহযাব ও আরও কয়েকটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হয়েছে। নবী যুগের মুসলমান দ্বীন ইসলামকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই তলোয়ার ধরেছিলেন। আর সে তলোয়ার ছিলো তাঁদের দেহের ভূষণ। তাদের সাথে খাপে তলোয়ার থাকতো সর্বক্ষণ। সে তলোয়ার ছিলো সে যুগে সর্বোচ্চ যুদ্ধাস্ত্র। আল্লাহর নবী নামাজের সময় সে অস্ত্র রাখার জন্য পিছনে নয়; সামনে মেহরাব নামে কিছুটা জায়গা করে নিয়েছিলেন প্রতি মসজিদেই। মেহরাব মানে আমরা মনে করি ইমাম দাঁড়ানোর স্থান। এ ছাড়া অনেকে কৌতুক করে বলে থাকেন মিষ্টির প্যাকেট বা মিলাদের তাবারুক রাখার স্থান। কিন্তু আসলে 'হারবুন' অর্থ যুদ্ধ, তার থেকে 'মেহরাব' অর্থ যুদ্ধের অস্ত্র। যুদ্ধের অস্ত্র রাখার স্থানকেই মেহরাব বলে।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো মসজিদকে শুধুমাত্র এবাদত গৃহ হিসেবেই বিবেচনা করছে। উপাসনা করার পর মন্দির-গীর্জায় যেমন তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয় ঠিক তেমনি মুসলমানেরাও নামাজের পর মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেয়। মসজিদে দুনিয়াদারী কথা বলা যাবে না– এ হাদিস তারা কোথায় পেয়েছেন তারাই জানেন। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল সমস্যা আলোচনা ও কর্মকান্ড মসজিদে বসেই সম্পন্ন করেছেন। নিয়ম হচ্ছে মসজিদে যে কথা বলা যাবে না তা সমাজেও বলা যাবে না। আর যে কথা সমাজে বলা যাবে না তা মসজিদেও বলা যাবে না। মসজিদে জীবন সম্পর্কিত (পারিবারিক গোপন বিষয়, হাসি-ঠাট্টা ও অশ্লীল বাক্য ছাড়া) ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণে সব বিষয়ই আলোচিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মসজিদে দুনিয়াদারী কথা বন্ধ করে দিয়ে তাকে গীর্জা, মন্দির ও প্যাগোডার মতো গতানুগতিক উপাসনালয়ে পরিণত করা হয়েছে।

অনেকে বলে থাকেন ইসলামে রাজনীতি নেই। সে যুগের কোরআনিক বিধান এ যুগে অচল। তাই মসজিদে রাজনীতি নিষিদ্ধ। অথচ ইসলাম সর্বপ্রথম মানব কল্যাণে মসজিদভিত্তিক রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। সে কালের রাজনীতির উৎস ছিলো পবিত্র কোরআন। আর মসজিদ ছিলো রাজনীতির কেন্দ্রভূমি। পৃথিবীতে মানুষের আগমনের এ দীর্ঘ সময়ের প্রারম্ভিক দিকে পৃথিবীতে সুস্থ ও সভ্য রাজনীতি ছিলো না। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই ছিলো বিধান। এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তির জোরে উৎখাত করে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে। নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের

www.pathagar.com

লক্ষ্যে এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে হত্যা, নির্যাতন করে নিশ্চিহ্ন করেছে। প্রাক-ইসলামী যুগের ইতিহাস এর সাক্ষী। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাসের পাতায় এবং ভারতের পৌরানিক কাহিনীতেও তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। একমাত্র মুসলমান শাসকেরাই ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়কে এক সাথে সহাবস্থানের অধিকার দিয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ইসলাম ধর্মের আলোকে মুসলমান শাসকদেরই অবদান। সুতরাং এ পৃথিবীতে সুস্থ ও সভ্য রাজনীতি প্রবর্তন করেছে মুসলমানেরা আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এবং তা শুরু হয়েছে মসজিদকে কেন্দ্র করেই।

ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অসম্পূর্ণ। ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়; একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সুতরাং ইসলাম হতে রাজনীতি আলাদা করার কোনো উপায় নেই। যারা বলেন, মসজিদে রাজনীতি চলবে না, তারা বোধহয় ইসলামকে বোঝেনি, বুঝতে চেষ্টা করেননি। বা বুঝেও না বোঝার ভান করছেন। আর যারা বুঝেও এর বিরোধিতা করছেন এরা জ্ঞান পাপী, নয়তো ইহুদী-খৃস্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের ক্রীড়নক অথবা ইয়াজিদী শাসনের পৃষ্ঠপোষক।

যে রাজনীতির জন্ম হয়েছে মসজিদে তা প্রতারণা, মিথ্যাচার, সন্ত্রাস, লুটপাট, হত্যা, নির্যাতন, জনগণের সম্পদ হরণ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, দুর্নীতি, বিচারের নামে অবিচার এক কথায় তা জনগণের দুঃখ বয়ে আনার রাজনীতি নয়। যে রাজনীতি ও সংবিধান আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে এনেছিল তা আজ বৈজ্ঞানিক যুগে কেনো পারবে না। কোরআনিক সংবিধান এক দেশের, এক যুগের, এক জাতির জন্য নয়। এটি সর্বকালীন, সর্বদেশের, সর্বজাতির কল্যাণের সংবিধান। সকল সম্প্রদায় ও জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে সঠিক দিক-নির্দেশনামূলক সংবিধান। এ সংবিধানে সকল সম্প্রদায়ের, সকল জাতির অধিকার স্বার্থ সংরক্ষিত রয়েছে। এ সংবিধান যে জাতি, যে দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে সে জাতি বা দেশের মধ্যে নেমে এসেছে বিপর্যয়। বিশ্বের অনেক জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করলেও নৈতিক অবক্ষয়ে চরম সীমায় পৌঁছেছে। আবার অনেক জাতির নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন প্রত্যক্ষ ঘটলেও অর্থনৈতিকভাবে তারা ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হয়েছে। এককালে বিশ্বের বহু রাষ্ট্র ইসলামকে আশ্রয় করে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে, বাহুবলে ছিলো সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা আজ দরিদ্র, নিরক্ষর, অজ্ঞ এবং নিজেদের মাঝে সংঘাত-সংঘর্ষ ও রক্তারক্তিতে লিপ্ত। সোনালী যুগে মুসলমানেরা নামাজ, রোজা ও কোরআনের মতো মৌলিক এবাদতগুলোর পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কল্যাণের লক্ষ্যে অনেক কিছু নিয়ে গবেষণা করেছে। এক সময় মুসলমানেরা ধর্মভীরুতার পাশাপাশি ছিলো ধর্মবীর। আজকে মুসলমানেরা ধর্মভীরু বটে; কিন্তু ধর্মবীর নয়।

যেদিন থেকে মুসলমানেরা জ্ঞানের অবাধ ও অনুশীলন ত্যাগ করেছেন সেই দিন থেকে তার সৃজনশীলতার প্রবাহে দেখা দিয়েছে ভাটা, তাদের জাতীয় জীবনে শুরু হয়েছে পতন। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং কোরআনের অবজ্ঞা ইসলামকে অবজ্ঞা

www.pathagar.com

করারই সামিল। সুতরাং যারা বলেছেন, এ যুগে ইসলামিক আইন তথা কোরআনিক সংবিধান অচল তারা মূলতঃ অন্যদের স্বার্থকে সংরক্ষণ করছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যারা জামায়াতে এসে নামাজ আদায় করে না, আমার ইচ্ছে হয় সে সব ঘরে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেই। যেহেতু শিশু এবং মহিলা আছে এ জন্য তিনি এ কাজে বিরত রয়েছেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি জামায়াতে নামাজ আদায়ের তাগিদ দিয়েছেন সে উদ্দেশ্য আজকে ব্যাহত হচ্ছে। জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করলে অধিক ছওয়াব হাসিল করা যায় শুধু এ উদ্দেশ্যে অনেকে জামাতে নামাজ আদায় করে থাকেন। অথচ জামায়াতে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্য যেমন ছিলো ধর্মীয় তেমনি ছিলো সামাজিক ও রাজনৈতিক।

মুয়াজ্জিন যখন 'আল্লাহু আকবর' বলে সবাইকে নামাজের জন্য আহবান করে তখন সাদা, কালো, পন্ডিত-মুর্খ, বাদশাহ, ফকির একই মসজিদে, একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়ায়। মনিবের মাথা চাকরের পায়ে লাগে। সুতরাং জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মানুষ শ্রেণী বৈষম্য দূর করার, গণতন্ত্র ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য এবং এক ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে এক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের শিক্ষা পায়। মসজিদের এ প্রশিক্ষণ নিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা বাস্তবায়নই ছিলো জামায়াতে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করলে পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে দৈনিক পাঁচবার দেখা-সাক্ষাতে কুশলাদি বিনিময় হয়। সুখে-দুখে, দুর্দিনে, দুঃসময়ে একে অপরের সহমর্মিতা জানাতে এবং সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। এ ছাড়া জামায়াতে নামাজ আদায়ে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। বর্তমানে মসজিদ থেকে গঠনমূলক জীবন ব্যবস্থার কোনো সাজেশনই সমাজ ও জাতি পাচ্ছে না।

বাংলাদেশে প্রায় দুই লাখ মসজিদ রয়েছে। এসব মসজিদ কমিটির সদস্য পদ অধিকাংশই সমাজের প্রভাবশালীদের কুক্ষিগত। এরা আল্লাহ মানে। কিন্তু আল্লাহর আইন, আল্লাহর সংবিধান মানে না। এরা নামাজের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সঠিক জীবন ব্যবস্থার প্রার্থনা জানায়। অথচ নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়েই বিধর্মীয় জীবন ব্যবস্থায় ইহলৌকিক কল্যাণ প্রত্যাশা করে।

মসজিদের ইমাম সাহেবরাও এই তথাকথিত মসজিদ কমিটির হাতে জিম্মি। ইমাম সাহেবরা হন তাদের আজ্ঞাবহ। মসজিদ কমিটির যারা সদস্য হন তাদের মধ্যে অনেকেই কর্মজীবনে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। এরা শেষ বয়সে ধার্মিক সেজে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি এবং বেহেস্ত পাবার আশায় টুপি মাথায় দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করে কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা সদস্য বনে যান।

শোনা যায়, একদিকে তারা মসজিদ কমিটির সদস্য আর অন্যদিকে (সবার নয়) অনেকের ছেলেরা হয় সন্ত্রাসী গ্রুপের লিডার, নেতারা মসজিদ নির্মাণ করে আর ছেলেরা

www.pathagar.com

হত্যা, গুম, হাইজ্যাক, চাঁদাবাজি ও ধর্ষণের মতো জঘন্য অপকর্ম করে। ছেলে কোথায় যায়, কি করে, কার সাথে মিশে এর কোনো খবরই তারা রাখেন না।

শুক্রবারে পঠিত খুতবায় থাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য। অনেক মসজিদেই তা বাংলায় ব্যাখ্যা করা হয় না। ইমাম সাহেব আরবীতে খুতবা দেন। কিন্তু মুসল্লীরা তা বুঝেন না। তারা সওয়াবের আশায় চুপ করে তা শুনেন। আবার অনেকে চোখ বুঁজে ঘুমায়। কেউ কেউ সংসারের কথা চিন্তা করে। ফলে যে উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মে প্রতি শুক্রবারের খুতবা পাঠের বিধান রয়েছে তা ব্যর্থ হয়। '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ঘোষণা করেন, বাংলাদেশে এক মুসলিম অপর মুসলিমকে খুন করায় ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। বাংলাদেশ এখন খৃস্টধর্ম প্রচারের উপযুক্ত সময়। তখন যীশু খৃস্টের মহান বাণী প্রচারের জন্য এদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে তথাকথিত মিশনারীরা আসতে থাকে। তাদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষক হয় স্ব-স্ব দেশের সরকার। আজ ওরাই এনজিও নামে খ্যাত। এই এনজিওদের সেবামূলক কর্মকান্ড আপাতদৃষ্টিতে মানবিক হলেও উদ্দেশ্য মহৎ নয়। সেবার নামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীর মানুষকে ধর্মান্তরিত করার একটি কৌশল মাত্র। যেখানে যীশুখৃস্টের বাণী প্রচারের সুযোগ রয়েছে সেখানেই এরা শিক্ষার নামে, আর্ত-পীড়িতের সেবার নামে, উন্নয়নের নামে, দারিদ্র্য দূর করার নামে এগিয়ে আসে। নোবেল বিজয়ী মাদার তেরেসাদের মানবিক সেবার হাত কাশ্মীর, বসনিয়াসহ নির্যাতিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মুসলমানদের জন্য প্রসারিত হয়নি। সেখানকার মুসলমানেরা বহু রক্তের বিনিময়ে উচ্চমূল্য দিয়ে এসব নেংটি ইঁদুর ও শ্বেত ইঁদুরদের হাড়ে হাড়ে চিনেছে। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের হিন্দু-মুসলমানেরা ২৪০ বছরেও এদেরকে চিনতে পারেনি। চিনতে পারেনি বলেই ভারত-বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জন্য তেরেসার স্বজাতিদের ঘুম নেই।

অনেকে চিনতে না পারলেও কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী ভারতের শিবসেনা নেতা বালথ্যাকারে ঠিকই চিনেছে। গত ১৩/১১/৯৫ তারিখে বোম্বাই থেকে এএফপি'র বরাত দিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায়, ভারতের শিবসেনা নেতা বালথ্যাকারে নোবেল বিজয়ী মাদার তেরেসাকে অভিযুক্ত করে বলেছেন, তিনি সামাজিক কল্যাণের নামে দরিদ্র হিন্দুদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করছেন। বোম্বাইয়ের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাতকারে বালথ্যাকারে বলেন, মাদার তেরেসা মিশনারী কিংবা প্রশংসামূলক কোনো কাজ করছেন না; বরং তিনি চাতুর্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কাজ করছেন।

শিবসেনা নেতা বলেন, মাদার তেরেসার ভাবমূর্তি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেন তিনি স্বর্গ থেকে এ ধরনীতে নেমে এসে দরিদ্রদের জন্য কাজ করছেন। অথচ প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত বলে তিনি দাবী করেন। মাদার তেরেসা সুচতুরভাবে হিন্দুদের খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করছেন। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩/১১/৯৫)

কট্টর মুসলিমবিদ্বেষী বালথ্যাকারে মাদার তেরেসার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন

www.pathagar.com

সে অভিযোগ মুসলিম শাসনের ৫৫০ বছরেও কেউ করতে পারেনি। কারণ মানব সেবার নামে মুসলমানেরা কোনোদিন ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে কোনো ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করেনি।

সুতরাং এসব এনজিওদের খপ্পর হতে মুসলমানদের ঈমান, আকিদা রক্ষার্থে মসজিদভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ধর্ম চর্চার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সেবামূলক কর্মকান্ড নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। মসজিদভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের নিরক্ষরতা, চিকিৎসা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, আইন-শৃঙ্খলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ বহুবিধ সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

গাড়িতে চড়ে আলোকসজ্জিত মঞ্চে শুধুমাত্র ওয়াজ নসিহত করে এনজিওদের প্রতিরোধ করা যাবে না। বগুড়ার কাহালু গ্রামের মুফতি মোঃ ইব্রাহীমের ন্যায় মানব কল্যাণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে এনজিওদের মোকাবেলা করা সম্ভব। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে মুসলমানেরা আজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে বসনিয়া-লেবাননের জনগণের মতো পরিণতি আমাদেরও ভোগ করতে হবে।

আমাদের দেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ বলেছেন– "অদৃষ্টের গোলামী হতে ইসলাম মুক্তি ঘোষণা করেছে। ইসলাম জীবনের ধর্ম, সাধনার ধর্ম, কর্মের ধর্ম, ইসলামে যে সত্যিকার অনুসারী সে এ জগতে বাঁচবে এবং প্রকৃত মানুষের মতো বাঁচবে। তার সে বাঁচবার পথে শ্রেষ্ঠতম সম্বল হবে তার সাধনা, তার কর্ম।"

মহাকবি ইকবাল বলেছেন–

"ছবক ফের পড়হো ছাদাকাত-কা,
আদালত-কা, শুজাআত-কা,
লিয়া জায়েগা তুঝছে কাম
দুনিয়া কি ইমামত-কা।"

অর্থাৎ আবার তোমরা ন্যায়, হক বিচার, সৎ সাহসের অনুশীলন কর; দুনিয়ার নেতৃত্ব তোমরাই পাবে।

মহররম

হিজরী সনের প্রথম মাস মুহররম। এ মাসটি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ মাসের দশ দিনকে আশুরা বলে ইসলামী ইতিহাসে এই দিনের মাহাত্ম্য বিশ্লেষিত হয়েছে। এদিনের নিম্নোক্ত ঘটনাবলী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন (ক) মহান আল্লাহপাক এই দিনে আরশ, কুরসী, লাওহে মাহফুজ, আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং এদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছেন। (খ) এই দিনেই মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে (মতান্তরে শবে কদর রাতে) এবং তারপর এই দিনেই তাঁকে আল্লাহর খলিফা মনোনীত করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। (গ) এই দিনেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ধূলার ধরণীতে আগমন করেন এবং এই দিনেই তিনি কুখ্যাত নমরুদের প্রজ্জ্বলিত অনলকুন্ড হতে মুক্তি লাভ করেন এবং পরবর্তীতে নিজের প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)কে আল্লাহর নামে কুরবানী করার উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে 'খলিলুল্লাহ' উপাধি লাভে ধন্য হন। (ঘ) এই দিনেই হযরত নূহ (আঃ)-এর কিশতি পৃথিবীতে প্রলয়ংকারী তুফানের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিল এবং জুদী পর্বতের চূড়ায় নোঙর করেছিল। (ঙ) হযরত আইয়ুব (আঃ) দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর এই দিনেই সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় হয়ে উঠেছিলেন। (চ) এই দিনেই হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ পাক এই দিনেই তাঁকে জালিম ইহুদীদের চক্রান্তের বেড়াজাল হতে বিমুক্ত করে চতুর্থ আকাশে উত্থিত করেছিলেন। (মতান্তরে শবে কদর রাতে) (ছ) এই দিনেই হযরত দাউদ (আঃ) স্বীয় পদস্খলনের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট হতে ক্ষমা ও অনুকম্পা লাভ করেছিলেন। (জ) এই দিনেই হযরত সুলায়মান (আঃ) তাঁর হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। (ঝ) এই দিনেই হযরত ইউনুস (আঃ) চল্লিশ দিন মাছের পেটে অবস্থান করার পর আল্লাহর করুণাবলে মুক্তিলাভ করেছিলেন। (ঞ) আর এই দিনেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় হারানো পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ)কে ফিরে পেয়েছিলেন। (ট) এই মর্যাদাপূর্ণ দিনেই ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া হযরত মূসা (আঃ)কে নদীর ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। (ঠ) এই দিনেই হযরত মূসা (আঃ) ৭০ হাজার বনী ইসরাইলীদের নিয়ে অলৌকিকভাবে নীল দরিয়া অতিক্রম করে মুক্তির নিঃশ্বাস পেয়েছিলেন এবং এই দিনেই অভিশপ্ত ফেরাউন তার দলবলসহ নীল নদীতে ডুবে ধ্বংস হয়েছিলেন। (ড) মহান রাব্বুল আলামীন এই দিনেই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বপ্রথম দুনিয়াতে আকাশ হতে বৃষ্টিবর্ষণ করেছে। (ঢ) আর এই দিনেই কোনও এক শুক্রবারে আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) শিঙ্গায় ফুৎকার করবেন এবং এই বিশাল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। মোট কথা, সৃষ্ট জগতের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই এই আশুরার দিনে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং ইতিহাস সাক্ষী যে, শুধু মুসলিমই নয়, বরং সকল ধর্মের লোকদের কাছে এ দিনটি পবিত্র, সম্মানীত ও আনন্দের দিন। ফলশ্রুতিতে এই দিনটির মাহাত্ম্য ও ফযিলত বহু গুণে বৃদ্ধি লাভ করেছে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায় যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের চতুর্থ খলিফা সাইয়্যেদেনা হযরত আলী (রাঃ) শাহাদাত বরণ করার পর আমীর মুয়াবিয়া মুসলিম জাহানের নেতৃত্বের আসনটি দখল করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় পুত্র এজিদকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদে মনোনীত করেন। কিন্তু সাইয়্যেদেনা হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এজিদের মনোনয়নকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি এবং তার হাতে 'বায়আত' গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। যার ফলে পবিত্র মুহররম মাসের ১০ তারিখ আশুরার দিনটি মুসলিম জাহানের কাছে এক হৃদয়বিদারক ও স্মরণযোগ্য দিন হিসাবে স্মৃতির পাতায় অম্লান হয়ে রয়েছে। এই দিনে ক্ষমতালোভী, নিষ্ঠুর, দূরাচার এজিদ বাহিনী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) ও খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) এর আদরের ধন, নয়নের মণি, সত্যের

www.pathagar.com

অকুতোভয় শহীদ সৈনিক সাইয়্যেদেনা হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) ও তাঁর ৭২ জন সঙ্গী-সাথীকে কারবালা প্রান্তরে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করেছিল। এ জন্য এই দিনটি মুসলিম মিল্লাতের নিকট যেমন বেদনার বার্তা বহন করে আনে, ঠিক তেমনিই সত্যাশ্রয়ী জীবনযাত্রার আশার আলোও সঞ্চারিত করে।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, এ দিনে দু'হাজার পয়গম্বর পৃথিবীতে আগমন করেছেন। আর এদিনে আল্লাহতায়ালা দু'হাজার পয়গম্বরের দোয়া কবুল করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আশুরার দিনে হযরত আদম (আঃ) এর উপর এবং অন্যান্য উম্মতদের উপর সিয়াম সাধনা বা রোজা রাখা ফরজ ছিলো।

মহানবী (সাঃ) আরো বলেছেন, মাহে রমজানের রোজার পরই পবিত্র মহররম মাসের ১০ তারিখ আশুরার রোজা অতি উত্তম। তাই মহানবী (সাঃ) আশুরার দিন নিজে রোজা রেখেছেন এবং মুসলমানদেরকে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে সর্বাধিক আবেদনময় ও তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। এর আগে এ দিনটি ছিলো ইসলামের ইতিহাসে আনন্দ ও উৎসবের দিন। বিগত শতাব্দী থেকে এ দিনে মুসলমানদের ইসলাম বিরোধী বিশ্বাস ও আচার পালন করে আসছে। গোঁড়া নিষ্ঠাবান শিয়া ও সুন্নী মুসলমানরা মহররম মাসের দশ দিন শোকের সময় বিবেচনায় রোজা রাখে, দান খয়রাত করে, সংযম পালন করে আহারে বিহারে। আবার শিয়া সম্প্রদায় হিন্দু সন্ন্যাসীদের চড়ক পূজার অনুকরণে মহররমের সময় মেতে উঠে আত্ম নিগ্রহে। গন্ডদেশে শলাকা বিদ্ধ করে বা উভয় ওষ্ঠ ছিদ্র করে তাতে তালাচাবি এঁটে রাখে। শোক প্রকাশের নামে দু'দলের লাঠি মারামারি, নিজের শরীর থেকে রক্তে বের করা, রামদা চালাতে চালাতে আহত হওয়া, বিরাট জাঁকজমক করে কাল্পনিক কবর তৈরী করা, হিন্দুদের প্রসাদের ন্যায় সাধারণ খাবার রেখে এ দিনেই খিচুরী খাওয়া ইত্যাদি মনগড়া কাজ প্রচলন হয়ে আসছে। মহররম উৎসব এবং দুর্গা পূজার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন বিদেশী পর্যটকেরাও। বৃটিশ আমলে দুর্গা পূজার মতো মহররমের স্থায়ীত্বকালও দশ দিন ছিলো। বাদ্য বাজনা সহকারে শোভাযাত্রা করে হিন্দুরা যেভাবে দুর্গা প্রতিমাকে নদীতে বিসর্জন দিতো ঠিক তেমনি মুসলমানেরাও জাঁকজমকপূর্ণ মিছিল বের করে মহররমের তাজিয়া বিসর্জন দিতো। আবার জনৈক ইংরেজ লেখক মহররমকে তুলনা করেছেন হিন্দুদের রথ যাত্রার সঙ্গে। এর উক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে সকল সন্দেহের নিরসন হবে বর্তমান কালের ঢাকায় মহররম উৎসব লক্ষ্য করলে। বাদ্য-বাজনা, হৈ-চৈ সহকারে মিছিল বের হয় মর্সিয়া গানের। প্রকান্ড মেলা বসে ঢাকার আজিমপুরে, নবাবপুরে, সদরঘাটে, হুসেনী দালানে। মিছিলের অন্যতম আকর্ষণ তাজিয়ার সম্মুখে দেখতে পাওয়া যায় মানত শোধের নানা উপকরণ চাল, পয়সা, ফুল, মিঠাই এমনিক খাসী, মুরগী, কবুতর পর্যন্ত।

এ ছাড়াও তাজিয়া মিছিলের নামে বাদ্য বাজিয়ে রং ছিটিয়ে অনেকেই আনন্দ মিছিল করে। আশুরা ও শাহাদাতে কারবালার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। কোন কোন জায়গায় এমনও দেখা যায়, মাটি দিয়ে দু'টি শির তৈরী করে লাল-কালো কাপড় জড়িয়ে

www.pathagar.com

হযরত ইমাম হাসান, হোসাইন বানিয়ে ভক্তি প্রদর্শন করা হয়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে মূর্তি পূজার শামিল।

আজ বিশ্বের ইতিহাসে মুসলমানগণ শিয়া ও সুন্নী নামে দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে। শিয়া সম্প্রদায় এ দিনে কালো পোশাক পরে এবং হায় মাতম, হায় মাতম করে দুঃখ প্রকাশ করে থাকে। জানি না শিয়া সম্প্রদায়ের এই আনুষ্ঠানিকতা ইসলামে কতটুকু বৈধ। কিন্তু সুন্নীরা এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন দুঃখ প্রকাশ করে না। তবে অনেকে খিচুড়ী পাক করে নিজেরা খায়, গরীবদেরকে বিলায়। বিশেষজ্ঞদের মতে পবিত্র আশুরার প্রকৃত শিক্ষা হতে মুসলমানদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়াই এসব ইসলাম বিরোধী ক্রিয়া-কর্মের প্রধান লক্ষ্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কারবালা প্রান্তরের সেই লোকহর্ষক মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অচেতন। সেদিন এ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই। ইমাম হোসাইনের সেদিনের জিহাদ অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রাম। স্বৈরশাসন ও দমননীতির বিরুদ্ধে ধৈর্য্য, শৌর্য, অটল অটুট মনোভাব নিয়ে রুখে দাঁড়ানোর সংগ্রাম। মহররমের শিক্ষা শুধু ছিলো এবাদত বন্দেগী ও দোয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মহররমের শিক্ষা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সুতরাং কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের সাথে কুখ্যাত এজিদের সংঘাত ছিলো সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক; ধর্মীয় নয়। এজিদ ইমাম হোসাইন (রাঃ)কে ধর্মীয় ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন বটে কিন্তু খিলাফতের ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ার কারণেই সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শাহাদাতের ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিল ইমাম হোসাইন (রাঃ)কে। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীতে চালু হয় ধর্মবিহীন এজিদী শাসন ব্যবস্থা। যা আজও পৃথিবীর অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবর্তিত। এজিদী শাসন ব্যবস্থা থেকেও নিকৃষ্ট সময় অতিক্রম করছে বর্তমান মুসলমানেরা। এজিদ কখনো ইমাম হোসাইন (রাঃ)কে বলতে সাহস পাননি 'হুজুর আপনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নাতি, আপনি ধর্ম নিয়ে থাকেন, আমি রাজনীতি নিয়ে থাকি। পবিত্র ধর্মকে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে ধর্মকে অপবিত্র করবেন না। কিংবা এজিদ মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়ার ঔদ্ধত্যও প্রকাশ করেননি। এখন তাও বলা হচ্ছে।

তাই পৃথিবীর বুক থেকে এই এজিদী শাসন ব্যবস্থা উৎখাতের শপথ নিতে হবে প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানকে। কারবালার ন্যায় জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এটাই হলো আশুরার প্রকৃত শিক্ষা। আশুরায় ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর শাহাদাত নিয়ে শোক ও মাতম করার শিক্ষা দেয় না। কবি নজরুল আশুরার প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরেছেন স্বচ্ছ আয়নার মতো অতি সুন্দর ও সহজ বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে। কবি বলেন ঃ

"হাসানের মত পিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের;

www.pathagar.com

আস্‌গর সম দিব বাচ্চারে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, দেব আজ গোর জান্!
সকীনার শ্বেত বাস দেবো মাতা-কন্যায়,
কাশিমের মত দেবো জান্ রুবি, অন্যায়।
মোহররম! কারবালা! কাঁদো "হায় হোসেনা!
দেখো মরু সূর্য এ খুন যেন শোষে না!"

আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। বিশেষজ্ঞদের মতে 'বিষাদ সিন্ধু' কোনো ইতিহাস নয়। এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা উপন্যাস মাত্র। কাল্পনিক রং লাগিয়ে এটাতে ইতিহাস বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।

এই গ্রন্থের মাধ্যমে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর চরিত্রকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যা সত্যের সম্পূর্ণ খেলাফ। যার মধ্যে সত্যের কোনো নাম গন্ধও ছিলো না। বিষাদ সিন্ধুতে যুদ্ধের মূল কারণ হিসাবে দেখান হয়েছে একটা বিবাহ সংক্রান্ত বিবাদ। কিন্তু এর মূল কারণ ছিলো ইয়াজিদের অবৈধ খেলাফতির স্বীকৃতি না দেয়া। এই গ্রন্থে ইমাম হুসাইনের চরিত্রকে উল্টোভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই উপন্যাসটি পরাধীন বৃটিশ আমলে প্রকাশিত হয়েছিলো। অনেকে মনে করেন এই উপন্যাসটি প্রকাশে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো।

এ সম্পর্কে খন্দকার আবুল খায়ের রচিত 'সওয়ার জবাব' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামকে মিথ্যা ধর্ম হিসাবে প্রমাণ করা এবং ইসলামের মহান ব্যক্তিদেরকে চরিত্রহীন হিসাবে সমাজের সামনে তুলে ধরা। ইংরেজ সরকার যখন দেখলো মীর মোশাররফ হোসেনের দ্বারা তাদের একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হচ্ছে তখন তারা একটা ব্যবস্থা করলো যা হয়তো আমরা খুব কম লোকেই ভেবে দেখে থাকি। তা হচ্ছে এই যে, তৎকালীন বাংলাদেশের প্রায় এক লাখ গ্রামের প্রতি গ্রামে যেন ২/৪টি বিষাদ সিন্ধু পৌছে যায় এবং এ বইটিকে যেন মুসলমানরা একটা ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করে। এ জন্যে যতো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা দরকার ছিলো তা তৎকালীন সরকার করেছেন। প্রতি গ্রামে কমপক্ষে দু'টি করে বই পৌছালেও ২ লাখ বইয়ের দরকার হয়েছিলো। এটা যে একজন লেখকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্ভব ছিলো না তা বুঝতে কারো পক্ষেই কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

ইংরেজদের যে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর ব্যাপারে বিরাট মাথা ব্যথা ছিলো তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। বিশেষ করে যে কারণে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) জীবন দান করেছিলেন এবং এর পিছনে যে ইসলামী ও রাজনৈতিক চেতনা ছিলো তা যদি এ দেশের মুসলমানদের মাথায় একবার ঢুকে যায় তাহলে যে তাদের গদির ভিত নড়বড়ে হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে এ দেশ ছাড়তে হবে এ ভয় তাদের ছিলো। এ কারণেই বিষাদ সিন্ধুর মাধ্যমে চেয়েছিলো মুসলমানদের ইসলামী জিহাদী চেতনাকে কালো পর্দা দিয়ে ঢেকে দিতে। কিন্তু আগুন যেমন খড়কুটো দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না

www.pathagar.com

তেমন তারাও কারবালার মূল চেতনাকে ঢেকে রাখতে পারেনি।

সে প্রায় ৮০ বছর আগের কথা হবে। একদিন দৈনিক আজাদে একটা ঘটনার কথা পড়লাম যা কলকাতায় ঘটেছিলো।

একদিন খৃস্টান ধর্মযাজকগণ এক ধর্মীয় সভা ডেকে বহু মুসলমান একত্রিত করে ওয়াজ করে বুঝাচ্ছিল যে, যীশুখৃস্টই সর্বশেষ নবী এবং খৃষ্টধর্মই একমাত্র সঠিক ধর্ম। যে দিন এই মাহফিল হচ্ছিল সেইদিনই ঘটনাক্রমে দিল্লী থেকে মরহুম মওলানা শাহ্ আব্দুল আজীজ দেহলবী (রঃ) কলকাতা আসেন এবং এসেই শোনেন যে, খৃস্টানরা মুসলমানদের মধ্যে ওয়াজ করতেছে। শুনে তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে হাজির হন।

মওলানা সাহেবকে যারা চিনতো তারা সবাই উঠে দাঁড়ালো, সালাম করলো। খৃস্টান ধর্মযাজকরা পরিচয় পেয়ে তাকে নিয়ে মঞ্চে বসালো। তারা ভাবলো মাওলানা সাহেবকে এমন প্রশ্ন করবো যে, প্রশ্নের দ্বারাই প্রমাণ করে দেবো যে, ইসলাম সত্য ধর্ম নয় এবং মুহাম্মদ (সঃ)ও প্রকৃত রাসূল নন (নাউযুবিল্লাহ)। তারা প্রশ্ন করলো ঃ

পাদ্রি ঃ আচ্ছা মওলানা সাহেব আপনারা বলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নাকি আল্লাহর খুব পেয়ারা দোস্ত ছিলেন এটা কি ঠিক?

মাওলানা ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই ঠিক।

পাদ্রি ঃ তিনি তার নাতি ছেলে ইমাম হুসাইন (রাঃ)কে নাকি খুবই ভালো বাসতেন, এটা কি ঠিক?

মাওলানা ঃ হ্যাঁ, এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

পাদ্রি ঃ আচ্ছা মাওলানা সাহেব আপনারা বলেন, বেহেশতের মধ্যে কেউ আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে যায়, এটা কি ঠিক?

মাওলানা ঃ হ্যাঁ, এটাও ঠিক।

পাদ্রি ঃ আচ্ছা ইমাম হুসাইন (রাঃ) যখন শত্রুর সম্মুখীন হলেন, তাকে যখন শত্রুরা হত্যা করতে উদ্যত হলো তখন রাসূল কোথায় ছিলেন?

মাওলানা ঃ বেহেশতে ছিলেন।

পাদ্রি ঃ তিনি জানতে পারেন নাই যে তার প্রিয় নাতি ছেলেকে শত্রুরা মারতে যাচ্ছে?

মাওলানা ঃ হ্যাঁ জানতে পেরেছিলেন।

পাদ্রি ঃ আচ্ছা যদি বেহেশতে বসে আল্লাহর কাছে বলতেন যে, আল্লাহ আপনি আমার দোস্ত আর আমিও আপনার দোস্ত এবং শেষ রাসূল। আপনি আমার নাতিকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করে দিন। তাহলে তো তার নাতিকে কেউ মারতে পারতো না। তা কি তিনি মুনাজাত করে বলেছিলেন?

মাওলানা ঃ হ্যাঁ তা বলেছিলেন।

পাদ্রি ঃ তা যদি বলে থাকেন তাহলে সে দোয়া কবুল হলো না কেনো? একে তো রাসূলের দোয়া, তাও একেবারে বেহেশতে বসে।

www.pathagar.com

মাওলানা ঃ রাসূলের দোয়া কবুল করতে না পেরে আল্লাহ্ হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

পাদ্রি ঃ কি বলেন মাওলানা সাহেব, আল্লাহ্ পারেন না, এ কেমন কথা বললেন? আর আল্লাহ্ কি কাঁদেন?

মাওলানা ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্ বললেন, দেখুন আপনি আমার বন্ধু আর হুসাইন হলো আপনার নাতি। আর ঈসা যে আমার নিজের ছেলে। তাকে যখন শত্রুরা মারলো তখনও তো আমি তাকে উদ্ধার করতে পারিনি। আর আপনার নাতিকে আমি কি করে উদ্ধার করবো।

পাদ্রি ঃ Oh you are very dengerous fellow ওহ্, আপনি তো বড় সাংঘাতিক বিপজ্জনক ব্যক্তি দেখছি।

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় ইংরেজরা কি চেয়েছিলো।

ধর্মীয় কুসংস্কার

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যে ধর্মভীরু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবহমানকাল ধরে এদেশের মুসলমানেরা (কতিপয় ধর্মদ্রোহী ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বাদে) কাজ শুরু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ', কাজ শেষ করার পর শুকুর আলহামদু লিল্লাহ, বিদায়ের প্রাক্কালে খোদা হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ, ফি আমানিল্লাহ, কোন কাজ করার সংকল্প করার পূর্বে 'ইনশাআল্লাহ', সভা-সমাবেশ ও মিছিলে 'আল্লাহু আকবর' বলে থাকে। এ শব্দগুলো এদেশের মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শত চক্রান্ত সত্ত্বেও এদেশের মুসলমানদের জীবন থেকে এ শব্দগুলো বাদ দেয়া যায়নি। তাই ইসলামের শত্রুরা এদেশের ধর্মভীরু মুসলমানদের ঈমান-আকিদা ও বিশ্বাসের পরিপন্থী বিধর্মীয় রীতি-নীতি বিভিন্ন কৌশলে মুসলিম সংস্কৃতিতে ঢুকিয়ে দেয়। ক্রমান্বয়ে এদেশের মুসলমানেরা তাদের লোকাচারের মাধ্যমে বিদায়াত, কুফরী ও শেরকী কর্মকান্ডে নিজেদের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ে। গত দু'শ' বছরের লোক ঐতিহ্য ও লোকাচারের ইতিহাস জ্বলন্ত প্রমাণ।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে এমন অনেক মুসলমানও বিভিন্ন কুসংস্কারে বিশ্বাসী। সকালে পবিত্র কোরআন পাঠ করে এমন অনেক ব্যক্তি দোকানে গিয়ে বিক্রির প্রথম টাকাটা কপালে ছোঁয়ায়। কোন কাজ করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করে। আবার নৌকা ছাড়ার পূর্বে পাঁচ পীরের দোহাই অথবা বদর বদর বলে নৌকা ছাড়ে। বিপদ-আপদে পবিত্র কোরআন খতম দেয়। আবার শীতলা দেবী ও গঙ্গা মার নামে ভোগ দেয়। রোগে-শোকে আল্লাহকে ডাকে, আবার বিভিন্ন পয়গম্বর ও দেব-দেবীর দোহাই দেয়। অনেক মুসলমান ইসলামের মৌলিক এবাদত বন্দেগী না করলেও কল্যাণের আশায় পীরের দরগায় মানত দেয়; পীরের নিকট ছুটাছুটি করে। ধর্মের নামে এসব কুসংস্কার অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। এক সময়ে এদেশের মানুষ কুফরী ও শেরকী কর্মকান্ডে ডুবে ছিল। ইসলাম ধর্ম আগমনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে এসব

www.pathagar.com

কুফরী, শেরকী ও বেদআতী কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে যায়। অশিক্ষিত সম্রাট আকবরের রাজ্যত্বকাল থেকে ক্রমান্বয়ে তা আবার শুরু হয়।

শাহজাদা সেলিম ও হিন্দু যোগী

প্রথম জীবনে আকবর অত্যন্ত ধর্মভীরু একজন পরহেজগার মুসলমান ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তিনি জামাতের সাথে আদায় করতেন। এমনকি কোথাও সফরে বের হলে ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বের হতেন। এসব কারণে চতুর্দিকে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র ষোল বছর বয়সে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তখন রাজনীতিতে আকবর ছিলেন একেবারে অজ্ঞ। এ সুযোগটিই হিন্দুরা গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অত্যন্ত সুকৌশলে তাগুতি শক্তি সম্রাট আকবরকে আয়ত্ব করে নেয়। দ্বীনে এলাহী নামে এক নতুন ধর্মের উদ্ভব করে মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে যায়। (তথ্য ঃ মাসিক মদিনা, নভেম্বর '৯৩)

শ্রী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী 'টেকনাফ থেকে খাইবার' গ্রন্থে লিখেছেন–

"বুদ্ধি-মেধা, বীর্যের দিক থেকে সম্রাট আকবর যে মুসলিম শাসকদের শ্রেষ্ঠতমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এটা তার চরম শত্রুও স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু কুসুমে কীটের ন্যায় আকবরের চরিত্রে একটি দুর্বলতা দানা বেঁধে উঠেছিল। বিরাট সাফল্যের বুকে সৃষ্ট চরম অহমিকায় আঁতুড় ঘরেই এ কীট জন্ম নিয়েছিল। এ কীটের রূপ ও অবয়ব গভীরভাবে পরখ করেই রাজপুতদের অবয়বে হিন্দু প্রতিভা রাজপুত সুন্দরীদের মোঘল হারেমে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে সততা প্রমাণের জন্য সম্রাট আকবর ইসলামের অনেক বিধি-নিষেধ অমান্য করতে শুরু করেন। মুসলমানগণ বহু ধর্মীয় অধিকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ দেশে মূর্তিপূজা ও অগ্নি পূজার অবাধ অধিকার লাভ করেন। শাহী মহলে মূর্তিপূজা, অগ্নি পূজা একটি নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।"

জামাল উদ্দিন আকবার শাহ গাজী স্বয়ং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা পরে চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে দরবারে উপস্থিত হতে লাগলেন। এটিই "শঠে শাঠ্যাং নীতি"। তারা সম্রাট আকবরকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে "দিল্লীশ্বরো বা জগাদিশ্বরো"

www.pathagar.com

এই ধ্বনিতে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে সম্রাট আকবরের মতিভ্রম ঘটিয়েছিল। সম্রাট আকবরের প্রশংসা কীর্তনে তারা এতোদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, দেবী বন্ধনা রচনার ক্ষেত্রেও হিন্দু ভক্ত কবি গেয়েছেন ঃ

"হেথা একদেশ আছে নাথে পঞ্চগৌর।
সেখানে রাজত্ব করে বাদশা আকবর।
অর্জনের অবতার তিনি মহামতি।
বীরত্বে তুলনাহীন জ্ঞানে বৃহস্পতি।
ত্রেতা যুগে রাম জেন অতি সযতনে।
এই কুলযুগোভুপ পারে প্রজাগণে।"

(টেকনাফ থেকে খাইবার, পৃঃ ৪৮, ৪৯)

হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাতে 'আদাব' বলে সৌজন্য বিনিময় করে থাকেন। অনেক সময় মুসলমানেরাও হিন্দু বয়জ্যেষ্ঠ বা ধনী বাবুদের 'আদাব' বলে সৌজন্য প্রকাশ করে থাকেন।

হিন্দুরা সাধারণত 'নমস্কার' এবং মুসলমানগণ পরস্পর সাক্ষাতে 'আস্‌সালামু আলাইকুম'; অর্থাৎ "তোমার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষণ হউক", এভাবেই সালাম বিনিময় যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ছিল।

শাসনতন্ত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সমান মর্যাদা দিতে গিয়ে মোঘল সম্রাট আকবর মুসলিম সংস্কৃতি এমনকি ইসলামের মৌলিক নীতিতেও অনেক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তিনি চিরাচরিত সালাম প্রথা বিলোপ করে "আল্লাহু আকবর" অর্থাৎ আকবরই আল্লাহ এবং উত্তরে 'জাল্লে জালালুহু' বলার নিয়ম প্রচলন করেন।

হিন্দুরা এতেও আপত্তি জানালেন। তাঁরা বললেন প্রভু, আমরাই আপনাকে "দিল্লীশ্বরৌ-জগদীশ্বরৌ" বলে সম্বোধন করি। আপনি সালাম বিনিময়ের সময় 'আল্লাহ্' শব্দটি ব্যবহার করলেন কেন? আল্লাহ তো হিন্দু বিরোধী শব্দ, অতএব ওটা তুলে দিন।

আকবর হিন্দুদের কথায় সায় দিয়ে ঘোষণা করলেন– আজ থেকে আল্লাহ এবং সালামের পরিবর্তে 'আদাব' শব্দ ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত সৃষ্টি সেই 'আদাব' আজও সালামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি সম্রাট আকবর ইসলামের মূলমন্ত্র কলেমা তাইয়্যেবাকে পরিবর্তন করে তার নিজের নামে কলেমার নতুন বাদশাহী ফরমান জারি করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে নিরক্ষর এই শাসক ভারতবর্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছিলেন। যে আগুন আজও জ্বলছে।

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর দেওয়ালী উৎসব পালন করতেন। শিবরাত্রিতে তিনি আহার করতেন যোগীদের সঙ্গে একত্রে বসে। সিকান্দার তাঁর পিতা আকবরের শ্রাদ্ধেরও অনুষ্ঠান করেছিলেন তিনি হিন্দুদের অনুকরণে। নবাব আলিবর্দী খাঁর দু'ভ্রাতৃপুত্র এবং তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাও মহা ধুমধামের সাথে হোলি খেলা উৎসব পালন করতেন। জীবনের শেষ মুহূর্তেও কীর্তেশ্বরীর চরণামৃত পালন করেছিলেন মীর জাফর আলী খান।

www.pathagar.com

এভাবেই চতুর্মুখী চক্রান্তের কারণে মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসে হিন্দু প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে। অনেক মুসলিম লেখকও হিন্দু লেখকদের ন্যায় মুসলিম ধর্ম বিরোধী সাহিত্য রচনা করেছেন। তাদের সাহিত্য কর্ম হিন্দুদের দেব-দেবীদের নির্ভর হয়ে পড়ে। মির্জা হুসেন নামক জনৈক কবি প্রশস্তি রচনা করেছেন কালিমা দেবীর। নবী বংশ গ্রন্থের প্রণেতা কবি সৈয়দ সুলতান মুসলিম পয়গাম্বরদের সাথে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবতাকে তালিকাভুক্ত করেছেন। হিন্দু মুসলিম লোকায়ত বিশ্বাসকে ভিত্তি করে অনেক মুসলিম কবি কাব্য রচনা করেছেন। উভয় সম্প্রদায়ের বীর পুরুষ তথা রুস্তম, হামজা, হযরত আলী এবং ভীম, কৃষ্ণ, অর্জুন প্রমুখকে তিনি এক এবং অভিন্ন প্রমাণ করার যুক্তি দেখিয়েছেন। মুসলিম বীর পুরুষ গাজীর আত্মীয় এবং সুহৃদ বলে হিন্দু দেব-দেবীর পরিচয় হলো এই শ্রেণীর সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট।

চিঠি লেখা শুরু করার আগে মুসলমানরা লিখতো এখনো কেউ কেউ লিখে 'এলাহি ভরসা' বা 'হকনাম ভরসা' ইত্যাদি। ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চিঠির প্রারম্ভে কিংবা খামের উপর ৭৪৷৷ (সাড়ে চুয়াত্তর) কথাটা লেখার রেওয়াজ বহুদিন থেকে চালু আছে। এই সাড়ে চুয়াত্তর লেখার তাৎপর্য হলো, অত্যাচরী মুসলমানরা নাকি কোন এক সময় বহু হিন্দু ব্রাহ্মণ হত্যা করেছিল যাদের পৈতার ওজন হয়েছিল ৭৪৷৷ মণ। চিঠির শুরুতে এবং খামের উপর ৭৪৷৷ কথাটা লেখার অর্থ হলো প্রাপক ব্যতীত অন্য কেহ যেন চিঠিটি না খোলেন বা পাঠ না করেন। যদি কেহ খোলেন বা পাঠ করেন তবে তিনি ৭৪৷৷ মণ পৈতা সম ব্রাহ্মণ হত্যা করেছিলেন? সেকি নাদির শাহ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, কিংবা আওরঙ্গজেব? ইতিহাস নিশ্চুপ। তবে কি এ শুধু বিদ্বেষ? (তথ্য ঃ আরিফুল হক, মাসিক সফর, জুলাই '৯৪ সংখ্যা)

ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্যে লোক সাহিত্যে মানবকূল শিরোমণি মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে একটি অত্যন্ত আপত্তিজনক গল্পের প্রচলন করেছে। কাল্পনিক গল্পটি নিম্নরূপ ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে যখন জামাতে নামাজ পড়তেন তখন হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ জোরে জোরে বাঁশী বাজাতেন। তাতে নামাজের একাগ্রতা বিনষ্ট হতো। সে কারণেই একদিন হযরত আলী (রাঃ) ভীষণ বিরক্ত হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এক্ষুণি গিয়ে এই নচ্ছারটাকে তলোয়ারের এক কোপে কতল করে আসি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রচন্ড উগ্র মেজাজ দেখে তাঁকে, সরাসরি বারণ করতে চাইলেন না। বললেন, ঠিক আছে, তুমি যদি কৃষ্ণকে হত্যা করতে চাও কর, কিন্তু তার আগে তার মুখমন্ডল ভালো করে একবার দেখে নিও। হযরত আলী (রাঃ) খোলা তলোয়ার নিয়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। কিছু দূর গিয়ে তিনি এক খেজুর গাছের নিচে কৃষ্ণকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। বাঁশী বাজাতে বাজাতে ক্লান্ত হয়ে বাঁশীটি তার বুকের উপর রেখে কৃষ্ণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক ঘুমন্ত কৃষ্ণকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করার

www.pathagar.com

পূর্বে তার মুখমন্ডলটির প্রতি ভালো করে তাকালেন। তিনি দেখলেন যে, কৃষ্ণের চেহারাটি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেহারার হুবহু অনুরূপ (নাউযুবিল্লাহ)। মুহূর্তের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) এর রাগ পড়ে গেল। তিনি কৃষ্ণকে হত্যা না করে নীরবে ফিরে এলেন। (তথ্যঃ মাসিক মদিনা, ফেব্রুয়ারী '৯৪ সংখ্যা)।

এভাবেই হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সাথে তুলনা করে বাল্মীকি মুনীরকে নিয়ে একটি কাল্পনিক গল্প ফেদেছে। মহানবী (সাঃ) ছিলেন পৌত্তলিকদের ঘোর বিরোধী। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পৌত্তলিকদের হোতা। অতএব, তাঁদের দু'জনের মধ্যে সাযুজ্য খোঁজাটা নিতান্তই ভন্ডামী। ইসলামের শিক্ষা ও মূলনীতির পরিপন্থী গল্প-কাহিনীর সৃষ্টি ও প্রচার করে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে। ফলে মুসলমানেরা আচারে ও বিশ্বাসে নানাবিধ কুসংস্কারে জড়িয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু সেবিত দেবীকে অনুন্নত মুসলিম সম্প্রদায়েরা সমীহ করে চলতো। খ্রীষ্টীয় ১৮শ' শতাব্দীতে তথাকথিত সত্য ধর্মের উপাসক কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বহু মুসলমান। দু'শ' ছয় বছর পূর্বে অনেক অজ্ঞ মুসলমান বিশ্বাস করতো মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বংশজাত।

মহামারীর সময় অনুন্নত মুসলমান সমাজ শরণাপন্ন হতো শীতলা, ওলা বিবি, রক্ষাকালীর। হিন্দু প্রতিবেশীর মাধ্যমে তারা ছাগ উৎসর্গ করতো ধর্মরাজ মনসা প্রভৃতি গ্রাম দেবতাকে। সন্তান লাভের জন্য তারা পূজা পাঠাতো ষষ্ঠীর কাছে। লক্ষ্মীকে তারা ভক্তি করে পাছে তাদের উপর তিনি অসন্তুষ্ট হন এই আশঙ্কায়। বাংলাদেশের অনেক স্থানে মুসলমানেরা নতুন বস্ত্র পরিধান করে দুর্গা পূজার উৎসবে অংশগ্রহণ করতো। হিন্দুদের মতো কোন বিশেষ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করে গাছের শাখায় হরিদ্রারঞ্জিত কাপড়ের টুকরা বেঁধে দিতো। গাছের মূলে প্রদীপ জ্বালানোকে মুসলমানেরা ধর্মীয় কাজ বলে বিবচেনা করতো। ধান রোপনের পূর্বে এবং শস্য কর্তনের পর নতুন চালের পায়েস, শির্নী পাঠাতো মুসলিম চাষী সম্প্রদায়। পৌষ পার্বন, হিন্দু উৎসব হলেও তা পালন করতো মুসলমানেরা। নৌকা ভ্রমণে ঝড়ের কবলে পড়লে অনেক মুসলমান গঙ্গা মাকে স্মরণ করতো।

বর্তমানে বাংলাদেশের মুসলমানেরা তাদের ধর্ম থেকে বহু কুসংস্কার বর্জন করলেও এখনো লোকাচারে তা কিছু কিছু টিকে আছে। এখনো মুসলমনেরা দৈবকের গণনায় বিশ্বাস করে। বিয়ে-শাদী, গাছ বিশেষ করে বাঁশ কাটা, গৃহ নির্মাণ, কিংবা কোন শুভ-অশুভ বিচার করে দিনক্ষণ ঠিক করা এক ধরনের কুসংস্কার।

হিন্দুদের মতোই হাঁচি, কাক ও প্যাঁচার ডাককে এখনো বিবেচনা করা হয় অশুভ ইঙ্গিত। বৃহস্পতিবার বিবাহকর্ম সম্পন্ন হলে তা শুভ হয় না বরং এই দিন নতুন ঘর তুলতে নেই। শনিবার, মঙ্গলবার পাড়া প্রতিবেশীকে হলুদ বা লবণ ধার দিতে নেই। সকালে ও সন্ধ্যায় বাকিতে মাল বিক্রি করতে নেই। স্বামী, ভাসুর ও শ্বশুরের নাম

www.pathagar.com

উচ্চারণ করতে নেই। পৌষ মাসে ও বুধবারে গোলার ধান বের করতে নেই। করলে অমঙ্গল হয়। নাক চুলকালে অসুখ হবার সম্ভাবনা। নতুন শাড়ীর কোণা পুড়িয়ে নিলে যাদু-বান-টোনা করতে পারে না। রাতে চুন নিতে আসলে চুন বলা যাবে না- তাহলে অমঙ্গল বাসা বাঁধে। দুই দাঁতের মধ্যে ফাঁক থাকলে মেয়েদের স্বামী মারা যায়। ভাঙা আয়নায় মুখ দেখলে সংসার ধ্বংস হয়। মেয়েরা রাতে আয়না দেখলে স্বামী মারা যায়। ঝাড়ু দিতে গেলে ঝাড়ু কারো গায়ে লাগলে ঝাড়ু পা দিয়ে মাড়াতে হয়, নইলে যার গায়ে লেগেছে তার অসুখ হয়। ১৩ অমঙ্গলজনক সংখ্যা। গর্ভবতী নারীরা ভরদুপুরে ও সন্ধ্যায় বাড়ীর বাইরে গেলে পেটের বাচ্চার ক্ষতি হবে। তবে চুলে গিট বা সঙ্গে লোহার টুকরা নিলে ক্ষতি হবে না। মাঝরাতে কুকুর কেঁদে উঠলে দেশে দুর্ভিক্ষ এসে বাসা বাঁধে। পুরুষ মানুষ তরকারীর পাতিল মুছে খেলে বরকত কমে যায় এবং অভাবে পড়ে। অসুস্থ রোগীর পাশে জ্বালানো প্রদীপ নিভে গেলে মৃত্যুর আলামত বলে ধরে নেয়া হয়। প্রথম পিঠা খেয়ে ফেললে তার পিঠা ভালো হয় না। বেলী ফুলের মালা মেয়েদের দিলে প্রেম নিবেদন করা হয়। ভয় পেয়ে বুকে থুথু ছিটালে ভয় কমে যায়। রাতে টাকা (ঘরের লক্ষ্মী) ধার-কর্জ দিলে অভাবে পড়তে হয়। ভাজা পিঠা বা অন্যকিছু খেয়ে রাস্তায় বের হলে ভূত-প্রেতে ধরে। মেয়েদের চুল ছেড়ে ঘরের বাইরে বের হলে জ্বীনের আছড় হয়। স্বামীর আগে স্ত্রী খেলে সংসারে অভাব দেখা দেয়। অল্প বয়সে মাথার চুল দু'চারটে পাকলে বলা হয় মুরুব্বিদের দোয়া লেগেছে। এক শালিক দেখলে নাকি দুঃখ বাড়ে, তবে দু'টো দেখলে সুখী হবার লক্ষণ। হাত থেকে চিরুনি বা অন্য কিছু বারবার পড়ে গেলে মেহমান আসে। মেয়েদের খরম পা থাকলে সে মেয়ে অলক্ষ্মী হয়। মেয়েদের নাক ফুল হারালে সংসারে ক্ষতি ডেকে আনা হয়। রাতে মেয়েরা দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালে অমঙ্গল এসে ভর করে। যাত্রাপথে মাকুন্দ (প্রাপ্ত বয়স্ক যে সব পুরুষের দাড়ি গোঁফ গজায় না) দেখলে যাত্রা শুভ হয় না। কোন শুভ অনুষ্ঠানের শুরুতে হাঁচি পড়লে সে অনুষ্ঠান শুভ হয় না। একচোখ দেখলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। বন্ধ্যা নারীর মুখদর্শন নাকি অশুভ। শুভ কাজে এদের উপস্থিতি অশুভের ইঙ্গিত। ছেলেরা মাগুর মাছের মাথা খেলে বউ মরে যায়। মাটির সরাতে ছেলেরা খেলে কথা বন্ধ হয়ে যায়। কোন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা যদি বেকায়দায় পড়ে কোন কিছু কেটে ফেলে তাহলে অশুভ ছায়া নাকি গর্ভের সন্তানের ওপর পড়ে। দুপুরবেলা বাড়িতে ঘুঘু পাখি ডাকলে বাড়ি

মোঘল পরিবারের অন্দর মহলে শিব পূজা

www.pathagar.com

বিরাণ (ঘুঘু চড়ে) হয়ে যায়। বিধবা মহিলারা বিয়ের অনুষ্ঠানে হাত লাগালে অশুভের ছায়া পড়ে। কপালে হাত উল্টো করে দিয়ে ঘুমালে তার জন্য অমঙ্গল ডেকে আনা হয়। রাতে হাতের আঙ্গুল ফুটানো অমঙ্গলজনক। সোনার জিনিস হারালে পরিবারের জন্য তা নিতান্তই অমঙ্গল ডেকে আনে। যাত্রার মাঝে কালো বেড়াল রাস্তা পার হলে বিপদ হবার সম্ভাবনা। ঝাঁটা উল্টে করে রাখলে সংসারে অমঙ্গল ডেকে আনে। যাত্রার শুরুতে খালিপাত্র/শূন্য কলস দেখলে কাজে অসফল হবার সম্ভাবনা। কোন মেয়েকে একচোখ দেখালে অবিবাহিতদের বিয়ে না হবার সম্ভাবনা ব্যাপক এবং বিবাহিতদের সংসারে গোলযোগের সৃষ্টি হবে। খাবারের প্লেটে হাতে লবণ তুলে দিলে সংসারে অভাব ডেকে আনা হয়। যাত্রার শুরুতে পেছন থেকে ডাকলে অমঙ্গল এসে ভর করে এবং ভালো কাজে বাধা পড়ে। অবিবাহিত মেয়েরা রান্নাঘরে কড়াই থেকে তুলে খেলে সংসার জীবন সুখের হবে না। বিয়ের রাতে বর্ষা হলে দাম্পত্য জীবনে অমঙ্গল ভর করে। বেরুতেই বাঁধা/হোচট খেলে যাত্রায় অশুভ। পা'র উপর পা তুলে নাচালে সংসারে অশান্তি আসে। ঘর থেকে বের হবার সময় খালি সেন্ডেল দেখলে যাত্রায় বাঁধা পড়ে এবং অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা। ভরদুপুরে কাক কা-কা করলে দুঃসংবাদ পাবার সম্ভাবনা। এক ধরনের হলদে পাখি (কুটুম পাখি) ডাকলে বাড়ীতে মেহমান আসবে। রাতে বিড়াল ডাকলে সংসারের অমঙ্গল হয়। বন্ধু বন্ধুকে রুমাল দিলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়। দুই জুতা পেটালে অন্যের সাথে ঝগড়া হয়। মহিলারা জোড়া ফল খেলে জোড়া বাচ্চা হবে। ডিম/গোল আলু খেয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে ফলাফল খরাপ হয়। হাতে হাতে মরিচ দিলে ঝগড়া হয়। মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতিবার চুল, দাড়ি, নখ কাটলে ধন-মানের হানি হয়। বাচ্চাকে বাঁ হাতে মারলে বাচ্চার অমঙ্গল হয়। টুপি, গামছা, তোয়ালে হারানো অমঙ্গলজনক। হাত পাখা দিয়ে বাতাস দেবার সময় গায়ে লাগলে পাখাটি মাটিতে ঠুকে নিতে হয় নইলে যার গায়ে লেগেছে তার অমঙ্গল হয়। যাবার সময় হাঁচি দিলে অমঙ্গল ডেকে আনে। শরীরে ফোঁড়া হলে ফসল বেশি হবার সম্ভাবনা। টেকো মাথা লোক ভাগ্যবান। হাত চুলকালে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

মুসলিম বিবাহে হিন্দু প্রথানুযায়ী দুলহা-দুলহীনকে গায়ে হলুদ মেখে গোসল করায় এবং কোন কোন অঞ্চলে তাদেরকে দিয়ে ধানের গোলা, দরজার কপাটে সিঁদুর লাগানো হয়। দুলহীনের কপালে থাকে চন্দন সজ্জা। বর-কনের শুভদৃষ্টি, বাসর ঘর, ফুলশয্যা, মাঙ্গলিক চিহ্নযুক্ত চিত্রিত বরণডালা, কুলা এসবও আজ প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলিম বিবাহে। অনেক বিয়ে বাড়ীতে উভয় পক্ষের ঘরের দরজায় মঙ্গলঘট স্থাপন করার রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলঘট শূন্য থাকলে চলবে না। তাতে পানি ভরা থাকতে হবে। তা না হলে নাকি লক্ষ্মীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। এ ছাড়া বরযাত্রায় ও বরাগমনের সময় গ্রামাঞ্চলে পটকা ফোটানো হয়। অতীতে আমাদের দেশের লোকদের বিশ্বাস ছিল যে, বিয়ের সময় পটকা ফোটালে বর-কনের উপর ভূত-পেত্নী ও অশুভ শক্তির আছর হয় না। পটকার বিকট আওয়াজে ভূত-পেত্নী ভয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে অবশ্য তা আনন্দ করার উপকরণে পরিণত হয়। বর্তমানে বিয়েতে পটকা ফোটানোর আধিক্য বেশ কমে গেছে। এ কর্মটি এখন স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলন ও

www.pathagar.com

শবেবরাতের রাতে। বিয়ে উপলক্ষে বর ও কনে উভয় পক্ষের বাড়ীর আঙ্গিনায় কলাগাছ কেটে লাগানো হয়। কারণ কলাগাছ নাকি উর্বরতার প্রতীক। বাড়ীতে আলপনাও আঁকা হয়। দান দুর্বাও বিয়েতে ব্যবহার করা হয়। দই, মিষ্টি, মাছ এক বাড়ী থেকে আরেক বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয় উপঢৌকন হিসেবে। মাছ, কলাগাছ, ধান-দুর্বা, আলপনা– এসবই পৌত্তলিক সমাজের পূজার উপকরণ। মাছের সঙ্গে ছেলের পক্ষ থেকে গরু-ছাগল দিলে চলবে না। মাছের সঙ্গে আস্ত খাসি বা গরু কেউ কেউ দেয়, কিন্তু আসল জোর হচ্ছে মাছের ওপর। বর্তমানে নতুন বৌ এনে বৌ-ভাত করতে হবে। বৌ দেখাতে হবে সবাইকে। যারা দেখবে তারা কিছু কিছু টাকা-পয়সা বা উপহার সামগ্রী দিয়ে নতুন বউ-এর মুখ দেখবে। বিবাহ অনুষ্ঠানে পান চিনি হতে শুরু করে বাসর শয্যা পর্যন্ত বিধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করা হয়। শুধুমাত্র বিয়ে পড়ানোতে ইসলামী রীতি অনুসরণ করা হয়। অন্যান্য সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় বিধর্মীয় রীতি-নীতিতে। এমনকি হিন্দু ধর্মীয় অনুকরণে বর-কনের মধ্যে মালা বদলের প্রচলন হয়ে গেছে মুসলিম সমাজে।

প্রথম ধান বোনার দিন পথে চিটে ধান ছড়াতে হবে। নইলে ধান পুষ্ট হবে না, চিটা হবে। পৌষ মাসে অবশ্যই পিঠা খেতে হবে। হিন্দুদের জামাই ষষ্ঠীর দিন মুসলমানদের জামাইকেও দাওয়াত করে খাওয়াতে হবে। সন্তান হলে ৬ দিনে ষষ্ঠীর কামান। এদিন রাতে সারারাত ঘরে আলো রাখতে হবে। একজনকে জেগে থাকতে হবে। ছেলের মাথার কাছে ধান, টাকা, কাগজ, কলম ইত্যাদি রাখতে হবে। এ ছাড়াও বর্তমানে আমাদের সমাজে আরেকটি প্রথা বেশ ব্যাপকভাবে প্রচলন হয়ে গেছে। যেমন নতুন ঘর, নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অথবা বছরের প্রথম দিন মিলাদ পড়ানো।

দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও এর কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানদের বাড়ীতে 'সত্যপীর' ও 'বিষ হরি' বা 'মনসা পূজা' অনুষ্ঠিত হয়। অকল্যাণ বা অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে অশিক্ষিত মুসলমানেরা এসব পূজা করে থাকে। রাজশাহী অঞ্চলের কলুরা জাতে মুসলমান হয়েও ঘানির জিহ্বাকে কালিকা বা শ্যামাদেবীর জিহ্বা জ্ঞানে পূজা করে। তাদের বিশ্বাস শ্যামাদেবী অসন্তুষ্ট হলে নাকি তৈল কমে যায়।

ইসলামে শুভ বা অশুভ লক্ষণ এবং কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস অবৈধ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একে অংশীবাদ বা পৌত্তলিকতা বলে অভিহিত করেছেন। পশুপক্ষী বা প্রাণীর শব্দ হতে অথবা অন্য কোন প্রকার আচরণে শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করা অবৈধ। হস্ত দর্শন করে ভবিষ্যৎ ভালো-মন্দ নির্ণয় করা না-জায়েজ। ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা অবৈধ। তবে জ্বীন ও ফিরেশতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ফরজ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পশুপাখির ডাকে অশুভ লক্ষণ, রাতে দরজা ধাক্কা অশুভ লক্ষণ ইত্যাদি শয়তানের কাজ। (আবু দাউদ)

তাবিজ মাদুলী

বাংলাদেশে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে আর এক জাতীয় বিশ্বাসের প্রচলন রয়েছে। তাহলো অশরীরি আত্মা বা ভূতকে সমীহ করে চলা। জড়বাদিত্ব থেকে ব্রাহ্মণ্য

www.pathagar.com

ধর্মে উন্নীত হবার ইঙ্গিত বহন করে এ জাতীয় বিশ্বাস ও তার সংশ্লিষ্ট আচার অনুষ্ঠানগুলো। 'ভূত' শব্দের সাধারণ অর্থ হলো কোন দুষ্ট প্রকৃতির অশরীরি জীব, বিশেষ করে অস্বাভাবিকভাবে মৃত কোন ব্যক্তির প্রেতাত্মা। লোকায়ত বিশ্বাসে এইসব ভূতের বাসস্থান হলো বন-জঙ্গল, নির্জন স্থান, বৃক্ষচূড়া, ভাঙ্গা মন্দির, কবরস্থান বা শ্মশান। এদের অশুভ প্রভাব এড়ানোর জন্য অবলম্বন করা হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়া। এদের দূরীকরণের জন্য ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকার তুক্‌তাক্ তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় নেয়। মৌলভী সাহেবরাও তাদের দেখাদেখি উপদেশ দেন কোরানের আয়াত তামার মাদুলীতে পুরে গলায় ঝোলাতে। ফকির দরবেশ, ওঝা বৈরাগীরা পয়সার বিনিময়ে বিতরণ করে জাদু-গুণ সম্পন্ন হাড়ের টুকরা, কোন পশুর দাঁত, বাঘের নখ, লোহার টুকরা, মাছের আঁশ কিংবা সুগন্ধি কাঠের টুকরা।

কতিপয় শিক্ষিত/ অশিক্ষিত লোক ইসলামের মৌলিক শিক্ষার ধার ধারে না। তারা ইসলামকে অনুধাবনও করতে পারে না তেমন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপদে পড়লে বা বিপদ দেখা দিলে হাতে, গলায় কোমরে কবজ-তাবিজ বেঁধে থাকেন। এরা মনে করে এতে করে বিপদ কেটে যাবে কিংবা বিকষিত হবে। কিন্তু কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এ সব ইসলামের তওহিদী আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মুসলমানদের মাঝে এটি একটি সম্পূর্ণ বিদয়াত ও শিরকী কাজ। একশ্রেণীর মোল্লা-মৌলভীরা সাধারণ লোকদের মাঝে রাস্তায় বসে সুর করে এ তাবিজ-তুমারের কথা বলে দু'পয়সা আয় করে খাচ্ছে। এরা অজ্ঞ-মুর্খ লোকদের মনে তওহিদী আকিদার কোন মোহ সৃষ্টি না করে স্পষ্টতই শিরকী আকিদাই তাদের মনে ও মগজে গেঁথে দিয়েছে। জ্বীনে আছর করলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে এমনকি কৃমি অথবা ধনুস্টংকারে আক্রান্ত হলেও অনেকেই গলায় বা হাতে বিভিন্ন ধরনের তাবিজ বেঁধে রাখে।

তাবিজ-তুমার-কবজ বাঁধা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী তা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন−

"মুমিন-মুসলমানরা কেবল আল্লাহরই রহমত পাওয়ার আশা করে এবং কেবল তাঁরই আজাবকে ভয় করে।"

"বল হে নবী, তোমরা কি লক্ষ্য করছো তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাক, আল্লাহ যদি আমাকে কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তারা কি তা রোধ বা দূর করতে পারবে? কিংবা আল্লাহ যদি আমাকে কোন রহমত দিতে চান তা হলে তারা কি আল্লাহর এ রহমতকে বাধা দিতে পারবে?"

তাবিজ-তুমার সম্পর্কে তো হাদীসে স্পষ্ট নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদীসের দৃষ্টিতে এ সব শিরকী কাজ। এখানে কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করছি।

"হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন সে পিত্তরসের রোগ থেকে বাঁচার জন্য একটি আংটি হাতে পরে রেখেছে। তিনি অসন্তোষের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি পরেছ'? বলল, রোগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে এটা পরেছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, ওটা খুলে ফেল। কেননা

www.pathagar.com

ওটা তোমার হাতে পরা থাকলে তোমার বিপদ বাড়িয়েই দেবেন কমাবে না একটুও। আর এটা হাতে রাখা অবস্থায় যদি তুমি মরে যাও তাহলে তুমি কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।"

হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন–

যে ব্যক্তি কোন তাবিজ-তুমার ঝুলাবে, আল্লাহ তাতে কোন ফায়দা দেবেন না। আর যে কোন কবজ ঝুলাবে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেন না কখনো। (কোন শান্তি পাবেন না সে)। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে–

"যে লোক কোন তাবিজ-কবজ বাঁধবে, সে শিরক করলো।" তথ্যঃ সুন্নাত ও বিদয়াত ঃ মাওলানা মুহাম্মদ রহীম, পৃঃ ২১৯, ২২০)

পবিত্র কোরআন আল্লাহপাকের দিক নির্দেশনামূলক গ্রন্থ। তা পড়ে, বুঝে জীবন যাপন ও ধর্মীয় চর্চায় আত্মনিয়োগ করাই পবিত্র কোরআনের শিক্ষা। মানুষের জীবনাচারে যা গ্রহণীয় ও বর্জনীয় তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে ঘটিয়েছেন এবং তাঁকে অনুসরণ/ অনুকরণ করার জন্যে আল্লাহপাক মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্প্রতি আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই বিজ্ঞাপনে দেখা যায় "সৌভাগ্য আপনার পাথরেই, অভিজ্ঞ হুজুরের পরীক্ষিত পাথর গ্রহণ করুন। পাথরই আপনার পাথেয়।"

এসব চটকদার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই হাতের দশ আঙ্গুলের ৫/৭টিতে বা ততোধিক আঙ্গুলে বিভিন্ন নামের পাথরের আংটি ব্যবহার করে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে– এই পাথরটা ব্যবসার উন্নতির জন্য, এটা স্বাস্থ্যের জন্য, এটা বিপদ-আপদের অগ্রিম সংকেত প্রদানের জন্য, এটা মনোবাসনা পূর্ণ হবার জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া ব্যবহারকারীর মধ্য থেকে অনেকেই বলে থাকে যে তারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেছে। অথচ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহাবা চরিত' ১ম খন্ডের ১৫৯ নং পৃষ্ঠায় দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান পাথর হিসেবে খ্যাত হজরে আসওয়াদকে উদ্দেশ্য করে হযরত উমর (রাঃ) এর একটি উক্তি হলো–

"আমি জানি তুমি একটি পাথর, কোন প্রকার লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমার নেই। যদি আমি রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনোই তোমাকে চুম্বন করতাম না।"

আল্লাহতালাকেই একমাত্র লাভ-লোকসানের মালিক বলে বিশ্বাস করা তাওহীদ, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বা কোন বস্তু লাভ-লোকসান করতে পারে বলে বিশ্বাস করা শিরক। মানুষের মন থেকে হজরে আসওয়াদ সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করে সঠিক ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যেই হযরত উমর (রাঃ) উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন।

মানুষের সৌভাগ্য আল্লাহর হাতেই। কোন পাথরেরই কোন ক্ষমতা নেই যে তা মানুষের সমস্যার সমাধান দেবে। যে সব লোক এ জাতীয় কথা প্রচার করে পাথর বিক্রি করে, তারা মানুষকে শিরকে লিপ্ত করে। এরা নিজেও ধ্বংস হয় অন্যকেও ধ্বংস করে।

www.pathagar.com

কোন মুমিনের জন্য এ জাতীয় প্রচারণার শিকার হওয়া উচিত নয়। যারা এ জাতীয় কাজে লিপ্ত তাদেরকে অবশ্যই তওবা করে আকীদা শুদ্ধ করে নিতে হবে। নতুবা আল্লাহতায়ালার ভয়ঙ্কর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এ জাতীয় বিজ্ঞাপন কোন পত্রিকা বা অন্য কোন প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা সম্পূর্ণ হারাম। কারণ এতে হারাম ও শিরকী কাজে সাহায্য করা হয়। যে পত্রিকা আদর্শ প্রচার করে তাতে এ জাতীয় বিজ্ঞাপন ছাপানো হলে তাওহীদ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মুমিনরা ঐ বিজ্ঞাপনের প্রতারণার শিকার হতে পারে।

যে সব লোক ঐ পাথর ব্যবহারের ফলে তাদের উদ্দেশ্য সাধন হয়েছে বলে মনে করে, এটা তাদের নিছক ধারণা বৈ অন্য কিছু নয়। ঐ পাথর ব্যবহার না করলেও আল্লাহ তাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা হতোই। সুতরাং মুমিনদেরকে একমাত্র আল্লাহর ওপর সব বিষয়ে নির্ভর করতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে তিনিই একমাত্র কল্যাণ অকল্যাণের মালিক।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) ডান হাতে আংটি পরতেন এবং আংটির পাথর খচিত দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখতেন। কারণ, সৌন্দর্য প্রকাশ তাঁর আংটি রাখার উদ্দেশ্য ছিলো না। সেই যুগে আরবের বাইরের দেশসমূহের রাজা-বাদশা মোহরবিহীন চিঠিপত্রের কোন গুরুত্ব দিতেন না। নবী (সাঃ) ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের কাছে পত্র পাঠাতেন। এসব পত্রে মোহর করার প্রয়োজনে আংটির সাথে মোহর তৈরীর বিধান ছিলো। এই উদ্দেশ্যেই নবী (সাঃ) আংটি তৈরী করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জীবনে কোনদিন কোরআনের আয়াত সম্বলিত তাবিজ ব্যবহার করেছেন এরূপ কোন দৃষ্টান্ত নেই। কিন্তু আমরা তা ব্যবহার করছি। এছাড়া অজু না করে পবিত্র কোরআন স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। অথচ এই পবিত্র কোরআনের আয়াত তাবিজ বা মাদুলীতে পুরে পবিত্র/অপবিত্র অবস্থায় ব্যবহার করে অসম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। রোগের সময় ওষুধ খাওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ রয়েছে। অথচ অনেক অজ্ঞ মুসলমান এ জাতীয় কুসংস্কার ক্রমশঃ দূর হওয়া সত্ত্বেও তাবিজ মাদুলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে আজও বসে আছে।

ঝাড় ফুঁক

ঝাড়-ফুঁকের মধ্যেও ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী অনাচার বিদ্যমান ছিলো। এ ধারা এখনো বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে গ্রাম-গঞ্জে দেখা যায়। অশিক্ষিত ফকিরেরা কোন লোকের উপর জ্বীনের আছর হলে জ্বীন তাড়াবার জন্য অমানুষিক নির্যাতন করে। জ্বীন তাড়ানোর জন্যে তপ্ত লোহার শেক, মরিচ ও তেল গরম করে নাকে প্রবেশ করাসহ ঝাড়ু ও ভাঙ্গা জুতা দিয়ে রোগীকে প্রহার করা হয়। এ ছাড়াও এসব ফকিরেরা ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে ভূত-প্রেত তাড়ানো, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন, বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করে। বিভ্রান্ত বাঙ্গালী মুসলমানেরা এই ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে বিদয়াত ও শেরকীতে

www.pathagar.com

জড়িয়ে পড়ে। এসব ঝাড়-ফুঁকের কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি।

কাউকে ভালোবাসলে তাকে পাওয়ার জন্য মন্ত্র–

"বিছমিল্যা গুন কর
ফলনার সাথে ফলনীর মিল কর।"

(১০০ বার ৭ দিন পড়তে হয়)

"আলহামদো লিল্যাহ ফলনীর দিল
ফলনার দিলে সাতে মিল্।"

(রোজ ২১ বার পড়তে হয়)

"এজাজিল জেলাতিল আরজে জালেলা
ফলনীর পাঁচ তনু জলে জা।"

(১০০ বার সাত দিন পড়তে হবে)

পরী, ভূতপ্রেত আছর হলে দূর করার মন্ত্র ঃ

"আদ্যচন্দ্র গুরুমুখে জান অনুমান চন্দ্র
রাখিলে প্রাণ গরল্চন্দ্র ভক্ষণক গোরখনাতে
উদ্রচন্দ্র পিন্ডারসার করিলে দিননাতে
শাহাদাৎ কলেমা শাহানাম ধ্বনি শাহাদাৎ কলেমা
মোর ফলনার পিন্ডার সরিলের সার।
শাহাদাৎ কলেমা দিয়া খেদায়া মার দইষ
দান ভূত পিপ্পাস বাগ বুড়ি সোমান মান শ্মশান
চড়কা মড়কা চোর চোঠটা অন্তর দেয়ান
চাইর চন্দ্র কথা জেবা নরে জানে, থাউক বইল দেও দেবতা,
চারি ফেরেশতা মান্যি করে
হু হাক্কা মার ধাক্কা।"

ভূত-প্রেত তাড়ানোর মন্ত্র ঃ

কুলহু আল্লাহ আহাদ ইয়া জিবিরিল
আল্লাহোষ ছমাদ ইয়া য়েছরাফিল
লামে ইলেদ ওলামে ইলেদ
ওলামে ইয়া মেকেরাইল নামে কুলহু কোফআন আহাদ
ইয়া আজরাঈল ফলনার বাড়ির দেও মারিয়া দূর কর ইয়া বুদ্দ্যহো।"

(মেহনত ঃ তিন হাজার বার)

চোখ ঝাড়ার মন্ত্র–

"নদীর পারেতে যবে জানকী যাইল
সেই সমে চক্ষুশূল তাহার জন্মিল
যন্ত্রণায় অস্থির সীতা করেন রোদন.

www.pathagar.com

রামচন্দ্র বেদনা তার করেন নিবারণ।
কার আজ্ঞা-হাঁড়ির ঝি চন্ডীর আজ্ঞা,
কার আজ্ঞা কাউরের কামাখ্যা দেবীর

কোন গ্রামে মড়ক, কলেরা বা বসন্ত শুরু হলে গাঁয়ের লোকেরা পালা করে রাত জেগে হাঁক ছাড়তো এ মন্ত্রটি পড়ে–

"হক নামে আল্লাহ পাক নামেছা
নিজ নামে নিরানজন কের্তা হু।"

অথবা–

"আলীর হাতে জুলফিকার
ফাতেমার হাতে তীর,
যেখান থেকে আইছস বালা
সেখানেতে ফির।"

অশুভ চক্র হতে বাড়ী-ঘর বন্ধের মন্ত্র এরকম–

এক চন্দ্রে বন করিলাম একামি ভুবন,
দুই চন্দ্রে বন করিলাম দুইশত মাদার,
তিন চন্দ্রে বন করিলাম তিনকোণ পৃথিবী,
চার চন্দ্রে বন করিলাম চারকোণ পৃথিবী,
পাঁচ চন্দ্রে বন করিলাম পাতালের পাঁচ ভাই পান্ডব,
ছয় চন্দ্রে বন করিলাম ফলনার বাড়িঘর,
সাত চন্দ্রে বন করিলাম সাতাশটি পর্বত
আট চন্দ্রে বন করিলাম আতাশি কোরআন,
নয় চন্দ্রে বন করিলাম নয় হনুমান,
দশ চন্দ্রে বন করিলাম গুরুর দোয়া দশ,
এগার চন্দ্রে বন করিলাম হুনোর চক্রবানী,
বারো চন্দ্রে বন করিলাম কিচিনী মিচিনী,
তের চন্দ্রে বন করিলাম কুজ্ঞান, কুমন্ত্র,
চৌদ্দ চন্দ্রে বন করিলাম আল্লার বাড়িঘর,
যেখানেতে বারিতালা করিয়াছে ভর,
নিজ নামে বন করিলাম আজরাইল, জিব্রাইল, ইস্রাফিল, মেকাইল,
রহে নাম, রহে নাম, রহে নাম তোর, রহে নাম তোর বাপের,
নিজের নামে ডাক দিলাম আইস একবার।

এই মন্ত্রটির বর্ণনাকারীর নাম শুধু ফকির। পিতার নাম– টুরু কবিরাজ। গুরুর নাম করিমুল্লাহ ফকির। "বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্যে'র লেখক জনাব আবদুল হাফিজ বাড়ীঘর বন্ধ করার মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে–

বাংলাদেশের শুধু বাড়ীঘর বন্ধ করা বা মন্ত্রপুত করবার জন্যে এ ধরনের অসংখ্য মন্ত্র

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয়। বর্তমান মন্ত্রটির ব্যাখ্যা এক রকম অসম্ভব। কারণ এতে অনেক উল্লিখিন (Allusion) আছে যার অর্থ পাওয়া দুষ্কর। শুধু ফকিরের কাছে যখন আমি মন্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাই- তখন তিনি অসুস্থ। অনেক কষ্টে গুটিকতক মন্ত্র তিনি আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত মন্ত্রই তিনি আমাকে লিখে দেবেন। দুঃখের বিষয় এর কিছুদিন পরেই তিনি মারা যায়। কয়েকশত মন্ত্র তিনি জানতেন। তাঁর মন্ত্রগুলো তিনি তাঁর পিতা ও গুরুর কাছে মৌখিকভাবে শুনে শুনে মুখস্ত করেছিলেন। মন্ত্রটির 'চন্দ্র' শব্দের অর্থ বীর্য, রস বা শুক্র। চারিচন্দ্রের অর্থও জানা যায়। এগুলো হলো, নিজ চন্দ্র, আদ্যচন্দ্র, ইলিমিলি ও গরলচন্দ্র। বাউলদের গানেও চারি চন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আবু তালিব বলেন-

বাউল ফকিরগণের 'সরাবন তহুরা' নামে চারিটি ফকিরী পেয়ালা মল, মূত্র, হায়েজের রক্ত এবং বীর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের নাম যথাক্রমে নূরী, হুরী, জব্বুরী, ছাওরী। এই পেয়ালা চতুষ্টয় ভক্ষণ করলে ফকিরী ছয় লতিফা অনায়াসে হাছেল হয়। এগুলোকে চারিচন্দ্র বলা হয়। (বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য, আবদুল হাফিজ, পৃঃ ১১৩, ১১৪)

সুপ্রিয় পাঠক একবার চিন্তা করুন, ইসলামের দুশমনেরা মুসলমানদেরকে কোন অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল। প্ররোচনে-প্রলোভনে ফকির বানিয়ে অন্তরালে কিভাবে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল।

এক ফোটা চানায় যেমন এক কলসী দুধ নষ্ট হয়, ঠিক তেমনি তিল পরিমাণ কোন কুফরী বা শেরকী ঢুকলেও মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিনষ্ট হয়ে যায়। এই ঈমান বিনষ্টের জন্য ইসলামের শত্রুরা নানাবিধ উপায়ে মুসলমানদের উপর আঘাত হানে।

নাম বিকৃতির সংস্কৃতি

নাইজেরিয়া রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণ মুসলিম। এরপর রয়েছে খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণকারী নাইজেরিয়া দলের খেলোয়াড়দের টিভিতে নামের পরিচিতি দেখে মনে হয়নি এরা মুসলমান। এ প্রসঙ্গে একজন অভিজ্ঞ লোককে প্রশ্ন করায় সে জবাবে যা বললো তাহলো- দেশটি ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত বৃটিশের উপনিবেশ ছিলো। সে সময়ে মুসলিম সম্প্রদায় যে একটি স্বতন্ত্র জাতি সে স্বাতন্ত্রতা মুছে ফেলার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময়ে খ্রীষ্টান ধর্মের অনুকরণে মুসলিম ছাত্রদের নাম লিখাতে বাধ্য করে। সুতরাং সে দেশের অধিকাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নাম দেখে চেনার উপায় নেই এদের সঠিক ধর্মীয় পরিচিতি।

নাইজেরিয়ার মতো তদ্রুপ অবস্থা হয়েছিল আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনামলে। এদেশ থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্রতা মুছে ফেলার জন্য বেনিয়া ইংরেজদের মদদে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরান্নভোজী হিন্দু জমিদারেরা মুসলমান প্রজাদের উপর সর্বমুখী নির্যাতন আর কর্তৃত্ব প্রয়োগের একটি দিক হিসাবে মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্মের

www.pathagar.com

পর বাধ্যতামূলকভাবে বিকৃত ও অর্থহীন নাম ঠিক করে দিতো। যেমন ঃ মরণ চাঁদ, কালা চাঁদ, গঙ্গা, ফালাইন্না, ঝাড়ু, ঝাড়ন, পচা, ভেটকু, সাবান, চিনি, চাঁদ, সুরুজ, মড়াই, দুখাই, তারা, মনা, মধু, বেঙ্গা, বুচা, টেকা, টেপা, বানেছা, কাউল্লা, লায়েক, টুনী বেচু, হাবু, গেদু, গেদা, খোকা ইত্যাদি। এই নামগুলো ছিলো মুসলিম পরিচিতি মুছে ফেলার সূক্ষ্ম চক্রান্ত। হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলমানেরাও তাদের নামের প্রথমে শ্রী শব্দটি জুড়ে দিতো। ব্রিটিশ আমলের জমি-জমার দলিলাদি দেখলে এর প্রমাণ মেলে। এ কুপ্রথাটি নিশ্চয়ই মুসলমানদের জন্য একটা কলঙ্কজনক বিষয়। তাই তদানীন্তন উলামায়ে কেরামগণ এ কুপ্রথাটি উচ্ছেদ করার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন এবং দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাছিম নানতুবী (সহঃ) সর্বপ্রথম উক্ত প্রথার বিকল্প হিসাবে তাঁর নামের প্রথমে মুহাম্মদ যুক্ত করেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের নামের প্রথমে মুহাম্মদ যুক্ত করবার পরামর্শ দেন। যার ফলে ক্রমে ক্রমে শ্রীযুক্ত করার নিয়মটি বিলীন হয়ে যায়। তখন থেকে অদ্যাবধি আমাদের মুসলমানদের নামের প্রথমে 'মুহাম্মদ' যুক্ত করার রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে আবার হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাবে নাম রাখার হিড়িক পড়ে গেছে।

মুসলমানদের নামকরণের ব্যাপারেও হিন্দুরা অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছিল। বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার নামে তারা মুসলমানদেরকে বিপথে টেনে নিয়ে গেছে। বৃটিশ আমলে হিন্দু ঠাকুর মশায়রা মুসলমানদেরকে বলেছিলো–

"তোমরা বাপু মুসলমান হলেও বাংলাদেশের মুসলমান। আরবদেশের মুসলমানের জন্যে যেমন আরবী নামের প্রয়োজন, বাংলাদেশের মুসলমানের জন্য তেমনি বাংলা নামের প্রয়োজন। আব্দুর রহমান, আবুল কাসেম, রহীমা খাতুন, আয়েশা, ফাতেমা, নামের পরিবর্তে বাংলা ভাষায় নামের প্রয়োজন। অতএব, ঠাকুর মশায়ের ব্যবস্থা অনুসারে নেপাল, গোবর্ধন, নবাই, কুশাই, পদ্মা, চিনি, চাঁপা, আদল, পটল, মুক্তা প্রভৃতি।" (তথ্য ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃঃ ২১৬)। এইসব নাম ইসলামকে ঘৃণা আর মুসলমানদের অমানুষ হিসাবে মনে করার প্রতিফলনযুক্ত। এ সম্পর্কে সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানদের বোঝানো হতো ভালো নাম রাখলে আয়ু কমে যায়। প্রাণ সংহারকারী বিষ্ণু দেবতার নজরে পড়ে যায়। কিন্তু বিকৃত নাম রাখলে নজরে পড়ে না, ফলে দীর্ঘায়ু লাভ করে। সহজ-সরল মুসলমানরা এই অপব্যাখ্যাকেই সঠিক মনে করে গ্রহণ করতো। তিতুমীরের সময় জমিদারদের দেয়া নাম পরিবর্তন করে ওহাবী মতে আরবী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফিস পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হুকুম ছিলো।

পরবর্তীতে মুসলমান নাম রাখার অপরাধে জরিমানার হুকুম না থাকলেও হিন্দু জমিদার কর্তৃক নাম বিকৃতির অনুশীল ১৯৪৭ সালের পরও অব্যাহত ছিলো। এ সম্পর্কে পিএ নাজির 'স্মৃতির পাতা থেকে' গ্রন্থে লিখেছেন, "ডাক্তার সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম কতোদিন তিনি আছেন এখানে। জবাবে জানালেন, তিন বছর পার করে ফেলেছেন। এবার কিছুটা নিশ্চিত হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার রোগীদের

www.pathagar.com

নাম বিশেষ করে মুসলমান রোগীদের নাম নিয়ে কোনো বিভ্রাট হয় নাকি? ভদ্রলোক খুব হুঁশিয়ার। বুঝতে পেরেছেন কেনো এ প্রশ্ন করেছি। বললেন, এই মহকুমায় হিন্দুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশি। প্রায় দশ বছর হয় পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাতে কি? আপনি দেখবেন মুসলমান বাড়ী বাচ্চা পয়দা হলে ছ'দিন পার হবার পর বাচ্চাটাকে নিয়ে বাবুদের বাড়ীর দরজার সামনে হাত জোড় করে ছেলে বা মেয়ের বাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আর মা জড়সড় হয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে স্বামীর পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকে, বাবু কখন বেরুবেন। বাবু দরজা দিয়ে বের হলে জোড় হাত কপালে ছুঁইয়ে মাথা নত করে বলে, 'বাবু' একটা নাম রেখে দিন'। বাবু অত্যন্ত করুণা স্বরে বলেন, তোর পোলা হয়েছে বুঝি? তা বেশ। কি নাম রাখবি- পচু বলেই ডাকিস। আর দেখিস কখনও গো-মাংস খাবি না, আর ওকেও খাওয়াবি না। কথা না শুনলে কিন্তু ছেলে অক্কারাম। একেবারে প্রাণে মারা পড়বে।" (পি.এ নাজির, স্মৃতির পাতা থেকে, পৃঃ ১১)।

মুসলমানদের নাম বিকৃতি যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ঘৃণাপ্রসূত পশ্চিম বাংলার পত্রিকা, সাহিত্য ও উপন্যাস পাঠ করলে তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। যেমন 'মুহাম্মদ'কে লিখে 'মহম্মদ' রহমানকে লিখে 'রেমান', সিরাজদৌল্লাকে লিখে 'ছেরাজদৌলা', 'আহমদ'কে লিখে 'আমেদ', 'সোহরাওয়ার্দী'কে লিখে 'সুরাবার্দী', 'আমিরুল'কে লিখে 'আমিরাল', 'নজরুল সঙ্গীত'কে লিখে 'নাজির সঙ্গীত', 'উসমানী'কে লিখে 'ওশমানি' ইত্যাদি। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। এসব নামের বিকৃতি যে ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্রুপাত্মক ও উপহাসত্মক তা বলাই বাহুল্য। কারণ মুসলমান সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্যান্য ভাষাভাষির কঠিন নামগুলো লিখতে তারা একটুও ভুল করেন না। সে ক্ষেত্রে বানান শুদ্ধ করে লিখতে এরা খুবই এক্সপার্ট।

ইংরেজ ও হিন্দুরা মুসলমানদের ইসলামী নামের বিকৃতি ঘটিয়ে অথবা বিধর্মীয় ভাবধারায় মুসলমানদের নাম রেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্রতা মুছে ফেলার প্রচেষ্টা একশত নব্বই বছর চালিয়েছে। বর্তমানে জমিদার বাবুরা নেই। স্বাধীন সার্বভৌম এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে জমিদার বাবুদের অপকর্মের দায়িত্ব নিয়েছে পরান্নভোজী বুদ্ধিজীবি ও টিভি'র রাম বাবুরা। আজকে বাবুরা আমাদেরকে আরবী নামের পরিবর্তে বাংলায় নাম রাখার নসিয়ত না করলেও মুসলমান নামধারী কতিপয় বর্ণচোরা বাবু স্টাইলে বাংলায় নাম রেখে আমাদের মুসলমান পরিচয়ের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলার অপচেষ্টা করছে। এমনকি সম্রাট আকবরের শাসনামলের ন্যায় বর্তমানে কেউ কেউ মুসলমানদের নাম থেকে 'মুহাম্মদ' ও 'হাজী' নাম বাদ দেয়ারও ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। বাঙালী সংস্কৃতির নামে পরোক্ষভাবে এরা ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে ভগবান-ভগবতীর অর্চনা করার ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছে। একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী সাহিত্যিক ও নাট্যকার তাদের সাহিত্য অথবা নাটকের চরিত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিজাতীয় সংস্কৃতির নাম ব্যবহার করছে। ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম চক্রান্তের মাধ্যমে টিভিতে প্রচারিত নাটকে মুসলমানদের বাপ-দাদার রাখা নাম মুছে ফেলার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। বদচরিত্রের নামগুলোর কোনো

www.pathagar.com

হেরফের হয় না। সে ক্ষেত্রে খাঁটি ইসলামী নাম ঠিকই রাখা হয়। যেমন ইজ্জত আলী তালুকদার, মহব্বত আলী চৌধুরী, খান বাহাদুর রইছউদ্দিন, কাদের বক্স, মাওলা বক্স, শরাফত আলী ইত্যাদি। কিন্তু সৎ চরিত্রের নামগুলো রাখা হয় বাংলা শব্দের বাহানায় সম্পূর্ণভাবে বিধর্মীয় ভাবধারায়। যেমন নীত, আনন্দ, অন্তরায়, আগুন, উন্মেষ, চৈতি, চিন্তা, স্বরূপ, অঞ্জন, জ্যোতি, চমক, শুভ, মাধব, নিশি, সুমন, সুধা, আকাশ, রবি, চারু, পার্থ, আনন্দ, ধ্রুব, হৃদয় প্রভৃতি। এসব নামগুলো যে মুসলমানিত্বের পরিচয় বহন করে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বৃটিশ আমলে ইংরেজরা জমিদারদের মাধ্যমে মূর্খ মুসলমান প্রজাদের উপর বিকৃত নাম চাপিয়ে দিয়েছিল। বর্তমানে একশ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমান নামধারী সংস্কৃতিসেবীরা আমাদের সন্তানদের বিজাতীয় নাম রাখার উৎসাহিত করছে। এদের ধারণা ইসলামী নামগুলো আধুনিক নয়; সেকেলে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী নামগুলোতেই রয়েছে সুন্দর সুন্দর অর্থ। কাজেই ইসলামী নামগুলোই আধুনিক। আধুনিকতার নামে যে নামগুলো রাখা হচ্ছে সেগুলোই সনাতন। বর্তমানে বিকৃতি নামের যে হিড়িক সমাজে লক্ষ্য করা যাচ্ছে আগামীতে হয়তো জীব-জন্তু, পাহাড়-জঙ্গলের নামগুলোও মানুষের নামের তালিকায় শোভা বর্ধন করবে।

আমরা স্বাধীন হয়েছি বটে; কিন্তু গোলামীর অভ্যেস এখনো ত্যাগ করতে পারিনি। গোলামীর মানসিকতায় সর্বক্ষেত্রে বিজাতীয়দের অনুসরণ করছি। তাই সন্তান জন্ম হলে বেছে বেছে বিজাতীয় নাম রাখা হচ্ছে। যেমন– বিল্টু, সেন্টু, মিন্টু, অগ্নি, ডেইজী, চম্পা, বিউটি, লাভলী, এলবার্ট, চার্লি, রুশো, উদয়, লেনিন ইত্যাদি। তাদের মন-মানসিকতা দেখে মনে হয় বিজাতীয় নামগুলোই গৌরবের; আর ইসলামী নামগুলো অগৌরবের। তাই ইসলামী নামগুলো উপহাস, বিদ্রুপ ও তাচ্ছিল্য ভাবধারায় এখন নাটক-সাহিত্যে ব্যবহার হচ্ছে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে। খ্রীস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধসহ অন্যান্য সম্প্রদায় স্ব-স্ব ধর্মীয় সংস্কৃতির বিধান অনুযায়ী তাদের নবজাত সন্তানদের নাম রাখছে। যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় প্রভাবে ঐতিহ্যগতভাবে এ ধারা চলে আসছে। এমনকি এই চরম আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও ধর্মীয় প্রভাব থেকে এরা এতোটুকু বিচ্যুত হয়নি।

লিঙ্গ, রমন ও যোনীকে নিয়ে হিন্দু ধর্মীয় পৌরানিক কাহিনীতে রয়েছে বিচিত্র ঘটনা। এ ছাড়া লিঙ্গ ও যোনীকে পবিত্র জ্ঞানে উপাস্যও করে থাকে। ভারতের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির নাম দিগম্বর মিত্র, কুমার লিঙ্গম, মহালিঙ্গম, বৃহৎ লিঙ্গম, রাধা রমন, রমন লাল প্রভৃতি অশ্লীল নাম অত্যন্ত গৌরবের সাথে ধারণ করতে দেখা যায়। ইসলাম ধর্ম সুন্দরের পূজারী। এখানে অসুন্দরের কোনো স্থান নেই। তাই ইসলাম ধর্মে নাম রাখার ক্ষেত্রেও রয়েছে সুস্পষ্ট নীতিমালা। ইসলামী সংস্কৃতির সূচনা নবজাতকের কানে আযান দেয়া থেকেই শুরু হয়। নামকরণের মাধ্যমে তা আরো বিকাশ লাভ করে। সুন্দর ও অর্থপূর্ণ নাম ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজনকে নির্বাচন করতে হয়। এ নামেই সে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এ নামেই তাকে হাশরে ডাকা হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজের এবং পিতার নামে ডাকা হবে। অতএব ভালো নাম রাখ।" (আবু দাউদ)।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেছেন, "পিতামাতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে প্রথমত তিনটি। (ক) জন্মের পরপরই তার জন্য উত্তম একটি নাম রাখতে হবে। (খ) জ্ঞান বৃদ্ধি হলে তাকে কুরআন তথা ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে। (গ) আর সে যখন পূর্ণ বয়স্ক হবে তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।" (তাম্বীহিল গাফিলীন আসশায়খুল সমরকন্দী)।

নামকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সনাক্তকরণ। তাই পৃথিবীতে নামের গুরুত্ব অপরিসীম। নামের মাধ্যমে ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। ব্যক্তি, বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় সহজ হয়। পৃথিবীতে যতো ধর্ম আছে কিন্তু সব ধর্মের বৈশিষ্ট এক নয়। পৃথিবীতে মানুষ আছে কিন্তু সব মানুষের বৈশিষ্ট্য এক নয়। 'ধর্ম' শব্দের পূর্বে 'হিন্দু', 'ইসাঈ', 'ইহুদী', 'ইসলাম' ইত্যাদি নাম যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে এ ধর্মগুলোর মধ্যে একটির সাথে অন্যটির পার্থক্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রন্থ জগতে কতো লেখকের কতো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থের নাম তার বিষয়বস্তু এবং রচয়িতার পরিচয় বহন করে। অনুরূপভাবে বংশ, গোত্র, জাতি, দেশ, নদী, সাগর, পর্বত ইত্যাদির নামের কতো কিছুই না পৃথিবীতে আছে। এর এক একটিকে শুধুমাত্র নামের মাধ্যমেই আমরা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারি না। নামকরণ হচ্ছে একটি আর্ট। এর মাধ্যমে মানুষের রুচিশীলতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

একাত্তরের রাজাকারের সূত্র ধরে অনেকেই আল্লাহ ও নবীর নামের সাথে নাম রাখাকে অপছন্দ করেন। কিন্তু বিষয়টি মুসলমানদের জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরী। তাবৎ সৃষ্টি জগত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হলেও প্রত্যেকটি সৃষ্টির আলাদা নামকরণ করা হয়েছে। ঐ সৃষ্টির গুণাগুণ বিচারের প্রেক্ষিতেই। গরু ও মানুষ মল ও মিষ্টির পার্থক্য তার নামের থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। যুক্তি বিদ্যায় নামের কোনো অর্থ না থাকলে প্রকৃত পক্ষে নাম অর্থহীন নয়।

প্রত্যেক মা-বাবা তাদের সন্তানদের জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করতে চান। আপন সন্তান একটি সুন্দর নামে পরিচিত হোক এটা তাদের সবারই প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু অসতর্কতা, অজ্ঞতা, উদাসীনতা, হীনমন্যতা, অনুকরণপ্রিয়তা, পরাধীন মানসিকতা এবং অপসংস্কৃতির প্রভাবে তাদের সন্তানদের নাম বিধর্মীয় সংস্কৃতিতে রাখা হচ্ছে।

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন, "তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধি দ্বারা ব্যথিত করো না, ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা বড়ই গর্হিত কাজ।" সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১১)। ইসলামের নামের ভান্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ জন্য প্রচুর তথ্যও হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে। সতর্ক বিবেচনা ছাড়াই নির্বিচারে নাম রাখা বিজাতীয় অনুসরণ করা। আল্লাহপাক বলেন, "তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও? (সূরা আল বাকারা ২:৬১)।

বিকৃত নামধারী ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছিলো খুব অপছন্দ। তাঁর একটি দুগ্ধবতী ছাগলের ব্যাপারে বললেন কে এটাকে দোহন করবে? তখন একজন উঠে দাঁড়াল এবং বললো আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর দিলো মুর্রা (তিক্ত)। তিনি তাকে বললেন বসো। পুনরায় বললেন, কে এটাকে দোহন করবে?

www.pathagar.com

অন্য একজন উঠে দাঁড়ালো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি? সে উত্তর দিলো হারব (যুদ্ধ)। তাকেও বললেন বসো? তারপর বললেন কে এটাকে দোহন করবে? আরেকজন দাঁড়িয়ে বললো, আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি? সে উত্তর দিলো ইয়ায়ীশ (সে বাঁচবে)। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি দোহন কর। (বুখারী (মাগাবী) ৪০৭২)।

ইয়াহীয়া বিন সায়ীদ হতে বর্ণিত উমর বিন খাত্তাবের কাছে জুহায়না কাবীলার এক ব্যক্তি এলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বললো, শিহাব (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ)। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার পুত্র? সে বললো, ইবন দেরাম (অগ্নি শিখার পুত্র)। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন গোত্রের? সে বললো, হারাকা (প্রজ্বলন) গোত্রের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাসস্থান কোথায়? সে বললো, বাহরুননার (অগ্নিগর্ভে)। তিনি অবশেষে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ অংশে? সে বললো, বিযাতিল লাযা (শিখাময় অংশে)। উমর (রাঃ) তাকে বললেন, যাও, তোমার গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে দেখ তারা ভষ্মীভূত হয়েছে। লোকটি বলে তাদের কাছে এসে দেখলাম সত্যিই তারা সকলেই ভষ্মীভূত হয়েছে (মুয়াত্তাঃ ২। ৯৭৩, মুসান্নাফ ১৯৮৬৪)।

ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় নামগুলো হলো (১) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য দেবতার নামে নামকরণ শিরক। যেমন আবদুল উযযা, আবদুল হুবাল, আবদুল কাবা এবং এ ধরনের যতো নাম রয়েছে। (২) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির নামের পূর্বে আবদুল যোগে নামকরণ হারাম। যেমনঃ আবদুন্নবী, আবদুল আলী, আবদুশ হাজার।

নবী (সাঃ) বলেছেন, "আমাকে ঐভাবে অতিরঞ্জিত করো না যেমন নাসারাগণ মারইয়াস তনয় ঈসা (আঃ)কে অতিরঞ্জিত করেছে, আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে, আমি কেবল তাঁরই বান্দা, দাস বরং বলো আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল (বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া)। তাই আবদুন্নবী নাম রাখা ঠিক নয়।

শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী তার 'ফাতহুল আযীয' তাফসীরে শাহ ইসমাঈল শহীদ তার 'তাক্কইয়াতুল ঈমান' কিতাবে এবং আল্লামা ইবন হাজার হায়ছামী শাফেয়ী তাঁর তাফতাহুল মুহতাজ কিতাবেও আল্লাহর সৃষ্টজীব বা বস্তুর নামের পূর্বে আব্‌দ শব্দ প্রয়োগ হারাম বলে রায় দিয়েছেন। মোল্লা আলী কারী হানাফী তাঁর 'শারহুল ফিকহুল আকবার, নামক কিতাবে লিখেছেন প্রচলিত নাম আবদুন নবী, গোলাম মুস্তাফা, গোলাম রসুল, পীর বখশ, বা নবী বখশ, ইত্যাদি নামগুলো প্রকাশ্য কুফর। (৩) আল্লাহর ক্রোধোদ্দীপক ও খবীছ নাম ঃ মালেকুল মুলক (রাজার রাজা), শাহের শাহ (বাদশাহদের বাদশা), সুলতানিস সালাতীন (সম্রাটদের সম্রাট), কাজীউল কুজ (বিচারকদের বিচারক, কাজীদের কাজী), হাকেমুল হুক্কাম, মালেকুল আমলাক (বাদশাহদের বাদশাহ) ইত্যাদি।

নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নামকরণ করে মালেকুল আখলাক তা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বিদ্রোহাত্মক নাম।" (বুখারী, মুসলিম)। (৪) নবীদের জন্য

www.pathagar.com

প্রযোজ্য নামে নামকরণঃ সাইয়্যেদুন্নাস (মানবের মধ্যে সর্বপ্রধান) সাইয়্যেদ ওলাদ আদম (আদম সন্তানের মধ্যে প্রধান), সাইয়্যেদুল কুল্ল (সকলের প্রধান), খায়রুল বাশার (মানব শ্রেষ্ঠ), সাইয়্যেদুল বাশার (মানবজাতির প্রধান), খায়রুল আনাম (সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি) ইত্যাদি। (৫) নবী ও রসূলদের আল্লাহর প্রদত্ত লকব (উপাধি) যেমনঃ নবী উল্লাহ, কালীমুল্লাহ, খালীলুল্লাহ, আবুল বাশার, রসুলুল্লাহ ইত্যাদি। এসব নামের প্রকৃত অধিকারী ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা সত্যের অপলাপ মাত্র। কেননা নবী উল্লাহ (আল্লাহর নবী)। কালীমুল্লাহ (আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী), খলীলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু), আবুল বাশার (মানব জাতির পিতা), রসুলুল্লাহ (আল্লাহর রসুল), যথাক্রমে আল্লাহর নবী, মুসা (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), আদম (আঃ) রসুলুল্লাহ (আল্লাহর রসুল)-এর নাম। সাহাবী, তাবেয়ী এবং সালফে সালেহীনদের মধ্যে এ ধরনের নামের প্রচলন ছিলো না। (৬) ফিরিশতাদের নামে নামকরণ। যেমন ঃ জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল ইত্যাদি। আবদুল্লাহ বিন জারাদ বলেন, মুযাইনা ক্বাবিলার এক লোক আমাকে সঙ্গে নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট এলো। সে বললো, ইয়া রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে। তা সবচেয়ে ভালো নামগুলো কি? তিনি বললেন, তোমার জন্য ভালো নামগুলো হচ্ছে- হারেছ (সম্পদ সঞ্চয়কারী/ উপার্জনকারী), হাম্মাম (আগ্রহশীল/ উচ্চাশা পোষণকারী)। আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমানতো কতো ভালো নাম। নবীদের নামে নাম রাখো। ফিরেশতাদের নামে নাম রেখো না। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, আপনার নামে? তিনি বললেন,আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার কনুইয়াত নাম রেখে না"। (তারীখুল কাবীর ঃ ইমাম বুখারী)।

আল্লাহর নামে নামকরণ ঃ যেমন- আল-জব্বার, আর-রহমান, আল-মালেক আর রায্যাক ইত্যাদি। এ নামগুলোর হকদার একমাত্র আল্লাহতাআলা।

অত্যাচারী ও দ্বীনের দুশমনের নামে নামকরণ ঃ যেমন- নমরুদ, ফেরাউন, আবুজেহেল, আবু লাহাব, ওলীদ ইত্যাদি। এক ব্যক্তি তার পুত্রের নাম আল-ওলীদ রাখার ইচ্ছে করে। রসুল (সাঃ) তাকে এ নাম রাখতে নিষেধ করে বললেন, "এক ব্যক্তির নাম হবে আল-ওলীদ, সে আমার উম্মতের সাথে ঐরকম ব্যবহার করবে যেমন ফিরাউন তার কাওমের সাথে করেছিল। আবদুর রাযযাক মুশানাফ। এ ওলীদ হচ্ছে আল ওলীদ বিন ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালেক। যার জন্য বহুলোক ফিতনায় পড়ে যায়। কতিপয় বিশেষ অর্থপূর্ণ নাম ক্ষেত্র বিশেষে অকল্যাণকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ঃ নিয়ামত (আশীষ/ বরকাত), খায়ের (মঙ্গলজনক), মুবারক (আশীর্বাদপূর্ণ, বরকতময়) ইত্যাদি। কেননা কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার কাছে খায়ের (মঙ্গল) আছে? তোমার ঘরে মুবারক (আশীর্বাদ) আছে? যদি উত্তর হয় নেই, তাহলে তো ভারি অমঙ্গল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, আর তাও নির্বিচারে নাম নির্বাচনের কারণে। এ কারণে রসুল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা কখনই তোমাদের ছেলের নাম রাখবে না ইয়াসার (ঐশ্বর্য) না রাবাহ, (মুনাফা/ লাভ) না নাজাহা (কৃতকার্য, সফল) না আফলাহ (নিস্কৃতি/ মুক্ত)। যদি কাউকে এসব কোনো নামে ডাকা হয় এবং উত্তরে যদি বলা হয় ইয়াসারা নেই, রাবাহ নেই বা

www.pathagar.com

নাজাহা নেই– তাহলে ঐ স্থান থেকে ঐ গুলো নেই হয়ে যায়– মুসলিম (আদাব) ঃ ২১৩৮। তিরমিযী) আদাব) ২৮৩৭।

নিজের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণকারী নাম রসুল (সঃ) বার্রা (নেক্কার/ ধর্মপরায়ণ) নাম রাখতে নিষেধ করে বলেছেন তোমরা নিজেদের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করো না, আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত তোমাদের মধ্যে কে ধর্মপরায়ণ।" (আবু দাউদ (আদাব) ঃ ৪৯৫/মুসলিম (আদাব) ঃ ২১৪২)।

অপছন্দনীয় নাম পরিবর্তনের অপরিহার্যতা ঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ) শুধু সুন্দর নাম রাখতেই বলেননি বরং অনেকের বা অনেক স্থানের মন্দ নামের পরিবর্তে সুন্দর নামও রেখেছেন। যায়নাবের নাম ছিল র্বারা (অত্যন্ত/ ধার্মিক)। বলা হলো যে, সে নিজের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাই তার নাম রাখলেন যায়নাব (সুগন্ধময়)। বুখারী (আদাব) ঃ ২১৩৯। ইবন মাজা (আদাব) ৩৭৩২। মুসলিম (আদাব ২১৪১)।

একজনকে বলা হতো আসরাম (কাটা/ শুষ্ক ফসল)। এক প্রতিনিধি দলের সাথে সে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এলো। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি? সে উত্তর দিলো আসরাম। তিনি বললেন, রবং তুমি যুবায়া (দানাদার ফসল) আবু দাউদ (আদাব) ৯৪৫৪)।

রায়তা বিনতে মুসলিম তাঁর পিতার উক্তি এভাবে উদ্ধৃত করেন "হুনায়নের যুদ্ধে আমি রসুল (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলে বললাম গুরাব (কাক)। তিনি বললেন, না বরং তুমি মুসলিম।" (বুখারী ঃ ৮২৪। আবু দাউদ ঃ ৪৯৫৬)।

রসুলুল্লা (সঃ)-এর হিজরতের পূর্বে মদীনার নাম ছিলো ইয়াছরের (দোষ দেওয়া)। নবী (সাঃ) সে নাম পরিবর্তন করে রাখলেন 'তাবা (পবিত্র)। হিজরতের পর সে ইয়াছরের নাম রাখা হয় 'মদীনাতুন্নবী' এবং পরবর্তীতে 'মদীনা' নামে এ নগরী খ্যাতি লাভ করে।

মন্দ নাম পরিবর্তন না করার পরিণাম ঃ সায়ীদের দাদা বর্ণনা করেন, আমি নবী (সঃ) এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি? আমি বললাম, হামুন (কর্কশ), রুক্ষ, (শুষ্ক মাটি) তিনি বললেন; তুমি সাহল (নরম, কোমল) সে বললো, আমার পিতা যে নাম রেখেছে তা পরিবর্তন করবোই না। ইবনে মুসাইয়্যের বলেন যে, তখন থেকেই আমাদের বংশের মধ্যে ঐ কর্কশ ও রুক্ষতা বিদ্যমান ছিলো।' বুখারী (আদাব) ঃ ৬১৯০। আবু দাউদ (আদাব) ঃ ৪৯৫৬। আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাম সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, নবীদের নামে নাম রাখ এবং আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান। প্রিয় নাম হলো হারেছ এবং হাম্মান। অত্যন্ত অপছন্দনীয় নাম হলো হারব ও মুররাহ।" (আবু দাউদ)।

নামকরণের উপযুক্ত সময় ঃ শিশু জন্ম গ্রহণের পূর্বেও নামকরণ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

তবে জন্মের পরই নাম রাখা শ্রেয়। তবে সাত দিনের মধ্যে বা তারপরেও করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে শরীয়তেরও হুকুমে উদারতা রয়েছে।

পৃথিবীতে অনেক ধর্মেই নবজাতকের নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। ১৬, ২০, ২২ অথবা ৩২ দিনে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র নবজাতকের নামকরণ করে। হিন্দু ধর্মে মনুর বিধান মতে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার দশম বা দ্বাদশ দিনে, প্রাচীন পারসিকগণ সন্তানের ব্যক্তিত্বে প্রকাশ ঘটলে, রোমে কন্যা সন্তান জন্মের দশম দিনে এবং পুত্র সন্তান জন্মের নবম দিনে, প্রাচীন পারসিকগণ সন্তানের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পেলে, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীগণ ব্যাপাটাইজম করার সময় নবজাতকের নামকরণ করে থাকে।

নবজাতকের নামকরণের সময় নির্ধারনের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসৃত নীতি ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, গত রাতে আমার এক পুত্র জন্ম হয়েছে এবং তার নাম রেখেছি আমার পিতা ইবরাহীমের নামে। (মুসলিম ফাযায়েল নং ২৩১৫, আবু দাউদ জোনায়েম নং-৩১২৬)।

"আবু মুসা বর্ণনা করেন, আমরা একটি পুত্র জন্মলাভ করলে আমি নিয়ে নবী (সঃ) এর নিকট গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং খেজুর দিয়ে তার তাহ্নীক করলেন।" –রায়হাকী (শুনান) নং- ৯/৩০৫, বুখারী আকীকা) নং ৫৪৬৭।

সাহল বিন সাদ-আস্‌সায়েদী বলেন, "মুনযের বিন আবী উসায়্যেদের জন্মের পর তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে আসা হলো। নবী (সাঃ) শিশুকে তাঁর উরুদেশের উপর বসালেন এবং উসাইয়্যেদ (সেখানে) বসেছিলেন। নবী (সাঃ) তখন তার সম্মুখে কোনো কিছু নিয়ে মনোযোগী ছিলেন। আবু উসাইয়্যেদ তার ছেলেটি উঠিয়ে নেওয়ার জন্য বললো। তাই বাচ্চাটি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উরুদেশ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর নবী (সাঃ) বললেন, শিশুটি কোথায়? আবু উসাইয়্যেদ বললো, আমরা তাকে ফেরত পাঠিয়েছি, ইয়া রাসুলুল্লাহ। তিনি বললেন, তার নাম কি? সে বললো, ফুলান (অমুক)। তিনি বললেন, বরং নাম মুনযের।" – মুসলিম (আদাব) নং ২১৪৯। বুখারী (আদাব নং ৬১৯১। তথ্য সূত্র ঃ মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, মাসিক সফর, জুলাই '৯৬ সংখ্যা)।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে ইসলামী আকীদা ও আদর্শের পরিপন্থী নাম, অহংকার বা গর্ব প্রকাশ পায় এমন নাম এবং অনৈসলামিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীকি নাম সর্বদা নির্বাচন অযোগ্য। কেননা প্রত্যেক সন্তানই চায় তাকে সবাই ভালো নামে ডাকুক। আদর্শ মাতা-পিতাও তা চাইবেন এবং চাওয়াটাই স্বাভাবিক। নামের মাধ্যমেও মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।

হাশরের ময়দানে লজ্জায় পড়তে হয় সন্তানের এমন নাম না রাখাই শ্রেয়। ইসলাম ধর্মে নামের গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিসীম ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এরূপ সুস্পষ্ট নীতিমালাকে উপেক্ষা করে নাম বিকৃতি সংস্কৃতির ধারা চালু হয়েছে তা হেলাফেলা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আমাদের জাতিসত্ত্বা মুছে ফেলে বিজাতীয়দের সাথে একাকার করার যে সব সুগভীর চক্রান্ত চলছে এর মধ্যে নাম বিকৃতির সংস্কৃতিও একটি। এই আত্মঘাতী প্রবণতা অবশ্যই আমাদের প্রতিহত করতে

www.pathagar.com

হবে। এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। নইলে নাইজেরিয়ার মুসলমানদের মতো পরিণতি আমাদের ভাগ্যেরও জুটবে। সেই বৃটিশের পরাধীন আমলের ন্যায় আবারও আমরা পরগাছা জাতিতে পরিণত হবো।

শিক্ষায় শেরেকীর প্রচলন

বৃটিশ আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছেলে-মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে হিন্দুদের দেবীর স্তুতি পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল।

এছাড়া তৎকালীন হিন্দু ছাত্রদের সাথে মুসলমান ছাত্রদেরকেও নানা দেব-দেবীর স্তব স্তুতি, বিশেষ করে সরস্বতীর বন্দনা বলতে হতো। যেমন ঃ

"জয় জয় মহারাণী
সবিনয়ে তোমা নমি;
জুড়িয়া দু'খানি হাত,
করি তোমায় প্রণিপাত।"

এছাড়া ছুটির পর নিম্নের ছড়া আবৃত্তি করে সব ছাত্রদেরকে গুরু মশায়কে নমস্কার করে বাড়ী যেতে হতো-

"সরস্বতী ভগবতী, মোর দাও বর,
চল ভাই পড়ে সর্ব, মোরা যাই ঘর।
ঝিকি মিকি ঝিকিরে সুবর্ণের চক,
পাত-দোত নিয়ে চল, জয় গুরুদেব।

এভাবেই মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের কচি-কোমল হৃদয়ে হিন্দু ধর্মের ছাপ অংকিত হয়ে যেতো।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন, "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া ও রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।" (সূরা ৩৬, ইয়াসিন ২/৪)। "আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবর্তন করে।" (সূরা রহমান)। অথচ আমাদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন- আদম (আঃ) এর মাধ্যমে প্রথম মনুষ্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ ডারউইন এর মতবাদ অনুযায়ী প্রচার করা হচ্ছে বানর থেকে মনুষ্য সৃষ্টি।

বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়নি। বরং বনী-ইসরাঈলদের কৃতকর্মের অপরাধে মানুষকে বানরে পরিণত করেছিল। হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়ে আল্লাহপাক শনিবার দিনটিকে পবিত্র ঘোষণা করেছিলেন। এই পবিত্র দিনে সমুদ্রের মাছ ধর্মীয় কথা শোনার জন্যে সমুদ্র তীরে আসতো। সে জন্যে এই দিনে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অপরাধে আল্লাহপাক সংশ্লিষ্ট লোকগুলোকে বানরে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর গজবে কিছুদিনের মধ্যেই এরা মারা যায়। ওদের কোন বংশ বিস্তার ঘটেনি। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি

www.pathagar.com

এ ধারণা অবান্তর।

ইতিহাসে ধারণা দেয়া হয় মানুষেরা আদিতে অসভ্য, বর্বর ও উলঙ্গ ছিলো। কিন্তু পবিত্র কোরআনে এর সত্যতা নেই। হযরত আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী। আল্লাহ তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন ফেরেশতারাও তা জানতেন না। আল্লাহতায়ালা যখন আদম (আঃ)কে বিভিন্ন বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তিনি নিশ্চয়ই ইশারায় জবাব দেননি। একটি ভাষায় বিভিন্ন বস্তুর নাম বলেছিলেন। কাজেই সৃষ্টির আদিতে ভাষা বিদ্যমান ছিলো। আল্লাহর একটি আদেশ অমান্য করার কারণে হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী বিবি হাওয়াকে বেহেস্ত থেকে বের করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। সে সময় বেহেস্তের পরিচ্ছদ তাদের শরীরে ছিলো না; কিন্তু লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের লতাপাতা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে রেখেছিলেন। এতেই প্রমাণিত হয় সে সময়েও মানুষের লজ্জাবোধ ছিলো। পরবর্তীতে হযরত আদম (আঃ) প্রায় নয়শ' বছর বেঁচেছিলেন। সে সময় বিবাহ প্রথাও প্রচলিত ছিলো। চাষাবাদ পদ্ধতি চালু ছিলো। পরবর্তীতে মানুষের কৃতকর্মের জন্য অনেক সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। যেমন আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– "নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অত্যাচার করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি অত্যাচারী।" (সূরা ইউনুছ ঃ ৪৪)

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মাটি খুঁড়ে লাখ লাখ বছরের পুরানো জনপদের ধ্বংসস্তূপ ও ফসিল আবিষ্কার করেছেন। কোথাও কোথাও আবার উন্নত সভ্যতারও অস্তিত্ব ছিলো বলে

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শামসুন্নাহার ও ফয়জুন্নেসা হল থেকে নামাজী ছাত্রীদের বের করে দেয়া হয়েছে। রোকেয়া হলে পবিত্র কোরআন ছিড়ে ফেলা হয়েছে। অথচ সেই শামসুন্নাহার হলে নির্বিঘ্নে সরস্বতী পূজা হচ্ছে। এই অবস্থা ১৯৪৭-এর বিভাগপূর্ব অবস্থাই স্মরণ করে দেয়। তৎকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা করা যেতো কিন্তু মিলাদুন্নবী (সাঃ) দিবস পালন করা যেতো না।

www.pathagar.com

অনুমান করা হচ্ছে। আমাদের পূর্বেও যে বহু প্রাচীন সভ্যতা ছিলো সেগুলো হয়তো তারই প্রমাণ বহন করে। সেসব সভ্যতাও হয়তো এক সময় বর্বর যুগ হতে যাত্রা শুরু করে আধা সভ্যতার যুগ পার হয়ে সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছে অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তৎকালে চিন্তার সভ্যতা ছিলো; কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতা ছিলো না। এছাড়া মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মাটির নিচে যেসব কারুকার্য খচিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাতেই প্রমাণ করে পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বেও মানুষ সভ্য ছিলো। মিসরের পিরামিড তৈরীর কৌশলও প্রমাণ করে মানুষ পূর্ব যুগে অসভ্য ছিলো না। অতি সভ্যতার অহংকার যখন মানুষ ব্যাভিচার ও বিশৃঙ্খল আচরণে বর্বরতার সীমায় এসে পৌঁছেছিল তখনই তারা আল্লাহর আক্রোশে পতিত হয়েছিল, পাহাড় পর্বত দ্বারা চেপে ধরে আল্লাহ তাদের

চারুকলা ইনস্টিটিউটে এ কোন্ সংস্কৃতি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ চারুকলা ইনস্টিটিউট এ কোন্ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে? চারুকলা ইনস্টিটিউটের (আর্ট কলেজের) দেয়াল জুড়ে সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের সমর্থনে হিন্দু পুরাণের অনেক দেব-দেবীর মূর্তি আঁকা হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর চলাচলের ফুটপাথ সংলগ্ন দেয়ালে প্রদর্শিত এসব ছবি দেখে সচেতন মহল প্রশ্ন তুলেছেন, রাষ্ট্র পরিচালিত আর্ট কলেজ কি 'বাঙালী সংস্কৃতির' নামে শিক্ষাঙ্গনে এখন এই বিশেষ ধর্মীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিয়েছে? নীরবে-নিভৃতে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সুকৌশলে এই প্রচারণার উদ্দেশ্য কি?

www.pathagar.com

উপর গযব নাযিল করেছিলেন। আজ হয়তো তাদেরই ফসিল ভূগহ্বর হতে আবিষ্কৃত হচ্ছে।

আজকে আমরা যেখানে সাগর দেখছি হয়তো একদিন সেখানে জনপদ ছিলো; আজকে যেখানে আমরা বাস করছি; হয়তো কোনদিন এখানে সাগর ছিলো।

মানুষের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহপাক যুগে যুগে অনেক সভ্যতা, অনেক জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন–

"সীমা লংঘনের জন্য আমি কতো জনপদ ধ্বংস করেছি। এসব জনপদ আজ ছাদভাঙা ধ্বংসস্তূপ। কতো ধ্বংসপ্রাপ্ত কূপ আর খাড়াই প্রাসাদ। তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি যাতে তারা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারে বা চোখ দিয়ে দেখতে পারে। চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মাঝের হৃদয়।" (২২ সূরা হজ্ব ঃ ৪৫-৪৬)

এই চরম বিজ্ঞানের যুগেও পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে সভ্যতার ছোঁয়া পৌছেনি। এখনো পৃথিবীর বহু স্থানে মানুষ পাহাড়ে-জঙ্গলে উলঙ্গ হয়ে বসবাস করছে। জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে খাদ্য সংগ্রহ করছে। জীব-বস্তু, পোকা-মাকড় ভক্ষণ করছে। গর্তের গুহায় অথবা গাছের উপরে মানুষ বসবাস করছে। ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলছে। কাজেই বর্তমান সভ্য জাতির পাশাপাশি অসভ্য জাতির অস্তিত্ব আছে; ঠিক তেমনি আদিকালেও তা ছিলো। সুতরাং সমগ্র মানব সমাজ এককালে অসভ্য ছিলো এ ভ্রান্ত মতবাদ অন্ততঃ মুসলমানেরা গ্রহণ করতে পারে না। যদি এ মতবাদকে গ্রহণ করা হয় তবে পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করা হবে। আর পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করলে মুসলমানিত্বই আর থাকে না। এভাবেই ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের ঈমান-আকিদার পরিপন্থী পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত মতবাদ আধুনিক শিক্ষার নামে চালিয়ে দিচ্ছে।

এপ্রিল ফুল শোক দিবস

পহেলা এপ্রিল পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলমানদের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটি শোকের দিন। খৃস্টান সম্প্রদায় প্রতিবছর এ দিনটিকে এপ্রিল ফুল হিসাবে পালন করে। এ দিনটি খৃস্টান বিশ্বে এক গৌরবময় অবিস্মরণীয় দিন। কিন্তু দুঃখজন হলেও সত্য যে বাংলাদেশের কতিপয় মুসলমান অশিক্ষ-কুশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে খৃস্টান সম্প্রদায়ের অনুকরণে পহেলা এপ্রিলকে উপহাস দিবস হিসাবে পালন করে থাকে। এই দিন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে বোকা বানিয়ে ঠকিয়ে থাকে। কাউকে বোকা বানানো বা ঠকানো একটি মারাত্মক অপরাধ হলেও দিন গুণে অনেকেই ক্ষমা করে দেন। এ ঠকানো বা বোকা বানানোর মধ্যে আমরা এক ধরনের আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি উপভোগ করে থাকি। কিন্তু এ দিনে কতো নিষ্ঠুর ও অমানবিক ঘটনা ঘটেছিলো তা আমরা অনেকেই জানি না। পহেলা এপ্রিল ইসলামের ইতিহাসে এক করুণ ও বিয়োগান্ত দিন। স্পেনের খৃস্টান সেনাপতি ফার্ডিন্যান্ড মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ দিয়ে ঘোষণা করলেন, দেশের মুসলমানরা মসজিদে আশ্রয় নিলে তাদের উপর কোনে প্রকার জুলুম-নির্যাতন চালানো হবে না। এ ঘোষণা ছিলো একটি প্রতারণা মাত্র। তার এই ঘোষণার পর নিরীহ-নিরস্ত্র

www.pathagar.com

মুসলমানরা মসজিদে আশ্রয় নিলে বর্বর খৃস্টান সৈন্যরা মসজিদগুলোতে অগ্নিসংযোগ করলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৭ লাখ মুসলিম নর-নরী ও শিশু শাহাদাত বরণ করেন। মুসলমানদের সাথে এ প্রতারণার স্মৃতি হিসাবে খৃস্টান জগত পহেলা এপ্রিলকে 'এপ্রিল ফুল' হিসাবে পালন করে। অথচ দিনটি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার কারণেই আমরাও খৃস্টানদের অনুকরণে আত্মপ্রবঞ্চনার শরীক হই মাত্র। এ দিনটির নিষ্ঠুর ঘটনাবলী নতুন বংশধরদের জানানো এবং এ দিনটিকে শোক দিবস হিসাবে মুসলমানদের পালন করা উচিত।

কবর পূজা

আমাদের ধর্মের নামে যে সব কুসংস্কার বা প্রথা প্রচলিত আছে, সে সবের মধ্যে কবর পূজা অন্যতম। এছাড়া কবর বা দরগায় মোমবাতি জ্বালানো, নযর-নেওয়াজ প্রদান কিংবা ধন-সম্পদ সন্তানাদি কামনা ইত্যাদিও চালু রয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে শরীয়ত বিরোধী।

ইসলামের দৃষ্টিতে কবর বাঁধানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও অনেক বিত্তবান মুসলমান মৃত আত্মীয়-স্বজনের কবর পাকা করে, খ্রীস্টান স্টাইলে কবরে এপিটাফ লিখে। যা কবরস্থানে গেলে দৃষ্টিগোচর হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই কর্মটিকে খুব ঘৃণা করতেন এবং কোন কবর উঁচু করে বাঁধানো দেখলে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

কবরকে পাকা-পোক্ত ও শক্ত করে বানাতে, তার উপর কোনরূপ নির্মাণ কাজ করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর কোন কিছু লিখতে নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট নিষেধ করেছেন।

নবী করীমের ফরমান অনুযায়ী বলা যায় যে, কবরকে কেন্দ্র করে এসব কাজ করা মহা অন্যায়, অবাঞ্ছনীয়। আর যারা এ কাজ করে তারা নিকৃষ্টতম লোক। নবী করীম (সাঃ) নিজে নিজের সম্পর্কে দোয়া করেছেন এই বলে–

"হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে কোন পূজার মূর্তি বানিয়ে দিও না।" বস্তুতঃ যে জাতি তাদের নবী-রাসূলদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে তাদের উপর আল্লাহর গজব তীব্র হয়ে উঠেছে।

এ হাদীসের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সিজদা করা, কবরকে কিবলার দিকে রেখে নামাজ পড়া শরীয়তে সুস্পষ্ট হারাম।

হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন–

সাবধান হও, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নবী-রাসূল ও নেক লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল। তোমরা কিন্তু সাবধান হবে, তোমরা কখনও কবরকে মসজিদ বানাবে না। আমি এ থেকে তোমাদের স্পষ্ট নিষেধ করেছি।

কবরকে কেন্দ্র করে যে ওরস ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাও ইসলামে নিষিদ্ধ। হযরত

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ

রাসূলে কারীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি; তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত কর না। (অন্তত নফল নামাজ নিজেদের ঘরেই পড়বে)। আমার কবর কেন্দ্রে মেলা বসাবে না, তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠাবে। যেখান থেকেই তোমরা দরূদ পাঠাও না কেন, তা অবশ্যই আমার নিকট পৌঁছাবে।

এ কারণেই কবরকে কোন স্পষ্ট ও উন্নত স্থানরূপে নির্মিত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন–

'সব মূর্তি চুরমার করে দেবে এসব উচ্চ ও উন্নত কবর ভেঙ্গে মাটির সাথে সমান ও একাকার করে দেবে। এ থেকে যেন কোন প্রতিকৃতি ও কোন কবর রক্ষা না পায়।'

এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে কবর জিয়ারত করা সাধারণ মুসলমানদের জন্যেই নিষিদ্ধ ছিল। নিষেধের কারণ এখানে সুস্পষ্ট বলা হয়নি। তবে অন্যান্য কারণের মধ্যে এরও একটি বড় কারণ অবশ্যই ছিল যে, কবর পূজা জাহিলিয়াতের জামানায় একটি মুশরিকী কাজ হিসেবে আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মুসলমান হওয়ার পরও কবর জিয়ারতের অবাধ সুযোগ থাকলেও তওহীদবাদী এ মানুষের পক্ষে কবর পূজার শিরক-এ নিমজ্জত হয়ে পড়ার বড় বেশি আশঙ্কা ছিল। কিন্তু পরে যখন ইসলামী আকীদার ব্যাপক প্রচার ও বিপুল সংখ্যক লোকের মন-মগজে তা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্ণ বাস্তবায়িত হয় ইসলামী জীবনাদর্শ, তখন কবর জিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, কবর জিয়ারত করতে মেয়েদের তা থেকে বাদ দিয়ে রাখা হয়। শুধু তা-ই নয় কবর জিয়ারত করতে মেয়েদের যাওয়ার ব্যাপারটিকে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অভিশাপের কাজ বলে ঘোষণা করা হয়।

অবশ্য মেয়েলোকদের পক্ষে কবর জিয়ারত করতে যাওয়ার ব্যাপারে কোন কোন ফিকহবিদ সামান্য ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁরা এক দিকে নিষেধ ও অপরদিকে অনুমতি-এ দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বলেছেন–

"নেককার লোকদের কবর জিয়ারত করে বরকত লাভ করার ইহা মেয়েলোকদের পক্ষে জায়েয। তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যুবতী মেয়েলোকদের পক্ষে মাকরূহ তাহরীম।"

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে– কবর জিয়ারতকারী মেয়েলোক এবং তার উপর যারা বাতি জ্বালায় তাদের উপর আল্লাহতায়ালা অভিশাপ করেছেন।

এছাড়াও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন– আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি, তোমরা কবর জিয়ারত কর। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কবর জিয়ারত করতে চায়, তবে সে তা করতে পারে। কেননা কবর জিয়ারত মানুষকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইমাম নবরী লিখেছেন– জিয়ারতকারীর কর্তব্য কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সালাম করবে এবং কবরস্থ সকলের রূহের প্রতি মাগফিরাত রহমত নাযিল হওয়ার জন্যে

www.pathagar.com

আল্লাহর নিকট দোয়া করবে। এই সালাম ও দোয়া তাই হওয়া উচিত যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া কুরআনের আয়াত সূরা বা রাসূল (সাঃ) থেকে বর্নিত দোয়াও পাঠ করা যেতে পারে।

ইমাম আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে সমরয়ুক জাফরানী একজন মুহাক্কিহ ফকীহ ছিলেন। তিনি তাঁর কিতাবে লিখেছেন- কবরকে হাত দ্বারা জড়িয়ে ধরবে না, স্পর্শ করবে না, কবরকে চুমু দেবে না। কবর জিয়ারতের সুন্নতী নিয়ম এই। তিনি আরো বলেছেন, কবর ধরা, স্পর্শ করা এবং তাকে চুমু দেয়া বা বর্তমান কালের সাধারণ মানুষ করছে- নিঃসন্দেহে বিদয়াত, শরীয়ত নিষিদ্ধ, ঘৃনিত। তা পরিহার করা এবং যে তা করে তাকে এ থেকে বিরত রাখা একান্তই কর্তব্য।

আমাদের দেশে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক অলীয়ে কামেল ইসলামী বিশেষজ্ঞ তসরীফ এনেছেন। তাঁদের অধিকাংশই এসেছিলেন আরব জাহান এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন ইসলামী কেন্দ্র থেকে। অনেকেই এখানে ইনতিকাল করেছেন। তাঁদের কবর বাংলাদেশের অনেক স্থানে দেখা যায়। মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাসে এসব কবরের মর্যাদা অপরিসীম। বর্তমানে তাঁদের মাজারকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণভাবে শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকান্ড স্থায়ী আসন গেঁড়েছে। কবর বা দরগায় মোমবাতি জ্বালানো, নযর নেওয়াজ প্রদান কিংবা ধনসম্পদ-সন্তানাদি কামনা ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ড চালু আছে। মূর্খতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন একশ্রেণীর মুসলমান এসব কবরকে কেন্দ্র করে এমন সব কর্মকান্ডের প্রচলন করেছে, যেগুলো সেইসব সাধক পুরুষদের জীবন-সাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এঁরা মানব সন্তানদেরকে একমাত্র আল্লাহর এবাদত ছাড়া অন্য যে কোন কিছুর সামনে মাথানত করার গ্লানি থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই সমগ্র জীবন সাধনা করে গেছেন। কিন্তু তাঁদের অনুসারী হওয়ার দাবীদার একশ্রেণীর মুসলমান তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করেই সেসব অপকর্ম করে যাচ্ছে।

এইসব মাজারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উত্তরোত্তর কবর পূজা, মাজার ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে। প্রতিবছর পীর আউলিয়াদের দরগাহ এবং মাজারকে কেন্দ্র করে উরস বা মেলা বসে যা হিন্দুদের তীর্থস্থানের রূপ ধারণ করে। সেখানে নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হয়। ভক্ত, গায়ক, সাধক, দোকানদার, ব্যবসায়ী, বাজীকর, জুয়ারী, বেশ্যা, বাইজী, কর্মহীন ভবঘুরে, জুয়াচোর, বদমাইস ইত্যাদি নানা সম্প্রদায় এক কথায় প্রতিটি মাজার পরণত হয় একটি ক্রাইম পয়েন্টে। সেখানে মাজারের পবিত্রতা আর থাকে না।

এছাড়া কবর জেয়ারতের নামে আরেক ধরনের বেদয়াতী কাজ কারবার শুরু হয়েছে। কবরে কোন খাদ্য বা পুষ্প অর্পণ করার নিয়ম ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ এবং তা শেরেকী। কিন্তু আজকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রথিতযশা ব্যক্তির কবরে মৃত্যু ও জন্ম বার্ষিকীতে পুষ্প অর্পণ স্থায়ী রীতিতে পরিণত হয়েছে। এ কাজটি করে মুশরেকরা। ফলে আমরা মুশরেকদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।

ফুল দিয়ে যদি কারো মাজারকে সম্মানিত করার নিয়ম থাকতো তবে তা হতো হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর মাজার। আর কবর পূজার নিয়ম থাকলে সেটা হতো

www.pathagar.com

মদীনায় নবীজীর রওজায়। কিন্তু নবীজীর মাজারে এ বেদআতী কর্মকান্ড নিষিদ্ধ হলেও আমাদের দেশে এ বেদআতী কর্মকান্ড অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান দেশের ক্ষেত্রে যা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

পীর পূজা

ভারতীয় উপমহাদেশের তথা বাংলাদেশে 'পীর' শব্দটি বহু প্রচলিত। 'পীর' ফারসী শব্দ। এটি আরবী শব্দ বা কোরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী শরিয়তের পরিভাষাও নয়। ফারসী ভাষায় পীর শব্দের অর্থ বৃদ্ধ বা বুড়া। মানুষের বয়স বেশি হয়ে গেলে সেই বৃদ্ধ মানুষকে বলা হতো পীর। পারস্যের অগ্নি পূজক পুরোহিতকে বলা হতো 'পীরে মুগাঁ'। মদের আড্ডায় যিনি মদ বিক্রি করেন ফারসী ভাষায় তাকেও 'পীরে মুগাঁ' বলা হতো। কেউকেউ আধ্যাত্মিক প্রেমকে রূপকভাবে মদরূপে অভিহিত করে সেই প্রেমরস পরিবেশনকারীকে পীরে মুগাঁ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে–

'বসায়ে সাজ্জাদাহ্ রঙ্গীন কুন
গিরাত পীরে মুগাঁ গোয়াদ
কে সাদেক বেখবর নাবুদ
সেরাহে রাসমো মান মেহ্লা।

অর্থাৎ পীরে মুগাঁ যদি বলেন তাহলে তুমি জায়নামাজকে মদের দ্বারা রাঙিয়ে তুলো। কেননা পথের সন্ধান গুরুজী ভালোভাবেই অবগত আছেন। পীর শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। পীর বলতে সাধারণত বুঝায় সেই ব্যক্তিকে যিনি বান্দাহ ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যম বা অসিলা হিসেবে কাজ করেন। খৃষ্টানদের যেমন Priest আর হিন্দুদের পুরোহিত বলতে যা বুঝায় পীর বলতে ঠিক তাই বুঝান হয়ে থাকে, হিন্দু-খৃষ্টানরা মনে করে তাদের আগে পুরোহিত একজন থাকা দরকার যিনি তাদের ভগবানও সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম হিসেবে কাজ করবেন। ইসলামে কি এ ধরনের মাধ্যম দরকার আছে? হাদীস কোরআনে কি এর কোনো প্রমাণ আছে?

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে কি কোনো পীর ছিলেন? নাকি কোনো সাহাবী নিজেকে পীর দাবি করতেন?

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, পীর শব্দটি আরবী বা হাদীস কুরআনের কোনো শব্দ নয় বা ইসলামী শব্দ নয়। এটা ফারসী শব্দ। এ থেকেই বুঝা যায় এটা ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে। ইসলামে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কোনো অসিলার ব্যবস্থা নেই। বান্দার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হবে সরাসরি। এ জন্য নামাজকে মেরাজ বলা হয়েছে। কারণ নামাজে বান্দা সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে যোগযোগ করে। কাফির, মুশরিক, ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের ঠাকুর/ ব্রাহ্মণ/ ওলী দরবেশদেরকে মধ্যস্থতা স্বীকার করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা কিন্তু এদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেনি। এদের কাউকে খোদার আসনে বসায়নি। তবুও এদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনায় রত রয়েছে, তারা তাদের লাভ বা

www.pathagar.com

ক্ষতি কিছুই করতে পারে না'। তারা বলে থাকে- "এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী মাত্র"। (ইউনুস ঃ ১৮)। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, "তোমরা জেনে রাখ! দ্বীন-ইবাদত সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য (খালেসভাবে কর)। যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ওলি বা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বলে আমরা এদের উপাসনা শুধু এই আশাতেই করি যে, এরা মাধ্যম হিসেবে আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে।" (জুমার ঃ ৩)।

ইহুদী, খৃস্টান ও কাফের-মুশরিকরা এদের ইবাদত করতো না, উপাসনা করতো না, তবুও এদের মাধ্যম বানানোকে উপাসনা করা বলে আল্লাহ তায়ালা অভিহিত করেছে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন কিভাবে তাদের উপাসনা করা হলো? কিভাবে তাদের ইবাদত করা হলো? এরূপ প্রশ্ন নবী করীম (সাঃ)কে করেছিলেন তদানীন্তন খৃষ্টান পন্ডিত আদী ইবনে হাতিম। নবী করীম (সাঃ) একদা সূরা তাওবা পাঠ করছিলেন, ইতিমধ্যে আদী ইবনে হাতিম তথায় প্রবেশ করেন। নবী করীম (সাঃ) যখন পাঠ করলেন 'তারা [ইহুদী খৃষ্টানরা] তাদের পন্ডিত আর যাজকদের আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে' তখন আদী বলেন, 'কৈ? আমরাতো তাদের উপাসনা করি না। নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেন, 'তারা আল্লাহর হালাল করা কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করলে তোমরা কি তা হারাম আর আল্লাহর হারাম করা কোনো বিষয়কে হালাল সাব্যস্ত করলে তোমরা কি তা হালাল বলে গ্রহণ কর না? এটাই হচ্ছে তাদের উপাসনা।' [আহমাদ তিরমিজী]

সুতরাং ইসলামের সুন্নতী আদর্শে পীর মুরীদীর প্রশ্নে ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তবে এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, উপমহাদেশে ইসলামের আলোর মশাল জ্বেলেছিল সূফী-সাধকেরাই। এঁরাই ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। এদেশে এক সময় বর্ণবাদী হিন্দুদের দ্বারা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নির্যাতিত, শোষিত ও অত্যাচারিত হয়েছিল। মুসলমান সূফী সাধকদের মহানুভবতায় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্যে অসহায় নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলো। কোনদিনই তরবারির জোরে বা জোর-জবরদস্তির পথে এই দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়নি। তা হয়েছে মুসলমানদের উদারতা ও মহানুভবতায়। শুধু এদেশেই নয় সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার হয়েছে অত্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। মুসলমানেরা তরবারি ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র শোষকদের হাত থেকে শোষিতদের রক্ষা করার জন্য। ধর্ম প্রচারের জন্য নয়।

এখানে উল্লেখ্য, ইসলাম মুসলমানদের দু'টি বস্তুই দান করেছে; একটি কোরআন, অন্যটি তলোয়ার। এটাই মুসলমানদের সাচ্চা চেহারা। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এক হাতে তলোয়ার, অপর হাতে কোরআন।

শক্তি ছাড়া সত্য দাঁড়াতে পারে না। পক্ষান্তরে শক্তি যদি সত্যাশ্রয়ী না হয়, তাহলে মানুষের অশেষ দুর্গতি ও অকল্যাণ ঘটে। সত্যহীন শক্তি জুলুমে রূপান্তরিত হয়। জগতের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সত্য ও শক্তির সমন্বয় তাই একান্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

এক সময়ে এদেশে সত্যহীন শক্তির দাপটে নিম্নবর্ণের ও ভিন্ন ধর্মের লোকেরা বর্ণবাদী হিন্দুদের দ্বারা চরম নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এসব নির্যাতিত জনগণ মুসলমানদের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছে।

ইসলামের উদার মতবাদ ও মুসলমানদের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই দলে দলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করতে থাকে। এই অবস্থা দেখে রক্ষণশীল হিন্দু নেতৃবর্গ নিজ সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন।

ঠিক এই সময়েই আবির্ভাব ঘটে চৈতন্যদেবের। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে সকল হিন্দুকে একই সমতলে এনে দাঁড় করাবার প্রয়াস ছিল বৈষ্ণব মতবাদের আদর্শে। এই মতবাদের উদ্ভব না হলে অধিকার বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু জাতি দল বেঁধে মুসলমান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব মতবাদ সেই সম্ভাবনার পথ রোধ করে দিয়ে নির্যাতিত বিপন্ন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আশ্রয়স্থল হিসেবে উদ্ভাসিত হয়। নইলে ইসলামের সুমহান আদর্শে হিন্দুরা যেভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে নিজেদের সমর্পিত করেছিল, সে সময় হিন্দু ধর্মকে টিকিয়ে রাখাই দায় হতো। এইভাবে আত্মরক্ষা নীতির ভিতর দিয়ে সে সময় ইসলাম বিস্তৃতির পথে বাধা সৃষ্টি করেই বৈষ্ণব মতবাদ নিরস্ত হলো না; সুলতান হোসেন শাহের উদার নীতির সুযোগ গ্রহণ করে কোন কোন বৈষ্ণব গোঁসাই মুসলমানদের পর্যন্ত বৈষ্ণব করার ধৃষ্টতা দেখাতে দ্বিধা করলেন না। বৈষ্ণব আচার্যরা প্রচার করলেন–

"ভাগ্যোদয়ে স্নেহ যদি কৃষ্ণভক্তি পায়।
ব্রাহ্মণত্ব লভে সেই বেদে ইহা গায়।"

কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়ার এই লোভ মুসলমান সমাজে বিশেষ কার্যকরী হলো না। যবন হরিদাসের মতো দু'চারজন বিভ্রান্ত লোক ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মুসলমান কর্তৃক বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণের কোন নজীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইসলামের বিস্তৃতি সারা পৃথিবীতে আজো সদর্পে এগিয়ে চলছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্বের শেষ প্রতিক্রিয়ার বিকাশ খুব বেশি দিনের পুরনো কথা নয়। এ দেশে ইংরেজদের আগমনের পর তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের ধ্বংস সাধনের যে চেষ্টা সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুরা শুরু করেছিল তার ফলস্বরূপ নানাভাবে নানা কৌশলে মুসলমান সমাজে ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ ঘটায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের উচ্চ পদগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার নামে কাজীদের অস্তিত্ব রাখা হলো, কিন্তু তাঁদের আর সমাজের উপর পূর্বের কর্তৃত্ব রইলো না। পীর, ফকির ও খন্দকার নামে মুসলমান ধর্মনেতাদের প্রাদুর্ভাব ঘটলো, কিন্তু তাঁদের প্রভাব রইলো নিজ নিজ শিষ্যদের মধ্যেই সীমিত। আরও দুঃখের কথা, তাঁরা আপন ডাল-রুটি রোজগারেই ব্যস্ত রইলেন; মুসলমান জনগণের

www.pathagar.com

ধর্মীয় জীবনের খবরদারী করার মহৎ কর্তব্যটা বিস্মৃত হলেন। তার ফল এই হলো যে, মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে বহু বেদয়াতের অনুপ্রবেশ হলো এবং আরও আক্ষেপের কথা এসব পীর ফকির খন্দকারেরা জীবিকার তাগিদে স্বার্থান্ধ হয়ে অনেক ইসলাম বিরুদ্ধ আচার-নীতিরও প্রশ্রয় দিতে থাকেন।

এরূপ বেদনাদায়ক উপস্থিতি ছিল পলাশীর পর তিন পুরুষ ধরে ষাট বছরেরও উপর। বাংলার মুসলমান বিপথগামী হলো, প্রতিবেশী হিন্দুর প্রভাবে ও অনুকরণে বহু কুসংস্কার ও শরীয়ত বিরুদ্ধ প্রথার তারা অনুসারী হয়ে পড়লো। বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক আচার প্রচ্ছন্নভাবে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং কালক্রমে তাদের ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে উঠে। অনেক নও-মুসলমান দুর্বলতা ও অশিক্ষার কারণে পূর্বের দেবদেবীর পূজায় ও কুসংস্কার পালনে অভ্যস্ত থাকে; আবার অনেকে সুবিধামতো সেগুলোকে ইসলামী পোশাক পরিয়ে ধর্মীয় মর্যাদায় উন্নীত করতে থাকে। মা-বরকত, ওলা-বিবি, শীতলা বিবির পূজা দেয়া, সিন্নী দেয়া (হরিলুটের মতো), তবারক (প্রসাদ) বিতরণ করা মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। কোরআনের আয়াত কিংবা হিন্দু ধর্মের মন্ত্র লিখিত তাবিজ (কবজ) পরার প্রথা, কলেরা, বসন্ত মহামারীর সময় হিন্দুর অনুকরণে মাটির পাত্রে এসব আয়াত বা মন্ত্র লিখে বাড়ীর দরজায় টাঙ্গানো, তেলপড়া, নূনপড়া, পানিপড়া, কালোজিরা পড়া প্রভৃতি খাওয়ার রেওয়াজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ চলিত হয়ে উঠে। ইসলামের উপর হিন্দুধর্মের এই প্রভাবকে লক্ষ্য করে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন ঃ

"যদিও হিন্দুর ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাসে তফাতটা দিন থেকে রাত্রির পার্থক্যের মতো, তবুও হিন্দু ধর্ম অন্য যে ধর্মেরই সংস্পর্শে এসেছে, সেটিকে আশ্চর্যভাবে নিজের রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। এর একটা সুন্দর উপমা হচ্ছে, মুসলমানের মসজিদকে হিন্দুর ঘন জঙ্গলে দেখার মতো। ক্রমে ক্রমে বুনো লতা-পাতা মসজিদের সুন্দর থামগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, আল্লাহর ঘরটি ঘন আগাছায় ভরে গেছে। মসজিদের সদা সাবধানী তদারককারীর হেফাজতেই তার পবিত্রতা রক্ষা সম্ভব। এরকম অবস্থা ভারতে বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল এবং ইসলামের পরিচ্ছন্ন সহজ সরল ধর্ম বিশ্বাসে বহু শতাব্দীর হিন্দু প্রভাবে মালিন্য জন্মেছিল। (আবদুল ওয়াদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩১১, ৩১২)

মহাকবি ইকবাল আরো বলেছেন–

"নিশ্চয়ই আমরা হিন্দুয়ানীতে হিন্দুদের ছাড়িয়ে গেছি। আমরা দু'রকমের জাতিভেদের কবলে পড়েছি– মযহাবী বিভেদ ও সামাজিক জাতিভেদ– আমরা এসব হিন্দুদের নিকট শিক্ষা করেছি, না হয় উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছি। এটিই হচ্ছে একটি নীরব উপায় যার ফলে বিজিত জাতি বিজেতার উপর চরম প্রতিশোধ নেয়।"

জীবদ্দশায় মুনি, ঋষি, সাধু বা পীররূপে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের দেবতা জ্ঞানে পূজা করার যে প্রথা হিন্দু ধর্মে প্রচলিত তা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজেও প্রচলন হয়ে যায়। হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদেরও ফকির, দরবেশ, আউলিয়াদের প্রতি পূজারীর মতো ভক্তি

www.pathagar.com

জানাতে থাকে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পীরের দরবারে বা মাজারে মুসলমানেরা ধর্ণা দেয়। প্রতিবছর ওরস উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্তের পীরদের দরগায় সমাগম ঘটে। পীরের শারীরিক বা অন্য কোনরূপ স্মারক চিহ্ন রক্ষিত মসজিদ বা মাজারকে গণ্য করা হয় বিশেষ পবিত্র বা ভক্তি শ্রদ্ধার স্থান বলে। মেলা বা ওরসের সময় পীর আউলিয়ার দরগাহ হিন্দুদের তীর্থস্তানের রূপ ধারণ করে। সেখানে সমাগম হয় নানা শ্রেণীর লোকের। ভক্ত, গায়ক, সাধক, দোকানদার, ব্যবসায়ী, বাজীগর, জুয়াড়ী, বেশ্যা, বাইজী, কর্মহীন ভবঘুরে, জুয়াখোর, বদমাইশদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। দরগাহে পীরের নিকট মুসলমানেরা আবেদন জানায় সন্তান, স্বাস্থ্য, ব্যাধি নিরাময়, সম্পদ লাভ ও মামলায় জয়ী হবার প্রত্যাশায়।

মাদারী নামে পরিচিত একশ্রেণীর মুসলমান ফকিরের বেশবাস হিন্দু সন্ন্যাসীদের অনুরূপ। সন্ন্যাসীদের মতো এরাও প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা করে। চুলে বিনুনী কাটে, শরীরে ভস্ম লেপন করে, গলায় ও কটিতে ঝোলায় লোহার শিকল। মাদারীদের বিশ্বাস, মহানবী মুহাম্মদ স্বর্গে আরোহণ করেন 'দাম মাদাম' এই দু'টি শব্দ উচ্চারণ করে।

পাঁচ পীরের উপাসনা কর্ম একশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। এরা 'পাঁচপীরিয়া' নামে পরিচিত। পাঁচ পীর হলেন মহাভারতের পঞ্চপান্ডব। দুঃসময় বা মহামারী উপস্থিত হলে এদের কাছে শরণাপন্ন হয় পাঁচপীরিয়া সম্প্রদায়।

নদী পথে নৌকা ছাড়বার সময় মাঝিরা পাঁচপীরের নামে ভক্তি সহকারে ডাক দিতো এভাবে–

"আমরা আছি পোলা পান, গাজী আছে নিখাবান।
শিরে গঙ্গা দরিয়া পাঁচ পীর বদর, বদর।"

জিন্দা গাজীর অনুরূপ আর একজন পীরকে ভজনা করবার রীতি আছে বাংলাদেশে। ইনি হলেন মহুয়া গাজী। শীতলক্ষ্মার উভয় তীরের অধিবাসীরা পাতার ছাউনির নীচে মাটির ঢিবি তৈরী করে তার উপর স্থাপন করতো দু'টি মাটির পিন্ড। এরা হলেন গাজী আর তাঁর ভাই কালু। ঢিবিগুলোর উপর ঢেলে দেয়া হতো নতুন গাইয়ের দুধ, তাদের সম্মুখে শিরনী চড়ানো হতো আধিব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে। শিরনীতে থাকতো ভাত, মিঠাই, কলা এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তু। এছাড়া গাজীর নিজস্ব দর্শনকে হিন্দু সাহিত্যিকরা বেশ উৎসাহের সাথে প্রচার করেছে। কালুর একটি উক্তি তখন লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতো। যেমন–

"কালু বলে নাহি আছে খোদার আকার
গাজী বলে যত মূর্তি সকলি তাহার।"

অথবা,

"হিন্দুর দেবতা তুমি, মুসলমানের পীর,
দম্‌দম্ বলিয়া কালু গাজী ছাড়িল জিকির।"

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আরেকটি উপাস্য বিষয় ছিল সত্যপীর।

www.pathagar.com

মালঞ্চার রাজা বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ময়দানবের অবিবাহিতা কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত্যপীরের জন্ম।

কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যে একস্থানে সত্যপীর আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

"হিন্দুর দেবতা আমি মুসলমানের পীর
যে যাহা কামনা করে তাহারে হাসিল।"

ময়মনসিংহ গীতিকায় দেখা যায় কবি রামেশ্বর তাঁর বই-এর সূচনাতেই সত্যপীরের পূজার প্রচলন কিভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন–

"কলিতে যবন দুষ্ট   হৈন্দুরী করিল নষ্ট
দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম।"

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতেও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় মেলে রামাই পন্ডিতের শূন্য পুরাণে–

"ব্রহ্মা হৈল মুহাম্মদ   বিষ্ণু হৈল মেগাম্বর
আদম হৈল শূলপানি
গনেশ হইল কাজী   কার্ত্তিক হইল গাজী
ফকির হইল যত মুনি।
তেজিয়া আপন ভেক   নীরদ হইল শেক
পুরন্দর হৈল মৌলানা
চন্দ্র-সূর্য আদিদেবে   পদাতিক হইয়া সেবে।
সবে মিলি বাজায় বাজনা।

মানিক পীরের নামে ছড়াগান গাওয়া হতো এভাবে–

"মানিকের নামে তোমরা হেলা কর না।
মানিকের নামে থাকলে বিপদ হবে না।।
মানিকের নামে চাল-পয়সা যে করিবে দান।
তাইলে হবে গরু-বাছুর ক্ষেতে ফলবে ধান।।

সত্যপীরের নামে বন্দনা হতো এভাবে ঃ

"তেজঃ পুঞ্জ যেন রবি, মুখে বাক্য পীর নবি
নমাজে দর্গার চুমে ধূলি।"

কবি মুকুন্দ রায়ের কাব্যে বৃটিশ আমলের মুসলিম সংস্কৃতির চিত্র এঁকেছেন এভাবে :

ফজর সময়ে উঠি
বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করত্র নমাজ
সোলেমানি মালা ধরে
জপে পীর পেকম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ।

www.pathagar.com

দশ-বিশ-বিরাদরে
বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কিতাব কোরান,
কেহ বা বসিয়া হাটে
পীরের শিরনী বাঁটে
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান।।
বড়ই দানিশমন্দ
কারো নাহি করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি,
ধর এ কম্বোজ বেশ
মাথায় না রাখে কেশ
বুকে আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।

পবিত্র কোরআনকে নিয়েও হিন্দুরা কাল্পনিক কবিতা লিখে মুসলমানদেরকে এক জাতিসত্ত্বায় একাকার করার প্রচেষ্টা চালায়। যেমন-

"আমায় পড়াও বাপ কোরান কেমন
কথা শুনি স্তব্ধ হইল কুশল ব্রাহ্মণ।
কহিতে লাগিল ঠাকুর হয়ে ক্রোধভাব
কি কারণে চাহিস তুই কোরান পড়িবার।
ব্রাহ্মণে কোরান পড়ে কোন শাস্ত্রে বলে
এইক্ষণে কোরান ভাসায়ে দেহ জলে।
সত্যপীর বলে কোরান পড়িলে কিবা হয়
দ্বিজ বলে কোরান পড়িলে জাতি যায়।
এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোসাই।
সেই নিরঞ্জনের নামে বিছমিল্লাহ্ কয়।
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়
কেহ কোন নদী বইয়া কোন দিকে যায়
সমুদ্রে যাইয়া সব একত্র মিশায়।
তেমনি ছত্রিশ জাতি এক জাত হইয়া
একপথ দিয়া সবে যাবে মিশাইয়া।"

বাবন পীরের নামে গানের দু'টি কলি এখানে উদ্ধৃত হলো-

"সাকসেরেতে এলেন হুজুর বাবন মোল্লা নূরানী
কর সেজদা, কর সেজদা ওহে মুরিদানী।"

হিন্দুরা আদম পীর, আবাল সিদ্ধিপীর, একদিল শাহপীর, কান্ত দেওয়ান পীর, কালুপীর, খাষবিবি গোরা চাঁদ, গোরা সইদ, চম্পাবতী, ঠাকুর বর সাহেব, দাদাপীর,

www.pathagar.com

নির্ঘিনশাহ, পাঁচ পীর, ফাতেমা বিবি, বদরপীর, বড় খাঁ গাজী, বড় পীর, বাবণ পীর, মসনদ আলী, মাদার পীর, রওশন বিবি, শাহবাজ, সাভরণ পীর, হাসান পীর, হায়দার পীর, ওলা বিবি, খুঁড়ি বিবি, ত্রৈলোক্য পীর, পাগলা পীর প্রভৃতি পীরের নামে কাল্পনিক চটকদার কাহিনী, গান ও কবিতা লিখে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতো।

(তথ্য ঃ বাংলা পীর-সাহিত্যিক কথা, ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ৪৮৮, ৪৮৯)

পূর্ব ভারতে মুসলমানেরা হিন্দু ধর্মের অনুকরণে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে থাকে। এই ফকির বা সন্ন্যাসীরা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের বিশ্বাস ও আচার ব্যবহার এতই অদ্ভুত যে, তাদের মুসলমান বলে চিহ্নিত করা ছিলো প্রায় দুঃসাধ্য। অর্জুনশাহী, জালালী, মাদারী, বেনওয়াজী প্রভৃতি এবং অন্যান্য শ্রেণীর ফকিরদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বাউল, লালনশাহী আর সহজিয়া। শেষোক্তরা প্রথম দু'শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এরা স্ত্রীলোকদের মতো বেশবাস করে এবং মেয়েদের নাচগান করা উপার্জনের অর্থই হলো এদের জীবিকার প্রধান উৎস। মুর্শিদ বা ধর্মীয় গুরুর সম্মুখে ভক্তিমূলক নৃত্যগীত, নানা প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন আর ব্যাভিচার অপর দুই সম্প্রদায়ের ফকিরদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

বৃটিশ আমলে তৎকালীন সিভিল সার্জন জেমস টেলর তার 'কোম্পানী আমলে ঢাকা' গ্রন্থে দু'জন পীর-ফকির সম্পর্কে লিখেন ঃ

শহরের সন্নিকটে বিরাট সম্মানিত পবিত্র দু'জন পীরলোক এবং বেশ কিছুসংখ্যক ফকির আছেন। এসব ফকিরের কেউ কেউ মাঝে মাঝে মুহররম ও রমজানের উৎসবের প্রাক্কালে মাটির নিচে নিজেদেরকে কবরস্থ করে তাঁদের ধর্মীয় আবেগের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে কবরের আকারে একটি গর্ত খোঁড়া হয় এবং কৃচ্ছ্রসাধনের প্রাক্কালে নেহায়েত জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে করে ভদ্রলোক উক্ত কবরে নেমে পড়েন। কেবল বাতাস প্রবেশের জন্য সামান্য একটুখানি ছিদ্রের ব্যবস্থা রেখে, অতঃপর এই কবরগুহা বাঁশ, মাদুর ও মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফকির এ অবস্থায় সেখানে অবস্থান করেন।

এদেশের মুসলমানদের দৈনন্দিন ধর্মীয় জীবনে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এর কিছু আঁচ করা যায় একজন ঐতিহাসিকের লেখায়। তিনি লিখেনঃ

"ফরায়েজী আন্দোলনের আগে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা মুসলমান হলেও ইসলাম বা শুদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ছিল সীমাহীন। অধিকাংশ ধর্মান্তরিত হওয়া ধর্মীয়বোধ তেমন জোরদার না হওয়ায় পুরুষানুক্রমে পুরনো ধর্ম আচরণেই ছিল সে অভ্যস্ত। ফরায়েজী আন্দোলন ধর্মের শুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু অংশের কিছু কিছু লোককে আলোকিত করেছিল মাত্র।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি মুসলমানদের ধর্মবোধ সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি কৃষ্ণকুমার মিত্রের লেখায়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক ও বিপ্লবী ও সন্ন্যাসী অরবিন্দ ঘোষের খালু। জন্ম তাঁর ময়মনসিংহে। ওই অঞ্চলের মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

"তখন ফরাজী আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই। মুসলমানরা নামাজ পড়িত না। গ্রামে মসজিদও ছিল না। স্থানে স্থানে দরগা ছিল। মুসলমানরা তপন বা লুঙ্গি পরিত না। কাছা কোঁচা দিয়া ধূতি পরিত। তাহাদের অনেকেরই হিন্দু নাম ছিল, যেমন গোপাল, সনাতন, ঈশান ইত্যাদি। মুসলমানেরা দুর্গা-কালী প্রভৃতি পূজার ভোগের জন্য মানকচু, কুমড়া ও বলির জন্য পাঁঠা দিত। তাহাদের দরগায় গরু প্রভৃতি জন্তুর মূর্তি রাখা হইত। মাদার বাঁশের অর্চনা হইত। মুসলমানেরা সেকালে কালী পূজার সময়েও বলির জন্য পাঁঠা দিত; কাগমারীর হিন্দু জমিদারেরা বিবাহদি শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে বাদ্য ভান্ডসহ দরগার নিকটে যাইতেন এবং নানা উপাচারে দরগার অর্চনা করিয়া বাড়িতে ফিরিতেন। দরগার নিকটে বাদ্য ভান্ড করিলে মুসলমানদের খুব আনন্দ হইত।"

বাংলার বাউল সম্প্রদায় সম্পর্কে জনাব আব্বাস আলী খান বলেন– "জঘন্য ও নোংরা পরিবেশের প্রভাবে বাংলার তৎকালীন মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন এবং সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিশৃঙ্খলার এক অতি শোচনীয় স্তরে নেমে আসে। এ অধঃপতনের চিত্র পাঠক সমাজে পরিস্ফুটিত করে তুলে ধরতে হলে এখানে মুসলমান নামধারী মারফতী বা নেড়ার পীর-ফকিরদের গঠন পদ্ধতির উল্লেখ প্রয়োজন। এ ভন্ড ফকিরের দল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যথা আউল, বাউল, কর্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি। এগুলি হচ্ছে হিন্দু বৈষ্ণব ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ যাতে করে সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বিপথগামী করা যায়।

এদের মধ্যে বাউল সম্প্রদায় মনে হয় সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও যৌনপ্রবন। মদ্য পান, নারী-পুরুষে অবাধ যৌনক্রিয়া এদের সকল সম্প্রদায়েরই সাধন পদ্ধতির মধ্যে অনিবার্যরূপে শামিল। তবে বাউলগণ উপরে বর্ণিত তান্ত্রিক বামাচারীদের ন্যায় যৌনসঙ্গমকে যৌনপূজা বা প্রকৃতি পূজারূপে জ্ঞান করে। তাদের এ যৌনপূজার মধ্যে 'চারিচন্দ্র ভেদ' নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। একে তারা একটি অনিবার্য পবিত্র অনুষ্ঠান মনে করে। তাদের মতে, মানুষ এ চারিচন্দ্র বা মানব দেহের নির্যাস যথা রক্ত, বীর্য, মল ও মূত্র পিতার অন্ডকোষ ও মাতার গর্ভ থেকে লাভ করে থাকে। অতএব এ চারিচন্দ্র বাইরে নিক্ষেপ না করে দেহে ধারণ করা কর্তব্য। বাউল বা নেড়ার ফকিরগণ এ চারিচন্দ্র সাধনের সাথে 'পঞ্চরস সাধন'ও করে থাকে। 'পঞ্চরস' হচ্ছে তাদের ভাষায় কালো, সাদা, হলুদ ও মুর্শিদবাক্য। এ চারবর্ণ যথাক্রমে মদ, বীর্য, রজঃ ও মলের অর্থজ্ঞাপক। আপন স্ত্রী অথবা পরস্ত্রীর সাথে সঙ্গমের পর তারা মুর্শিদবাক্য পালনে এ চারবর্ণের পদার্থ ভক্ষণ করে থাকে।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা আকরাম খাঁ তার 'মুসলিম বংগের ইতিহাস' গ্রন্থে বাউলদের সম্পর্কে লিখেন ঃ "কোরআন মজিদের বিভিন্ন শব্দ ও মূল তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এই সমস্ত শয়তান নেড়ার ফকিরের দল দিয়াছে তাহাও অদ্ভুত। "হাওজে কাওসার" বলিতে তাহারা বেহেশতী সঞ্জীবনী সুধার পরিবর্তে স্ত্রীলোকের রজঃ বা ঋতুস্রাব বুঝে। যে পূজা পদ্ধিতিতে এ ঘৃন্য ফকিরের দল বীর্য পান করে, তাহার সূচনার বীজ মে আল্লাহ (মায়াযাল্লাহ, মায়াযাল্লাহ) অর্থাৎ বীর্যে আল্লাহ অবস্থান করেন– এই অর্থে "বিসমিল্লাহ"

www.pathagar.com

শব্দ উচ্চারণ করে থাকে।

"এই মুসিল ভিক্ষোপজীবী নেড়ার ফকিরের দলের পুরোহিত বা পীরেরা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্র হরণের অনুরূপ এক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যখন পীর তাহার মুরীদানের বাড়ী তশরিফ আনে, তখন গ্রামের সকল যুবতী ও কুমার উত্তম বসনে সজ্জিত হইয়া, বৃন্দাবনের গোপীনীদের অনুকরণে একটি গৃহকক্ষে পীরের সহিত মিলিত হয়। নাটকের প্রথম অংকে এই সকল স্ত্রীলোক নৃত্যগীত শুরু করে। নিম্নে এই সখীসংগীতের গদ্যরূপ প্রদত্ত হইল ঃ

ও দিদি যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতে চাও,
আর আত্মপ্রতারণা না করিয়া শীঘ্র আস,
দেখ, প্রেমের দেবতা আসিয়াছে।
আঁখি তোল, তাহার প্রতি তাকাও
গুরু আসিয়াছে তোমাদের উদ্ধারের জন্য
এমন গুরু আর কোথাও পাইবে না।
হ্যাঁ, গুরুর যাহাতে সুখ
তাহা করিতে লজ্জা করিও না।

"গানটি গীত হইলে পর এ সমস্ত নারী তাহাদের গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পড়ে এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। পীর এখানে কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেও তদ্রূপ এই সমস্ত উলঙ্গ নারীর পরিত্যক্ত বস্ত্র তুলিয়া লইয়া গৃহের একটি উঁচু তাকে রক্ষা করে। এই পীরকৃষ্ণের যেহেতু বাঁশী নাই, তাই সে নিম্নোক্তভাবে মুখে গান গাহিয়া এইসব উলঙ্গ রমনীদেরকে যৌনভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে ঃ

"হে যুবতীগণ। তোমাদের মোক্ষের পথ ভক্তকুলের পুরোহিতকে অর্ঘস্বরূপ দেহদান কর।

কোনরূপ সংকোচ বোধ না করিয়া পীরের যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করাই ইহাদের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।" (মুসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস)

সব নির্ভৃত, গোপন বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ দুর্নিবার। যৌন ক্রিয়া নিঃসন্দেহে সুখকর অনুভূতি। তাই বলে এর অবাধ ব্যবহার কখনো কাম্য হতে পারে না। যৌন সঙ্গম যেমন গণ-ধিকৃত তদ্রূপ একটি জঘন্য পাপাচার। এমন কোন ধর্মই যদি অনুসারীদেরকে সে লাম্পট্যতার আহবান জানায় তা হলে উক্ত ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আসলে ধর্মের নামে কতিপয় বিকৃত রুচির মনবাঞ্চা চরিতার্থের এটি একটি অপপ্রয়াস মাত্র।

উপরে বর্ণিত ভন্ডপীর ফকির দলের এরকম অনেক অপকীর্তি ও অশ্লীল ক্রিয়াকান্ডের উল্লেখ করা যায়।

পীর ফকিরদের এসব বিকৃত আধিপত্য বিস্তার হিন্দু এবং ইংরেজদের সৃষ্ট একটি মনগড়া নীতি যা মুসলমানদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

কতিপয় মুসলমানরা প্রভাবিতও হয়েছে।

১৯১১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে এমন কিছু সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া গেছে যারা নিজেরাই স্বীকারোক্তি করেছে যে, তারা হিন্দুও নয় এবং মুসলমানও নয়। বরঞ্চ উভয়ের সংমিশ্রণ।

কিছু সংখ্যক মুসলমানের পৌত্তলিক ভাবধারার রস এখনো সঞ্জীবিত রেখেছে বাংলা ভাষার কতিপয় বৈষ্ণববাদ ভক্ত ও পৌত্তলিক ভাবাপন্ন মুসলিম কবি। ভক্ত কবি লাল মাসুদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বৈষ্ণববাদের প্রতি এতটা বিশ্বাসী হয়ে পড়েন যে, একটি বট বৃক্ষমূলে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করে রীতিমত সেবা-পূজা করতে থাকেন। যেদিন গোস্বামী প্রভুর লালুর আশ্রমে উপস্থিত হন, সেদিন নিম্নোক্ত গান গেয়ে প্রভুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

"দয়াল হরি কই আমার
আমি পড়েছি ভব কারাগারে, আমায় কে করে উদ্ধার
শত দোষের দোষী বলে, জন্ম দিলে যবন কুলে
বিফলে গেল দিন আমার।"

এরপর আসে কবি লালন শাহের কথা। তার কয়েকটি গান নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

"পার পর, চাঁদা গৌর আমায়, বেলা ডুবিল
আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিনত বয়ে গেল।
আছে ভব নদীর পাড়ি
নিতাই চাঁদ কান্ডারি।....
ও চাঁদ গৌর যদি পাই, ও চাঁদ গৌর হে,
কুলে দিয়ে ছাই
ফকীর লালন বলে শ্রীচরণের দাসী হইব।"

উপরে কবি লাল মাসুদ আক্ষেপ করে বলেন যে, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তার জীবন বিফল হলো। লালন শাহ্ বলেন, গৌর নিতাইকে পেলে মুসলমানী ত্যাগ করে তার শ্রীচরণের সেবায় রত হবেন।

লালন শাহের কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কীয় গান ঃ

"কৃষ্ণপ্রেম করব বলে, ঘুরে বেড়াই জনমভরে
সে প্রেম করব বলে ষোল আনা
এক রতির সাধ মিটল নারে।
রাধারাণীর ঋণের দায়
গৌর এসেছে নদিয়ায়
বৃন্দাবনের কানাই আর বলাই
নৈদে এসে নাম ধরেছে গৌর আর নিতাই।"

মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার উপাদান রমেশ শীলের গানেও রয়েছে। যেমন–

"মীমের পর্দা উঠইলে দেখবি ওরে মন–

www.pathagar.com

রাম রহিম কৃষ্ণ করিম মূলেতে একজন
আহমদে আহাদ পাওয়া আহমদ আহাদ হওয়া
মনছুরের আনাল এক কওয়া সেই কথার কারণ।
দেখবি সেই পর্দার ভিতরে রছুলুল্লা বিরাজ করে
গুপ্ত খবর ব্যক্তি করে খেলে মাওলা ধন॥
ফানা ফিল্লা গুলীর চোটে সত্তর হাজার পর্দা ফাটে
সচুক্ষু ফোটে ভাগ্যে জোটে মাওলার দরশন।
রমেশ কয় মোর্শেদেরে পর্দা উঠাও দয়া করে
হেজাবুল আকবরে পাড়ি গেল এই জীবন॥

(সূত্র : বাংলার মুসলমানের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান)

পাশ্চাত্যের অনেক অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ইসলামকে জানতে গবেষণা করে যাচ্ছে। আর আমাদের দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল বলে দাবীদার বুদ্ধিজীবীরা গবেষণামূলক ধর্মকে বাদ দিয়ে লালনকে নিয়ে গবেষণা করছে। আল্লাহ-রাসূল, ইসলাম, মুসলমান– এই শব্দগুলো নিয়ে এদের এলার্জি থাকলেও লালনবাদ নিয়ে তারা খুবই উচ্চকিত। প্রেস ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় লালন ও বাউলবাদ প্রচারে খুবই উৎসাহিত। এর রহস্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

লালন দর্শনে 'ষট্ চক্র' রয়েছে। স্থানাভাবে এই 'ষট্ চক্রের' ব্যাখ্যা এখানে দেয়া সম্ভব নয়। তবে লালন দর্শনের স্বরূপ কি তা উপলব্ধি করার জন্য শুধু মূলাধার চক্রের ব্যাখ্যা সংযোজিত হলো।

স্বাধিষ্ঠান চক্রের নিম্নদেশে গুহ্য ও মেঢ্রের মধ্যস্থলে মূলাধার (১৮) পদ্ম আছে। উহার চারিটা দল। ঐ চতর্দ্দলে ব শ ষ স এই সুবর্ণ বর্ণ ৪টি বর্ণ আছে এবং (১৯) যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বীরানন্দ নামক গুরুপংক্তি বিরাজিত আছেন। ঐ পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথ্বি মন্ডলাভ্যন্তরে লং বীজ সহ হস্তিবাহনোপরি পৃথিবী ক্রোড়ে ডাকিনী শক্তিনামা সাবিত্রী সহিত ব্রক্ষা অধিষ্ঠিত আছেন। ঐ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পৃথ্বি মন্ডলের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমন্ডলে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ মহাদেবকে তড়িদ্বনা মৃণালতন্তু সদৃশ সূক্ষ্মা কুন্ডলিনী শক্তি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকৃতি রূপে সপাকারে বেষ্টন পূর্ব্বক ব্রহ্ম দ্বার রোধ করিয়া নিদ্রিতা আছেন।

(১৮) আধার পদ্ম সমাখ্যাতং গুদোর্দ্ধে পরমেশ্বর।
সুষম্মা মুখলগ্নন্তু ধ্রজাধে চতুরঙ্গুলে।
সুবর্ণ রচিতং পত্রং চতুঃ সংখ্যা সুশোভনং।
অধোবক্ত্রং মহাপদ্মং বেদবর্ণযুতং স্মরেং।।
বকারাদিসা ন্তৈশ্চবর্ণে নিযুক্তৎ।
চতুস্কোণ চক্রান্ত পদ্মং প্রসিদং।
চতুস্কোণ মধ্যে ধরায় ঃ স্ববীজং।।
গজেন্দ্র বাহনং দেবং দেবদেবং সনাতনং।

www.pathagar.com

চিত্রে লালন দর্শন

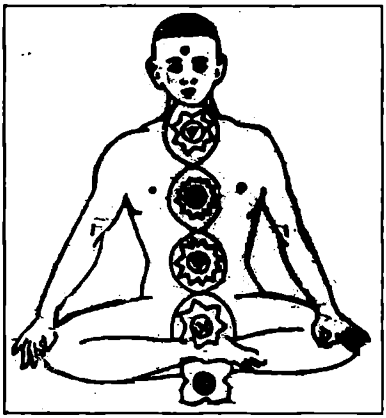

ষট্ চক্রের স্থিতি

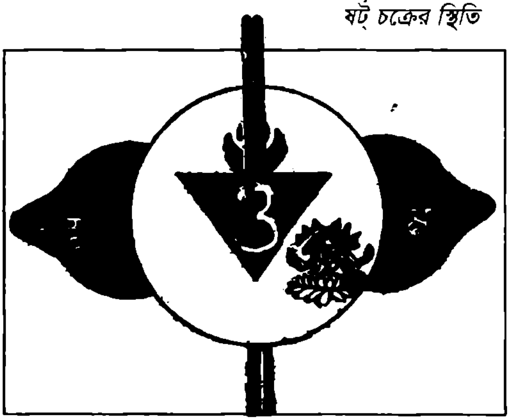

আজ্ঞা চক্র

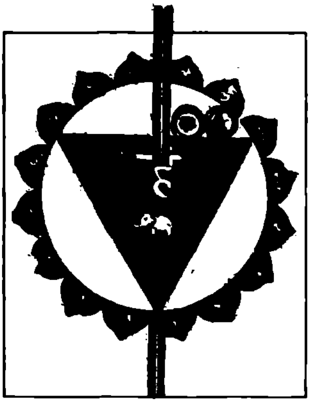

বিশুদ্ধ চক্র

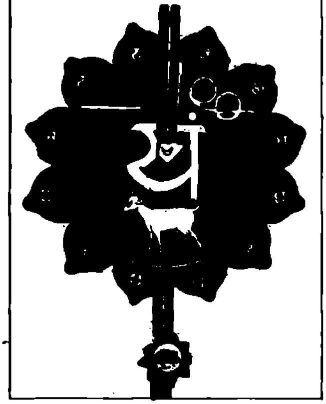

অনাহত চক্র

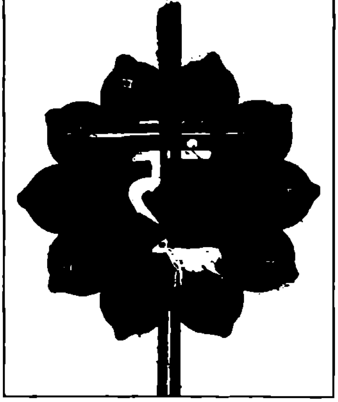

মণিপুর চক্র

www.pathagar.com

তদঙ্কে সংস্থিতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকারী পুনঃ পুনঃ।।
তত্রস্থ ডাকিনী শক্তি মধুমত্তা সনাতনী।
রক্ত নেত্রা বিশালাক্ষী শত সূর্য্য সমপ্রভা নিগম।
এই চক্রে লং বীজ দ্বারা পৃথ্বি তত্ত্বের ধ্যান করিতে হয়।
লং বীজং ধরণীং ধ্যায়েৎ চতুরস্রাং সুপীতভাং।
সুগন্ধং স্বর্ণ বর্ণত্বমা রোগ্যং দেহলাঘবং।। ১৬৬।।
স্বরোদয়।

পৃথিবীতত্ত্বের বীজ মন্ত্র লং। পৃথ্বি তত্ত্ব, চতুষ্কোণ, পীতবর্ণ, উত্তম গন্ধযুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণসংযুক্ত এবং আরোগ্য ও শরীরের লঘুতাকরণ শক্তি সম্পন্ন– এইরূপ ধ্যান করিবে।

মূলাধার চক্রস্থ বৃত্তি
(১৯) গুদ লিঙ্গান্তরে চক্রামায়ারত্তু চতুর্দ্দলম।
পরম সহজস্তদ্বদানন্দো বীর পূর্ব্বকঃ।।
যোগানন্দশ্চ তস্য স্যাদীশানাদি দলে ফলম।
টাকা– হংসোপনিষৎ।
[আত্মতত্ত্বদর্শন ঃ পৃঃ ১৬৯-১৭৪]

(সূত্র : হারামনি (৫ম খন্ড), মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, পৃঃ ২৪১, ২৪২)

সুতরাং কোনো ঈমানদার মুসলমান এই জগাখিচুড়ি মার্কা ঈমান-আকিদার পরিপন্থী এই লালন দর্শনের অনুরক্ত হতে পারে না।

লালনের গানে যে দেহতত্ত্বের দর্শন রয়েছে তা অত্যন্ত চাতুরিপূর্ণ। সরল প্রাণ মানুষকে গোমরাহীর দিকে ঠেলে দেয়ার একটি অভিনব প্রতারণা। প্রকৃতপক্ষে দেহতত্ত্ব. চিকিৎসা বিদ্যার বিষয়; আধ্যাত্মিকতার নয়। লালনের গানে যে দেহতত্ত্ব-এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় দেহই সব। যা ফ্রয়েডের দর্শন এবং যা ইসলামী দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক। আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাবো না। আর এখানে তা সম্ভবও নয়। আমি শুধু দৃষ্টান্ত হিসেবে এই নোংরা ও কুৎসিত মতবাদের প্রবক্তা লালনের গান থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। লালন বলেন ঃ

"উপাসনা নাই গো আর
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থ ব্রত যার জন্য
এই দেহের তার সব মিলে।"

অথবা

"এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন
তাইতো মানুষরূপ গঠনে নিরঞ্জন।"

কথাগুলোর মর্মার্থ হলো– বিকৃতি ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে দেহলিপ্সু নারী পুরুষকে ডেকে নেবার একটা ভূমিকা মাত্র। এই ধরনের পংক্তি আরো অনেক আছে, যার কাজ

www.pathagar.com

হলো লালনের উদ্ভাসিত অথবা ঈপ্সিত নিভৃত সাধনার গোপন অন্দর মহলে প্রবেশের আহবান। কিন্তু সকল 'উপাসনা', 'তীর্থ ব্রত', 'মাধুর্য ভজন' যে লক্ষ্যে নিবেদিত সেই 'মহামূল্যবান' সাধারণ স্বরূপ কী? খুবই অশ্লীল ও অকথ্য কিন্তু লালন বড় 'সুন্দর' করে বলেনঃ

"জন্মপথে ফুলের ধ্বজা
ফুল ছাড়া নাই গুরুপূজা
সিরাজ সাঁই কয় এ ভেদ বোঝা
লালন ভেড়োর কর্ম নয়।"

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়, নারীর জন্মপথ অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়কে পুষ্পার্ঘ্যরূপে গুরুর কাছে নিবেদন করাই সাধনার প্রথম পাঠ (নাউজুবিল্লাহ) এবং গানের স্তাবকটিতে উল্লেখ করা আছে, তা সাধারণ ফুল নয়, 'বাঁকা নদীর তীরে বারো ফুল ফোটে'। বুঝা যায়, 'জন্মপথে' নারীর যে মাসিক রজঃস্রাব, সেই 'মহাযোগের' মাহেন্দ্রক্ষণে ভক্তির নৈবেদ্য সাজিয়ে গুরুর কাছে নিঃশেষে সমর্পিত হবার নামই সাধিকার জন্য 'পরম সাফল্যের' সন্ধান লাভ; শুধু সাধিকা নয়, গুরুর জন্যও বটে।

লালনের একটি বিখ্যাত গানের কিছু অংশঃ

"তিরপিনীর তীর ধরে
মীনরূপে সাঁই বিহার করে
তুমি উপর উপর বেড়াও ঘুরে
সে গভীরে ডুবলে না
মাস অন্তে মহাযোগ হয়
নীরস হতে রস ভেসে যায়
করিয়ে সে যোগের নির্ণয়
মীনরূপে খেল দেখলে না।"

তিরিপিনীর অর্থ ত্রিবেণী। লালন এখানে দেহ সাধনার নামে লাম্পট্যের এক আবহ নির্মাণ করেছেন। এক সময় ভারতবর্ষে অনেক

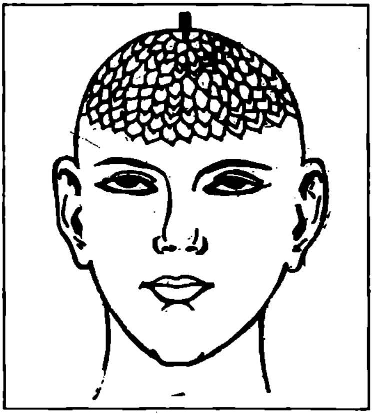

মস্তকের মধ্যবিন্দুতে স্থিত সহস্রার

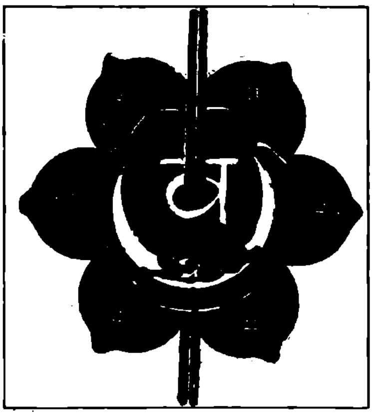

স্বাধিষ্ঠান চক্র

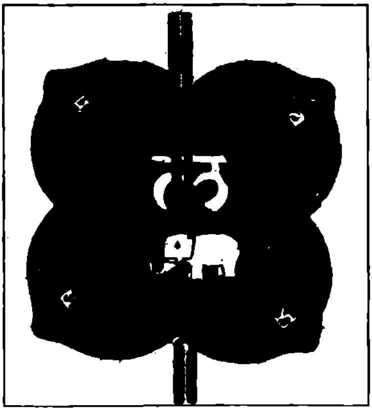

মূলাধার চক্র

www.pathagar.com

চতুর মোহান্ত দেবতার নামে দেবদাসীদের শরীর ভোগ করতো। দক্ষিণ ভারতে কোন কোন স্থানে এই যৌনাচার এখনো অব্যাহত আছে। লালন এই চতুর মোহান্ত দেবতার নামে দেবদাসীদের ভোগ করতো। লালন এই চতুর মোহান্তদেরই চতুর এক বাঙ্গালী সংস্করণ।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী, গীতিকার, গ্রন্থকার এবং কুষ্টিয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক আবু জাফর বলেন, দেহতত্ত্ব যে কী জিনিস, আল্লাহ মালুম! দেহতত্ত্ব চিকিৎসা বিদ্যার বিষয় হতে পারে কিন্তু এর সাথে আধ্যাত্মিকতার কি সম্পর্ক? বস্তুত, এটা একটা অতি নিম্নমানের চাতুরিতাপূর্ণ পরিভাষা, সরলপ্রাণ মানুষকে গোমরাহির দিকে টেনে নেবার একটা প্রতারণা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যতো নোংরা প্রতারণাই হোক, এই গানের সংখ্যাও বিপুল, প্রভাবও ভয়াবহ। লালনের গানে যে দেহতত্ত্ব, তার সরল অর্থ হলো দেহই সব। প্রায় হুবহু ফ্রয়েডের মতো কথা। ফ্রয়েড তবু তো অনেক ভাল যে, তিনি যৌনতাকে মানব জীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। খুবই ভুল কিন্তু ফ্রয়েডের মধ্যে অন্তত কোন রকম চালাকি ছিলো না। অথচ লালন এ ক্ষেত্রে এক চতুর-কামুকতা ও বিকৃত কামপ্রক্রিয়ার ধারক ও প্রচারক। লালন তত্ত্বের প্রধান কথাই হলো, সাধনা-সিদ্ধি-মোক্ষ সবকিছুই এই দেহেরই মধ্যে। এই তত্ত্ব কারও কারও কাছে খুবই প্রিয়; কারণ স্পষ্ট, আধ্যাত্মিকতার আবরণে প্রাণভরে দেহ-সম্ভোগের এমন নির্ঝঞ্ঝাট সুযোগ অন্য আর কোথায় পাওয়া যাবে। লাম্পট্যের মধ্যে এমন মারেফাতী তরিকার সবক ও সৌরভ কতই না মূল্যবান। সবাই জানে, মানুষের দেহে আত্মার আনাগোনা বলে কিছু নেই। আত্মা একবারই আসে, একবারই বিদায় গ্রহণ করে। কতিপয় পন্ডিতের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন, রূহ বা আত্মা হলো আল্লাহর হুকুম। আসলে 'অচিন পাখি', 'অচিন মানুষ' ইত্যাদি শব্দবন্ধ লালন ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে। লালনের বিবেচনা মতে, 'অচিন পাখি, ধরার স্থান হলো 'মূলাধারাচক্র বা ত্রিবেণীর ঘাট'; অর্থাৎ একেবারে নারীর নিভৃত যৌনাঙ্গ। বস্তুতই, লালনগীতির সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এই ধরনের কদর্য অশ্লীলতা। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৭ জানুয়ারী ১৯৯৯)

দেহতত্ত্বের নামে এই মজা মারা দলের কদর্য অশ্লীলতার বাণী ও দর্শন অত্যন্ত গুরুত্ব. সহকারে ঘন ঘন প্রচার করে থাকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অর্থে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে। এমনকি বেসরকারী চ্যানেল 'একুশে টিভি' লালন মতবাদ প্রতি সপ্তাহে প্রচার করে থাকে। কয়েক দিন পূর্বে এমনই একটি পর্ব দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিলো। প্রশ্নকারীর উত্তরে লালন অনুসারী বলেন– "কোন নারী যদি কোন পুরুষের পাপকে অর্থাৎ অপকর্মকে গোপন করে সে ঐ পুরুষের আপন হয়ে যায়। সেই মহিলাকে ব্যবহার করতেও কোন বাঁধা নেই। (নাউজুবিল্লাহ)।

লালনের কিছু গান আছে সর্বমহলে স্বীকৃত। এ গানগুলো সুর ও বাণীতে সমৃদ্ধ। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে কিছু গানের কলি উদ্ধৃত করছি।

আমার বাড়ীর কাছে আরশি নগর

www.pathagar.com

এক পড়শী বসত করে।
আমি একদিনও না দেখলাম তারে।

★ ★ ★

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।

★ ★ ★

লালন মরলো জল পিপাসায়
থাকতে পদ্মা মেঘনা প্রভৃতি।

লালনের অনেক গান মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে বিতর্কিত ছিলো। সূফীবাদের অন্তরালে মুসলমানদের স্বাতন্ত্রতা অন্যান্য ধর্মের সাথে একাকার করার একটি হীন অপচেষ্টা বৃটিশ আমল থেকেই শুরু হয়েছে। এখনো হচ্ছে। যেমন লালনের একটি গানে বলা হয়েছে ঃ

সব লোক কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন কয়! জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান?

ভাববাদী এসব বাউলদের লোকপ্রিয়তার অনেক কারণই এ দেশের সংস্কৃতিতে রয়েছে। এ নিয়ে বেশী কথা এখানে বলার সুযোগ নেই। তবে লালন তার এ গানের চার লাইনে (সব লোক কয় লালন..... কি হয় বিধান?) তিনি তার বিশেষ সমাজ ও গোষ্ঠীর বোধ ও চেতনারই পরিচয় তুলে ধরেছেন। লালনের মতো সাধুরা সংসার, ধর্ম ও সমাজ ত্যাগী বাউল ভবঘুরে। তাই ঠিকই বলেছেন তিনি কোনো বিশেষ জাতির (ধর্ম বিশ্বাসমূলক) নন। তাঁর খেয়ালী ও অচেতন নজরে জাতের ভেদ বিচার ধরা না দেয়াই স্বাভাবিক। তবে এ ধরনের খেয়ালী ও হেয়ালী লোক দাবী করলেও খৎনা ছুন্নত মুসলমান হওয়ার কোনো শর্ত কখনো নয়। ছুন্নত বা খৎনা মিল্লাতে ইব্রাহীমের (মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদী) একটি নিয়ম যা অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত। অবশ্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিশেষ করে কিডনী বিশেষজ্ঞরা এতোদিনে খৎনার (ছুন্নত) যে অকাট্য কল্যাণের কথা আবিষ্কার ও প্রমাণ করেছেন তা লালনদের কখনো জানার কথা নয়। মুসলমান হওয়ার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো তৌহিদের উপর ঈমান ও আমল। তা নারী পুরুষ উভয়ের বেলায়ই প্রযোজ্য। এখানে খৎনার সাথে মুসলমানিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ অশ্লীলভাবে নারী সম্পর্কে খৎনার বিষয়টি টেনে এনে লালন ইসলাম ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা ও মুর্খতারই পরিচয় দিয়েছেন। এইসব অশ্লীল ও সুরসুরি মার্কা উক্তি গানের আসর মাতিয়ে তুলে একই পর্যায় ও শ্রেণীর লোকদের সাময়িক রসনা সিক্ত করা যায়। কিন্তু জ্ঞান-প্রজ্ঞাভিত্তিক ধর্মীয় বিষয়াবলী এসব আজগুবি দর্শনের উপর নির্ভর নয়।

আমাদের ঐতিহ্যবাহী সারি গান, জারি গান, পালা গান, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া

www.pathagar.com

ইত্যাদি গানের মেলা হয় না আনুষ্ঠানিক কদর বাড়ে না। এই বাউল মেলার পাশে আমাদের পরিচয় আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা মুছে ফেলারও অপচেষ্টা চলছে। গ্রাম বাংলার মরমী সাধক, কবি ও শিল্পীদের সবাইকে পাইকারী হারে বাউল বানানোর পাঁয়তারা সত্যিই হাস্যকর। বাংলাদেশে নাকি ৫ থেকে ৬ লাখ বাউল আছে। প্রকৃতপক্ষে বাউল কারা এ সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাবে পর্যটক লিখেছেন–

বাংলা সাহিত্যে বাউল শব্দটি প্রথম ব্যবহার হয়েছে তার অনেক পরে উদ্ভব হয়েছে বাউল মতবাদ ও বাউল গান, হিন্দু-বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তিতে বাউল মতবাদ গড়ে উঠেছে। এতো সূফীবাদের প্রভাবও আছে বলে পন্ডিতেরা জানিয়েছেন। বাউল মতবাদের দু'টি দিক রয়েছে। একটি বিশ্বাসগত দিক, অন্যটি সাধন পদ্ধতিগত দিক। বিশ্বাসগত দিক থেকে সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র ও অদ্বিতীয় পরম সত্তাকে উপলব্ধি করা তথা মানুষ ও স্রষ্টাকে অভেদ কল্পনা করা বাউল মতবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাউল মতবাদ গুরুবাদী। এই গুরু কখনো মানুষ কখনো স্বয়ং স্রষ্টা। বাউল মতবাদের অনুসারীরা আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারে বিশ্বাসী নয়। দেহবাদী সাধনা এই মতবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সাধনা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসারে হয়ে থাকে। সাধন পদ্ধতিগত দিক থেকে দেখা যায়, বাউল মতবাদীরা রাগপন্থী। কামাচার বা মিথুনাত্মক যোগ সাধনই বাউল পদ্ধতি। বাউল মতে, স্রষ্টা বস্তুতরূপে মানব দেহেই অবস্থিত। পুরুষের বীজরূপী সত্তাই স্রষ্টা। পুরুষ দেহে অবস্থিত বীজরূপী স্রষ্টা প্রকৃতিরূপী নারী দেহে বর্তমান রজের সঙ্গে মিলিত হয়। এই মতবাদ যে নিতান্তই কামাচারসর্বস্ব এ থেকে তা বুঝা যায়। এ ছাড়া বাউলদের সাধনার আরেকটি দিক হলো, চারি বস্তু ভক্ষণ। এই চারি বস্তু হলো ঃ মল, মূত্র, শুক্র, রজ। এদিক থেকে তারা ঘোরতর অনাচারী। বাউলরা প্রথাসিদ্ধ বিবাহে বিশ্বাসী নয়। তবে সাধন সঙ্গিনী হিসাবে পুরুষ নারীকে এবং সাধন সঙ্গী হিসাবে নারী পুরুষকে রাখতে পারে।

এটা উভয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। দেখা যাচ্ছে, সাধন পদ্ধতিগত দিক থেকে বাউল মতবাদ জঘন্য দৈহিক ও সামাজিক অনাচারের প্রতিভূ। প্রশ্ন হলো ঃ লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, হাসন রাজা এবং একালের খোদাবখশ সাঁই, মোকছেদ সাঁই, মহিন শাহ কি এই মতামত, মতবাদ, সাধন পদ্ধতি ও জীবনাচারে বিশ্বাসী? মোটেই নয়। এরা সবাই সূফী ও মুরশিদপন্থী সাধক কবি ও শিল্পী। এদের অনুসারীরাই মরমী সাধনা ও সঙ্গীত ধারার ঐতিহ্য লালন ও বহন করছেন। বাউল বলতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের সংখ্যা আগেও কম ছিলো। আর এখন নেই বললেই চলে। এই মতবাদ কালের প্রবাহে বিলীন হয়ে গেলেও এবং অনুসারীরা নিঃশেষ হয়ে গেলেও এই মতবাদ ও অনুসারীদের জয়গান গাওয়া হচ্ছে। যারা বাউল নয় তাদের বাউল বানানোর জোর কোশেশ করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য কি? এক. মরমী কবি, সাধক ও শিল্পীদের বাউল বানিয়ে তাদের ধর্মবিমুখ, সমাজবিমুখ, দায়িত্বহীন অনাচারী হিসাবে প্রমাণ করা। দুই. মরমী সাধনা ও সংগীত ধারা, ঐতিহ্যকে ভিন্ন পরিচয়ে চিহ্নিত করা। বস্তুত দেশের আবহমান সামাজিক রীতি, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এটি একটি জঘন্য চক্রান্তেরই নামান্তর। (দৈনিক

www.pathagar.com

ইনকিলাব, '৯৪)

এই চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের দেশে এ বাউলবাদ-এর পক্ষে সভা-সেমিনার হচ্ছে। বাউল সম্মেলন হচ্ছে। বাউলদের পক্ষে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখছে। এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ-বক্তৃতায় বলা হচ্ছে– বাউলদের জীবন নাকি সহজ, সরল ও সুন্দর। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির প্রতীক। বাউলদের এই নোংরা জীবন ও জগাখিচুরী মতবাদ মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। এ বাউলবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে আমাদের দেশের কতিপয় তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী বুদ্ধিজীবী। এসব বুদ্ধিজীবী লালন শাহের মতবাদকে মুসলিম সমাজে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় আছে।

অপরদিকে হাসন রাজা অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তার গানের স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক প্রেমের পরিচয় মেলে। যেমন–

"লাগলোরে পিরীতের নিশা,
হাছন রাজা হইল বেদিসা।'

★ ★ ★

লোকে বলে বলেরে
ঘরবাড়ী ভালা না আমার
কি ঘর বান্ধিব আমি
শূন্যের মাঝার?

★ ★ ★

নিশা লাগিল রে, বাঁকা দু'নয়নে
নিশা লাগিলরে.....।

★ ★ ★

আমি যাইমুরে যাইমু
আল্লার সঙ্গে
হাসন রাজা আল্লাহ বিনে
কিছু নাহি মাঙ্গে। প্রভৃতি।

আমাদের দেশে মাইজভান্ডারী নামে কিছু গান প্রচারিত হচ্ছে। যা সম্পূর্ণভাবে শেরেকী ও বিদাতে পরিপূর্ণ। এখানে আমি কিছু গানের উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

দেখে যারে মাইজভান্ডোরে হইতেছে নূরের খেলা
নূরের মাওলায় বসাইছে প্রেমের খেলা (২) ঐ
আল্লাহু আল্লাহু রবে নানান বাদ্য শোনা যায়।
গাঁউছেল আযম মাইজভান্ডারী আশেকগণ হুশ হারায়।
জিকিরেতে আকাশ-পাতাল করে আল্লাহু আল্লাহু (২) ঐ
খাঁটি দেলে নূরে বাবার যে কইরাছে যিয়ারত
দিলের পর্দা খুলে যাবে এই হবেরে তার এবাদত

www.pathagar.com

অন্ধকারে ডাকছে তারে না হইলে তোর দিল খুলা।
দিন থাকিতে ওরে মন পাগলা গেলি নারে মাইজভান্ডার
মনের আশা মিটলো না তোর পাইলি না মাওলার দিদার
যাইতে যদি মোরা কাবার দেখতি নূরে খেলা?
দেখে যারে মাইজভান্ডারে হইতেছে নূরের খেলা।

★ ★ ★

কোন সাধনে পাব খোদারে, ভান্ডারী মাওলারে॥
বন্দী হইলাম মায়ার জালে
দিন কাটাইলাম হেসে খেলে (২)
পার করি কি নিবে আমারে ভান্ডারী মাওলারে। ঐ
করছি তোমায় মিনতি, চরণে তোমার আরজ ইতি। (২)
দিবা নিশি ডাকি তোমারে ভান্ডারী মাওলারে॥
ধন জন সবই বল এই সব কিছু অকারণ (২)
মরণকালে পাবো তাহারে ভান্ডারী মাওলারে ঐ

★ ★ ★

তুমি আমার কাবা শরীফ তুমি আমার মদীনা
পারের কান্ডারী মাইজভান্ডারী বাবা মাওলানা। ২
বাবা তুমি ওলি ওয়ালা, তুমি রাজা হইলে রাজা আল্লাহতালা
আশা করি ধৈর্য ধরো নৈরাশ করো না
পারের কান্ডারী মাইজভান্ডারী বাবা মাওলানা।
বাবা সাধন ভজন নাহি জানি
অন্ধজনে পার করে দে তার ধরি টানি ২ বার
জনম দুঃখী এ সংসারে আমি এক জানা ২ বার
পারের কান্ডারী মাইজভান্ডারী বাবা মাওলানা। ঐ
গফুর পাগলা বলি তোরে
বাবা রাখিবে হাত লইবে সবদিন কোলে তুলি
তোর ডাকে সাড়া না দিয়া বাবা পারে না,
পারের কান্ডারী- মাইজভান্ডারী বাবা মাওলানা।

এ ধরনের অসংখ্য গান রয়েছে যা আমাদের ঈমান আকিদার পরিপন্থী। এসব গানে আল্লাহর চাইতে রাসূলকে, রাসূলের চাইতে মুর্দা পীরকে বড় করে দেখানো হয়েছে। এইসব জাহেলী অবস্থা থেকে জাতিকে উদ্ধার করার যেন কেউ নেই।

পীর ব্যবসা

শত কোটি কাল্পনিক দেবতার ক্রীতদাসত্ব হতে মানবজাতিকে উদ্ধার করে সত্যের পথে পরিচালিত করার জন্যেই তৌহিদ বা একত্ববাদের শিক্ষা নিয়ে জগতে ইসলামের অভ্যুদয়। কিন্তু তথাকথিত একদল পীর ফকির ইসলামের তৌহিদ মন্ত্রকে কলুষিত করে

www.pathagar.com

আজ পৌত্তলিকতা ও মানুষ পূজার আদর্শ প্রচার করছেন এবং মুসলমানদেরকে ক্রমে অধঃপতনের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের মধ্যে ভারত, আফগানিস্তান ও সিরিয়ায় পীরদের প্রধান লীলাক্ষেত্র। ইসলামের জগতে অন্য কোন দেশে এ পীরবাদের অস্তিত্ব নেই। এই পীরের দল প্রচার করে থাকে–

১। পীরের সাহায্য ব্যতীত কেহ কোরআনের মর্মকথা উপলব্ধি করতে সক্ষম নহে।

২। আল্লাহ তাঁর একদল প্রতিনিধি বা ওয়ালীর মধ্যস্থতায় বিশ্বজগতের সকল কার্য নিয়ন্ত্রিত করেন।

৩। মানুষের সকল ভাল-মন্দ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য এই পীর বা অলীদের সন্তুষ্টির উপরই নির্ভর করে।

৪। আল্লাহর কাছে মানুষ যা কিছু প্রার্থনা করবে বা ফরিয়াদ করবে, তা অলীদের কাহারও নির্দেশমতো তাদেরই মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হওয়া উচিত।

৫। পীর বা অলী 'সেজদায় তাজিম'-এর অধিকারী ও পীরের সন্তুষ্টি সাধন করে ইহকালে সাফল্য এবং পরকালে নাজাত পেতে হলে, মুরীদের পীরের সম্মানার্থে 'সেজদায় তাজিম' করতে হবে।

৬। বাধ্যতামূলকভাবে কোন পীর বা অলীর মুরীদ হতে হবে। কারণ 'যার নেই পীর, তার নেই শির'। সুতরাং পীর ছাড়া কেউই নাজাত পেতে পারে না।

৭। যখন কেউ কোন পীরের মুরীদ হবে, তখন তাকে সম্পূর্ণভাবে পীরের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হবে। এমনকি তাকে একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজের সর্বস্ব পীরের পায়ে সমর্পণ করতঃ বায়েত করতে হবে। পীরের প্রতি মুরীদের এই বায়েত গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসত্ব স্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮। বায়েত গ্রহণ করে মুরীদ যে বাস্তবিকই পীরের প্রতি পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, মুরীদকে বাস্তব জীবনে বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রমাণ করতে হবে। এমনকি, পীর যদি ধর্মীয় আদেশের বিরুদ্ধে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করে তথাপি মুরীদ তার কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না। পীরের প্রতি কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবে না।

৯। পীরের প্রতি মুরীদকে এরূপ ভক্তি সর্বদা পোষণ করবে। কারণ "এলমে বাতেনের" প্রকৃত রহস্য খুব অল্প লোকেই অবগত আছে এবং 'রূহানী' জগতে এমন অনেক জিনিস আছে, যা প্রকাশ্যে দেখলে ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হবে। কিন্তু যাদের অন্তশ্চক্ষু আছে, তারাই মাত্র এসব কার্যের রহস্য বুঝতে পারেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, পীর যদি মাদকদ্রব্য গ্রহণ বা পান করে মুরীদকে মনে করতে হবে তা আধ্যাত্ম সাধনার উচ্চস্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

যুগ যুগ ধরে ভন্ড পীরেরা এরূপ শিক্ষা প্রচার করে সমাজের অজ্ঞ জনসাধারণকে নানারূপে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার সাথে সাথে সমাজে পৌত্তলিকতার প্রসার ঘটিয়েছে। কোন কোন পীর স্বীয় মুরীদানকে "তাসাওর-ই-শেষ" বা সর্বদা মানসচক্ষের

www.pathagar.com

সামনে পীরের মূর্তি উদ্ভাসিত রাখার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এরূপ শিক্ষা মূর্তি পূজারই রূপান্তর।

পূর্বে আমাদের দেশে একটি প্রবাদ ছিলো ২২ কোটি হিন্দুর ৩৩ কোটি দেবতা আছে। কিন্তু কোটি কোটি মুসলমানদের মধ্যে যে বিরাট "পীর বাহিনী" রয়েছে হিসাব করলে পীর দেবতার সংখ্যাও হিন্দুদের ছাড়িয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, "প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মের দায়িত্ব তার ঘাড়েই অর্পিত। ... একের বোঝা অপরে বহন করবে না। (সূরা ১৭ আয়াত ১৩-১৫)। এতে প্রমাণিত হয় প্রত্যেক মানুষই তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে এবং এর জবাব দিতে হবে। কোন পীর-মোরশেদ কারও দায়িত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ নয়। কোরআনের অন্য আয়াতে আছে- "যখন আমার বান্দা তোমার (রাসূলুল্লাহর) নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন আমি নিশ্চয়ই তাদের অতি নিকটে অবস্থান করি। যে, কেউ আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, আমি তার প্রার্থনা পূর্ণ করি। কাজেই তাদের উচিত প্রত্যুত্তরের আশায় আমাকে আহবান করা যেন আমি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করতে পারি।" (সূরা বাকারা, ১৯৬ আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়, সত্য পথের সন্ধান পাবার জন্যে কোন পীর মোরশেদের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। যে কেউ সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং সত্যপথ প্রদর্শন করবেন। এই সম্পর্কে কোরআনের অন্যত্র বলেছেন- "আল্লাহ বিশ্বাসীদের একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথ প্রদর্শন করেন।"

অথচ ভন্ড পীরেরা তাদের মুরীদদেরকে বেহেশতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। তারা বলে থাকেন, "আমার মুরীদদেরকে না নিয়ে বেহেশতে যাব না। পরকালে এসব ভন্ডপীরেরা মুরীদদেরকে পাড় করার জন্যে তরী নিয়ে বসে থাকবে। এদের কথায় মনে হয় যেন আল্লাহর কাছ থেকে যেন এরা ঠিকাদারের চুক্তি নিয়েছে মানুষকে বেহেস্তে নেয়ার জন্যে।

পীরালিয়াত হাসিল করতে কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তার কোন প্রয়োজন নেই। বংশ পরম পরায় গদীনশীন পীর অর্থাৎ পীরের ছেলে পীর হবে এ নীতিই এদেশে চালু হয়ে আছে। পূর্বে বাদশাহের ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে বাদশাহ হয়ে গদিতে বসতেন। বর্তমান বিশ্বে এ প্রথা (২/১টি দেশ বাদে) রহিত হয়েছে। এখন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের দেশ চালানোর যোগ্যতা এবং জনগণের সমর্থনের প্রয়োজন হয়। ব্যবসায়ীর ছেলে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার কারণে পিতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব পান অর্থাৎ পিতার ব্যবসায়ী গদিতে বসার অধিকার পান। কিন্তু আমাদের দেশে পীরানী ব্যবসায় তারও প্রয়োজন নেই। যেহেতু পিতা পীর সেহেতু উত্তরাধিকার সূত্রে ছেলে গদিনশীন পীর বনে যায়।

www.pathagar.com

বৃটিশ আমলে বর্ষাকালে বড় বড় নৌকা কিংবা বজরা ভাসিয়ে পীর সাহেবরা গাঁয়ে এসে ওয়াজ মাহফিল করতেন। বেনামাজী, বেরোজদারদেরকে ওয়াজে দোযখের ভয় দেখাতেন। দোযখের আজাবের কথা বয়ান করতেন নানা রকমের উপমা দিয়ে। অন্দর মহলে থেকে স্বামী সেবাই কর্তব্য বলে ওয়াজে বার বার সাবধানের বাণী শোনাতেন। মুরীদরা চাল, ডাল, ঘি, খাসি, মুরগী দিয়ে খুশী করতেন পীরদের। এ ব্যবসায়িক ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে আজ পীর ব্যবসা খুবই জমজমাট। বিনা পুঁজিতে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা এই পীর ব্যবসা। বাংলাদেশে এক শ্রেণীর মুসলমান আছে যারা ইসলাম ধর্মের মৌলিক ইবাদতগুলো পালন না করলেও পীরবাদে খুবই বিশ্বাসী।

এ সম্পর্কে পরে আলোচনা রাখবো। এর আগে একজন সাংবাদিকের মজার অভিজ্ঞতার কথা উদ্ধৃত করছি।

১৯৮২ সালের ১৬ জানুয়ারী শনিবার। দৈনিক বাংলার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ঐ দৈনিকের এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। শুনতে পেলাম মিছিলের আওয়াজ। মনে হলো আওয়াজ পশ্চিম দিক থেকে আসছে। হ্যাঁ, পশ্চিম দিক থেকেই। পুলিশ সার্জেন্টরা বাঁশি বাজিয়ে মিছিল চলার পথ সুগম করে দিচ্ছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো রাজনৈতিক মিছিল; কিন্তু পুলিশ সার্জেন্টদের বাঁশির আওয়াজ আর রাজপথ সাফ করার ব্যস্ততা দেখে মনে হলো যে, হয়তো এই রাস্তা দিয়ে কোনো বিদেশী, মেহমান বা আমাদের কোনো প্রভাবশালী মন্ত্রী যাবেন, তাই রাস্তা সাফ করা হচ্ছে। মিনিট দু'য়েকের মধ্যে আমার এ ধারণাও ভুল প্রমাণিত হলো। কোনো

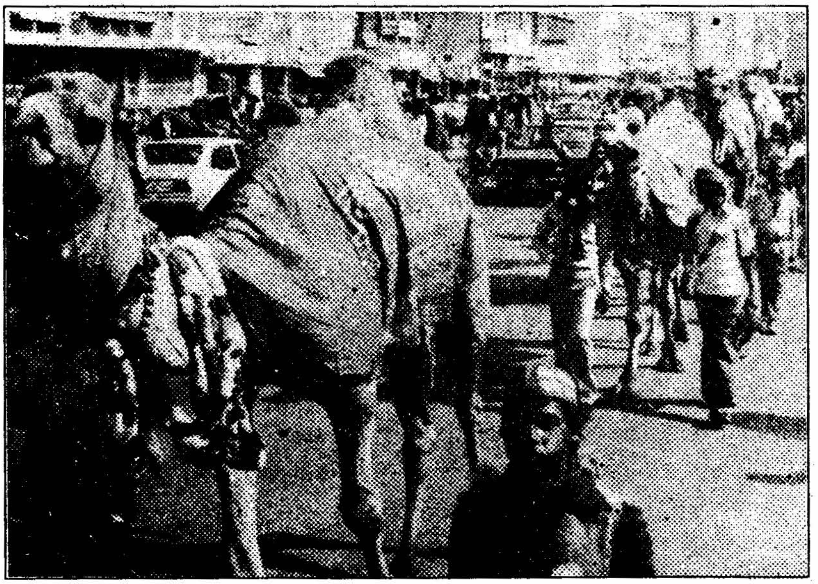

পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত উটের কাফেলা ঢাকার রাজপথে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক মিছিল নয় বা দেশী-বিদেশী কোনো মন্ত্রী-মেহমানের জন্যও এই বাঁশি বাজানো নয়। উটের মিছিল আসছে, সার্জেন্টদের বাঁশি বাজছে, আসছে উটের কাফেলা। এক দুই করে ২৫টি উট গণনা করলাম। এই উটের কাফেলার সঙ্গে চলছে একদল মানুষ। তারা পীরের নামে শ্লোগান তুলছে। দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, উটগুলো এসেছে পাকিস্তান থেকে অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে উট ক্রয় করা হয়েছে। এই কাফেলা যাবে ফরিদপুরের আটরশিতে পীর সাহেবের বাড়ীতে। সেখানে ওরস হবে, উটগুলো জবাই হবে। 'মহা পবিত্র ওরসে' পবিত্র উটের গোশত খাবেন হুজুরের ভক্তেরা। অঢেল পূণ্য অর্জন করবেন তারা। মনে প্রশ্ন জাগলো, আমদানী তালিকায় উট আমদানী একটি নিষিদ্ধ আইটেম। এতদসত্ত্বেও কিভাবে আমদানী করা হলো এই উটগুলোকে? এ প্রশ্ন সাপ্তাহিক বিচিত্রাও করেছে। একজন ভক্ত বললেন, মুরীদরাই ওয়েজ আর্নার স্কীমের আওতায় উটগুলো যথানিয়মে আমদানী করেছে। বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের 'বাংলার কল্লোল' জাহাজ যোগে ১৫ ডিসেম্বর (১৯৮১) প্রেরিত উটগুলো ২৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পৌঁছে। তারপর নোয়াখালী, কুমিল্লা ও চাঁদপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় বিরতি দিয়ে আজ ঢাকায় পৌঁছে। পরদিন আবার আউটার স্টেডিয়ামে উটগুলো দেখতে গিয়ে আরেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। দেখলাম উটগুলো বেঁধে রাখা হয়েছে। এসব উটের পিছনে ৪/৫টি মাটির মটকা রয়েছে। একটি উট পেশাব করছে। সাথে সাথে টিনের একটি পট হাতে করে দৌড়ে এলো এক যুবক। এক ফোঁটা পেশাবও সে মাটিতে পড়তে দিলো না। পটে নেয়া উটের পেশাব একটি মাটির মটকায় ঢাললো। জিজ্ঞাসা করলাম, উটের পেশাব কেনো মটকায় রাখা হচ্ছে? জবাবে এক তরুণ ভক্ত বললেন, পবিত্র উটের পেশাবও পবিত্র। আমি দু'চোখ ভরে দেখলাম, কাঁচের টাই গ্লাসের এক গ্লাস এক টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। এই পেশাবে নাকি রোগ ব্যাধিও সারবে। পরিবেশ অনুকূল ছিলো না বলে শুধু শুনেই গেলাম, জবাব দিলাম না। সুন্দরভাবে সামিয়ানা খাটিয়ে নানা রংয়ের বৈদ্যুতিক বাতি দ্বারা আউটার স্টেডিয়াম সাজিয়ে আলোয় ঝলমল করে উটগুলোকে রাখা হয়। এক ভক্ত বললেন, এবার এই উটগুলো ছাড়াও দু'হাজারের বেশি গরু-ছাগল ওরস চলাকালীন দিনগুলোতে জবেহ করা হবে। ভাবলাম, হবেই তো, এই সেই আটরশি যেখানে প্রশাসনের কলহ-বিবাদের ফয়সালা এবং জটিল সমস্যারও সমাধান হয় বলে শোনা যায়।

অনেক মুরীদ সারা বছর ধরে অবৈধ উপার্জন করে। কিন্তু ওরসের সময় পীরের দরগায় গরু-ছাগল, মহিষ, উট, চাল-ডাল এবং নগদ অর্থ নজরানা দেয়। পীরের বাড়ীতে আগে শুধু মানুষের গমনাগমন ছিলো। বর্তমানে গরু-ছাগলও যায়। ১৯৮২ সালে পীরের দরগায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে কিছু উট ঢাকায় আনা হয়েছিল। এ উটের প্রশ্রাব নেয়ার জন্যে লোকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। এ সংবাদ তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বেশ কয়েক বছর আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সোশ্যাল ফর্মেশন ইন ঢাকা সিটি, গ্রন্থে প্রকাশিত তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলো ঃ রাজধানী ঢাকার ৬৮ জন শীর্ষস্থানীয় প্রত্যেকের বার্ষিক নেট আয় ৫ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকা। এদের ২৪ জনের

www.pathagar.com

৫ একরের বেশি জমি রয়েছে। এদের ৮৫ শতাংশ নিয়মিত ধর্মকর্ম করেন না। তবে ৫০ শতাংশই বিভিন্ন পীরের মুরিদ। (যায় যায় দিন, ২ জানুয়ারী '৯৬ সংখ্যা)

আমাদের দেশের গদিনশীন পীরদের নামের বাহারও খুব চমকপ্রদ ও অদ্ভুত। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে একটি রূপক নাম দেয়া হলো। যেমন– রহিমাবাদের বর্তমান গদিনশীন হুজুর জমানার কুতুব, হুজুরে কেবলা, পীরে সূফি, মাহবুবে খোদা, ভক্তে গাউসুল আজম পীরে কামেল আল-হাসনে, আল-হুসনি আলহাজ্ব শাহ্ সূফি মুহাম্মদ নজর আলী ইবনে তাবারুক আলী সুবিধাবাদী ছাহেব।

সম্প্রতি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় একজন পীরের দাওয়াতনামা পড়েছিলাম। দাওয়াতপত্রে পীরের নাম যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা হুবহু তুলে ধরলাম। "উক্ত মাহফিলে তাশরীফ আনবেন মাসিক আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকা ও মুহাম্মদীয়া জামিয়া শরীফ মাদ্রাসা-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক, পীরে কামেল, মুর্শিদে মুকাম্মিল, ইমামুল আইম্যা, মুহিয়্যুস সুন্নাহ, মাহিয়্যুল বিদআত, কুতবুল আলম, কাইয়্যুমুজ্জামান, হাফিজুল হাদীস, মুফতীয়্যুল আযম, তাজুল মুফাস্সেরীন, রইসুল মুহাদ্দেসীন, হুজ্জাতুল ইসলাম, মুজাদ্দিদুজ্জামান, সাইয়্যেদুল মুনাজেরীন, লিসানুল উম্মত, ফখরুল ওলামা ওয়ালামাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী শায়খ, সাইয়্যিদ মুহাম্মদ দিল্লুর রহমান আল হাসানী, ওয়াল হুসাইনী, ওয়াল কুরাইশী, মুদ্দা জিল্লুহুল আলী, পীর সাহেব কিবলা।

উপরের এ নামটির প্রকৃত নাম বাদে পীরে কামেল থেকে শুরু করে পীর সাহেব কিবলা পর্যন্ত মোট ২৮টি উপনাম বা উপাধি রয়েছে। লেখার টানে মনে হয় এ নামটির সঙ্গে আরো অনেক নাম বাদ রয়ে গেছে, সময় সুযোগ মতো ছাপতে পারেন। কারণ লাগাতে পারতেন নামের সঙ্গে, অনেক আরবী ভাষায় কথার মালা। উপরোক্ত শব্দগুলো সবই আরবী। সাপ্তাহিক বিক্রমে জনাব আ. ই. মে. নেছারউদ্দিন লিখেছেন ঃ

মূলতঃ এমনিতেও এসব বলাতে বা লেখাতে আমার বা আরেকজনের কি আসে যায়, এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে। প্রশ্ন আসতে পারে বা বলা হতে পারে, তাঁর মধ্যে এসবই আছে, তাই লেখা হয়েছে। কিন্তু আসলে যা লেখা হয়েছে তা আরবী ভাষায়। আর এগুলোর অর্থ বাংলায় যা দাঁড়ায়, তাতে নানা প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। কেউ কাউকে পীর সাহেব মানবেন এর স্বাধীনতা আছে। ভাল-মন্দের মীমাংসার কথা এখানে গৌন। কিন্তু এর পর যা শুরু করা হলো, যেমন– মুর্শিদে মুকাম্মিল অর্থ– পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শক, ইমামুল আইম্যা– অর্থ– ইমামগণের ইমাম, মুহিয়্যুস সুন্নাহ অর্থ– সুন্নতের জীবন দানকারী, মাহিয়্যুল বিদআত– বিদায়াতের মূলোৎপাটনকারী, কুতুবুল আলম মানে সারা বিশ্বের কুতুব, কাইয়্যুমুজ্জামান মানে কালের স্থায়ী, হাফিজুল হাদীস– হাদীসের হাফেজ, মুফতীয়ুল আযম বড় মুফতী, তাজুল মুফাসসেরীন– মুফাসসির বা তফসীরকারকগণের মাথার মুকুট, রইসুল মুহাদ্দেসীন মানে হাদীস বিশারদগণের নেতা, হুজ্জাতুল ইসলাম– ইসলামের দলীল, মুজাদ্দিদুজ্জামান মানে জমানার সংস্কারক, সাইয়্যেদুল মুনাজেরীন– দূরদর্শনকারীদের নেতা, লিসানুল উম্মত-উম্মতের কণ্ঠস্বর বা মুখপাত্র, ফখরুল ওলামা ওয়াল মাশায়েখ– আলেম ওলামা মাশায়েখগণের অহংকার।

www.pathagar.com

এরপর তিনি শাহ, তিনি সূফী, তিনি আল হাসানী, তিনি আল হুসাইনী, তিনি আল কুরাইশী, আরো নামের সঙ্গে উপাধি মিলানোর এ ধারাটি রাসূলের (সাঃ) যুগ থেকেই শুরু হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) কে 'আতীক' ছিদ্দিক, হযরত আলীকে (রাঃ) আসাদুল্লাহিল গালিব, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে (রাঃ) সাইফুল্যাহ, হযরত ওসমানকে যিন্নুরাইন, হযরত আবু হুরায়রাকে (রাঃ) যাঁর প্রকৃত নাম আবদুর রহমান উপাধি দিয়ে ডাকতেন। আবার বাবুল ইলম, আসফুরুন লিল্জান্নাহ সাবাবি আহলিল জান্নাহ, সাইয়্যেদাতুন নিসায়ে ইত্যাদি নামে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে রাসূল (সাঃ) ভূষিত করেছেন। পরবর্তী সাহাবীদের যুগেও বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ উপনামে ইসলামের অনেক মনীষী ভূষিত হয়েছেন। তবে অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁরা দুনিয়ার থেকে বিদায় নেয়ার পর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদেরকে এসব নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), খাজা মাঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ), মুজাদ্দিদে আলফেছানী, কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) সহ আরো অনেকে। জীবদ্দশায় পারতপক্ষে তারা কারো কাছে নিজেকে জাহের করতে চাননি। অনেক মনীষীর জীবনীতে এও পাওয়া যায়– মাওলানা, মুফতী, অর্জিত পদবী লাগিয়েও তাঁদেরকে ডাকা হলে তারা রেগে যেতেন।

প্রিয় নবীর এক হাদীসে পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন, আমি শেষ নবী, এতে আমার কোন গর্ব বা অহংকার নেই, আমি নবীদের সরদার, এতেও কোন অহংকার নেই। আমি গুনাহগারদের সুপারিশকারী এতে আমার কোন গর্ব নেই। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এটা পরিষ্কার করে বোঝাতে চেয়েছেন, কারো কাছে বিশেষ শরীয়তের বা মারেফাতের কোন গুণাবলী থাকলেও একে প্রকাশের আদৌ কোন সুযোগ নেই। নিজের সামনে নিজের প্রশংসা করা নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) হাদীসে বলেছেন– যারা তোমার সামনে প্রশংসা করে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। (সাপ্তাহিক বিক্রম, ১৫-২১ জানুয়ারী সংখ্যা '৯৬)

লেখালেখির উপাদান সংগ্রহে আমি এক পীরের দরগায় কিছুদিন যাতায়াত করেছিলাম। সেখানে কিভাবে জিকির হয় তার কিছু অভিজ্ঞতা এখানে বর্ণনা করছি। জিকির শুরু হবার পূর্বে বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে ঢিমেতালে জিকির শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে পীর সাহেবের জিকিরের তালে মুরীদদেরও জোশ বেড়ে যায়। প্রথমে বলে আল্লাহু, আল্লাহু। পরবর্তীতে শুধু বলে হু-হু-হু। এভাবেই বিকৃতভাবে আল্লাহ্ বাদ দিয়ে শুধু 'হু' বলতে থাকে। এরপর শুরু হয় মুরীদদের জিকিরের তালে তালে নৃত্য। নৃত্যের ছন্দে ও জোশে একজনের উপর আরেকজন গিয়ে পড়ে। পরনের কাপড়ও ঠিক থাকে না। পৃথিবীর কোথাও এভাবে জিকির করার প্রচলন আছে কিনা আমার জানা নেই।

জিকির সম্বন্ধে ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবদুর রহীম বলেন– জিকিরের আভিধানিক অর্থ হলো স্মরণ করা। জিকিরকে এখানে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। মাথা নিচু করে বসে অথবা নৃত্য করে 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' কিংবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা' কালেমা নিম্নস্বরে অথবা উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করাকেই 'জিকির' বলে ধরে নেয়া হচ্ছে এবং

www.pathagar.com

তা করলেই আল্লাহ্‌র 'জিকির' করার কর্তব্য আদায় হয়ে যায় বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এ যে কতো সংকীর্ণ ধারণা এবং ইসলামী আদর্শের একটি মৌল বিষয়কে বিকৃত করা, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌র 'জিকির' করার জন্যে সুষ্ঠু নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একটি আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন–

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার শোকর কর, আমার অকৃতজ্ঞতা কর না।"

এছাড়া কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী শুধু 'জিকির'ই একমাত্র করণীয় কাজ নয়। সেই সঙ্গে ফিকিরও অপরিহার্য। এই জিকির ও ফিকির উভয়ের গুরুত্ব ও সার্বক্ষণিকতা বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ্‌ বলেছেন– "যারাই আল্লাহ্‌র 'জিকির' করে দাঁড়ানো, বসা ও পার্শ্ব নির্ভর শয়ন অবস্থায় এবং নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা করে (বস্তুত তারাই বুদ্ধিমান লোক)।"

আয়াতটিতে আল্লাহ্‌র 'জিকির' করতে বলা হয়েছে বসা, দাঁড়ানো ও শয়ন অবস্থায়। অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। কেননা এই তিনটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটি অবস্থায়ই মানুষ থাকে। কোন সময়ই কোন একটি ভিন্ন অন্য কোন অবস্থায়ই তার হয় না। হয় সে বসে আছে, নয় দাঁড়িয়ে আছে কিংবা সে শুয়ে আছে। অতএব, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌র 'জিকির' করতে হবে। অর্থাৎ স্মরণে রাখতে হবে। কোন অবস্থায়ই আল্লাহকে ভুলে যাওয়া চলবে না।

দ্বিতীয়তঃ আয়াতটিতে শুধু যিকির এর কথাই বলা হয়নি; সেই সঙ্গে ফিকির-এর কথাও বলা হয়েছে। আর ফিকির বলতে বোঝায় ইমাম রাগেবের ভাষায়– "কোন বিষয়ে জানবার জন্য নিয়োজিত শক্তি" এই শব্দটির আসলরূপ ছিল– বিষয়াদি ঘর্ষণ করা তার নিগূঢ় তত্ত্ব ও গভীর নিহিত সত্য জানবার উদ্দেশ্য। এক কথায় নিছকই জিকির আল্লাহর কাম্য নয়, বুদ্ধিমান লোকেরও কর্ম নয়। সেই সঙ্গে ফিকিরও আবশ্যক। ফিকিরবিহীন যিকির নির্বোধ লোকদের কাজ। আর 'জিকির'হীন 'ফিকির' কাজ হচ্ছে নাস্তিক ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের। (আবদুর রহীম, সুন্নাত ও বিদয়াত, পৃঃ ১৩০, ১৩১)।

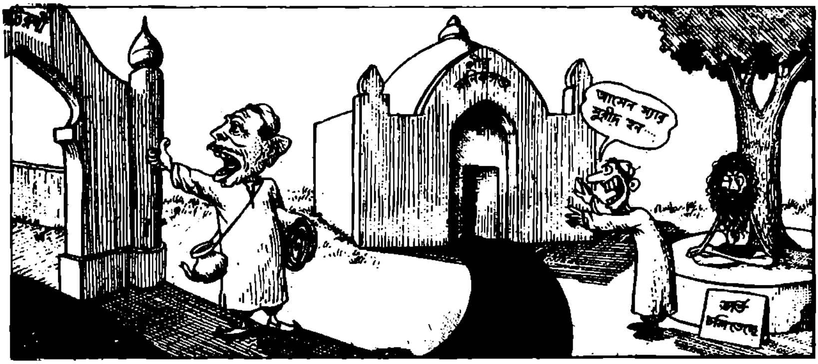

স্বার্থের জন্যই পীর-মুরিদ — *যায় যায় দিন পত্রিকার সৌজন্যে*

www.pathagar.com

বিধর্মীয়রা 'জিকির' করেনা কিন্তু 'ফিকির' করে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে। ফলে এসব বিধর্মীয়দের নৈতিক উন্নতি না হলেও বৈষয়িক উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু আমরা 'জিকির' করি কিন্তু 'ফিকির' করিনা। ফলে বিধর্মীয়দের মতো নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন না ঘটলেও বৈষয়িক উন্নতি ঘটেনি। এক সময় মুসলমানেরা 'জিকির'-এর সাথে ফিকিরও করেছে। যার প্রেক্ষিতে এককালে মুসলমানরাই ছিলো আবিষ্কারক। মুসলমানদেরই আবিষ্কারের ফসল ঔষধ, আগ্নেয়াস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিশাস্ত্র প্রভৃতি।

কিন্তু আজকালকার 'তাসাউফে' শুধু 'যিকির' আছে, 'ফিকির' নেই। যিকির-এর সঙ্গে 'ফিকির' করলে প্রচলিত ভাষায় তাসাউফ হলো না। কোন পীরের মুরীদ তা করতে চাইলে তার মুরীদগিরীই চলে যাবে, শুধু তা-ই নয়, এই 'জিকিরকেও তথায় খুবই ভাল অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে ও নির্দিষ্ট সময়ে চোখ বন্ধ করে মুখে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ্' করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে সেই নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অন্যান্য সময়ে এবং সেই বিশেষ প্রক্রিয়ার বাইরে জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে কোথাও তাদের জীবনে আল্লাহ্‌র জিকির-এর কোন লক্ষণ দেখা যায় না। 'জিকির'-এর এই প্রক্রিয়া ও সময় নির্ধারণ ইসলামে এক মারাত্মক বিদয়াত। এই 'বিদয়াত' ইসলামকে সর্বাত্মক বিপ্লবী আদর্শ হতে না দিয়ে যোগ-সাধনার বৈরাগ্য ধর্মে পরিণত রেখেছে। ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুর রহীম আরো বলেন–

মৌখিক জিকিরও জিকির বটে, যদি তার সাথে অন্তরের জিকির যুক্ত হয়। তাই ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ মৌখিক জিকিরকেও জিকির বলা হয়েছে। কেননা তা অন্তরের জিকির-এর নিদর্শন। অর্থাৎ অন্তরের জিকিরের জিকিরই মৌখিক জিকির-এর রূপ লাভ করে। কিন্তু তাসাউফে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জিকির প্রবর্তিত। সেখানে অন্তরের জিকির-এর কোন স্থান নেই। অন্তরের জিকির-এর যে লক্ষ্য, তাও এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এখানে মৌখিক জিকিরই প্রধানত মুখ্য। তার আঘাতে 'কলব' সাফ করা ও ছয় লতীফা জারী করাই সে জিকির-এর উদ্দেশ্য। তাই বলতে হয়, সে 'জিকির' কুরআনে বলা জিকির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর জিনিস। যার কোন দলীল কুরআন-হাদীসে নেই। লতীফাও একটা বিদয়াতী ধারণা মাত্র। কুরআন হাদীসে তা স্বীকৃত নয়, তা থেকে পাওয়াও যায়নি।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে খুব বেশি বেশি স্মরণ কর।" আল্লামা কুরতুবী এর তাফসীরে লিখেছেন ঃ আয়াতটিতে যে জিকির করার নির্দেশ, তার অর্থ দিল দিয়ে এমনভাবে আল্লাহ্‌র জিকির করা যা সর্বাবস্থায় ও স্থায়ীভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে। কোন সময়ই তা হারিয়ে ফেলবে না বা ভুলে যাবে না।

এই পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিও প্রণিধানযোগ্য ঃ

আল্লাহ্‌র দিকে উত্থিত হয় সব পাক-পবিত্র কথাবার্তা। আর নেক আমলই তাকে উত্থিত করে। অর্থাৎ ভালো ভালো ও পবিত্র কথা– তওহীদ বিশ্বাস, আল্লাহর জিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি সবই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায়. তবে তা পৌঁছিয়ে দেয় নেক

www.pathagar.com

আমল। নেক আমলবিহীন শুধু কথা, শুধু জিকির বা তাওহীদ বিশ্বাস অর্থহীন। তা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে না।

এই কারণে হাদীসে জিকির-এর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে তার বাস্তব রূপ কি হলে আল্লাহ্‌র জিকির হয় বা আল্লাহ্‌র জিকির এর বাস্তব পন্থা কি, তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ যে লোক আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো সে-ই আল্লাহ্‌র 'জিকির' করলো, যদিও তার (নফল) নামাজ-রোজা ও কল্যাণময় কাজ খুব কমই হলো।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জিকির-এর সঠিক বাস্তবরূপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করা। কেননা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করলে আল্লাহ্‌র জিকির স্বতঃই হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্ স্মরণে না থাকলে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন সম্ভব হতে পারে না। অতএব, আল্লাহ্‌র 'জিকির' বিশেষ একটা স্মরণে ও নির্দিষ্ট সময় ও সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই হচ্ছে বিদয়াত। তাসাউফে– তথা পীর-মুরীদীতে এই বিদয়াতই মূল উপজীব্য। এইরূপ জিকির-এর অনুষ্ঠান করেই পীরেরা বোকা লোকদের ভেড়া বানিয়ে রাখে ও হাদীয়া-তোহ্‌ফা আকারে শোষণ করে। বস্তুত জিকির-এর এই ধরন হিন্দু বৈরাগ্যবাদী ও বৈষ্ণবাদের মধ্যেই প্রচলিত। পীরদের এই পদ্ধতিটি হিন্দু বৈরাগ্যবাদী থেকে গৃহীত হয়েছে বললে বিন্দুমাত্র অতুক্তি করা হবে না। (আবদুর রহীম, সুন্নাত ও বিদ্‌য়াত, পৃঃ ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫)

সুতরাং জিকির অর্থ যেমন মুখে উচ্চারণ করা তেমনি মনে মনে স্মরণ করা কিংবা কোন নির্দেশ পালন করার অর্থেও হতে পারে। জিকির একটি সর্বোত্তম এবাদত। পবিত্র কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে, একা একা অনুচ্চৈস্বরে গভীর আবেগের সাথে আল্লাহ্‌র নাম কোরআন হাদীসের কোন কালাম জপ করা। অন্যের এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিরক্তি উৎপাদন করে উচ্চকণ্ঠে জিকির করা জায়েয নয়। তেমনি সমবেত জিকির করাও অনুমোদিত নয়। প্রাথমিক অবস্থায় শুধু অনুশীলন করার উদ্দেশ্যে সমবেত কণ্ঠে জিকির করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে এই অনুমোদন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

কয়েক বছর আগে ওরস ও জিকিরের নামে একটি চমৎকার মজার ঘটনা ছেপেছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়। এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

আঁধার নেমে এসেছে। হল রুমে বাতি জ্বালানো হয়েছে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মতো আলো। মাঝখানে কালো পর্দা টানানো হয়েছে। হলরুম এখন দু'টি অংশে বিভক্ত। এক পাশে পুরুষ। অন্য পাশে নারী। সবাই জিকির-আশকারের প্রিপারেশন নিচ্ছে।

..... মাইকে জিকির আশকার শুরু হয়ে– হু-হু-হু। আল্লাহ্-হু-হু আল্লাহ্। মুরিদানরাও শুরু করেছে। 'হু' দিয়ে আল্লার নাম শুরু হয় জীবনেও শুনিনি। বোধ হয় ছন্দ এবং জোশ আনার জন্য এটি একটি কৌশল। লোকজনের মধ্যে নাচন শুরু হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা জোশে চলে গেলো। পুরো হলরুমে গমগম শব্দ হচ্ছে।

তালে তালে মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, মনের বাত্তি বড় বাত্তি; বাইরের বাত্তি দেও

www.pathagar.com

নিভাইয়া।

মাই গড। মন্ত্রের মতো কাজ হলো। মুহূর্তে সবগুলো বাতি অফ হয়ে গেছে। চারদিক অন্ধকার। পুরো পরিবেশই এখন অন্যরকম। শব্দ হচ্ছে- হু-হু-হু। ছন্দের তালে আবার মাইকে বলা হলো, মনের পর্দা বড় পর্দা। বাইরের পর্দা দেও উঠাইয়া।

আবারো আগের মতোই ক্রিয়া হলো। হড়-হড় করে শব্দ হচ্ছে। পর্দা তুলে নেয়া হচ্ছে। এখন নারী পুরুষ আর কোন ভেদাভেদ নেই। মনের পর্দা বড় পর্দা! আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে।

লোকজন সব একজন আরেকজনের ওপর গড়িয়ে পড়ছে। এরা সব মাতাল হয়ে পড়েছে কি-না কে জানে। গায়ের ওপর পড়েই চেপে ধরছে। আবার ছেড়ে দিচ্ছে। চারদিকেই বিকট পরিবেশ।

আবার কে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। পাখির বাসার মতো ওম তার বুকে। সেও বলছে- হু-হু-হু। ওহ্ মাগো। হারামজাদী আমার ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দিয়েছে। পরের দিনের ঘটনা।

বড় হাড়ি থেকে খিচুড়ি ঢালা হচ্ছে। ভূনা খিচুড়ি। ধোঁয়া উড়ছে। ভালো ঘ্রাণ আসছে। কোত্থেকে এক বেরসিক কুকুর এসে হাজির। এসেই আগুন গরম খিচুড়িতে মুখ ডুবিয়ে দিলো। সব লোক হা করে তাকিয়ে আছে। কি সর্বনাশ! কুকুরের বাচ্চা কুকুর আর জায়গা পেলো না? হারামজাদা কাজটা করলো কি? এই গরম শির্নীর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিলো। উপস্থিত লোকজন থ হয়ে গেছে। আমার মজাই লাগছে।

এই খিচুড়ি এখন কেউ খাবে না। নতুনভাবে রান্নারও উপায় নেই। মহাপবিত্র(!) উরসে লোকজন শির্নী না খেয়ে যাবে- এটি দরবারের জন্য মহা অসম্মানের।

কিছু লোক ভেতর দিকে ছুটে গেলো। তারা ফিরলো হুজুরকে নিয়ে। সবাই হুজুরকে ঘিরে ধরেছে। হুজুর বসলেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, কুকুরটা লাল রঙের ছিলো, তাই না?

সবাই একযোগে বললো- জ্বি-হুজুর।

কানের দিকে একটা কালো দাগ ছিলো, তাই না? মানুষ কুকুর দেখে। কুকুরের কানের দিকে কেউ খেয়াল রাখে না। এগুলো হচ্ছে সব ভন্ডামী। হুজুর আবার বললেন, ডান কানের দিকে একটা দাগ ছিলো না? কথা কন না ক্যান মিঞারা? কেউ কোনো জবাব দিলো না। ছিলো। ছিলো। আপনারা লক্ষ্য করেন নাই। আচ্ছা, আপনারা একটু চুপ থাকেন আমি দেখি। হুজুর ধ্যান ধরলেন। চোখ বন্ধ।

এতো লোকজন। অথচ কি নীরবতা। হুজুর জাতীয় লোকগুলোর সম্মোহনী ক্ষমতা প্রবল। সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। হুজুর ধ্যানে কি দেখে কে জানে। সবার দৃষ্টি স্থির। চোখের পাতা পড়ছে না।

হুজুর কান্না শুরু করলেন- আপনারা চেনেন নাই। আপনারা চেনেন নাই। ওনারে চিনেন নাই। লোকজন সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সবার মধ্যে কৌতুহল। হুজুর

www.pathagar.com

কার কথা বলছেন? হুজুর মুখ খুললেন। ছন্দ মিলিয়ে সুরেলা গলায় বললেন–

"বাবায় কায়া বদলাইছে
বাবায় কায়া বদলাইছে
কুত্তা হইয়া শির্নী খাইয়া
তাবারুক বানাইছে।"

বড় হুজুর আপনাদের সঙ্গে দেখা দিছে। আপনারা ভাগ্যবান। বড় ভাগ্যবান। কুকুরের রূপ ধইরা আসছিলেন।

সবার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেলো। একজন বললো, একেই বলে বুজুর্গী। সেই তো কথা। না হলে এমন গরম খিচুড়িতে কোনো কুকুরের পক্ষে মুখ দেয়া সম্ভব না। লোকজনের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেছে। কে কার আগে তাবারুক খেতে পারে। কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেছে।

আমার পেট ফেটে হাসি আসছে হুজুর যে কুকুরের কথা বললেন, সেটা আসলে কুত্তা না। স্তনের বোটা ঝুলেছিল। ওটা কুত্তী। ফটকামি আর বলে কাকে?

ইসলাম ধর্মে এরূপ ভাবাবেগের কোন স্থান নেই। এটি কোন রাক্ষস-ক্ষোক্কস অথবা ব্যক্তি বিশেষের গাল-গল্পের অলৌকিক কোন ধর্ম নয়। ইসলাম ধর্ম ইতিহাসে, বিশ্বাসে, বিজ্ঞানে, যুক্তি নির্ভর ধর্ম। এখানে দু'টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

বিশ্ব বিখ্যাত নাবিক কলম্বাস যখন আমেরিকার উপকূলে গিয়ে জাহাজ নোঙর করলেন তখন সেখানকার প্রাচীন অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা সমুদ্র বক্ষ দিয়ে আসা পাল তোলা জাহাজ দেখে সেগুলোকে দৈত্য-দানব ভাবলো। জাহাজের নাবিকদের ভাবলো অলক্ষুণে ও ক্ষতিকর জীব। নাবিকরা খাদ্য চাইলো রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে, কিন্তু তারা তা সরবরাহে জানালো অস্বীকৃতি। ভাগ্যক্রমে সূর্য গ্রহণের সময়টা ছিলো তখন অত্যাসন্ন। কলম্বাস রেড ইন্ডিয়ানদের ভয় দেখিয়ে বললেন, তোমরা যদি আমাদের খাদ্য না দাও তবে আমরা সূর্যকে ঢেকে ফেলব, গায়েব করে দেব। রেড ইন্ডিয়ানরা বিশ্বাস করলো না সে কথা এবং স্বীকৃত হলো না খাদ্য সরবরাহে। ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেলো সূর্য গ্রহণ। ওরা বিস্ময় ভরে দেখতে থাকলো ঠিক ঠিকই নাবিকরা আকাশের সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওরা খাদ্য এনে জমা করলো জাহাজের পাশে, ক্ষমা চাইল নাবিকদের কাছে এবং সূর্যকে মুক্ত করার প্রার্থনা জানালো সকাতরে। খাদ্য পেয়ে ওরাও আশ্বাস দিলো সূর্য মুক্ত করার। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই সূর্য গ্রহণের অবসান ঘটলো আর রেড ইন্ডিয়ানরা ভাবলো সেটাকে জাহাজে আগত দেবতাদের তেলেসমাতি। এটা এক এক ধরনের স্বজ্ঞান ব্লাকমেল। এ পরিস্থিতিতে সেটা করা ঠিক কি বেঠিক সে আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। এ রকম পৌরানিক অনেক উপকথাও আছে যার দ্বারা বুজুরগি দেখানোর প্রয়াস ছিলো সেসব লোকদের। কিন্তু সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঘটনা পুরোপুরি এর ব্যতিক্রম। প্রিয় নবীর প্রিয় পুত্র হযরত ইবরাহীমের হলো ইন্তেকাল। ঘটনাক্রমে এ সময়ই শুরু হলো সূর্য গ্রহণ। ঢেকে যাচ্ছে সূর্য. আঁধার হয়ে আসছে পৃথিবী। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে মদীনার বাসিন্দারা।

www.pathagar.com

বলাবলি শুরু করে দিয়েছে, মহানবীর ছেলে ইব্রাহীমের ইন্তেকালের কারণে উপস্থিত হয়েছে এই বিপর্যয়ের। একটা মহাসুযোগ বুজুর্গী দেখানোর। কিন্তু সব কুসংস্কার অবসান ঘটিয়ে সত্যের আলোকে সারা বিশ্বকে উদ্ভাসিত করার জন্য এসেছেন যিনি তিনি এই ভ্রান্তি অপনোদনে অগ্রসর হলেন। বললেন– না। ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে উদ্ভব ঘটেনি এ অবস্থার। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে ঘটে না সূর্য কি চন্দ্র গ্রহণ। চন্দ্র-সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর দুটো নিদর্শন। সুতরাং তোমরা যখন এদের গ্রহণ দেখবে তখন তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকবে, সালাত আদায় করতে থাকবে। কী অপূর্ব ইসলাম। কি বাস্তব মহানবীর শিক্ষা।

কথিত আছে, বাদশাহ শাহজাহান একবার দারা, সুজা, মুরাদ ও আওরঙ্গজেবকে নিয়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রশ্নে তাঁর পীরের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। বাদশাহ্ তাঁর চার ছেলেকে নিয়ে পীরের সাথে দেখা করলে পীর সাহেব নিজ আসনের চাঁদরখানা দারাকে প্রদান করে। দারা চাদরখানা চুমো খেয়ে পীর সাহেবকে ফেরত দেন। পর্যায়ক্রমে সুজা ও মুরাদকে পীর সাহেবের চাদরখানা দিলে দারার ন্যায় উভয়ই চুমো খেয়ে পীর সাহেবকে ফেরত দেন। সবশেষে চাদরখানা আওরঙ্গজেবকে দেন। আওরঙ্গজেব চাদরখানা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুত পীর সাহেবের আস্তানা ত্যাগ করেন। আওরঙ্গজেবের এ ব্যবহার দেখে সম্রাট মনে মনে রাগান্বিত এবং বিরক্ত হন। অন্যদিকে পীর সাহেব মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। শাহজাহান এ অবস্থায়ই পীরের কাছে ভবিষ্যত সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন রাখেন। জবাবে পীর সাহেব বলেন– যার সিংহাসন প্রাপ্য সে নিয়ে গেছে। আমি আপনার তিন ছেলেকে আমার বসার চাদরখানা দিয়েছিলাম কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করেনি। এরা উপলব্ধি করতে পারেনি আমি চারদখানা দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু আওরঙ্গজেব উপলব্ধি করেছে। সুতরাং সেই সিংহাসন পাবার যোগ্য উত্তরসূরী।

ইসলাম যুক্তি নির্ভর ধর্ম। বাদশাহ শাহজাহান তাঁর ছেলে এবং পীর সাহেবের মধ্যে সে ঘটনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এখানে ভক্তির আতিশয্য স্থান পায়নি। এটাই বাস্তবতার নিরিখে যথার্থ।

সম্রাট আকবর এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় মুজাদ্দেদে আলফেসানী ছিলো মস্ত বড় অলীয়ে কামিল। তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্বের সময়ে অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। সে জেহাদে আকবরের পরাজয় ঘটেছিল। কথিত আছে, মুজাদ্দিদে আলফেসানী একটি ইসলামী মহাসম্মেলন ডেকেছিলেন। ঠিক অনুরূপ আরেকটি সম্মেলন ডেকেছিলেন সম্রাট আকবর দ্বীন-ই-এলাহী নামক একটি জগা খিচুড়ী মার্কা ধর্মের নামে। সম্মেলন চলাকালে হঠাৎ ঝড় এসে প্যান্ডেলের একটি খুঁটি সম্রাট আকবরের মাথায় আঘাত হানে। সে আঘাতে সম্রাট আকবর শয্যাশায়ী হন। তিনি আর আরোগ্য লাভ করেননি। বেশ কিছুদিন রোগ যন্ত্রণায় ভোগার পর ইনতেকাল করেন। পরবর্তীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিষ্টিত হলে মুজাদ্দেদী আলফেসানীকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করাতে ব্যর্থ হন। তখন রাজদরবারে নীতি ছিলো কুর্নিশ করা।

www.pathagar.com

আলফেসানী কোনদিন সম্রাটকে কুর্নিশ করেননি। সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি কৌশল অবলম্বন করেন। আলফেসানীকে সম্রাটের পক্ষ থেকে দাওয়াত করা হয়। রাজদরবারে প্রবেশ দ্বার অত্যন্ত নিচু করে তৈরী করা হয়েছিল যাতে আলফেসানী প্রবেশের সময় সম্রাটের দিকে মাথা নিচু করতে বাধ্য হন। নির্ধারিত দিনে আলফেসানী রাজদরবারে গিয়ে সম্রাটের চাতুর্যতা ধরে ফেলেন। তিনি তখন পিছনে ঘুরে রাজদরবারে প্রবেশ করেন। এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মুসলমান কারো নিকট মাথা নত করতে পারে না। এটি ইসলামের শিক্ষা। এখানে ভন্ড পীরদের সম্পর্কে আলফেসানীর কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি।

হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রাঃ) তাঁর ৩৩ মকতুবে লিখেছেন ঃ "আমল একজন দোস্ত (মুরিদ) শয়তানকে স্বপ্নে দেখলেন যে শয়তান মানুষকে পাপ কার্যে চালিত করার কাজ হতে ক্ষ্যান্ত হয়ে নিশ্চিন্ত বসে আছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে ঃ বর্তমান যুগের অসৎ আলেমগণ তার কার্যে বিশেষ সহায়তা করছে এবং তাকে উত্তম কাজ করার চিন্তা হতে পূর্ণভাবে অবসর গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছে।" (৩৩ মকতুব) এলেম অনুযায়ী আমল না করে সে সকল দুনিয়াদার আলেম দ্বীনদার আলেমের ছদ্মবেশে শয়তানের খলিফার কাজ করছে।

শরীয়ত-মারফত নিয়েও ভন্ডপীর ও কিছু আলেমের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। 'শরীয়ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ সরল-প্রশস্ত রাস্তা। আল্লাহ্‌তায়ালা মানবজাতির জন্য যে জীবন ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকেই শরীয়ত বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে শরীয়ত হচ্ছে ঐ সমস্ত আদেশ নিষেধ যা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশ-নিষেধ ও ব্যাখ্যায় যা জানা যায়, কোরআনের ভাষায় তার নাম 'মিনজাহ'। সাধারণভাবে দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের ঐসব মূলনীতি যা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আখেরী নবী (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের নিকটই আল্লাহ্‌পাক নাযিল করেছেন। দ্বীনের যে সব করণীয় ও বর্জনীয় সে সবের সমষ্টির নামই শরীয়ত। অনেক ক্ষেত্রেই দ্বীন ও শরীয়ত সমার্থবোধক। আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র ইসলামই মনোনীত দ্বীন, এই আয়াতে দ্বীন অর্থে শরীয়তকেই বোঝানো হয়েছে।

কোরআন সুন্নাহ প্রদর্শিত নিয়ম-কানুন অনুযায়ী জীবন যাপনে নিজেকে অভ্যস্ত করার পর মনোজগতে যে আলোর অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তারই নাম মারেফত। কোরআন-হাদীস অনুসরণের মাধ্যমেই মারেফত অর্জন সম্ভব, অন্য কোন পথে নয়।

মানুষ যখন শরীয়ত মোতাবেক আমল করে, তখন হয় শরীয়তের আমল। আর এই আমল যদি ইখলাস, আল্লাহ্‌র ভয় ও আল্লাহ্‌র ভালোবাসার সিক্ত ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠে, আল্লাহকে সব সময় হাজের-নাজের অনুভব করতে পারে, তখনি তা হয় মারিফাত বা তরীকত ইল্‌ম ও আমলের মাঝে যদ্দিন দ্বন্দ্ব থাকবে মনে, ততোদিন তা হবে শরীয়ত পর্যায়ের ব্যাপার। আর যখন এ দ্বন্দ্বে মন অন্তর মুতমায়িন হবে, পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করবে আমলের নিকট, আমলময় হয়ে উঠবে জীবন, তখন তরীকত বা মারিফত অর্জিত

www.pathagar.com

হলো বলা যাবে।

মহাকবি ইকবালের ভাষায় ঃ

"এলমে বাতেন হামচুঁ মসকা,
এলমে জাহের হামুচুঁ শির
কায় বুয়াদ বে শিরে মস্কা,
কায় বুয়াদবে পীরে পীর।"

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান মাখন সদৃশ ও জাহেরী এলেম (জ্ঞান) দুগ্ধ সমতুল্য। সুতরাং দুগ্ধ ব্যতিরেকে যেমন মাখন প্রস্তুত হয় না, তদ্রূপ উপযুক্ত কামেল পীরের সংসর্গ লাভ ব্যতীত মানুষ কখনও পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারে না।

আমাদের দেশের কতিপয় ভন্ডপীর ও ফকিরেরা শরীয়তের মূল বিধানের ধার ধারে না অথচ মারেফাত নিয়ে খুবই ব্যস্ত। অনেকে মনে করেন শরীয়ত দুধ আর মারেফাত হলো মাখন বা ছানা। শরীয়ত হলো কর্ম; মারফত হলো ফল। সুতরাং দুধ ছাড়া মাখন; কর্ম ছাড়া ফসলের চিন্তা করা যায় না; ঠিক তেমনি শরীয়তের বিধান যথাযথ পালন করা ছাড়া মারফত হাসিল করা যায় না।

আমাদের দেশে আরেক ধরনের ন্যাংটা ফকিরের দল আছে। এদের দর্শন অদ্ভুত। ছোটকালে এক ন্যাংটা ফকিরের ওরসে আমি গিয়েছিলাম। ওরসে ন্যাংটা ফকিরের চ্যালাদের শ্লোগান ছিলো ঃ

আইছি ন্যাংটা যাইমু ন্যাংটা
হু-হু-হু
দোহাই ন্যাংটা বাবা
বাবা তুঁই-ই খোদা (নাউযুবিল্লাহ)

এছাড়া স্ত্রীকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেও শুনেছি। তাদের মতে মেয়েরা মায়ের জাত। কাজেই স্ত্রীকে মা বলা দোষের নয়।

এসব ভন্ড পীর ও ফকিরেরা আবার নানা চমকপ্রদ গল্প-কাহিনী করে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে কয়েকটি কাহিনী উল্লেখ করছি।

"একদিন হযরত মুসা (আঃ) এক বাড়ীতে গেলে বাড়ীওয়ালার স্ত্রী এসে মুসা (আঃ)কে বললেন, হুজুর আমার জন্যে দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আমাকে একটা পুত্র সন্তান দেন। তিনি মুরাকাবায় বসে দেখলেন যে, তাঁর (স্ত্রী লোকটির) নামে লওহে মাহফুজে সন্তান লেখা নেই। মুসা (আঃ) বললেন, তোমাদের নামে সন্তান লেখা নেই। এর পনর বছর পর মুসা (আঃ) সেখানে এসে দেখলেন যে, ঐ মেয়ে লোকটির ৪টি সন্তান হয়েছে। মুসা (আঃ) সন্তান দেখে লজ্জিত হলেন ও পরে আল্লাহর দরবারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্ পাক! তুমি আমাকে নবী করে লজ্জা দিলে? আমাকে দেখালে যে ওর সন্তান মঞ্জুর করনি, আর একটা ফকিরের দোয়ায় তাকে সন্তান দিলে? আল্লাহ্ বললেন, আমাকে মানুষের গোশ্ত খাওয়াও তারপর তোমার এ কথার জবাব দেব। পরে তিনি মানুষের গোশতের জন্য বের হলেন। কেউ গায়ের গোশ্ত দিলো না।

www.pathagar.com

দিলো সেই ফকির যে ঐ মেয়েটার সন্তানের জন্য দোয়া করেছিল আর যার দোয়ায় আল্লাহ্ তাকে সন্তান দিয়েছেন।

✯ ✯ ✯

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ওফাতের পূর্বে তাঁর ব্যবহৃত একটি জামা ওয়াজকরুনী নামক এক ফকিরকে দেয়ার অসিয়ত করে যান। অসিয়ত অনুযায়ী হযরত আলী (রাঃ) জামা নিয়ে ওয়াজকরুনীর সন্ধানে পাহাড়ের চূড়ায় যান। হযরত আলী (রাঃ) ওয়াজকরুনীর হাতে জামা হস্তান্তরের পূর্বে জিজ্ঞাসা করেন তাঁকে জামা প্রদানের রহস্য। ওয়াজকরুনী বলেন, অহুদের যুদ্ধে নবীজির দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছে এ সংবাদ আমি পেয়েছি; কিন্তু কোন্ দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছে নির্দিষ্ট করে কোন সংবাদ আমি পাইনি। কাজেই আমি পাথর দিয়ে আঘাত করে সব ক'টি দাঁত ফেলে দিয়েছি। আর আপনি নবীজির জামাতা, অথচ আপনার সব ক'টি দন্ত অক্ষত রয়েছে। সুতরাং এ পবিত্র জামার হকদার নবীজী আপনাকে দেয়নি। আমাকে দিয়েছেন।

✯ ✯ ✯

এক ক্ষুধার্ত পাগলকে রুটি খাওয়ানোর জন্যে পাগলের দোয়ায় প্রিয় নবীজীর সার্বক্ষণিক সহচর ও খাদেম ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রাঃ)-এর ৭০ বছরের হায়াত বৃদ্ধি করেছিলেন। হযরত বিলালের (রহঃ) রূহ কবজ করার জন্য যখন হযরত আজরাইলকে নির্দেশ দিলেন তখন হযরত ওয়ায়েস কুরণী আজরাইলকে হযরত বিলালের (রহঃ) রূহ কবজ করতে বারণ করেছিলেন। আজরাইল যখন আল্লাহর কাছে গিয়ে একথা বললেন, তখন আজরাইলকে ধমক দিলেন এবং বললেন যে, তুমি যদি এখনই বেলালের রূহ কবজ করে আনতে না পার, তবে তোমার পরিবর্তে অন্য আজরাইল তৈরি করবো। এ রকম বহু গল্প ওয়াজে এবং ভন্ড পীরেরা বলে থাকে। সাধারণ জনগণ এ ওয়াজ শুনে সুবহানাল্লাহ্ পড়ে। হাদীসের আলোকে এর কোন প্রমাণ নেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ওয়ায়েস কুরণী ছিলেন একজন বুযুর্গ তাবেয়ী। আর হযরত বিলাল ছিলেন সম্মানিত সাহসী। হযরত ওয়ায়েস কুরণী বেলালের ইন্তেকালের অন্তত দশ বছর আগে ইন্তেকাল করেছিলেন বলে কিতাবে উল্লেখিত আছে। এছাড়া একজন ফেরেশতা মর্তের একজন মানুষের কথায় স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলেন এরূপ গাঁজাখোরী কথা শয়তানের মস্তিষ্কপ্রসূত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এসব কাল্পনিক কাহিনী বলে পীর-ফকিরদের মর্যাদা নবীগণের উর্ধ্বে দেখানো হচ্ছে। যেখানে নবীদের দোয়া কবুল হয় না; অথচ ফকিরদের দোয়া কবুল হয়। গায়ের গোশ্ত মুসা (আঃ) দিতে পারলো না অথচ ফকির দিয়েছে।

নবীজীর দন্ত মোবারক শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনে খলিফা ও জামাতা হযরত আলীর দন্ত মোবারক অক্ষত রয়েছে অথচ ফকির ওয়াজকরুনীর সমস্ত দাঁত ফেলে দিয়েছে। বেলালের আয়ু ছিলো বাসর রাত পর্যন্ত। অথচ নবীজি তাঁর হায়াত বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেনি অথবা তাঁর দোয়া কবুল হয়নি অথচ একজন পাগলা ফকিরের দোয়ায় তাঁর ৭০

www.pathagar.com

বছরে হায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে। সেসব কাল্পনিক কাহিনীর মাধ্যমে মানুষকে নবী-রাসূলের রাস্তা থেকে সরিয়ে পীর-ফকিরের রাস্তায় এনে গোমরাহীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এছাড়া এসব ভন্ড পীরেরা সাধারণ মানুষকে ধারণা দেয় পরকালে নবীদের সুপারিশে কাজ না হলেও পীর-ফকিরদের সুপারিশে কাজ হবে। আর তথাকথিত পীরেরা ভক্তদেরকে সুকৌশলে বুঝায় যে, নবীর রাস্তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সে রাস্তা সংগ্রামের, সে রাস্তা জিহাদের। এরপর নবীর দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা নেই যেমন নবীর দোয়ায় ঐ মেয়েটার সন্তান হলো না। পক্ষান্তরে ফকিরের রাস্তায় কোন ঝুঁকি নেই। কোন সংগ্রাম নেই, কারও সাথে কোন বিরোধিতা নেই। আর লাভ তাতে এতো বেশি যে আল্লাহ্‌র কোন ভিন্ন সিদ্ধান্ত থাকলেও পীর-ফকিরের কথা আল্লাহ্ কোন মতেই ফেলতে পারবেন না। যেমন ফেলতে পারেননি ঐ মেয়েটার সন্তান কবুল করার ব্যাপারে। এইভাবে বলখের বাদশাহ্ ইব্রাহীম আদহামের ইতিহাস বর্ণনা করে বুঝান হয় যে, রাজদরবার থেকে খোদাকে পাওয়া যায় না। ওয়াজে বলা হয়, উম্মতের ফাসাদের যামানায় অর্থাৎ এই যুগে যদি কেউ একটা আদনা সুন্নাতও জেন্দা করে তবে তিনি ১০০ শহীদের দরজা পাবেন। কিন্তু শ্রোতারা কখনও চিন্তা করেন না যে, ১০০ নয়, বরং একটা শহীদের দরজা পেলে তাতেই তো বেহেশত পাওয়া যাবে, আর যদি একটা আদনা সুন্নাত পালন করলেই ১০০ শহীদের দরজা পাওয়া যায় তবে এ যুগে মানুষ আর কিছু না করলেও মেসওয়াক তো করেই। তাহলে ঐ একটার অছিলায় তো তার জন্যে যথেষ্ট; অন্য কোন আমলইতো আর প্রয়োজন থাকে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার জীবন পদ্ধতি ও আমার নিয়ম-নীতি অর্থাৎ আমার সুন্নাত তরীকা মোতাবেক চলবে সে ১০০ শহীদের দরজা অবশ্যই পাবে। কারণ এ যুগে পুরো সুন্নত তরীকা মতো যেই চলতে যাবে তাকেই কমপক্ষে ১০০ বার শহীদ হওয়ার মতো দুঃখ কষ্ট ও বিরোধিতা সহ্য করতে হবে। এসব বুঝে-সুঝেই তিনি বলেছেন– ১০০ শহীদের দরজা পাবে। ১০০ শহীদের দরজাও যেমন কম কথা নয় তেমন গোটা নবী জীবনের ন্যায় নিজের জীবন যাপন করাও চাট্টি কথা নয়। এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং জেহাদের পথ। কাজেই এতে দুনিয়ার জিন্দেগীতে যেমন দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই তেমনি আল্লাহ্‌র দরবারে তার পুরস্কারেরও পরিসীমা নেই।

ভন্ড পীরেরা বলে থাকে আল্লাহ্‌র কালাম নব্বই হাজার। ত্রিশ হাজার জাহেরী এবং ষাট হাজার বাতেনী। এছাড়াও একশ্রেণীর ভন্ড পীর মারেফতকে কোরআন-হাদীস বহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য করে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ মানব জাতিকে পবিত্র কোরআন এবং রাসূলের আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের জীবনাচারের প্রতিটি বিষয় পবিত্র কোরআনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যা ঘটা স্বাভাবিক তা হুজুর (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত জীবনে ঘটিয়ে তার সমাধান দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে ছোট্ট দু'টি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। মানুষের মধ্যে দুষ্ট লোক কর্তৃক মিথ্যা কলঙ্ক রটানো স্বাভাবিক। সেটা নবীজির পারিবারিক জীবনে ঘটিয়েছেন। প্রিয় নবীজীর আয়েশাকে মিথ্যা কলঙ্কের অপবাদ দিয়েছিলেন এবং সেটার সমাধানও পবিত্র

www.pathagar.com

কোরআনের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার নিজ বাসস্থানের গেইটের বাইরে থেকে পর্দার আড়ালে অবস্থানরত হযরত আয়েশার সাথে কথা বলছিলেন। সে সময়ে এক সাহাবী নবীজির পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিলেন। সাহাবী ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে এ জন্যে নবীজি সাহাবীকে ডেকে বলেছিলেন- "আমি আমার স্ত্রী আয়েশার সাথে কথা বলছি"। সুতরাং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার ইঙ্গিত যেমন পবিত্র কোরআনে দিয়েছেন, পাশাপাশি নবীজীর জীবনেও তা ঘটিয়েছেন মানব জাতির শিক্ষার জন্য। মানব জাতির জন্য যা করণীয় ও পালনীয় তা পবিত্র কোরআনে এবং রাসূলের আদর্শে রয়েছে। কোন কিছু গোপন করেননি। অথচ ভন্ড পীরেরা কোরআন এবং হাদীসের যা করণীয় ও পালনীয় তা বর্জন করে; যা করণীয় নয় তা পালন করছে। আল্লাহ্ নাকি মানুষের জন্য যা করণীয় তার অনেক কিছু গোপন রেখেছেন। এরা মারফতের নামে গোপন বিষয় নিয়ে টানাটানি করছে। এ সম্পর্কে বিদায় হজ্বের বাণীতে নবীজীর সুস্পষ্ট বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়।

বিদায় হজ্বের বাণী শেষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ তুলে আবেগ ভরে বলেছিলেন-

"হে আল্লাহ্, হে আমার প্রভু, আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিতে পেরেছি? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলাম? লক্ষ কণ্ঠে নিনাদিত হলো- "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!!"

তখন হযরত কাতর কণ্ঠে পুনবার বলতে লাগলেন- "প্রভু হে, শ্রবণ কর, সাক্ষী থাকো। এরা বলছে আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি।"

সুতরাং মানুষের যা করা উচিত, যা করণীয় আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ ভন্ড পীরেরা বলে পবিত্র কোরআনের ৩০ পারার বাইরে অজ্ঞাত আরও ৬০ পারা রয়েছে। এ প্রচারণা মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিনষ্ট করার একটি শয়তানী কর্মকান্ড।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধে অন্যান্যদের সাথে নিজ হাতে মাটি খনন করেছেন এবং মাথায় মাটির বোঝা বহন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি বলেছেন- "প্রত্যেক মুসলমানই সমান, কেউ কারো চেয়ে বড় নয় এবং কেউ কারও চেয়ে ছোটও নয়।" তিনি আরো বলেছেন, "আমি তোমাদের মতোই মানুষ। পার্থক্য শুধু আমার উপর অহী নাজিল হয়, তোমাদের উপর হয় না।" রাসূল (সাঃ)-এর জীবন, সাহাবীদের জীবন পর্যালোচনা করলে যে ব্যবহারিক জীবনের সন্ধান পাই, তার সাথে আমাদের কোনো আলেম খতীবের জীবনের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা ছিলেন দারুণ পরিশ্রমী। মহানবী নিজে রান্নার লাকড়ি যোগাড় করেছেন। খলিফা হবার পরেও হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) নিজ হাতে নিজের কাজ করতেন। মহানবীর নির্দেশ ছিলো- 'হাতের লাঠি পড়ে গেলেও চাকর নয়, নিজে তুলে নাও।' পক্ষান্তরে বর্তমান ভন্ড পীরগণ বৃদ্ধ লোকদের দ্বারাও হাত-পা শরীর টিপিয়ে নেন।

www.pathagar.com

হুজরা খানায় বসে আরাম-আয়েশে দিন গুজরান করেন। ভক্তদের নিকট থেকে বিভিন্ন কায়দায় লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। অথচ প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা আর্ত পীড়িতের সেবায় এরা একটি পয়সাও খরচ করেন না। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহঃ) পৃথ্বিরাজের বিরুদ্ধে, খাজা নিজামুদ্দিন (রহঃ) ও হযরত শাহজালাল (রহঃ) পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশে ইসলামের আলোর মশাল জ্বেলেছিলেন। অথচ এঁদের মাজারগুলো আজ পৌত্তলিকতা, বেদায়াতী ও শেরেকী কর্মকান্ডের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এই কর্মকান্ডগুলো উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। সেজদা, ব্যাভিচার, ঢোল বাজানো, আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালানো, গাঁজা সেবন, কাওয়ালী ও মেয়ে-পুরুষের নাচ-গান ইত্যাদি অপকর্মগুলো মাজারগুলোতে অহরহ চলছে। এসব মাজারগুলোতে বেদআতী ও শেরেকী কর্মকান্ড বৃটিশ আমল থেকেই এ উপমহাদেশে প্রচলিত হয়ে আসছে।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথের পরিপন্থী সব ক্রিয়া কর্মই বেদয়াতী এবং শেরেকীর অন্তর্ভুক্ত। এ বেদয়াতী এবং শেরেকী বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় ও জেহাদী চেতনাকে বিনষ্ট করে একটি নিষ্ক্রিয় জাতিতে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের মুসলমানেরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে ধর্মভীরু। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রকৃত ইসলাম ধর্মীয় ও জেহাদী চেতনা অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি বিশেষ দেশ থেকে একজন প্রতারক অথবা লোফারও যদি বাংলাদেশে আসে তখন এদেশের মানুষ ছওয়াবের আশায় দলে দলে এদেরকে চুমো খায়। এমনি একটি ঘটনা বেশ কয়েক বছর পূর্বে এদেশে ঘটেছিল। ঘটনাটির বৃত্তান্ত নিম্নরূপ ঃ

একটি বিশেষ দেশের শেখরা প্রতি বছর ফূর্তি করার জন্য ভারতে আসে। তেমনি একটি দল ফূর্তি করার জন্যে ভারতের কলকাতা থেকে আসাম যাচ্ছিল। পথের মধ্যে হেলিকপ্টার খারাপ হয়ে যায়। আশেপাশের গ্রামের মানুষ ছুটে আসে হেলিকপ্টারের কাছে। এসে দেখতে পায় একটি বিশেষ দেশের লোক। লোচ্চা শেখদেরকে কে আগে চুমো খাবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এ দেশে যারা নামাজ পড়ে না তারাও মসজিদকে সম্মান করে। যে মদ খায় সেও যদি শুনে কেউ মসজিদের অবমাননা করেছে তাহলে মদের বোতল ছুড়ে ফেলে দিয়ে রুখে দাঁড়ায়। বাবরী মসজিদ ধ্বংসে দেশের মুসলমানেরা দলমত নির্বিশেষে নিন্দা-ধিক্কার এবং প্রতিবাদ জানিয়েছে। অথচ প্রতিবছর সীমান্তের লোকদেরকে ভারতীয় সৈন্যেরা নির্যাতন, হত্যা, লুট করছে। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করতে পারছেন না। যারা পারছে না এদের বিরাট অংশই আজকে ভারত প্রেমে অথবা পীর পূজা, মাজার পূজায় অভ্যস্ত।

মাজার পূজা যদি সওয়াবের অথবা কল্যাণের কাজ হতো তবে সৌদি আরবে হতো সবচেয়ে মাজারের জমজমাট ব্যবসা। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর লক্ষাধিক সাহাবী ছিলেন। এঁদের অনেকের মাজারের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। অথচ আমাদের দেশে আলতু-ফালতু লোকের কবরস্থানও মাজারে পরিণত হয়ে যায়। এ রকম অসংখ্য মাজারে

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে। এসব শেরেকী ও বেদায়াতী কর্মকান্ড হতে বিভ্রান্ত মুসলমানদেরকে রক্ষা পাবার জন্য প্রয়োজন একজন গাদ্দাফী অথবা মাহাথির মোহাম্মদের মতো নেতৃত্বের।

আরেকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। কতিপয় বখাটে লোক অথবা খাজা বাবার ভন্ড প্রেমিকেরা গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে পীর ও খাজা বাবার নামে চাঁদা উঠায়। এরা বাজারে অথবা রাস্তার মোড়ে লাল কাপড় অথবা কাগজ দিয়ে মাজারের নকল গম্বুজ তৈরী করে। এসব নকল গম্বুজে পীরের অথবা মাজারের ছবি টানিয়ে ঢোল বাজনা করে। উচ্চস্বরে মাইকে মুর্শিদী-মারফতি গান বাজিয়ে চাঁদা উঠায়। যেমন–

"কেউ ফিরে না খালি হাতে
খাজা বাবার দরবারে"

এমনও শুনেছি কোনো কোনো পীরের অতিভক্তরা নাকি বলে থাকে–

"তুমি খোদা, তুমি রসূল
তুমি বাবা......" (নাউজুবিল্লাহ)

এভাবে আদায়কৃত অর্থ কোথায় কিভাবে খরচ হয় কেউ জানে না। মাজারে লেখা থাকে– "নিজ হাতে টাকা ফেলুন"– কর্তৃপক্ষ। মাজার কর্তৃপক্ষের যেন টাকা আদায়ই প্রধান কাজ। জনগণকে শিরকের মতো গর্হিত পাপ থেকে জনগণকে সজাগ ও বিরত রাখতে তারা একেবারেই নির্বিকার।

এসব মাজারে যিনি শায়িত আছে তিনি নিশ্চয়ই কামেল ব্যক্তি। অথচ তার উপর চলছে শত অত্যাচার। এ অত্যাচার থেকে মাজারকে রক্ষা করা, সকল পাপকর্ম থেকে জনগণকে বিরত রাখা মাজার কমিটির একান্ত কর্তব্য। আর আদায়কৃত অর্থ সরকারের কোষাগারে জমা দিয়ে তা সরকারের তত্ত্বাবধানে মাজার উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, নও-মুসলিমদের পুনর্বাসন খাতে খরচ করলে তা হবে যথার্থ। খাঁটি ও ধর্মভীরু মুসলমান তাই প্রত্যাশা করে।

পরিশেষে একজন পর্যটকের দৃষ্টিতে 'আজমীর শরীফ' জিয়ারতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা দিয়ে এ বিষয়ে ইতি টানছি।

আজমীর স্টেশনে পৌঁছিলে চট্টগ্রামের সুবিমল কান্তি খোকন ভাইয়ের পরামর্শে রিক্সা নিয়ে গেলাম হোটেলের খোঁজে। রেল স্টেশন থেকে আজমীরের রাস্তা খুবই নোংরা। পাকার পীচ উঠে যাওয়ার কারণে ফাটা তবলার মতো ধ্যা ধ্যা ধ্যাৎ ধ্যাৎ শব্দের তালে নাচছে। মাজারের কাছে পৌঁছিলে এক বৃদ্ধা মুয়াল্লিমের উত্তরাধিকারী মুজাহীদ চিশতি নামের এক যুবক কার কাছে যাবো জানতে চাইলেন। দিল্লী থেকে সংগ্রহ করা একজন মুয়াল্লিমের নাম বললাম। সে বললো, আমার সঙ্গে আসুন। যেতে যেতে পথ আর ফুরোয় না। কি নোংরা, ঘিঞ্জি সংক্ষিপ্ত রাস্তা। ক্রমান্বয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছি। ভারী ব্যাগটা বহনে মুজাহিদ চিশতি আমাকে একটুও সাহায্য করলো না। চিশতি বংশ তাকে বংশ মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব শিক্ষা দিয়েছে। যারা কষ্ট পায় তাদের সাহায্য করতে শিক্ষা দেয় নাই। যাই হোক তাদের বাড়ীতে পৌঁছিলে বাড়ীর সদর দরজায় নাম

www.pathagar.com

দেখলাম একজন ভক্ত ঐ ছবির নিচে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করছে। এরপর দরজার চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে সেজদা পদ্ধতিতে ছালাম করে চলে গেলেন। সমস্ত মনটা আমার বিরূপ হয়ে উঠলো। মুজাহিদ চিশতিকে আর জিজ্ঞাসা করলাম না যে, কেনো মজিদ বাড়ীতে না গিয়ে হালিম বাড়ীতে নিয়ে এলো। মুজাহিদ চিশতি বরলো, 'গোসল অজু করে মাজারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।' কিন্তু আমি এতো শীতে গোসল না করে, অজু করেই মাজার জিয়ারত করার জন্য বেরিয়ে পড়ি।

মাজারের পথের ধারে অসংখ্য ভিক্ষুক। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সারিতে বসে আছে ভিক্ষার আশায়। অর্ধ ভাঙ্গা গম দিয়ে রেঁধেছে মাড়ি। খাচ্ছে সকলে পরম তৃপ্তিতে। পৃথিবী যে কতো এগিয়ে গেছে এদের অন্ধ দৃষ্টিতে তা এখনও ধরা পড়েনি। জুতা-জামা রেখে প্রবেশ করলাম মাজারের ভিতরে। শুনলাম মাজারের গায়ে এবং মিনারে ৫০ মণ স্বর্ণের পাত আছে। কতোগুলো আছে জানি না। তবে মাজারের মিনারটা স্বর্ণের মতো বেশ ঝকঝক করছে। মাজারের ভিতরে অনেক মানুষ জিয়ারত করছেন। হিন্দু মুসলিম অনেক জন। কেউ কাঁদছে, কেউ মাথা নত করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ দু;হাত তুলে করছে মুনাজাত। আমি মাজারে প্রবেশ করলে মুজাহিদ চিশতি আমার মাথায় মাজারের গেলাফ তুলে দিয়ে ঢেকে ধরলো। আমার জন্য অনেক কিছু চাইলো বাবার কাছে, আল্লাহর কাছে নয়। ঘটনা এতো দ্রুত ঘটে গেলো যে আমি কিছু বুঝে উঠার আগেই সকল কিছু শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া ওখানে টানা হেঁচড়া করাও ঠিক হতো না বলে, আমার অনিচ্ছাতে মুজাহিদ চিশতির ইচ্ছাই পূর্ণ হলো।

মাজারের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করে এটা ছবি তোলা শেষে, ভলান্টারী গাইড হালিম বাড়ীর উত্তরাধিকারী দাড়িহীন যুবক মুজাহিদ চিশতি আমাকে নিয়ে আসলো চাঁদা কালেকশন মঞ্চে। কয়েকজন সেখানে বসে আছে বিরাটাকায় খাতা হাতে আদালতের মুহরীদের মতো। আমার কাছে একান্ন রূপী চাঁদার কথা বললে আমি দিলাম মাত্র দশ রুপী। মুজাহিদ চিশতি আমার উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে চাইলো। কিন্তু গেলাফ দিয়ে ঢেকে ধরার সময় হেরে গেলেও এবারে হারতে চাইলাম না। বললাম, 'জিয়ারত করতে আসছি চাঁদা কেনো দিতে হবে'। আমার এতোক্ষণের কথাবার্তায় মুজাহিদ চিশতি ধৈর্য ধরে থাকলেও এবারে হাল ছেড়ে দিলেন, বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলো বাসায়। আমি একা মাজার থেকে বের হয়ে আতর ও পাথরের দোকানে গেলাম। কিন্তু অস্বাভাবিক মূল্য। তাজমহলের পার্শ্বের দোকানগুলো অপেক্ষা এখানে দ্বিগুণ মূল্য হাঁকলো দোকানীরা। মেজাজটা খিঁচড়ে গেলো এই ভেবে যে, এখানের সকলেই গলাকাটা ব্যবসায়ী। মানুষ কতো কষ্টে যে আয় করে তা এদের চিন্তার বিষয় নয়। এঁদের ধারণা, এখানে যারা আসে তারা টাকার কুমির এবং এদের টাকাটা বিভিন্ন কৌশলে হাতিয়ে নেয়াই ধর্ম। ফুলের ডালা সাজিয়ে বসেছে বহুজন। মানুষ ফুল কিনে মাজারে দিচ্ছে। বহু ফুল মাজারে জমা হলে কুড়িয়ে এনে বিবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বার বার সে ফুল বিক্রি হচ্ছে। মাজারের এক কোণে লৌহনির্মিত বিরাটকায় একটা কড়াই। কুড়ি মণ চাউল রান্না করার যাবে এতে। এটার মধ্যে টাকার ছড়াছড়ি। ছোটখাটো একটা বস্তা এ টাকা দিয়ে ভরে যাবে। কড়াইটার কাছে আসলেই টাকা ছুঁড়ে দেয় সকলে বাবার নামে।

www.pathagar.com

আস্তে আস্তে মাজার এলাকা থেকে বেরিয়ে আন্না সাগরের দিকে হাঁটা দিলাম। এদিকে পূজার মূর্তি আছে। আছে চার্চ। সেদিকটা কতো পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে। কিন্তু মাজারের আশেপাশে কতো নোংরা। সন্ধ্যার পূর্বে ফিরে গেলাম হালিম বাড়ীতে। মুজাহিদ চিশতির দাদু আসলেন আমাকে বিদায় দিতে। মুখ ভরা পান চিবোতে চিবোতে কথা বলছেন তিনি। বিচ্ছিরিভাবে সে পান ছিটকে পড়ছে বাইরে, আমার গায়ে। আমাকে বলছে, 'এবার যাও সন্ধ্যা হয়ে এলো'। তাঁর বাড়ীর চাকর আমার ব্যাগ হাতে নিয়ে তাড়া দিলো। আমি মাগরিব পড়ে বের হতে চাইলে, রাস্তায় মসজিদ আছে বলে তিনি জানিয়ে দিলেন। আমি বের হচ্ছি তিনি বললেন, 'আমাকে কি দিবি দে'। পকেট হাতরিয়ে দেখি খুচরো টাকা আছে মাত্র চল্লিশটি। তাই-ই দিলাম। এর চেয়ে বেশি কি দেয়। এক দুপুর মাত্র তার বাড়ীতে আমার ব্যাগটা ছিলো। একবার টয়লেট ব্যবহার করেছি। গোসল করেছি মাত্র একবার। কিন্তু তিনি বললেন, 'কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা দে'। কিন্তু দিলাম না।

ফিরে চললাম আজমীর থেকে। মহান আল্লাহ জানেন মাজারকে কেন্দ্র করে যারা আয়ের উপায় খুঁজে পরকালে তাদের কি গতি হবে। আরেকটা ব্যাপার আমাকে ভাবিয়ে তোলে, তা হলো, আজমীরে হাজার হাজার মানুষ কোনো কাজ করে না। শিক্ষা বিস্তারে কোনো উদ্যোগ নেই। গবেষণা করার মানসিকতার অভাব, কুরআন শরীফ বুঝে পড়ে কিনা সন্দেহ। সকলের মুখে এক কথা 'বাবা দিবে'। বাবা বড় না আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বড় জানতে চাইলে জবাব দেয়, 'ও ভি বড়তো আছেই। হুজুরের ছেড়ে ছিরি ভি না ধোরলে যেতি পারবে না।'

আজমীরে শত শত ভিক্ষুক। জীবনে তারা একবারও গোসল করেছে কিনা সন্দেহ। জীবনে একবার নামাজ পড়েছে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ হয়। মাথার চুল ধুলা দিয়ে সাদা হয়েছে। পাংসু বর্ণের দাড়ি। অসম্ভব নোয়রা কাপড় পরে বসে আছে ভিক্ষা নিবে। পাহাড়ের গায়ে স্থাপিত বাড়ী থেকে পায়খানা মিশ্রিত পানি ঢালু বেয়ে নেমে আসছে। মানুষ বসে আছে তার পার্শ্বে। শূকোর খুঁজছে খাদ্য। হায়রে মুসলিম। উৎপাদনশীল অন্যান্য জাতি হবে তোমাদের প্রভু, তোমরা অনন্তকাল থেকে যাবে ভিক্ষুক।

দিল্লীর মসজিদে দেখলাম মুসল্লীরা স্বাস্থ্যহীন, কাপড় কতো মলিন। সম্রাট শাহজাহান মসজিদ নির্মাণ করে গেছেন ঐ পর্যন্তই। একবারও এর রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। হয়তো মুসলিমরা বলবে বিভিন্ন কারণে আমরা গরীব। কিন্তু ইতিহাস খুঁজে দেখা যায় ইহুদীরাও বিতাড়িত হয়েছিল দেশ থেকে, কিন্তু তারা থেমে থাকেনি। বিশ্বে তাদের প্রভাব বলয় বৃদ্ধিই করে চলছে অদ্যাবধি। হিটলার কর্তৃক দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তারা বিভিন্ন দেশে ভিক্ষা না করে সব্জির ব্যবসা করতো, নয়তো কাজ করতো স্বর্ণকারের। যদি সে দেশেও কোনো কারণে বসবাস করা কঠিন হয়ে উঠে তাহলে স্বর্ণ ও যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে সটকে পড়তো অন্যত্র। একটা দোকানে মাত্র এক কেজি স্বর্ণ হলেই বিরাট ব্যবসা করা যেতো। স্বর্ণ কোট-প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে পালানো তো কঠিন কাজ নয়। আর সব্জি সকালে কিনে সারাদিন বিক্রির পর দোকানে সামান্যই

www.pathagar.com

অবশিষ্ট থাকতো। যদি পালাতে হয়, টাকা কোমরে গুঁজে নিয়ে পালিয়ে যেত। অপরাপর ব্যবসা তারা ফাঁদতো না। কারণ বিরাট দোকান, বহুত মালামাল নিয়ে পালিয়ে যাওয়াও অসুবিধা। লোকসানের সম্ভাবনা বেশি। আসলে মুসলিমরা গবেষণা করে না। কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে, শুধু মাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে অপেক্ষা করে। কিন্তু আল্লাহ্ চেষ্টা করতে বলেছে এ কথা তারা ভাবতেও চায় না। দিল্লী জামে মসজিদ এলাকায় মুসলিম শিশুরা বিদেশীদের ধরে বলে, 'চিংগাম (চুইংগাম) দে'। বৃদ্ধারা হাত পাতে 'একটা রুপী, ভাত খানে কি লিয়ে সাহাব'। কিন্তু তাদের পাশাপাশি শিখ ও হিন্দুদের কতো সুন্দর স্বাস্থ্য, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, বিরাট বিরাট করবার। দেখলে বুকটা ভেঙ্গে যায়। বিদেশীরা যখন বলে, 'মুসলিম ধর্মে দর্শন নাই'। তখন লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। আর এ লজ্জা তো মুর্খ ও অলস মুসলিমদের জন্যই পেতে হয়। বলতে পারি না শ্রেষ্ঠ দর্শন আছে মুসলিম ধর্মে। কিন্তু প্রচার নাই, শিক্ষিত ও গবেষক মুসলিমের বড়ই অভাব। তাই মাঝে মাঝে মহান রাব্বুল আ'লীমীনকে বলি, "হে আবার রব, মুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষায় শাণিত কর, সুমতি দাও। এঁদেরকে দলাদলি ও কোন্দল থেকে বিরত রাখ এবং মোনাফেকদের চরিত্র প্রকাশ করে দাও। নইলে কতোকাল যে এঁরা পরমুখাপেক্ষি থাকবে তার ইয়ত্তা নেই।"

মুসলিমরা ভালো প্রচারকও নয় ঃ আজমীরের পথে জার্মানীর যুবক মার্কো দারান টোসকী কতো ভদ্র, কতো হাসি-খুশি। তার কথা শুধুই শুনতে ইচ্ছে করে। ফিলিস্তিনী মুসলিমরা ইসরাইলীদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে বলে ইসরাইলের লোককে অপছন্দ করতাম। কিন্তু ট্রেনে রুটি খেয়ে পানির জন্য উস্‌খুস করছিলাম দেখেই ইসরাইলের ভদ্রলোক নিজের পানির বোতলের ছিপি খুলে দিলেন, আমাকে পানি পান করতে। তখন বুঝলাম মানবতা সবখানেই আছে। শুধু নাই রাজনীতিতে, নেতা-নেত্রীদের চরিত্রে ও শাসক প্রশাসকদের অন্তরে। যেটুকু থাকে তা সীমিত সংখ্যকদের মাঝে আছে। যাই হোক জার্মানের অমুসলিম যুবক ও ইসরাইলী ভদ্রলোকের অকৃত্রিম আন্তরিকতা, প্রাণ জুড়ানো হাসি, তাদের ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য করে, কথা শুনতে আগ্রহী করে তোলে। কিন্তু বহু মুসলিম ধর্মীয় নেতা হঠাৎ দৈবাৎ মানুষের সঙ্গে যেচে কথা বলে। কারো সাথে হাসতে চায় না কিংবা মুখটা নরম করে কথা বলে না। অপরিচিতের সামনে কথা বলতেও তাঁরা আগ্রহী নয়। তাই চিন্তা করি, এঁদের ভারিক্কি চলন, গম্ভীর আচরণ দেখে কি মানুষ তাদের কাছে ঘেঁষবে? এরা কি কখনও মুসলিম দর্শন প্রচারের সুযোগ পাবে? অসংখ্য ভাষায় কুরআনের বাণী লিখে সারা বিশ্বে প্রচারে সমর্থ হবে? প্রতি বছর কি কমপক্ষে এক হাজার ইসলাম প্রচারকারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশ্বের সুবিধামতো জায়গায় পাঠাতে পারবে? পারবে কি ফান্ড সংগ্রহের জন্য প্রতি পাড়ায় বা মহল্লায় সমিতি করে সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচ টাকা করে সঞ্চয় করতে? মাসে কমপক্ষে একবার না খেয়ে সে টাকা কি এ কাজে ব্যবহারের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে?

www.pathagar.com

সূফীবাদ

বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার এবং আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচার ও অকথ্য নির্যাতন থেকে বৌদ্ধ এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের উদ্ধার ও ত্রাণকল্পে সুফী-সাধক ও আলেমদের ভূমিকা প্রশংসনীয় অবদান রাখে।

'সূফী' নামের উদ্ভব সম্বন্ধে কয়েকটি মতের উল্লেখ করা যায়। 'সুকী' নামে এক প্রকার রুক্ষ পশমী পোশাক সূফীরা পরতেন বলে এই নামের উৎপত্তি। কারো মতে আরবী সাদা (পবিত্র অর্থ) থেকে সূফী শব্দের উদ্ভব। অন্য মতে, সুফ্‌ফা অর্থাৎ ঘরের ছাদ থেকে সূফী কথার আর্বিভাব। তাঁরা হযরতের তৈরি মসজিদে বাস করতেন এবং ছাদে নিদ্রা যেতেন। তাই তাঁরা সুফ্‌ফার লোক অর্থাৎ সূফী বলে পরিচিত। এই সূফীরা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)কে প্রথম এবং হযরত আলীকে দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক গুরু এবং হাদী বলে শ্রদ্ধা করেন।

এভাবে ইসলামের মধ্য থেকে এরকম অনেকগুলো দল বেরিয়ে গেছে যাদের মুসলিম সমাজ মুসলমান বলেই স্বীকার করে না। এরকম একটা সম্প্রদায় হচ্ছে ইরানের বাহাই দল, আরেকটি হচ্ছে এই উপমহাদেশের কাদিয়ানী সম্প্রদায়। লেবাননের দ্রুজরাও ইসলামের সঙ্গে অনেক কিছু মিশিয়ে এক রকম ধর্ম সৃষ্টি করেছে। সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট আসাদ যে মতবাদের অনুসারী তার মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের অনুকরণে আল্লাহ, মুহাম্মদ এবং আলীকে নিয়ে একটা Trinity সৃষ্টি করা হয়েছে। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর সত্তা তিন অংশে বিভক্ত ঃ একটি অংশ হচ্ছে আল্লাহ স্বয়ং দ্বিতীয়টি তার পুত্র যীশু এবং তৃতীয়টি আল্লাহর রূহ। এই সম্প্রদায়ের নাম 'আলাবী'।

এরকম আরো অনেক ছোট বড় সম্প্রদায়ের নাম মাঝে মাঝে শোনা যায়। বাংলাদেশে পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে এরকম একটা সম্প্রদায়ের কথা শুনেছি যারা দাবী করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে যেমন ওহী বা ঐশীবাণী আসতো তেমনি তাদের ধর্মীয় নেতারাও ঐরূপ ঐশী বাণী লাভ করেন। শুনেছি অনেক অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত মুসলমান এসব কথায় বিশ্বাস করে। কারণ সাধারণ লোকে শেরেকী এবং তৌহিদের প্রভেদ ভালো করে বুঝতে পারে না।

যারা এসব নতুন এবং উদ্ভট মতবাদ প্রচার করে তারা প্রায়ই দাবী করে যে, তারা হচ্ছে উঁচু দরের সূফী। এবং যেহেতু বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান অনস্বীকার্য সেজন্য সূফী পরিচয় দিয়ে মনে হয় অনেক কিছু করা সম্ভব।

তবে এ প্রক্রিয়া বাংলাদেশ বা এই উপমহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি এরকম এক সূফীর সন্ধান পাওয়া গেছে যিনি বহুকাল পাশ্চাত্য জগতে ইসলামের ধারক ও বাহক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এ সম্পর্কে একজন ইসলামী চিন্তাবিদের নিবন্ধ থেকে জানা যায়, এ ব্যক্তির নাম Frithjof Schuon. তার জন্ম সুইজারল্যান্ডে। তিনি উচ্চ শিক্ষিত এবং অনেকগুলো ভাষা জানেন। তিনি ইসলামে কবে দীক্ষিত হয়েছিলেন তার সঠিক তারিখ জানা নেই তবে

www.pathagar.com

এটুকু জানা আছে যে, ১৯৬৮ সালে তিনি যখন মরক্কো যান তখন তিনি উপরোল্লিখিত আলাবী সম্প্রদায়ের শেখ আহমদ আল আলাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। এ ঘটনা থেকে তার নতুন সূফীবাদের সূচনা। ১৯৮১ সালে শুওন আমেরিকায় চলে যান এবং সেখানে একটা সূফী কেন্দ্র স্থাপন করেন। তার বর্তমান বয়স ৮৪।

শুওনের মুরীদের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে রয়েছেন ইরানের প্রখ্যাত পন্ডিত ডঃ সৈয়দ হোসাইন নাসের। তিনিও নিজেকে সূফী বলেন এবং ইসলামের সূফীবাদ সম্পর্কে একাধিক বই লিখেছেন। ১৯৭৭ সালে লন্ডনে যে Festival of Islam অনুষ্ঠিত হয় তার পিছনে হোসাইন নাসের এবং শুওনের অন্যান্য ভক্ত সক্রিয় ছিলেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো ডঃ হোসাইন নাসের এ উপমহাদেশে বেশ পরিচিত। পাকিস্তান আমলে তিনি ঢাকায়ও এসেছেন। তাছাড়া বহুবার লাহোর, পিন্ডি এবং করাচী ভ্রমণ করেছেন। জন্মসূত্রে তিনি ইরানী তবে খোমেনী বিপ্লবের পর তিনি ইরান যেতে পারেননি। বর্তমানে একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ডঃ হোসাইন নাসের শুওনের রচনাবলী সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। শুওনকে তার আশি বছর বয়সে, যে সমস্ত প্রবন্ধ উপঢৌকন দেওয়া হয় সেগুলোও সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন হোসাইন নাসের। বিশ্বাস এবং তত্ত্বের দিক থেকে শুওন এবং নাসেরের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে গুরু-শিষ্যের।

শুওন যে সূফীবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার সঙ্গে প্রচলিত অর্থে ইসলামী সূফীবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। শুওন দাবী করেন, যে বিশ্বাস তিনি প্রচার করছেন সেটা একটা সনাতন সর্বগ্রাহ্য মতবাদ। তার সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের অর্ফিয়সবাদের যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি এটা ভারতের নাগার্জুন এবং শংকরাচার্যের মতবাদেরও সম্পর্ক। তেমনি চীনের লাউৎসু এবং চুয়াংসু মতবাদেরও একটা প্রতিধ্বনি। হোসাইন নাসের দাবী করে যে, বিশ্বের পরমাত্মা বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ছিলেন এই পরমাত্মার অবতার তেমনি যীশুও। নবীদের কথা স্পষ্টভাবে বিশেষ বলা হয়নি কিন্তু পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয় যে, তারাও এ শ্বাশতবাণীর বাহক।

শুওন বিশেষভাবে তার মতবাদে আরেকটি উপদানের প্রবর্তন করেছেন। এটা যীশুর মাতা বিবি মরিয়মকে কেন্দ্র করে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, যীশুর মাতা হিসাবে বিবি মরিয়নের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে বিশ্বের ধর্মচেতনায়। সৃষ্টির মূলে যে শক্তি সক্রিয় তার প্রধান প্রতিনিধি হচ্ছে নারী এবং এই শক্তিকে শুওন বোধন করেন মরিয়ম রূপে। বিবি মরিয়ম নাকি কয়েকবার তাঁকে দর্শন দিয়েছেন, তাঁকে আলিঙ্গনও করেছেন। শুওন এবং তার শিষ্যবৃন্দ কলেমার মতো যে বাণী উচ্চারণ করে জিকির শুরু করেন সেটা নিম্নরূপ ঃ

ইয়া মরিয়ম আলাইকেস সালাম
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

অর্থাৎ হে মরিয়ম তোমাকে সালাম জানাচ্ছি। শুওনের তরীকার নাম দেয়া হয়েছে তরীকায়ে মরিয়মীয়া। এ তরীকার চেলারা (যার মধ্যে নারী পুরুষ সবাই থাকে) শুওনকে

www.pathagar.com

কেন্দ্র করে জিকির করেন বিবস্ত্র হয়ে এবং জিকির যখন একটা বিশেষ মার্গে উপস্থিত হয় তখন বিবসনা নারীরা শুওনকে আলিঙ্গন করে। তার দেহের সঙ্গে তাদের দেহ মিলিত হয় এবং শুওন নারীদেহের বিভিন্ন স্থান হাত দিয়ে স্পর্শ করেন।

এ সমস্ত তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন শুওনেরই একজন প্রাক্তন শিষ্য Mark Koslow। স্বভাবতই শুওনের নিজের রচনা অথবা হোসাইন নাসেরের ব্যাখ্যায় এই জিকিরের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। কসলোফ জানিয়েছেন যে, একবার শুওন অবৈধ যৌনাচারের অভিযোগে অসুবিধায় পড়েছিলেন। তার বিশেষ আকর্ষণ নাকি কিশোর বয়সী বালক-বালিকা। তবে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে সে যাত্রায় তিনি রেহাই পেয়েছিলেন। এই ঘটনা ঘটে আমেরিকার ব্লুমিংটন শহরের কাছে ১৯৯১ সালে। ব্লুমিংটনে Hearald times পত্রিকায় ১৯৯১ সালের ১৫ অক্টোবর সংখ্যায় এই অভিযোগের বিবরণ বেরিয়েছিল।

বলা বাহুল্য, শুওন সূফীবাদের নামে যে তরীকায়ে মরিয়মীয়া সৃষ্টি করেছেন সেটা শেরেকিতো বটেই কুফুরী বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু গায়ে ইসলামী লেবেল এঁটে শুওন এবং হোসাইন নাসের ইউরোপ আমেরিকার বহু নব্য মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করছেন। সাধারণ মুসলমান যাদের পক্ষে সম্যকভাবে কুরআন হাদীসের বাণী অধ্যয়ন করা সম্ভব নয় তাদের অনায়াসেই বিভ্রান্ত করা সম্ভব। একে তো সাধারণ মানুষ মাত্রই রহস্যের কথা শুনলে আকৃষ্ট হয় দ্বিতীয়তঃ হযরত ঈসা এবং বিবি মরিয়মের নাম কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। এ কারণে অতি সহজে সাধারণ লোকজনকে বোঝানো সম্ভব যে, মরিয়ম কেন্দ্রিক বিশ্বাস ইসলাম বহির্ভূত কিছু নয়।

আসলে শুওন এবং নাসের যে আন্দোল চালিয়েছেন সেটা গত শতাব্দীর Theosophy আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি। যারা ঊনিশ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করেছেন তারা নিশ্চয়ই মাদাম ব্লাবাৎসকির নাম শুনেছেন। ইনি দাবী করতেন যে, মহাশূন্যে একশ্রেণীর আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়, যারা পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন এদের সন্ধানে একবার ব্লাবাৎসকি তিব্বত গিয়েছিলেন। ভারতে ব্লাবাৎসকির প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন মিসেস বৈসান্ট। এই মহিলা ইন্ডিয়ান হোম রুল (Indian home rule) আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এরাও একটা শ্বাশত ধর্মের কথা বলতেন যার প্রকাশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং সমাজে ঘটেছে। ঐ যে মহাত্মারা মহাশূন্যে বাস করেন তারা এই শ্বাশত ধর্মের প্রধান প্রতিনিধি।

মাদাম ব্লাবাৎসকি কখনও সূফীবাদে নাম করেননি। এদিক থেকে শুওনের মধ্যে অভিনবত্ব আছে কিন্তু মূলতঃ ব্লাবাৎসকির মতবাদের সঙ্গে শুওনের মতবাদের কোনো অভিন্নতা লক্ষিত হয় না। বরং শুওন আরো অনেকগুলো উপাদান যোগ দিয়ে সে পুরনো মতবাদকে আরো রহস্যময় এবং আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

যত বিপদ হচ্ছে শুওনের লেবেল নিয়ে। যারা শুওনের Understanding Islam বইটা শুধু পাঠ করেছেন তাদের ধারণা যে, তিনি ইসলামকে নতুনরূপে বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় লিপ্ত। আসলে তার কর্মকান্ডের ফলে ইসলামের মূলে

www.pathagar.com

কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। শুওন দাবী করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তার তরীকায়ে মরিয়মীয়ার জিকির এবং কাবার তওয়াফের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তার শিষ্যদের বিশ্বাস যে শুওন সত্যি একজন অবতার। তার মানে খ্রিস্টান যেমন বিশ্বাস করে, যে যীশু মানবরূপী খোদা, হিন্দুরা যেমন বিশ্বাস করে কৃষ্ণই ভগবান তেমনি শুওন অবতার বৈ আর কিছু নন। অনেকে হয়তো জানেন যে পন্ডিচেরীর শ্রী আরবিন্দকেও তার শিষ্যরা অবতার বলে ভাবতো।

আমি আগেই বলেছি যে, শুওন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। হঠাৎ করে তার দর্শনের সঙ্গে পরিচতি হতে গেলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। আর যেখানে তিনি ইসলামী সূফীবাদের নামে মতবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন সেখানে এই বিভ্রান্তির আশঙ্কা আরো বেশি।

মাঝে মাঝে যেমন শুনি কোনো কোনো হিন্দু মহাঋষি আমেরিকায় কেন্দ্র স্থাপন করে বহু ভক্ত জুটিয়ে ফেলেন শুওন সে কর্মটিই করছেন ইসলামের নামে। তার সঙ্গে হোসাইন নাসেরের মতো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকায় শুওনের অপকর্মের পথটা আরো সহজ হয়ে উঠেছে। বুদ্ধির ক্ষেত্রে শুওনের তরীকা যে ইসলামের প্রতি একটা বিরাট হুমকি সে সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল মহলের সন্দেহ থাকার কোনো কারণ নেই। বর্তমান বিশ্বে ইসলাম যে কতো দিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে শুওনের তরীকা তারই একটা স্পষ্ট প্রমাণ।

আলেম সমাজের বর্তমান ভূমিকা

'ইসলাম-প্রচারক' সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকায় ১৯০৩ সালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় মোল্লাদের কটাক্ষ করে ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'মোল্লা চিত্র' শিরোনামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেন। আমাদের আলেম-ওলামাদের সমকালীন ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে কবিতাটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি।

"বাহাবা! বাহাবা! ধন্য! বঙ্গের মৌলভী
নায়েবে রসূল ব'লে তোমাদের দাবী;
তোমরাই জ্ঞানী-গুণী জগতের সার
আর যত মূর্খ সবে দুনিয়া মাঝার।
তোমরাই এ যুগের 'আরস্তু' লোকমান'
সত্য বটে তোমরাই খাঁটি মুসলমান!
অতুল জ্ঞানের খনি প্রতিভার রবি
বাহাবা! বাহাবা! ধন্য! বঙ্গের মৌলভী;
সত্য সত্য ইহারাই ইসলামের রবি!
পড়ে না হাদীস কভু বুঝে না কোরান
অথচ আলেম বলে মনে অভিমান!
মূর্খ দলে লম্ফঝম্ফ চিল্লি বিল্লি সার
"মোসলেমে গরীব আল্লাহ করেছে ধরায়

www.pathagar.com

যেখানে সেখানে এরা কহিয়া বেড়ায়!
বাহবা! বাহবা! ধন্য! বাঙ্গালার মোল্লা
'হানাফী' 'ওহাবী' লয়ে সদা করে হল্লা।
কোরানের মূল তত্ত্বে নাহি ধারে ধার
'নফল' লইয়া কিন্তু টানাটানি সার!
সাদীর 'বয়াৎ' ঝাড়ে যেখানে সেখানে
অদ্ভুদ মিলাদ পড়ে কি অপূর্ব তানে!
গরীবের বাড়ী যেয়ে গ্রামের ভিতর
খাইতে মুরগীর রান নেহায়েৎ তৎপর।
পিঠে বোঝা দুই চারি চেলা লয়ে সাথে
ভিক্ষা করি ফেরে সদা গাঁয়েতে গাঁয়েতে।
হিজিবিজি খুৎবা পড়ে আরবী ভাষায়
বুঝিতে পারে না নিজে কি বুঝাবে হায়!
'জামাত' লইয়া শুধু করে টানাটানি
এক জুম্মা ভেঙ্গে করে তিন চারখানি।
'ঈদগাহ' ভাঙ্গিয়া করে তিন চার মাঠ
বাঙ্গালার মোল্লাদের চমৎকার ঠাঁট।
কথায় কথায় আছে মুখেতে বেদাৎ
গন্ডা কিছু দিলে পড়ে 'ছুন্নত' নেহাৎ।
ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা হস্তি সমজ্ঞানী
'দাল্লিম' 'জাল্লিম' লয়ে করে হানাহানি।

এই কবিতাটিতে একশ্রেণীর অপূর্ণাঙ্গ মোল্লা-মৌলভীর বাস্তব স্বরূপ চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। অথচ এক সময় আলেম-ওলামা সম্প্রদায় এ দেশের আজাদী লড়াইয়ে বুকের রক্ত দিয়েছে। জেহাদী চেতনায় নিজেদের উৎসর্গ করেছে। ইসলামী দুনিয়ায় এঁদের দান অপরিসীম। একদিন এই আলেম সমাজই ইসলামের বিজয় পতাকা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলো। পরবর্তীতে ইংরেজরা আলেমদের এই জেহাদী চেতনাকে ধ্বংস করে অন্ধকারের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল। নানাবিধ বিভ্রান্তির বেড়াজালে তারা আজ বহুধাবিভক্ত। আলেম সমাজের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে উদারতার ধর্ম ইসলামকে আনুষ্ঠানিকতার ধর্মে পরিণত করেছে। ইসলামের সঠিক আদর্শ থেকে আলেম-ওলামা সম্প্রদায় বিচ্যুত হয়ে মনগড়া এবং প্রভাবিত নীতিতে চলছে। এঁদের অতি গোঁড়ামীর ফলে যুবকেরা বিপথগামী হচ্ছে। ইসলাম থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের পিছনে ছুটছে। যার প্রেক্ষিতে মুসলিম উম্মাহ আজ দুর্বল। এসব নামধারী আলেমদের কারণেই আল্লাহ এবং রাসূলের প্রদর্শিত ইসলামী রীতি-নীতিকে নিয়ে ইসলামের শত্রুরা. ইসলাম বিদ্বেষীরা উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে সাহস পাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহর এমন নড়বড়ে অবস্থা হবার কথা ছিলো না। মুসলমানদের আল্লাহ এক.

www.pathagar.com

রাসূল এক, ধর্মীয় গ্রন্থ এক। ইসলামের আদর্শ অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা শুধু উৎকৃষ্টই নয়; সর্বশ্রেষ্ঠ। তবুও কেন মুসলামনেরা বহুধাবিভক্ত এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত। এ সম্পর্কে জানতে হলে একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে।

তিতুমীর তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান বড়োই দুর্বল হয়ে পড়েছে।" তাঁর এই উক্তির মর্মার্থ এবং আন্দোলনের যথার্থতা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের জানা দরকার মুসলমানদের ঈমান কতোখানি দুর্বল ছিলো এবং কি পরিবেশে তিনি তাঁর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন। বাংলার হিন্দুজাতি ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এবং আপন মাতৃভূমির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদেরকে শুধু রাজ্যচ্যুতই করেনি, জীবিকা অর্জনের সকল পথ রুদ্ধ করেছে এবং একজন মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ট সম্বল ঈমানটুকুও নষ্ট করতে চেষ্টার কোন ক্রটি করেনি। মুসলমানদেরকে নামে মাত্র মুসলমান রেখে, ঈমান, ইসলামী জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি থেকে দূরে নিক্ষেপ করে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষাও এক নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে তাদেরকে দাসানুদাসে পরিণত করতে চেয়েছিল। (সূত্র ঃ আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২১৩, ২১৪)

বৃটিশ আমলে বাংলার নতুন হিন্দু জমিদারগণ হয়ে পড়েছিল ইংরেজদের বড়ই প্রিয় পাত্র। একদিকে তাদেরকে সকল দিক দিয়ে তুষ্ট রাখা এবং মুসলমানদিগকে দাবিয়ে রাখার উপরেই এ দেশে তাদের কায়েমী শাসন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলো। সুতরাং সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের উপর হিন্দু জমিদারগণ ন্যায় অন্যায় আদেশ জারী করার সাহস পেতো।

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদেরকে যেমন ব্রাহ্মণেরা ধর্মকর্মের স্বাধীনতা ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল, অনুরূপভাবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমানদের মধ্যেও একদল লোককে মুসলমান ব্রাহ্মণরূপে দাঁড় করিয়ে মুসলমান জনসাধারণকে ইসলামের আলোক থেকে বঞ্চিত করেছিলো।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী শহীদ তিতুমীর গ্রন্থে বলেন ঃ

"পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জমিদার ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিরক্ষর মুসলমানদেরকে বুঝাইল ঃ "তোরা গরীব। কৃষিকার্য ও দিনমজুরী না করলে তোদের সংসার চলে না। এমতাবস্থায় তোদের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক ও বার্ষিক নামাজ এবং রোজা, হজ্ব, জাকাত, জানাজা, প্রার্থনা, মৃতদেহ স্নান করানো প্রভৃতি ধর্মকর্ম করিবার সময় কোথায়? আর ঐ সকল কার্য করিয়া তোরা অর্থোপার্জন করিবার সময় পাইবি কখন এবং সংসার যাত্রাই বা করিবি কি প্রকারে? সুতরাং তোরাও হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় একদল লোক ঠিক কর, তারা তোদের হইয়া ঐ সকল ধর্মকার্যগুলি করিয়া দিবে, তোদেরও সময় নষ্ট হইবে না।"

দ্বীন ইসলামের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও কৃষিমজুর শ্রেণীর মুসলমানেরা বাবুদিগের এই পরামর্শ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিল। ক্রমে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজেও এই ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িল। এই সঙ্গে আজাজিল শয়তান এবং নফস্

www.pathagar.com

আমাদের দেশের সাহেব ও হুজুরদের ধর্মীয় মানসিকতা

একটি শোক সভায় প্রার্থনারত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

কয়েক বছর আগে প্রতিদিন মাগরিব বাদ ঢাকা আউটার স্টেডিয়ামের হকি গ্রাউন্ডের দেয়ালের পাশে খোলা মাঠে ঢাকা নারিন্দা মশুরীখোলা শাহ শাহেবের উদ্যোগে অসহায় টোকাইদের সংগঠিত করে তাদেরকে ইসলামী বুনিয়াদি শিক্ষা দেয়া হতো। বুনিয়াদি শিক্ষা দানকালে সুন্নত পালনের জন্যে টোকাইদেরকে টুপি সরবরাহ করা হতো। অথচ পরনে ফরজ ঢাকার কাপড় নেই।

www.pathagar.com

আম্মারা তাহাদিগকে প্ররোচনা দান করিল। তাহারা বাবুদিগের কথার জবাবে বলিল ঃ

"বাবু আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। এতদিন আমাদিগকে এই প্রকার হিতোপদেশ আর কেহ দেন নাই। আমরা নির্বোধ, কিছু বুঝি না। আপনি আমাদের জন্য যাহা বিবেচনা করেন তাহা করুন।" (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৫-৬)

বলাবাহুল্য, মুসলমানদের ব্রাহ্মণ সাজবার লোকেরও অভাব হলো না। প্রাচীনকালে মুসলমানদের শাহী দরবারে একশ্রেণীর মুসলমানকে তাদের যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ ভালো ভালো উপাধিতে ভূষিত করা হতো। উপরন্তু তাদের ভরণ-পোষণের জন্যে সয়মা, লাখেরাজ ও বিভিন্ন প্রকারের ভূ-সম্পত্তি দান করা হতো। ইংরেজদের আগমনের পর তাদের এসব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারা হয়ে পড়ে নিঃস্ব-বিত্তহীন। শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলো না বলে তাদের জীবিকার পথও বন্ধ হয়ে গেলো। বিদ্যা শিক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের ছিলো না। বলতে গেলে তারা সম্ভ্রান্ত ভিখারীর দলে পরিণত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলো কিছু সংখ্যক শেখ, সৈয়দ, মীর, কাজী প্রভৃতি নামধারী লোক। তারা ছিলো প্রাচীন বুনিয়াদী ঘরের সন্তান। কিন্তু অভাবের তাড়নায় তাদেরকে এখন কৃষক, শ্রমিক, মজুরদের দ্বারস্থ হতে হয়। তাদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাদেরকে সহানুভূতির সুরে বলতে লাগলো ঃ

"চাষী মজুর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান এখন আর আপনাদেরকে পূর্বের ন্যায় মানে না, মানতে চায় না। ভক্তি শ্রদ্ধাও করে না। তাদের এরূপ ব্যবহারে আমরাও হৃদয়ে খুব বেদনা অনুভব করে থাকি। কি আর করা যাবে– কলিকাল। আমরা চাই যে তাদের ধর্ম কাজগুলি করে দেবার দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত করে আপনাদেরকে সাহায্য করব। আপনারা মুসলমান সমাজের আখঞ্জী, মোল্লা, উস্তাদজী, মুনশী, কাজী প্রভৃতির পদ গ্রহণ করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করুন। তাহলে আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। তারাও আপনাদের অনুগত থাকবে। ধনহারা, মূর্খ, অর্ধমূর্খ, শরাফতীর দাবীদার শেখ, সৈয়দ, মীর ও কাজীর দল হিন্দু, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বাবুদিগের কথায় ভুল্লো। তারা আখঞ্জী, মোল্লা, উস্তাদজী ও মুন্সীর পদ গ্রহণ করে মুসলমান জাতির ব্রাহ্মণ সেজে বসলো। মুসলিম জাতির সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করলো। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণের আদর্শে মুসলমান সমাজেও ব্রাহ্মণের পদ সৃষ্ট হলো। সাধারণ মুসলমানরা আপাতঃ মধুরভাবে বিভোর হয়ে ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তের পথ থেকে বহু দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়লো। হিন্দু ব্রাহ্মণ জাতির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে তারা আত্মহত্যা করলো। (শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৭)

আজও মুসলমানরা বিশেষ করে কতিপয় আলেম সম্প্রদায়ের ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান এবং অন্যান্য ধর্মে যথাক্রমে পুরোহিত, ভিক্ষু এবং পাদ্রী রয়েছেন। এরা তাদের মান্যবর ধর্মীয় নেতা। কিন্তু ইসলাম ধর্মে কোন ধর্মীয় নেতা নেই। আছে ইমাম। ইমাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নেতা। ইমাম সাহেবের দায়িত্ব যেমন ধর্মীয়ভাবে নেতৃত্ব দেয়া ঠিক তেমনি সামাজিকভাবেও নেতৃত্ব দেয়া। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা

www.pathagar.com

ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য নাগরিক তৈরী হবার অবকাশ নেই। ফলে ইমাম সাহেবেরা সামাজিক নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আবার যারা বর্তমানে সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা আবার মসজিদের ইমামতি করার যোগ্যতা রাখেন না। অথচ ইসলামের আদর্শ হচ্ছে যারা ধর্মীয় নেতৃত্ব দিবে তারা সমাজেরও নেতৃত্ব দিবে। হুকুমাত ও ইমামত একই সাথে চলবে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা তাই প্রত্যক্ষ করি।

আমাদের দেশে ধর্মীয় ইমাম নিয়োগ করার পূর্বে ইমামের চরিত্র, ধর্মীয় জ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে থাকে। বিশেষ করে চরিত্রে কোন ত্রুটি থাকলে তাকে ইমাম নিয়োগ করা হয় না বা তার পিছনে কেউ নামাজ পড়ে না।

ইসলামের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী ইমাম নির্বাচনের ন্যায় সমাজের বা রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচিত হতো তাহলে এদেশে সৎ নেতৃত্ব গড়ে উঠতো। ধর্মীয় নেতা বা ইমাম নির্বাচনে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হয়। কিন্তু সমাজের বা জাতির নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে উত্তম চরিত্রের প্রয়োজন নেই। যার প্রেক্ষিতে জাতি ধর্মীয় ক্ষেত্রে যোগ্য ইমাম পাচ্ছে না; পাচ্ছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ধর্মান্ধ, স্বার্থান্ধ ও অপরিপক্ক ইমাম। আর অন্যদিকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাচ্ছে অসৎ অথবা পাশ্চাত্য ভাবধারায় আচ্ছন্ন ইসলাম বিদ্বেষী নেতা। ইমামদের মুখ্য কাজ নামাজ, মিলাদ, জানাজা, বিয়ে পড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে ইসলামের সঠিক কল্যাণ হতে মুসলমানেরা বঞ্চিত।

আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবেরা নিজেদেরকে আশেকানে রাসূল হিসাবে গণ্য করে। অথচ তাদের মধ্যে দাড়ি টুপি ও লম্বা আলখেল্লা ছাড়া সুন্নতি অনেক কর্মকান্ডই লক্ষ্য করা যায় না। এখানে ২/১টি ছোট্ট দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কারো সাথে সাক্ষাত হলে তিনি কাউকেই আগে সালাম দেয়ার সুযোগ দিতেন না। কিন্তু ইমাম সাহেবেরা এ সুন্নত পালন করেন না। মনে করেন অন্যান্যরা আগে তাদেরকে সালাম দিবে। একমাত্র তাদেরই সালাম প্রাপ্য। সালামকে তারা পদমর্যাদার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে। আগে সালাম দেয়া সুন্নত এবং সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজেব। এসব মৌলভীরা সালাম তো দেয়ই না বরং ভালো করে সালামের জবাবও দেয় না। আয়েশী ভঙ্গিতে শুধু একটু মাথা ঝাঁকান মাত্র।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঈদের দিন এক রাস্তা দিয়ে মসজিদে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে মসজিদ থেকে বাড়ী ফিরতেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো এই খুশীর দিনে গরীব-দুঃখী ইয়াতিমরা অংশগ্রহণ করতে পারছেন কিনা তা প্রত্যক্ষ করা। একবার ঈদের জামাতে যাবার পথে একজন ইয়াতিম শিশুকে কান্নারত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি সেই শিশুটিকে বাড়ীতে এনে গোসল করিয়ে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করে ঈদের জামাতে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের ইমাম সাহেবেরা মুসল্লীদেরকে ঈদের জামাতে এক রাস্তা দিয়ে আসার এবং অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফেরার পরামর্শ দেন ঠিকই কিন্তু এ সুন্নতের প্রকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন না। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতো যদি প্রত্যেক মুসল্লী এবং ইমাম সাহেবেরা

www.pathagar.com

ঈদের দিনে সুন্নত পালন করতেন তাহলে এদেশের একজন গরীব-দুঃখী ইয়াতিমও ঈদের আনন্দ হতে বঞ্চিত হতো না। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ফজর নামাজারে পর মুসল্লীদের সামনে বসে তাদের দিনের কাজ বন্টন করতেন এবং আছর নামাজের পর দিনের কাজের হিসাব নিতেন। এছাড়াও তিনি মুসল্লীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব ও পরামর্শ দিতেন। অথচ ইমাম সাহেবরা মসজিদে এই সুন্নতও শুধু তসবীহ জপের মাধ্যমেই পালন করে। তাঁরা যদি হুজুর (সাঃ)-এর মতো এই সুন্নত পালন করতো তাহলে সমাজের, জাতির সঠিক কল্যাণ সাধিত হতো। বর্তমানে শুধু ছওয়াবের উদ্দেশ্যে সুন্নত পালন করার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে এর কোন শুভ প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে না।

যে সব দ্রব্যাদি এবং নগদ অর্থ মসজিদে আসতো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) গরীব দুঃখীদের মাঝে তা দান করে হাত ঝেড়ে-মুছে বাড়ী ফিরতেন। কিন্তু আমাদের আলেম সাহেবরা এ সুন্নত পালন করে না। রমজান মাসে ইফতারের সময় দেখেছি মহল্লা থেকে যে সব ইফতারী মসজিদে আসে ভালো ভালো ইফতারীগুলো ইমাম সাহেবের হুজরায় চলে যায়। আর অর্ডিনারী ইফতারীগুলো মুসল্লীদের ভাগে পড়ে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (সাঃ) হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন। তিনি এ জন্য হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করতেন যেন প্রদানকারী যাতে মনে কষ্ট না পায়। আর তিনি তার বিনিময়ে হাদিয়াও প্রদান করতেন। কোন কোন হাদিসে বলা হয় যে, প্রাপ্ত হাদিয়ার চেয়ে তিনি উত্তম হাদিয়া দিতেন। কারণ হাদিয়াদাতা যদি ভক্তি ও ভালোবাসার খাতিরে কষ্ট করে হাদিয়া প্রদান করে থাকে তাহলে যেন তার মন জয় হয় এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ইমামেরা এ সুন্নত পালন করে না।

আমাদের দেশে আরেকটি কু-প্রথা চালু আছে। হিন্দুরা যেমন প্রথম গাভীর দুধ, ক্ষেতের প্রথম ফসল অথবা ফল পুরোহিতকে দেয় ঠিক তেমনি আমাদের দেশে মুসলমানদের মধ্যে এ প্রথা চালু আছে। অনেকের বিশ্বাস– গাভীর প্রথম দুধ, ক্ষেতের প্রথম ফসল ইমাম সাহেবকে দিলে গাভী বেশি দুধ দিবে, ক্ষেতে বেশি ফসল ফলবে। হিন্দুরা মন্দিরে দেবতাকে ভোগ দেয়; আমরা দেই হাদিয়া। হিন্দুরা পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করে, আমরা বিতরণ করি তাবারুক। আবার অনেকে ইমাম সাহেবকে দাওয়াত করে খাওয়ায় পরিবারের কল্যাণের আশায়।

একবার এক গৃহস্থ মসজিদের ইমাম সাহেবকে দাওয়াত দিয়েছিল। ইমাম সাহেব প্রচুর খেয়েছেন। খাবার শেষ মুহূর্তে আনা হয়েছে দুধ। ইমাম সাহেব দুধ দেখে বলেন, আমি প্রচুর খেয়েছি পেটে জায়গা নেই। বাড়ীর মালিক তখন বলে, হুজুর খান। দুধ খাওয়া রাসূলের সুন্নত। হুজুর (সাঃ) খাবার শেষে দুধ খেয়েছেন। এভাবেই হুজুরকে দুধ খাইয়ে সুন্নত পালন করা হয়। অথচ হুজুর (সাঃ) নিজে না খেয়ে ক্ষুধার্তকে খাইয়েছেন। এ ছাড়া হাদীসে বর্ণিত আছে, পাশের বাড়ীর অভুক্ত লোকের যে খোঁজ নেয় না সে প্রকৃত মুমেন নয়। অথচ এ সুন্নত পালনে মুসলমানেরা সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত। হুজুর (সাঃ) একাধারে ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক, সমর নায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

শিক্ষক। কিন্তু ইমাম সাহেবেরা এ সুন্নতও পালন করেন না। এ সুন্নতের ধারে কাছেও যান না।

অনেক দিন পূর্বে এক মিলাদ মাহফিলে দু'জন মৌলভী সাহেব এসেছিলেন। মিলাদ শেষে গৃহস্থ পাঁচটি টাকা দু'মৌলভীকে ধরিয়ে দেয়। এ পাঁচটি টাকা দেয়াতে এক মৌলভী সাব নাখোশ হন। পথে এ নিয়ে দু'মৌলভীর মাঝে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক মৌলভী বলে গরীব মানুষ খুশি অইয়া যা দিছে এইডার মধ্যে জোর-জবরদস্তি করনের কিছু নাই। জোর জরবদস্তি করলে গুনা অইবো। নোয়াখালীর অন্য মৌলভী তৎক্ষণাৎ বলে উঠে, "আই আইছি অইসার লাইগ্গা, আই কি হয়দার লইগা আইছিনি। সুতরাং বুঝুন এদের কাছ থেকে কি ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা আশা করা যায়? অথচ এদের কাছেই আমরা ইসলামের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। এদের জন্যেই আজকে মানবতার মহান ধর্ম, সার্বজনীন ধর্ম ইসলামকে নিয়ে বিজাতীয়, বিধর্মীরা কটাক্ষ ও উপহাস করছে।

ইসলামের ধর্মীয় রীতিতে মুসলমানদের ঢিলা কুলুফ নেয়া স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানসম্মত। এই সুন্দর প্রথাটিকে কতিপয় মোল্লা-মৌলভী উপহাসে পরিণত করেছে। অনেককে দেখা যায় পরিবার পরিজনের সামনেই দৃষ্টিকটূভাবে এ কর্মটি করতে। এছাড়া অশালীনভাবে ডান পা বাম দিকে এবং বাম পা ডান দিকে ঘুরায়। বারবার কাশি দেয়। এ সুন্দর প্রথাটি অসুন্দরভাবে এস্তেমাল করার ফলে অনেকেই হাসি-ঠাট্টা করে। অথচ এ কর্মটি প্রাকৃতিক কর্মের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাধা করলে ইসলাম বিদ্রোহীরা তা নিয়ে উপহাস করার সুযোগ পেতো না। এটা শুধু এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; সর্বক্ষেত্রে।

আলেম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিশেষজ্ঞ। তা শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, রোগ বিশেষজ্ঞ যে কোন পেশার ব্যক্তিই হতে পারে। কিন্তু আলেমরা মনে করেন, সাধারণ মানুষ যে কোন সমস্যায় তাদের শরণাপন্ন হবে। রোগ ব্যাধি যেমন তারা পানিপড়া আর ঝাড়-ফুঁক দিয়ে সারাতে চান। তেমনি অনেক বিষয়ে তারা অনধিকার চর্চা করেন। মূলতঃ আলেমদের দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্র এবং সমাজের নেতৃত্ব দেয়া। নেতৃত্ব দেয়ার অধিকারী হতে হলে আলেমদের পূর্ণাঙ্গ এলেমধারীরূপে গড়ে উঠতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সে সুযোগ নেই। আমাদের দেশের আলেমরা শুধু নামধারী আলেম।

বহু বছর পূর্বে রাজশাহী জেলার কোন এক পাড়াগাঁয়ে দোয়ালিন ও জোয়ালিন নিয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটেছিলো। ঘটনাটি আমার এক বন্ধুর মুখ থেকে শোনা।

মুসলমানদের মধ্যে আহলে হাদীস এবং হানাফী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘদিনের। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। ঐ এলাকায় কোন মতবাদের লোক সংখ্যাধিক্য তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। দু'সম্প্রদায়ের লোকেরা রাস্তার দু'মাথায় দাঁড়িয়ে জনগণকে আলহামদু সূরা পড়তে বলে। আহলে হাদীসের সমর্থকদের কাছে কেউ যদি 'দোয়ালিন' বলে তাহলে তার রক্ষা নেই। লাগায় এক থাপ্পড়। যদি বলে 'জোয়াল্লীন' তাহলে তাকে সমর্থকেরা মাথায় তুলে নিয়ে নাচে। আর যদি কেউ বলে

www.pathagar.com

আমি আলহামদু সূরাই পড়তে পারি না তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। হানাফী সম্প্রদায়ও অনুরূপ কর্মকান্ড করে। এখানে উল্লেখ্য, জোয়াল্লিনের পরিবর্তে দোয়ালীন অথবা দোয়াল্লিনের পরিবর্তে জোয়াল্লিন বললে অপরাধ হয়। এর জন্য শাস্তি দেয়া হয়। অথচ যে আলহামদু সূরাই জানে না এর জন্য তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। জোয়াল্লিন এবং দোয়াল্লিন নিয়ে অহেতুক ঝগড়া-ফ্যাসাদ না করে যদি এরা জনগণকে আলহামদু সূরা শিক্ষা দিতো সেটা হতো যথার্থ কল্যাণকর। ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলেম-ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ এর কারণে আজকে মুসলিম উম্মাহর বহুধা মতবাদে বিভক্ত। আর এ সুযোগ গ্রহণ করছে ইসলামের শত্রুরা।

মরহুম আবুল মনসুর আহমদ তাঁর এক গ্রন্থে একটি কাহিনী লিখেছেন। কাহিনীটির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

এক গ্রামে দু'মৌলভী সাহেব ছিলেন। একজনের বাড়ী ছিলো সুধারাম। অন্য জনের বাড়ী ছিলো পরশুরাম। এ জন্যে একজনকে বলা হতো সুধারাম মৌলভী; অন্যজনকে বলা হতো পরশুরাম মৌলভী। এ দু'জন মৌলভী সাহেবকে নিয়ে গ্রামে প্রায়ই ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক হতো। একজন যদি ফতোয়া দিতো, অন্যজন তার বিপরীত ফতোয়া দিতো। একবার এক মহিলার জানাজার নামাজ পড়তে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়। সুধারাম মৌলভী বলে, মাইয়াতের জানাজার জন্য ইমামকে লাশের সীনা বরাবর দাঁড়াতে হবে। পরশুরাম মৌলভী বলে না এটা ঠিক নয়। সহি হাদীসে আছে ইমামকে লাশের শির বরাবর দাঁড়াতে হবে। জানাজার নামাজ বাদ দিয়ে এ নিয়ে দু'মৌলভীর মধ্যে তর্কযুদ্ধ শুরু হয়। এদিকে বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়। তর্কের মীমাংসা হয় না। গ্রামবাসীরা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে সমস্বরে বলে ওঠে– "রাখেন হুজুর আপনাদের সীনা আর শির। এ নিয়ে আপনারা পরে তর্ক করবেন। সীনা আর শিরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়িয়ে আমাদেরকে ছেড়ে দিন। মাঠে আমাদের কাজ আছে।"

আমার এক বন্ধু ছিলো চরম ইসলাম বিদ্বেষী, বামপন্থী রাজনীতির কট্টর সমর্থক ও ভক্ত। মহান ইসলাম ধর্মের ছিটে-ফোটা জ্ঞানার্জনের পর প্রায়ই বন্ধুটির সাথে বামপন্থী রাজনীতি ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তর্ক হতো। ইসলাম ধর্মের অনেক রীতি-নীতিকে নিয়ে বন্ধুটি কটাক্ষ করতো। একদিন তাকে ইসলাম বিষয়ক কিছু বই (দোয়া-দরূদের বই নয়) পাঠ করতে দেই। সেসব বই পাঠ করে তার জীবনেও বিরাট পরিবর্তন আসে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় এবং প্যান্ট-সার্ট ছেড়ে ইসলামী পোশাক অর্থাৎ সুন্নতী লেবাস পরিধান করে। দাড়ি রাখে। বর্তমানে সে বন্ধুটি একটি জাতীয় দৈনিকে কাজ করছে। এখন তার চেহারা সুরত ও লেবাস দেখলে মনে হবে এক মস্ত বড় আলেম। পারিবারিকভাবেও ইসলামের বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।

আমাদের দেশে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ নেই। চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের কারণে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। ইসলাম ধর্মকে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় নিছক একটি ধর্ম হিসাবেই মনে করে। বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরী ধর্মান্ধ

www.pathagar.com

ও অসম্পূর্ণ ইসলামী জ্ঞানধারী আলেম সম্প্রদায় বেহেস্ত-দোযখের কাহিনী বয়ানের মধ্যেই সার্বজনীন মহান ধর্ম ইসলামের আবেদনকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। সুতরাং এসব আলেমদেরকে নিয়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের কোন মাথাব্যধা নেই। যেমন মাথাব্যথা নেই পীর ও তাবলীগওয়ালাদেরকে নিয়ে। তাদের মাথাব্যথা শুধু পবিত্র কোরআনের তাফসীরকারকদেরকে নিয়ে। তাই দেখা যায় যেখানেই তাফসীর মাহফিল সেখানে আসে বাঁধা। কারণ পবিত্র কোরআন শুধু বেহেস্ত-দোযখেরই কথা বলে না, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বিষয়েও কথা বলে। পবিত্র কোরআন মুসলমানদের জেহাদের প্রেরণা দেয়। ইহুদী, খৃস্টান সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার তাগিদ দেয়। তাই ওয়াজ নসিয়ত, পীরগিরি ও তাবলীগ যতো পার কর কিন্তু কোরআন তাফসীর নয়। ব্যাপকভাবে এদেশে পবিত্র কোরআনের তাফসীর হলে এসব ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের তথাকথিত মানবতার মুখোশ খুলে যাবে। অতএব তাফসীরকে রোখ।

গ্রাম-গঞ্জে তথাকথিত প্রভাবশালী ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা বহু অপকর্ম করে। এসব অপকর্ম সামাজিকভাবে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে সাজানো সালিশের আয়োজন করে। সেখানে ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। এসব সালিশী সভায় ফতোয়া দেয়ার যোগ্য নয় এমন আলেমকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করে– "হুজুর আপনাদের ইসলামে(?) অমুক অপরাধের শাস্তি কি?" আলেম সাহেব প্রভাবশালী ব্যক্তির পক্ষে প্রভাবিত হয়ে উল্টা-পাল্টা ফতোয়া দেয়। পরবর্তীতে এসব ফতোয়াকে ধর্মনিরপেক্ষবাদী বুদ্ধিজীবীরা সাহিত্যে নাটকের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে। মিডিয়াগুলোতে টুপি-দাড়ির কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করে রসিয়ে রসিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা হয়। ইসলাম ভক্তদের সন্ত্রাসী ও কূট-কৌশলের নাটের গুরু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতিকে বিভিন্ন অপকৌশলের মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। সূক্ষ্ম চক্রান্তের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়। কয়েকজন অর্ধশিক্ষিত আলেমের জন্য গোটা আলেম সম্প্রদায়কে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। এক সময় এদেশের অধিকাংশ লোক ছিলো মূর্খ। আলেমদের বিচরণ ক্ষেত্র প্রধানত অশিক্ষিত জনগণের মাঝে ছিলো। তখন এসব অর্ধ শিক্ষিত আলেমদের ভ্রান্ত ফতোয়া নিয়ে জনগণ তেমন মাথা ঘামায়নি। বর্তমানে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ। এছাড়া আমাদের দেশের সামাজিক সংগঠনগুলোও তাই। যুব সম্প্রদায়ের যে অংশটি শিক্ষিত হচ্ছে নানা অপপ্রচারে ধর্মীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত না হয়ে সেক্যুলার মূল্যবোধে উজ্জীবিত হচ্ছে। ফলে ইসলামের সুন্দর গঠনমূলক বিধি-বিধানগুলো অপপ্রচারের শিকার হয়ে জনমনে বিভ্রান্তি এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বর্তমানে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে। নামাজ-রোজা ফরজ এবাদতগুলো প্রতিটি মুসলমানের অবশ্যই পালনীয়। কিন্তু এ জরুরী এবাদতগুলোর পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর জন্য আরো অনেক মৌলিক বিষয় রয়েছে যা পাশ কাটিয়ে কিছু মামুলী সুন্নত অবশ্যই পালনীয় বলে চাপিয়ে দিচ্ছে। ইসলামের মৌলিক অনেক বিষয় উপেক্ষা করে ছোট-খাট বিধি-নিষেধ সমাজে কঠোরভাবে পালন

www.pathagar.com

করা হচ্ছে। সুন্নত পালনের এসব ভয়ে অনেক যুবক ইসলাম থেকে দূরে থাকে। এছাড়া আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায়ের ধারণা ধর্ম-কর্ম শেষ বয়সের ব্যাপার। এ সম্পর্কে আমাদের দেশে একটি প্রবাদ রয়েছে যে–

"যত পার কর পাপ
শেষে হজ্ব আর পীর সাব।"

পূর্বেই বলেছি বিভিন্ন কৌশলে ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ছাড়িয়ে আমাদের যুব সম্প্রদায়কে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায় জড়িয়ে পড়ছে বা অনুপ্রাণিত হচ্ছে ভ্রান্ত মতবাদে। সুতরাং আমাদের যুব সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত মতবাদ থেকে বাঁচাতে হলে তাদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ দিতে হবে। ইসলামের রঙে যুব সম্প্রদায়ের মন রাঙাতে হবে। মন রাঙালেই যুব সম্প্রদায় নিজ উদ্যোগেই ভূষণ রাঙাবে। যেমন রাঙিয়েছেন আমার ঐ বন্ধুটি। আর যদি আলেম সম্প্রদায় মন রাঙার পূর্বে যুব সম্প্রদায়ের ভূষণ রাঙাতে চেষ্টা করেন তাহলে হিতে বিপরীতই হবে। যা বর্তমানে হচ্ছে।

সুতরাং আলেম সমাজ যদি গঠনমূলক বক্তব্যের পরিবর্তে অগভীর ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেন তাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের আশঙ্কাই বেশি। এসব বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের কারণে স্যাকুলারিজম যুব সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন শিক্ষা হতে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই আলেম সমাজের উচিত ইসলামের মহান সৌন্দর্যের দিকে জ্ঞান-গর্ভ বক্তব্য দিয়ে যুব সম্প্রদায়কে ধর্মের দিকে টেনে আনা। ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা। এর পাশাপাশি পবিত্র কোরআনের তাফসীর এবং বিভিন্ন ইসলামিক বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা। পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে যেসব ইসলামী চিন্তাবিদ, পীর-মাশায়েখ বক্তব্য দেবেন তা গ্রহণ করা। এর বাইরে যারা যত চিত্তাকর্ষক বক্তব্যই রাখুন না কেন, তা বর্জন করা। তা হলেই বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী শিক্ষিত জনগণ বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে ইনশায়াল্লাহ।

আমাদের দেশের মোল্লা-মৌলভীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল নয়। নামাজ, মিলাদ, জানাজা, বিয়ে পড়ানো ইত্যাদি ধর্মীয় কর্মগুলো সম্পাদনের মাধ্যমেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আর আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমান ফরজ এবাদতকে বাদ দিয়ে নফল এবাদতকে অবশ্যই করণীয় বলে মনে করে। এই নফল কাজের মাধ্যমে মোল্লা-মৌলভীরা অর্থ উপার্জন করে থাকে। এ নফল কাজগুলো বন্ধ হয়ে গেলে তাদের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং মোল্লা-মৌলভীরাও নফল কর্মকে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে করে থাকে। যার প্রেক্ষিতে সমাজে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, রীতি-নীতি, সঠিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুসলমানেরা বিচ্যুত। বৃটিশ ও হিন্দুরা বিধর্মীয় স্টাইলে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে যেসব আচার-অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুকৌশলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা আজও অব্যাহত রয়েছে। যেমন– মিলাদ, চেহলাম, কুলখানি, তাবিজ-তুমার প্রভৃতি। যা এ গ্রন্থে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বৃটিশ আমলে বড়লাট, গভর্নর জেনারেল, ইংরেজ শাসক ও বিচারককে 'লর্ড' বলে সম্বোধন করতে এদেশের জনগণকে বাধ্য করেছিল। যেমন লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়াভেল, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন প্রভৃতি। তৎকালীন বিচারককে 'মাই লর্ড' বলে সম্বোধন করতে হতো। যা ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী। একজন মুসলমান আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে প্রভু বলে স্বীকার করতে পারে না। অথচ এ শেরেকী কাজটি মুসলমানদের করতে হতো। এ 'লর্ড' সম্বোধনের প্রথা বৃটেনেও নেই। কিন্তু এ ধূর্ত ইংরেজরা এ কুপ্রথাটি আমাদের দেশে প্রচলন করেছে। এরা মনে করতো তারা প্রভু এবং আমরা তাদের দাস। সে সময়ে বৃটিশ সরকারের অধীনে এদেশের যারা সরকারী চাকরি করতো তাদের দরখাস্তের শেষে Your most obedient servent বলে উল্লেখ করতে হতো। অনেকে মনে করেন সরকারী চাকরি যারা করেন তারা পাবলিক সার্ভেন্ট। অনেকে মনে করেন দরখাস্তের শেষে Your most obedient servent লিখা দোষের কিছু নেই। আমি এ মতের সাথে একমত নই। কারণ দরখাস্তটি দেয়া হতো ইংরেজ প্রশাসকের বরাবরে। ইংরেজরা নিজেদেরকে প্রভু মনে করতো। সে উদ্দেশ্যে দরখাস্তের শেষে Your most obedient servent লিখতে হতো।

ধূর্ত ইংরেজরা মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিনষ্টের 'লর্ড'-এর প্রতিশব্দ 'মাওলানা' শব্দটি অত্যন্ত সুকৌশলে ইসলামী শিক্ষা সমাপান্তে শিক্ষার্থীদের নামের পূর্বে টাইটেল হিসাবে জুড়ে দেয়। মাওলানার আভিধানিক অর্থ 'প্রভু'। আমাদের দেশের আলেমরা 'মাওলানা' শব্দটি নামের পূর্বে টাইটেল হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। অথচ ১৮৫৭ সালের পূর্বে এই 'মাওলানা' শব্দটি কোন ইসলামী চিন্তাবিদদের নামের টাইটেল হিসাবে দেখা যায় না। পৃথিবীর অন্য কোন দেশেও ইসলামী চিন্তাবিদদের নামের পূর্বে 'মাওলানা' উপাধি নেই। শুধু আমাদের দেশেই এর প্রচলন রয়েছে। নামের সাথে মাওলানা না বললে বা না লিখলে তারা অপমানিত বোধ করেন। মাওলানা শব্দ জুড়েও এরা সন্তুষ্ট নয়। ট্রেনের ইঞ্জিনের সাথে যেমন বহু বগি জুড়ে দেয় ঠিক তেমনি এদের নামের সাথে বহু শব্দ জুড়ে দেয় যা নবী-রাসূলদের নামের সাথেও দেখা যায় না। যেমন- আশেকানে রাসূল, আমীরে-শরীয়ত, মোফাচ্ছেরে কোরআন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হযরত মাওলানা আলহাজ্ব সামসুদ্দীন ইবনে রহীমুদ্দীন হুজরাবাদী বুলবুলি।

আমাদের দেশে একজন মস্ত বড় মাওলানা আছেন। তিনি পাকিস্তান আমল থেকে যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে সেই সরকারের সাথেই মিশে গিয়েছেন। শুনেছি এ মাওলানা নাকি দিনে তিনবার কাপড় বদলান। দামী গাড়ী চড়ে মানুষকে হেদায়েতের জন্য ওয়াজ নসিয়ত করেন। বিশেষ বিশেষ দিনে টিভির পর্দায় রাসূলের প্রেমে গদ্‌গদ হয়ে মুখ ভেংচিয়ে রাসূলের আদর্শ অনুসরণের নসিয়ত করেন। আবার উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে মিলাদ শরীফও পড়িয়ে থাকেন। আগেই বলেছি মিলাদ শরীফ আজ থেকে দু'শ' বছর পূর্বে এদেশে প্রচলিত হয়েছিল। অথচ শুধু মিলাদ শরীফের মাধ্যমেই ধর্মীয় বিশেষ দিনগুলো তাৎপর্য তুলে ধরার মাধ্যমে কর্তব্য পালন করেন।

আরেকজন মাওলানা আছেন। তিনিও বিখ্যাত তাফসীরকারক। শোনা যায়,

www.pathagar.com

তাফসীর মাহফিলে তাঁকে নিতে হলে বিরাট অংকের একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দিতে হয়। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ছাড়া তিনি তাফসীর মাহফিলে শরীক হন না। রসূল (সাঃ) এর জীবন, সাহাবীদের জীবন পর্যালোচনা করলে যে ব্যবহারিক জীবনের সন্ধান মেলে তার সাথে আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেমের ব্যক্তিগত জীবনের কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। মহানবী (সাঃ) নিজে রান্নার লাকড়ি জোগাড় করেছেন, খন্দকের যুদ্ধে নিজ হাতে মাটি কেটেছেন। খলিফা হবার পরও হযরত আবুবকর সিদ্দিকী (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) নিজ হাতে নিজের কাজ করতেন। এ ছাড়া মহানবীর নির্দেশ ছিলো- "হাতের লাঠি পড়ে গেলেও চাকর নয়, নিজে তুলে নাও।" অথচ আমাদের দেশের আলেমরা যখন তাফসীরে হযরত উমর (রাঃ) এবং তাঁর চাকর সম্পর্কিত মরুভূমির কাহিনী বিবৃত করেন তখন তার পশ্চাৎদেশে ২/৩ জন পাখায় বাতাস করে। এভাবেই তারা ওয়াজ নসিয়তে স্ববিরোধী বক্তব্য রেখে নিজেরাও ডুবছেন, জাতিকেও ডুবাচ্ছেন। এরা ওয়াজ নসিয়ত, বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে মানুষকে হেদায়েত করার কোসেস করেন। আর অন্যদিকে ইসলামের শত্রুরা সেবার নামে মানুষকে ধর্মান্তরিত করেন।

এনজিওদের বিরুদ্ধে আলেমরা সোচ্চার শুধুমাত্র প্রতিবাদের মাধ্যমে। কিন্তু প্রতিরোধে কেউ এগিয়ে আসছে না। বিধর্মীরা এনজিও-এর মাধ্যমে সেবার নামে এদেশের লাখ লাখ দরিদ্র মানুষকে গত ত্রিশ বছরে ধর্মান্তরিত করেছে। এনজিওরা বিভিন্ন কৌশলে পাইকারী হারে ধর্মান্তরিত করার ফলে বাংলাদেশের অনেক এলাকায় মুসলমানেরা সংখ্যালগিষ্টে পরিণত হয়েছে। আর আমাদের দেশের মৌলভী-মাওলানারা বক্তৃতা-বিবৃতি ও ওয়াজ-নসিয়তে এনজিওদের উৎখাত করার হুমকি দেয়। শুধুমাত্র বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে এদেশ থেকে এনজিওদের কোনদিন উৎখাত করা যাবে না। এদের উৎখাত করতে হলে, এদেশের মুসলমানদের বাঁচাতে হলে বগুড়ার কাহালু অঞ্চলের মুফতি ইব্রাহীমের ন্যায় কর্জে হাসানাসহ ইসলামী বিধান মোতাবেক জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী নিয়ে এনজিওদের মোকাবেলা করতে হবে। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক আমাদের দেশের আলেম সম্প্রদায় এনজিওদের মতো অঢেল অর্থ পাবে কোথায় যা দ্বারা সেবামূলক কর্মকান্ডে এগিয়ে আসবে এবং তাদের মোকাবেলা করবে? জবাবে আমি বলবো ওয়াজ-নসিয়ত ও পীরের পেছনে প্রতি বছর আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকা বেহুদা খরচ হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এরূপ নজির নেই। আমি ওয়াজ-নসিয়তের বিরোধী নই। আবহমান কাল ধরে এদেশে ওয়াজ-নসিয়তের অনুষ্ঠান আয়োজন হয়ে আসছে। তা আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে একটি স্থায়ী প্রথা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। কাজেই ওয়াজ-নসিয়তের অনুষ্ঠান অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানের নামে যেসব বাহুল্য খরচ হচ্ছে তা পরিহার করতে হবে।

আমাদের দেশে ইসলাম চর্চা হচ্ছে ঃ (ক) খানকায় বসে দ্বীনের তালিম (খ) মাদ্রাসায় ইসলাম শিখানো (গ) তবলীগী ময়দানে তালিম ও (ঘ) আর ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে। আর অন্যদিকে খৃষ্টানরা ওয়াজ-নসিয়ত করে না। এরা ধর্মান্তরিত করে ছলে, বলে ও কৌশলে। এছাড়া তারা বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতিতে মানুষকে ধর্মান্তরিত করে।

www.pathagar.com

পাজেরো গাড়ীতে চড়ে আলোকসজ্জিত প্যান্ডেলে বসে গরম গরম মৌসুমী বক্তব্য বা ওয়াজ নসিয়ত করে ইসলামের খেদমত করা যায় বটে কিন্তু ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন মুফতী ইব্রাহীমের মতো সৎ সাহস জেহাদী চেতনা ও সেবামূলক কর্মসূচী। প্রয়োজনে চেচনিয়া, কাশ্মীর, আলজেরিয়া ও বসনিয়ার মুসলমানদের মতো ভাগ্য বরণ করে নিতে হবে আমাদেরকে। তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেই এদেশ থেকে চিরতরে ইসলামের শত্রুদের সমূলে নির্মূল করা সম্ভব।

প্রসঙ্গ তাবলীগ

মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্যে বহুকাল পূর্ব থেকেই এদেশে একটি হ্যান্ডবিল অশুদ্ধ ভাষায় প্রচারিত হয়ে আসছে। আমি ছোটকালেও দেখেছি, এখনো দেখছি। পাঠকের জ্ঞাতার্থে হ্যান্ডবিলটির ভাষা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

ইহা সত্য!　　　　ইহা সত্য!!　　　　ইহা সত্য!!!

এক জরুরী খবর

নিজে পড়ুন ও অন্যকে পড়ে শোনান

এটা একটা সত্য ঘটনা। মদীনা শরীফ থেকে শেখ আহাম্মদ এই অছিয়তনামা লিখে পাঠাইয়াছেন। তিনি জুম্মার দিন রাতে কোরআন শরীফ পড়তে পড়তে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপনে তিনি দেখতে পান যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) উনার সামনে দাঁড়িয়ে বলিতেছেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে ৭০০০ হাজার লোক মারা গেছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে একজনও ঈমানদার লোক পাওয়া যায়নি যাহা আল্লাহতায়ালার ইবাদত বাণী গণ্য না। তিনি আরো বলেন, এখন খুব খারাপ সময় এসেছে। এখন স্ত্রী স্বামীকে খেদমত করে না। মেয়েরা পর্দা ছাড়া চলাফেরা করে, মা-বাবা গুরুজনকে সম্মান করে না, ধনী লোকেরা গরীবদের দেখেন না। কোন দান-খয়রাত করে না। যাকাত দেয় না। তিনি আরো বলেন যে, আহম্মদ তুমি দুনিয়ার লোকগণকে বলে দিও তারা যেন নেকী করে, নামাজ পড়ে ও রোজা রাখে এবং দান খয়রাত করে। কারণ কেয়ামত খুব কাছে। আকাশে একটা তারা দেখা দিবে তখন সঙ্গে সঙ্গে তওবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। কোরআন শরীফের অক্ষর উঠে যাবে সূর্য সোয়া গজ উপরে থাকবে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যে লোক এই অছিয়তনামা অন্যজনকে পড়ে শোনাইবে রোজ কিয়ামতের দিন আমি তার উছিলায় জান্নাতে জায়গা করে দেব এবং যে লোক এর বিপরীত বলবে সে খোদার রহমত হতে বঞ্চিত হবে। গরীব লোক এই পত্রকে ছাপিয়ে বিতরণ করলে তার অনেক আশা পূর্ণ হবে। শেখ আহম্মদ বলেন যে, এই পত্রখানা যদি মিথ্যা হয় তবে আমার মৃত্যু যেন কাফেরের মতো হয়। রাসূল (সাঃ) বলেছেন– রোজা রাখ, নামাজ পড়, যাকাত দাও, গরীবদের ভালোবাস। যে লোক এই পত্রটির ৩৫টি ছাপিয়ে বিতরণ করিবে ৫ দিনের মধ্যে তার ফল পাবে। এক লোক ৪০ খানা পত্র ছাপিয়া বিতরণ করেছেন তার ব্যবসায় ৮০ হাজার টাকা মুনাফা করেছেন। এক লোক

www.pathagar.com

এটা মিথ্যা ভেবেছে ফলে তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। অন্য একজন আজ নয়, কাল নয় করিতে করিতে আর ছাপানো হলো না। একদিন সে মারা গেলো। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমাকে স্বপ্নে বলেছেন, পৃথিবীর মানুষ যেন ভালোভাবে নামাজ আদায় করে।

অতএব, আপনাদের নিকট প্রার্থনা এই অছিয়তনামা ভুল বুঝবেন না। আল্লাহ্ ও নবীকে চিনেন এবং নিজের গুনাহ্ হালকা করেন। খোদার পথে চলার তৌফিক দান করুন। আপনার উপর দ্বীন ও দুনিয়ার শান্তি বর্ষিত হউক। কেউ ফেলে রাখবেন না। আলহামদুলিল্লাহ্।

ইসলামের শত্রুরা ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু মুসলমানদের ঈমান, আকিদা এবং জেহাদী চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য প্রতারণামূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো শয়তানের নিজস্ব স্টাইলে সরাসরি মুসলমানদের ইসলাম বিদ্বেষী হিসাবে গড়ে তোলা; অন্যটি হলো ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে অথবা ধার্মিকের ছদ্মাবরণে মুসলমানদেরকে ধর্মান্ধ ও বিভ্রান্তি করা।

এই প্রচারপত্রটিও ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়া ও বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বহুদিন যাবত আমাদের দেশে বিলি হয়ে আসছে। অনেকে প্রচারপত্রটির মিথ্যা প্রচারণায় বিশ্বাস করে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ এবং বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তা ছেপে বিলি করছে।

উল্লিখিত হ্যান্ডবিলটি যেমন ইসলামের মৌলিক কর্তব্য থেকে মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং ঈমান-আকিদা বিনষ্টের জন্যে কাজ করছে ঠিক তেমনি তাবলীগ জামাতও ধর্মের নামে ভনিতা করে ধর্মান্ধ করে মুসলমানদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হতে বঞ্চিত করছে। এছাড়া পবিত্র কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশিত সঠিক তাবলীগ হতে মুসলমানদেরকে পারতোপক্ষে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

তাবলীগের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অপরের কাছে কোনো কিছু পৌছানো বা প্রচার করা। বিদায় হজ্বের দিন উপস্থিত লাখো লাখো মুসলমানকে নির্দেশ প্রদান করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন– "উপস্থিত ব্যক্তিরা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে আমার রেসালতের বাণী পৌছে দিও।" হযরত (সাঃ) অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, "আমার একটি বাক্য হলেও তোমরা এর তাবলীগ বা প্রচার করো।" তাবলীগ মূলত নবুয়তি কাজ। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ ইসলামের দাওয়াত অমুসলিমদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানদেরকে জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন– "সামনে অন্যায় দেখলে হাত দিয়ে বাধা দাও, হাতে সক্ষম না হলে মুখে বাধা দাও, মুখে সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা কর। আর অন্তর দিয়ে ঘৃণা করাটা দুর্বলতম ঈমানের পরিচয়।" এ ছাড়াও নিজে এলেম শিক্ষা করা এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রাদি, অধীনস্থ লোক, পাড়া-প্রতিবেশী গ্রাম বা মহল্লাবাসীগণকে পর্যায়ক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ফরজ। আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ পবিত্র কোরআন হতে পাঠ করে শুনানো, জাহেরী, কু-স্বভাব,

www.pathagar.com

অহংকার, পরশ্রীকাতরতা থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি কাজগুলো প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানদের কর্তব্য এবং পবিত্র দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমান তাবলীগ জামাতের আদর্শ ও নীতি সম্পূর্ণ বিপরীত।

তাবলীগের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ তিনটি। একটি হলো- ইসলামের মৌলিক এবাদতগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা করা ও অজ্ঞ লোকদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া। এ কাজটি প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পারিবারিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন শেষে নিজ নিজ এলাকায় থেকেই করতে পারে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করা। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজটি রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীরা করলেও বর্তমানে তথাকথিত তাবলীগ ভক্তরা এ দায়িত্বটি মোটেই পালন করেন না। তাই এ তাবলীগওয়ালারা ধর্মনিরপেক্ষবাধীদের খুবই প্রিয়। তৃতীয়টি হচ্ছে অমুসলিমদের নিকট ইসলাম ধর্মের মহান বাণী পৌছিয়ে দেয়া। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত অমুসলিমদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সাহাবীরাও এ কাজ করেছেন। পরবর্তীতে অলীয়ে কামেলগণ এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কিন্তু বর্তমান তাবলীগীগণ অমুসলিমদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজটি মোটেই করছেন না। ইহুদী-খ্রীস্টানেরা সেবার নামে তাদের ধর্মীয় মতবাদ মুসলমানদের নিকট প্রচার করে ধর্মান্তরিত করছে। আর মুসলমানেরা তাবলীগের নামে দাওয়াতের কাজ শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছে। এছাড়া ইসলামের দাওয়াতের নামে মুসলমানদের অজান্তেই উল্টো আল্লাহ্‌র ও তাঁর সঠিক নির্দেশিত পথ থেকে দূরে সরিয়ে

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এটা কি মুসলমানদের প্রকৃত স্বরূপ? ধর্মের নামে সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়ে এ স্থান দখল করে নিচ্ছে ইহুদী-খ্রীষ্টান চক্রের পোষ্য মুসলিম নামধারী দালালেরা।

www.pathagar.com

দিচ্ছে। ধর্মীয় এবং জেহাদী চেতনাকে নিষ্ক্রিয় এবং ইসলামের মূল স্পিরিটকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

তাবলীগ ভক্তরা গ্রামে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে চিল্লার নামে বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করে। হিন্দু ধর্মে এই রীতির প্রচলন আছে। এভাবে তাবলীগের নামে হিন্দুদের মতো সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "নামাজ শেষ হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে ও আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।" অন্যত্র বলেছেন, "যে জাতি নিজ ভাগ্য পরিবর্তন ঘটায় না আমিও সেই জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাই না।" অথচ তাবলীগীরা আপন পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক দূরবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়ে দেশের প্রতিটি মসজিদে ভ্রমণে বের হয়। এ ছাড়াও স্ত্রী-পুত্র ঘর-সংসার ত্যাগ করে চিল্লায় যাওয়ার ফলে পরিবারের দায়িত্ব পালনের অবকাশ থাকে না। তাদের অনুপস্থিতিতে ছেলে-মেয়েরা অসৎ সঙ্গে মিলেমিশে চরিত্রভ্রষ্ট হয়। অনেক দরিদ্র পরিবার উপোষ থেকে ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে।

এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে এনজিওরা তাদের বিধ্বংসী কর্মকান্ড পরিচালনার প্রয়াস পায়। দারিদ্র্যতা মানুষের বড় অভিশাপ। রিজিক ও দারিদ্র্যের কাছে মানুষ ঈমানী পরীক্ষায় পরাজিত হন। কিন্তু নিজ থেকে দারিদ্র্যতা ডেকে এনে পরিবারের সদস্যদের পাপকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করা এবং বিধর্মীয়দের হাতে ধর্মান্তরিত হওয়ার মতো জঘন্য কাজগুলোর জন্যে তাদেরই দায়ী থাকতে হবে।

সারা বাংলাদেশে দৈনিক এক লাখ লোকও যদি চিল্লায় নেমে তাবলীগে ঘুরে বেড়ায় তাহলে দেখা যায়, তাদের দৈনিক উপার্জন ১০০ টাকা করে ধরা হলে প্রায় এক কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। এভাবে প্রতিনিয়ত তাবলীগের লোকেরা একদিকে নিজ পরিবারকে আর্থিক দুর্গতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে; অন্যদিকে কোটি কোটি টাকা আয় থেকে বঞ্চিত করছে দেশ ও জাতিকে।

তাবলীগের লোকেরা লঞ্চে, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, মাথায় ও কাঁধে হাড়ি-পাতিল ও বিছানাপত্রের বোঝা নিয়ে উদ্বাস্তুর মতো ঘুরে ইসলাম ও মুসলমান জাতিকে অন্যান্য জাতির কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে তুলে ধরছে। মুসলমানদের হৃদয়ে আল্লাহর পবিত্র কোরআন এবং রাসূলের আদর্শ এবং এক হাতে তলোয়ার অথবা চাবুক অন্য হাতে ফুল থাকার কথা ছিলো। কিন্তু এই তাবলীগীরা কাঁধে-হাতে হাড়ি-পাতিল, লোটা-কম্বল নিয়ে পথে প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে ইসলামের কোন কল্যাণ বয়ে আনছে না। উপরন্তু ইসলাম ধর্ম দেউলিয়াপনায় আক্রান্ত হচ্ছে। এই তাবলীগ জামাতে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করে দেশ ও জাতির সেবামূলক কাজ থেকে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে। মুসলিম জাহানে অনেক ত্যাগ তিতীক্ষা আর অপেক্ষার পর গাদ্দাফী, ইমাম খোমেনী, মাহাথির মোহাম্মদের ন্যায় নেতৃত্ব পেয়েছে। তাঁদের মতো যোগ্য ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব পরবর্তীতে যেন কোন মুসলিম দেশে বেরিয়ে আসতে না পারে তাবলীগ জামাত তারই একটি সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এই চক্রান্তের জাল ছিন্ন করা কি সম্ভব?

www.pathagar.com

ইমামের ছালাম ফেরাবার সাথে সাথেই তাবলীগীরা জরুরী এলান বলে ঘোষণা দেয়। জামাতের মাঝখানে অংশগ্রহণকারী মুসল্লীদের নামাজের বিঘ্ন ঘটায়। জামাত শেষে পরবর্তীতে যারা নামাজ আদায় করতে আসে তাবলীগীরা বয়ানের নামে তাদেরও ফরজ নামাজে বিঘ্ন ঘটায় এবং নিজেদেরকে পাপের ভাগী করে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মেয়ে মানুষ দিয়ে দেশ-বিদেশে কখনও তাবলীগ করাননি। অথচ আজকে মেয়ে মানুষকেও তাবলীগে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। প্রকারান্তরে রাসূল (সাঃ) এর নীতি ও আদর্শকেই অবমাননা করা হচ্ছে।

১২০ দিনে হয় এক চিল্লা। এ চিল্লা প্রথাও ইসলামে নেই। এই চিল্লার নামে তারা মসজিদে অবস্থান করে। আবু দাউদ কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত আছে– রোজা না রেখে কোন এত্তেকাফ হয় না। আর এত্তেকাফ ছাড়া মসজিদে খানা-পিনা, ভিজা-কাপড় মসজিদের ভিতরে শুকাতে দেয়া, ভাত-তরকারীর পাতিলের কালি এবং পায়খানার বদনা দ্বারা নোংরা করা প্রভৃতি বেদায়াতী কাজ। এতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়। এ ছাড়া মানুষ রক্ত-মাংসের গড়া। ১২০ দিন একবারও কেউ অপবিত্র হবে না এর কোন গ্যারান্টি দেয়া বোধহয় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন তাবলীগী সদস্যকে মসজিদ পরিষ্কার করতে দেখা যায়নি।

বর্তমান বিশ্বে বিভ্রান্ত মুসলমানদেরকে ইসলামের সঠিক পথ নির্দেশের জন্য তাবলীগ অপরিহার্য। কিন্তু পবিত্র কোরআন ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশিত পথ ও নীতির অনুসরণ না করার ফলে তাবলীগ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। তাবলীগের বদৌলতে কিছু মানুষ নামাজ পড়া ধরেছে; মসজিদে আসছে; সমাজের আংশিক উপকার হচ্ছে। কিন্তু সঠিক পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ বয়ে আনছে না। এর প্রধান কারণ বর্তমান তাবলীগ মাটির নিচের কথা বলছে; কিন্তু মাটির উপরের কথা বলছে না। অথচ আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সাঃ) মাটির নিচের কথা যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনি মাটির উপরের কথাও বলেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় বর্তমান তাবলীগ পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহের পরিপন্থী।

এক সময় তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন একজন লেখক তাঁর একটি গ্রন্থে বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগের কর্মকান্ডে সংশয় প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ

১। ঈমান একিন বৃদ্ধির জন্য আমি দেখেছি চিল্লায় গিয়ে কারও টাকা-পয়সা না থাকলে তাকে রোজা থাকতে বলা হয়। অতঃপর কয়েকদিন রোজা থাকার পর আমীর সাহেব তার চোখ এড়িয়ে তার বিছানার নিচে টাকা রেখে দেন। সে বেচারা বিছানা তুলতে গিয়ে টাকা পায়, আর বলা হয়– "আল্লাহর গায়েবী মদদে টাকা পেয়েছে"। আল্লাহর গায়েবী মদদ তো অবশ্যই আছে তাই বলে বালিশের নিচে টাকা রেখে সেটাকে গায়েবী মদদ বলে চালানো এটা কি শরীয়তে জায়েজ?

২। মরহুম ইলিয়াছ (রঃ)-এর লেখা মুলফুজাতে কি লেখা আছে তা পড়তে জোর তাকিদ দেয়া হয় না কেন?

৩। মরহুম শাহ সাহেব তৎকালীন সমাজের অবস্থা দেখে আপাততঃ জরুরী মনে

www.pathagar.com

করে যে ক'টা অসুলের উপর কাজ শুরু করেছিলেন সেই ক'টা অসুলই কি দ্বীন ইসলামের সবকিছু? আর তাই যদি সবকিছু হবে তবে নবী (সাঃ) তা কেন বলে গেলেন না?

৪। বয়ান করতে গিয়ে যা বলা হয়, তা কুরআনে বা হাদীসে আছে তা বলা হয় না, বলা হয় 'মুরব্বিরা বলেছেন'। এখন মুরুব্বিদের কথার দাম দেব বেশি না কুরআন হাদীসের কথার? ফজিলতের কেতাব যত বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়া হয় ততো গুরুত্ব দিয়ে হাদীস তাফসীর পড়তে কেন উদ্বুদ্ধ করা হয় না? ৬ অসুলের এক অসুলে এলেমের কথা বলা হয় অথচ এলেম অর্জনের জন্য ফজিলত ও দোয়ার কেতাব ছাড়া হাদীস তাফসীর পড়তে বলা হয় না কেন?

৫। তাবলীগে রাজনীতিকে খারাপ মনে করা হয়। ভোটে অংশগ্রহণ না করে প্রমাণ করা হয়; তাবলীগওয়ালারা রাজনীতির মধ্যে নেই। যদি সত্যই রাজনীতি ইসলাম হারাম করে থাকে তবে কুরআন হাদীসের দলিল দিয়ে ফতোয়া দেয়া উচিত যেন কোন মুসলমানই রাজনীতি না করে। কারণ যা হারাম তা কেউই করবে না। কিন্তু এতেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, আমরা সবাই যদি তাবলীগ করি তাহলে রাষ্ট্র চলবে কোন মেশিনে? না কি আমরা বলতে চাই যে আমাদের কিছু মুসলমানকে ছেড়ে দাও আমরা তাবলীগ করে বেহেশতে যাই আর কিছু তোমরা থেকে যাও দুনিয়ার রাজনীতি কর, পরে পরকালে দোজখে যেও।

৬। আমরা নামাজের মধ্যে বলি "নাখলাও ওয়া নাতরুকু মাইইয়াফজুরুকা"। যারা ফাজের তাদের সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ত্যাগ করেছি। কিন্তু কেন? বাস্তবে তো তা ত্যাগ করিনি। তাদেরই সঙ্গে ওঠা-বসা, তাদেরই অধীনে চাকরি, তাদেরই তৈরী আইনের অধীনে বসবাস, তাদেরই সুদওয়ালা ব্যাংকের সঙ্গে কারবার, সেই ব্যাংকে চাকরি এর কোনটাই কি গোনাহের কাজ নয়? কিন্তু সেসব সম্পর্কে কিছুই তো বলতে শুনি না। এতে 'নাখলাও ওয়ানাতরুকু" বলে যা আল্লাহর নিকট অঙ্গিকার করি, বাস্তবে করি তার উল্টো। এতে কি মুনাফেকী হয় না?

৭। বর্তমানে আল্লাহর নবীও বেঁচে নেই মরহুম শাহ সাহেবও বেঁচে নেই। আর আমাদের সামনে রাসূলের রেখে যাওয়া নীতিও রয়েছে যা আছে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে আর মরহুম শাহ সাহেবের রেখে যাওয়া আদর্শও রয়েছে যা পাই তাঁর মালফুজাতের মধ্যে। এখন কোনটার অনুসারী হওয়া উচিত। যা রাসূল রেখে গেছেন সেইটার? না কি যা শাহ সাহেব রেখে গেছেন ঐটার?

৮। গাস্তে বা চিল্লায় যে পরিমাণ সওয়াব হয় সে পরিমাণ তো নয়ই, বরং তার কাছাকাছি সওয়াব মাদ্রাসায় পড়লে ও পড়ালে হয় না (তাবলীগের বর্ণনা মোতাবেক)। তাহলে কি সব ছেড়ে দিয়ে যেটায় বেশি সওয়াব সেটায় লেগে যাব? গাস্ত ও চিল্লার যে সওয়াব ফজিলতের কথা বয়ান করা হয়, তা পাওয়া

www.pathagar.com

গেছে কোন কিতাবে? মুরুব্বিদের কাছ থেকে না কুরআন হাদীস থেকে? আমি এমনও বলতে শুনেছি, "ফজিলতের দোয়া এতোদিন বাংলাদেশে আসেনি। তাবলীগের মুরুব্বিগণ এসব দোয়ার কেতাব এনেছেন, এর পূর্বে এসব কেউ জানাতো না" এ বুঝ কি করে সৃষ্টি হলো?

৯। মুস্তাহাব কাজের বা ফজিলতের কথা বলা হয়, আল্লাহ তো অবশ্যই তার চেয়ে বেশি সওয়াব দিতে পারেন। তাঁর প্রতি অটল ঈমান আমার আছে কিন্তু গোনাহের আগুনে যে সব সওয়াবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তা তো তেমন জোর দিয়ে বলতে শুনি না। উদ্দেশ্য কি এই যে, সওয়াবের কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেলে গোনাহ করা আপনা থেকেই ছেড়ে দেবে? রাসূল পাক (সাঃ)-এর জীবনী থেকে দেখা যায় তিনি পূর্বে অন্যায় অপকর্ম থেকে সমাজের লোকদেরকে ফিরানোর চেষ্টা করেছেন এবং সমাজ থেকে সব রকমের পাপকে নির্মূল করার কাজে প্রথমে হাত দিয়েছিলেন।

১০। তাদের ইজতেমা কোনো বছরেই শুক্রবারে শুরু হয় না। ইহুদীদের সাপ্তাহিক শুভদিন ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন অর্থাৎ শনিবার দিন শুরু হয়। ৩ দিনব্যাপী ইজতেমায় সোমবার হয় আখেরী মোনাজাত। কিন্তু শনিবার কেনো শুরু হয় এর রহস্য অনেকের কাছে অজ্ঞাত।

১১। ইজতেমা শুরু থেকেই কয়েক কোটি টাকা মূল্যের বিরাট মাঠটি ইহুদী প্রতিষ্ঠান বাটা কোম্পানী দিয়েছে। অথচ অন্য কোনো ইসলামী অনুষ্ঠানে এই স্থানটি ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে ইসলামের শত্রু ইহুদীদের এই পৃষ্ঠপোষকতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি?

১২। ইজতেমায় প্যান্ডল বাবদ প্রতিবছর লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু উদ্যোক্তারা চাঁদা আদায় করে না। তাহলে এ টাকা কোন্ উৎস থেকে ব্যয় হয়।

১৩। তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হয় না। কারণ এই টাকা প্রাপ্তির উৎস অজ্ঞাত।

১৪। অন্যদের বিদেশ যেতে ভিসা পেতে যথেষ্ট হয়রানি হতে হয়। অথচ তাবলীগের লোকদের ভিসা পেতে কোনো হয়রানির শিকার হতে হয় না, সহজেই মিলে যায়। এর কারণ কি?

এ ধরনের বহু প্রশ্ন তাদের সম্পর্কে জনমনে রয়েছে। এছাড়া শোনা যায়, তাবলীগের বই ছাড়া অন্যান্য ইসলাম বিষয়ক বই পড়তে নাকি তাদের মুরুব্বীরা নিষেধ করছেন।

আমাদের সাধারণ জ্ঞানেও দেখি পূর্বে ঘাস পরিষ্কার না করলে সে জমিতে ধান বোনা যায় না। জমি পরিষ্কার করার পরই ধান বোনা হয় এবং পরে সর্বক্ষণই লক্ষ্য রাখতে হয় যেন ঘাসে জমি নষ্ট না করে। তবেই তাতে ধান হয়। ঘাস মারার পূর্বে কবে

www.pathagar.com

কার জমিতে ধান হয়েছিল? রোগ হলে প্রথমে কুপথ্য বন্ধ করা প্রয়োজন। তারপর ওষুধে কাজ করবে। কুপথ্য চালু রেখে ওষুধে কার কবে রোগ মুক্তি হয়েছিল? তা হয়নি। তেমনি মুসলমানদের মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কাজ চালু থাকবে, আর তা চালু থাকবে দেশের সর্বত্র মানুষের ব্যক্তি জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, ব্যবসা বাণিজ্যে, অফিস আদালতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে– আর তা যেমন আছে তেমনই থাকবে, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করবো না কারণ তাতে মার খাওয়ার ভয় আছে, যেমন মার আল্লাহর নবী খেয়েছিলেন। কাজেই সে সব বিষয়ে কিছুই বলবো না, মানুষকে ডাকবো শুধু সস্তা সওয়াবের নামে, পরে ওগুলো আপছে উঠে যাবে এ নীতি কি রাসূলের কাজে সংশোধনী নয়?

তাবলীগীরা পবিত্র কোরআন এবং হাদীস পাঠের চেয়ে বেশি পড়ে 'ফাজায়েলে আমল' নামক গ্রন্থখানা। যখনই সুযোগ পায় এরা এই গ্রন্থটি পড়ে এবং লোককে শোনায়। অথচ পবিত্র কোরআনের তাফসিরসহ আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অপরকে অবগত করাই হচ্ছে তাবলীগের মূল শিক্ষা। এরা পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ কোন মুসল্লীদেরকে শোনায় না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে বর্তমান তাবলীগী জামাতের আমিরের আসন এমন অযোগ্য লোককেও গ্রহণ করতে দেখা যায় তিনি নবুয়াতী কাজের ফরজ হাছেল করা দূরে থাক বরং একটিও পূর্ণভাবে হাছিল করতে পারেনি। এর ফল এই হয় যে, তারা নিজেরা মনগড়াভাবে এমন সব মছলা বর্ণনা করে লোককে পথভ্রষ্ট করে, যা কোরআন, হাদীস, এজমা ও কেয়াছের কিতাবের কোথাও নেই। তাবলিগী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মৌলভী ইলিয়াস সাহেব মাঝে মাঝে এরূপ বানোয়াট মনগড়া মছলা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ব্যারিস্টার ডক্টর ছানাউল্লাহ সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের মালফুজাতের ১৭৫ পৃষ্ঠার ২০৯ নং বাণীতে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব বলেন : "দীনের দাওয়াতের কাজ আমার নিকট এতো জরুরী যে একজন লোক নামাজে মশগুল আছে আর একজন নতুন লোক এসে চলে যেতে চায় ও তাকে পুনরায় পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে আমার মতে মধ্যখানে নামাজ ভঙ্গ করে তার সাথে দ্বীনি কথা বলা চাই ও তার সাথে কথা শেষ হলে অথবা তাকে বসিয়ে নিজের নামাজ পুনরায় পড়া চাই।" (মলফুজাৎ ১৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রতিবছর টঙ্গীতে তাবলীগ জামাতের বিশ্ব এজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এজতেমায় লাখ লাখ মুসলমান যোগ দেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এজতেমাকে অনেকে হজ্বের সাথে তুলনা করার দৃষ্টতা দেখাতে সাহস পাচ্ছে। অনেকে আবার বলে থাকে– "হজ্বে তো যেতে পারবো না, বাড়ীর পাশের হজ্বটা অন্ততঃ করে আসি।" কিন্তু এজতেমাকে কোনভাবেই হজ্বের সাথে তুলনা করা চলে না। হজ্ব ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। হজ্ব একটি ফরজ এবাদত। এই ফরজ শুধু সামর্থবান মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত। পক্ষান্তরে এজতেমা একটি মনগড়া বিষয়। কিন্তু এই এজতেমাকে ঘিরেও অনেক রহস্যের উদ্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

হজ্ব বিত্তবান মুসলমানদের জন্য ফরজ। অর্থনৈতিক কারণে অধিকাংশ মুসলমানের পক্ষে হজ্ব পালন করার সৌভাগ্য হয় না। একটি ফরজ এবাদত পালনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। কিন্তু তাবলীগ এর অর্থের উৎস সম্পর্কে তাবলীগওয়ালারা বলে থাকেন– তাবলীগে গেলে আল্লাহর কুদরতের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ হয়ে যায়। আল্লাহর কুদরতের সাহায্যেই সমস্ত অর্থের আয়োজন হয়। কিন্তু অর্থ উপার্জনের জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম ও অছিলা বা মাধ্যম। হজ্ব ফরজ এবাদত। সামগ্রিকভাবে এ ফরজ এবাদত সম্পন্ন করার জন্য যে বিশাল অর্থের প্রয়োজন হয় সে অর্থ সংগ্রহের উৎস বা মাধ্যম সবাই জ্ঞাত। সৌদি সরকার প্রতি বছর হজ্ব আয়োজনের বিরাট খরচ বহন করে থাকে কিন্তু টঙ্গীতে প্রতিবছর বিশ্ব ইজতেমা আয়োজনের যে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয় এর খরচ বহন করে কে? হজ্বের খরচ বিশ্ববাসী জানলেও এজতেমার খরচ কোথেকে আসে বিশ্ববাসী জানে না।

মিডিয়াগুলোতে প্রচারিত হয়ে থাকে এ বিরাট আয়োজনের খরচ যোগান দেয় শিল্পপতিরা। এছাড়া স্বেচ্ছায় শ্রম দেয় তাবলীগ ভক্তরা। স্বেচ্ছায় শ্রম দেয় না হয় মানলাম কিন্তু যে সব শিল্পপতিরা অর্থ যোগান দেয় এরা কারা? অর্থের অভাবে অনেক মুসলমান ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করতে পারে না। এদেরকে তো শিল্পপতিরা (তবে সবাই নয়) অর্থ দিয়ে হজ্ব করার সুযোগ দেয় না। এছাড়া আমাদের দেশের শিল্পপতিরা যা দান করে এর দশ গুণ প্রচার করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থের যোগানদান শিল্পপতিরা প্রচার বিমুখ এটা রহস্যজনক নয় কি? শোনা যায় টঙ্গীর ইজতেমার বিরাট আয়োজনের সিংহ ভাগ অর্থ বাটা নামক ইহুদী কোম্পানী যোগান দিয়ে থাকে। জানিনা এ তথ্য কতটুকু সত্য। যদি এ তথ্য সত্য হয়ে থাকে তবে বিশ্ব ইজতেমায় তাদের বিরাট অংশের অর্থ যোগানের উদ্দেশ্য কি?

বেশ কয়েক বছর আগে সুপ্রীম কোর্টের একজন প্রখ্যাত আইনজীবী ও সাবেক মন্ত্রীর সাথে তাবলীগ বিষয়ে আলাপ হয়। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আমলা বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত হয়ে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বেশ কিছুদিন পর ভদ্রলোক তাবলীগ জামাতের খপ্পরে পড়ে। তাঁকে স্থানীয় তাবলীগ জামাতের আমীর করা হয়। আমীর হয়ে ভদ্রলোক সমাজ সেবা বাদ দিয়ে বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ করে এবং জামাত নিয়ে এলাকায় এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। যেহেতু তিনি উচ্চ পদস্থ আমলা ছিলেন। সেহেতু কিছুদিন পর তাঁর বিদেশ যাবার সুযোগ হয়। বিদেশ যাবার পূর্বে একদিন আইনজীবী সাহেবের কাছে আমলা ভদ্রলোক দেখা করতে আসে। আইনজীবী সাহেব বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে– তুমি যে বিদেশে যাচ্ছ এর খরচ বহন করছে কে? ভদ্রলোক বললেন আমি জানি না। তবে বলেছে এয়ারপোর্টে টিকেট ও ভিসা পেয়ে যাবেন। ভ্রমণকারীও জানে না তার টিকেটের অর্থ যুগিয়েছে কে?

ইসলামের শত্রুরা নানাভাবে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার নানা কৌশল অবলম্বন করে যাচ্ছে। মুসলমান এবং তাদের ধর্ম ইসলাম এদের নিকট অসহ্য। তাই প্রতিনিয়ত এরা ইসলামের বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত করছে এবং মুসলমানেরা এ চক্রান্তের ফাঁদে

www.pathagar.com

মনের অজান্তে হলেও পা দিচ্ছে।

আমার পরিচিত এক মহিলা আইনজীবী বেশ কয়েক বছর লন্ডনে ছিলেন। তিনি লন্ডন থেকে ফিরে এসে একখানা বই লিখেন। তিনি এই বইয়ে স্মৃতিচারণে এক জায়গায় লিখেছেন–

বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় কালে-ভদ্রে বাংলাদেশের ছোট্ট দু'একটি খবর ছাপা হয়। তা বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় অথবা বন্যা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর কর্মকান্ড, বর্মী শরণার্থীদের বিদ্রোহ ইত্যাদি। গার্ডিয়ান, ইনডিপেন্ডেন্ট, সানডে টাইমস্ এইসব কাগজে বাংলাদেশের খুব সংক্ষিপ্ত খবর পাওয়া যায়। তবে বিশ্ব ইজতেমার খবর বেশ ভালভাবে প্রচারিত হয়। পত্র-পত্রিকা ছাড়াও টেলিভিশনে ইজতেমা শুরু ও শেষ দেখায়। মাঝে মাঝে ডকুমেন্টারী ফিল্ম হিসেবে বিবিসি'র অনুষ্ঠানে বিশ্ব ইজতেমা স্থান পায়। ট্রাকের মাথায়, বাসে, ট্রেনে মুসল্লীরা ঝুলে ঝুলে ইজতেমায় শরীক হচ্ছেন এ দৃশ্য আমরা লন্ডনে বসে দেখেছি।

ইসলামের শত্রুদের প্রধান ঘাটি হচ্ছে এই লন্ডন শহর। এই শহরটি ইসলামের বিরুদ্ধে সমস্ত ক্রোধের সূতিকাগার। সেই লন্ডনের পত্র-পত্রিকায় বিশ্ব ইজতেমার খবর বেশ ফলাও করে প্রচার করার হেতু কি? হেতু আছে। '৯৫-এর বিশ্ব ইজতেমায় বিশ্ব তাবলীগ জামাতের আমীরের বয়ান সচেতন মুসলমানদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

বিশ্ব তাবলীগ জামাতের আমীর মাওলানা এনামুল হাসান হযরতজী (রঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে বসবাসের জন্য আমাদের ৫টি আস্‌লী জরুরত বা মৌলিক চাহিদা রয়েছে। এ চাহিদাগুলো পূরণ করতে হবে আল্লাহ্‌পাকের হুকুম মোতাবেক। ৫টি জরুরত পূরণে আমরা যত সহজ ও সাধাসিধা ব্যবস্থা নিতে পারব ততই আমাদের জন্য শরীয়তের উপর চলা সহজ হবে। তাঁর ভাষায় ৫টি জরুরত (চাহিদা) হচ্ছে খানাপিনার জরুরত, পরিধানের জন্য কাপড়ের জরুরত, থাকার জন্য ঘরের, সফরের জন্য সওয়ারীর (বাহনের) এবং বিবাহ-শাদীর। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে মানব ও জ্বীন জাতিকে পবিত্র কোরআন এবং রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। রাসূল অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। তিনি দীর্ঘ দশটি বছর রাজনীতি করেছেন। তিনি ছিলেন সফল রাষ্ট্রনায়ক, সেনানায়ক, সমাজ সংস্কারক। আল্লাহ ও তাঁর রসূল শিক্ষার জন্য অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই হযরত(?) কোথায় পেলেন মুসলমানদের জন্য শুধু খাওয়া-পড়া, বসতবাড়ী, বিয়ে-শাদীর মধ্যেই জীবনচর্চায় আসলী জরুরত। তাবলীগরা বলে নামাজ পড়ে তাবলীগে বেরিয়ে পড়। আল্লাহ খাবার ঘরে পৌঁছিয়ে দিবেন। যেখানে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন– নামাজ শেষে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তিনি আরো বলেছেন– যে জাতি নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করে না আমিও সে জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাই না। সুতরাং চিল্লার নামে দেশে দেশে ঘুরলে খাদ্য, বস্ত্রসহ পাঁচটি জরুরত মিটবে কিভাবে? মুসলমানদের জন্য যেমন ঐ পাঁচটি বিষয় জরুরী; ঠিক তেমনি তার অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে শিক্ষা, নেতৃত্ব ও জেহাদও জরুরী বিষয়।

www.pathagar.com

আজকে বসনিয়ায়, চেচনিয়ায়, কাশ্মীরের মুসলমানেরা বিধর্মীর হাতে মার খাচ্ছে। এ নিয়ে তাবলীগীদের কোন মাথাব্যথা নেই। এরা শুধু দোয়া খায়ের করেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। দোয়ার মাধ্যমেই যদি সব সমস্যার সমাধান হতো তাহলে আল্লাহ মুসলমানদেরকে জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন কেন? দোয়ার মাধ্যমেই যদি সব সমস্যার সমাধান হতো; তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দোয়ার মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান করেননি কেন? তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দোয়াকারী আর কে আছে? অথচ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দীর্ঘ তেইশ বছর ছোট-খাটো যুদ্ধ মিলিয়ে প্রায় ২৭টি মতান্তরে ১৯টি যুদ্ধ করেছেন। মুহম্মদ ইবনে কাশিম যুদ্ধ করেছেন অত্যাচারী দাহিরের বিরুদ্ধে। ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজী যুদ্ধ করেছেন লক্ষণ সেনের বিরুদ্ধে। হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া যুদ্ধ করেছেন রাজা পৃথ্বিরাজের বিরুদ্ধে; হযরত শাহজালাল যুদ্ধ করেছেন গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে। দোয়ার মাধ্যমেই যদি সব সমস্যা মিটে যেত; পৌত্তলিকতার বিনাশ হতো; সমাজে ইনসাফ কায়েম হতো তাহলে তাঁরা এদেশে এসে হুজরাখানায় বসেই দোয়া করতেন। অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না।

এছাড়া আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে মুসলমানদেরকে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ আল্লাহর নির্দেশিত রুটিনকে উপেক্ষা করে তাবলীগীরা তাদের মনগড়া রুটিন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে প্রচার করে তাদের বিভ্রান্ত করছে। ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নক এনামুল হাসান গংরা কোথায় পেলেন এ তথ্য যে, ইসলামে শুধু খাওয়া, পড়া, থাকা, বাহন ও বিয়ে এই পাঁচ বিষয় জরুরী। পবিত্র কোরআন ও রাসূলের আদর্শে কি তা বলে? এদের কারণেই পৃথিবীতে মুসলমানেরা আজ বিধর্মীদের হাতে নির্যাতিত, নিপীড়িত হচ্ছে। ভিক্ষার থালা নিয়ে মুসলমানেরা আজ বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। অথচ পবিত্র কোরআন এবং রাসূলের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানেরা এই পৃথিবীকে প্রায় আটশ' বছর শাসন করেছে। এসব এনামুল হাসানদের নিয়ে পাশ্চাত্যের কোন মাথাব্যথা নেই। এদের মাথাব্যথা বসনিয়া, মালয়েশিয়া, আলজেরিয়া, কাশ্মীর, চেচনিয়া, ইরান, ইরাক ও লিবিয়ার মুসলমানদেরকে নিয়ে।

লাখ লাখ মুসলমান কিছু কিছু ভালো কথার সাথে এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্য শোনার জন্যে প্রতিবছর বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণ করছে। যারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর আইন এবং রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়নে বিরোধিতা করছে তারাও বিশ্ব ইজতেমায় শরীক হচ্ছে অশেষ ছওয়াবের আশায়? আর যেসব আন্তর্জাতিক চক্রের ইসলামের নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসে, মৌলবাদ, মৌলবাদ বলে চিৎকার করে তারাই আবার তাবলীগের অনুষ্ঠানগুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচার করে। ব্যাপারটি রহস্যজনকই বটে।

এই তাবলীগ সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের ৩১/১২/৯৬ সংখ্যায় উপসম্পাকীয় কলামে 'পথচারী' লিখেছেন ঃ

....মুসলমানদের অনেকে আল্লাহতায়ালার ইবাদত করেন ঠিকই কিন্তু হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক আদায় করেন না তাদের অনেকেই। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট মানব

www.pathagar.com

সমাজের কল্যাণের কাজ কম করেন তাঁরা। বলতে গেলে মুসলমানদের জন্য এটা খুবই লজ্জার বিষয়। ইসলাম ধর্ম তাবৎ মানুষের কল্যাণের জন্য হলেও মুসলমানদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই ক্ষুধার্থের দরজায় খাদ্য, রুগ্নের দরজায় ঔষধ ও চিকিৎসা ও বস্ত্রহীনের দরজায় বস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। অথচ এ কাজটি এখন খৃষ্টানেরা বেশি করে। সারা দুনিয়া ঘুরে ঘুরে করে। আর মুসলমানেরা কম করে বলেই দুনিয়ায় এখন মুসলমানদের মধ্যে হতদরিদ্র বেশি। রোগে শোকে, বাসস্থানের অভাবে তারাই বেশি কাতর। শিক্ষায়-দীক্ষায় তারাই পিছিয়ে। পাশ্চাত্যের খৃষ্টানদের দান ছাড়া তাদের এখন চলে না। অপরদিকে তেলের খনি রয়েছে মুসলমানদের হাতে। এই বাংলাদেশের দরিদ্র মুসলমান, হিন্দু ও উপজাতির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় খৃষ্টান পাদ্রী, এনজিও এবং রামকৃষ্ণ মঠের গেরুয়াপরা ব্রহ্মচারিরা। কিন্তু সেবা, সাহায্য ও মানবতার বাণী ও আল্লাহর দাওয়াত নিয়ে যায় না ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা। এমন কি এই তাবলীগ জামায়াতের অনুসারীরা মুসলমানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যায়। কিন্তু যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত বা কালেমা নামাজ পৌঁছেনি তাদের কাছে এ দাওয়াত নিয়ে তাঁরা যায় না। তাবলীগ জামায়াতে এ এক বৈপরীত্য। বিশ্ব ইজতেমায় বান্দার হকের যে কথা বলা হয় অনুসারীদের কাজে তা লক্ষ্য করা যায় না। তারা যেন পরকালের ফায়দা আদায়ে বেশি আগ্রহী। অথচ বান্দার হক বা মানব কল্যাণ সাধনও আল্লাহর ইবাদত। পরকালের ফায়দা আদায়ের এও এক বড় পথ। বড় কর্তব্য।

.... ইজতেমায় যে লাখ লাখ লোক আসেন তাঁরা প্রত্যেকে এক টাকা করে দিলে যে অর্থ পাওয়া যাবে তেমন দু'তিন বছরের অর্থে টঙ্গীতে ইজতেমার যাবতীয় ব্যবস্থা মিটানো সম্ভব। আর প্রতি বছর প্রত্যেকে এক টাকা করে দিলে বাংলাদেশ কেনো, বহু দেশের মানুষের জন্য বহু কল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব। এসব করণীয় কাজের নির্দেশ ইসলামের বিধানেই রয়েছে। প্রতিটি মুসলমান রোজার ফেতরা ও জাকাত ঠিকমতো দিলে সে টাকায় দুনিয়ার সকল দরিদ্র মুসলমানকে দারিদ্রমুক্ত করে স্বাবলম্বী করা যায়। বাংলাদেশের দশ কোটি মুসলমানের অর্থে এ দেশের দারিদ্রমুক্তি ঘটতে পারে। দুঃখজনক যারা ধর্মপ্রাণ বলে পরিচিত তারাও সঠিকভাবে জাকাত আদায় করেন না। সে জন্য ইসলামে মানব কল্যাণের যে বিধান রয়েছে মুসলমানেরা কিংবা ধর্মপ্রাণ মুসলমান পীর-মাসায়েখ, আলেমরা পালন করলে দেশে দেশে মানুষের মানসিক, আত্মিক, আচরণগত সব ধরনের উন্নতি ঘটতে পারে। তাই আমাদের শুধু মুখে নয়, মননে ও কর্তব্য-কর্মে ইসলাম পালন করা কর্তব্য। এটা হলেই তাবলীগ বা ইসলামের দাওয়াত যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে পারে। দরিদ্র মানুষেরা মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১/১২/৯৬)

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। এছাড়া এদেশের মুসলমানেরা ধর্মভীরুও বটে। বিশ্ব এজতেমায় লাখ লাখ লোকের উপস্থিতিই প্রমাণ করে এদেশের মুসলমানেরা ধর্মভীরু। সুতরাং দিল্লীর সৃষ্ট পবিত্র কোরআন ও রাসূলের আদর্শের পরিপন্থী এই তাবলীগ জামাত বেছে নিয়েছে বাংলাদেশের টঙ্গীকে। টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত এই বিশ্ব

www.pathagar.com

এজতেমায় লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান যোগ দেন পরকালের কল্যাণের আশায়। এদের নিয়তে ও ঈমানে কোন ভেজাল নেই। ভেজাল রয়েছে পর্দার অন্তরালে থেকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে যারা এই বিশ্ব ইজতেমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের মধ্যে। এরা চায় বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ যাতে শক্তিশালী হতে না পারে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাতে মুসলমানেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। এরা চায় মুসলমান জাতি চিরদিন ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হয়ে বিধর্মীয়দের পায়ের তলায় পড়ে থাকুক। এরা চায় না বিশ্বের নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে ফিরে আসুক। ধর্মের ছদ্মাবরণে ইসলামকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে ইসলামের মূল স্পিরিটকে ধ্বংস এবং সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে নিষ্ক্রিয় করাই এই তাবলীগ জামাত বা বিশ্ব ইজতেমার মূল লক্ষ্য। আজকে যদি এই বিশ্ব এজতেমার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও রাসূলের (সাঃ)-এর নির্দেশিত পন্থায় মুসলমানদের ঈমানী চেতনাকে জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করা যেত তাহলে বিশ্বের বাতিল শক্তি বহু পূর্বেই ফুৎকারে উড়ে যেত। এখনো যদি এদেশের মুসলমানেরা দেশী ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বেড়াজালকে ছিন্ন করে পবিত্র কোরআন ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশিত তাবলীগের মাধ্যমে ইসলামের মহান আদর্শে উজ্জীবিত করা যায় তাহলে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব গড়ে উঠবে এ বাংলাদেশ থেকেই ইনশাআল্লাহ।

কাদিয়ানী ফিৎনা

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, ১৮৬৯ সালে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি বৃটিশ প্রতিনিধি দল ভারতে আসে এবং এই দলের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বৃটিশ কর্মকর্তাগণ নবী সৃষ্টির প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং মির্জা গোলাম কাদিয়ানীকে নির্বাচিত করে। তখন থেকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় চলতে থাকে। সুতরাং কাদিয়ানী নামের নতুন ধর্মমতটির প্রথম সূচনা হয়েছে তদানীন্তন বৃটিশ-ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বাইরে এরা বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায় বৃটিশ উপনিবেশেরই কয়েকটি দেশে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের খৃস্টান শাসিত এলাকাগুলো এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এদের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে এদের অস্তিত্ব নেই। বাইরে থেকে এই ঘৃণ্য আপদ যাতে তাদের দেশে অনুপ্রবিষ্ট হতে না পারে সে কারণে মুসলমান শাসিত দেশগুলোতে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম এবং ইসলাম বিরোধী একটি বৈরী শক্তিরূপে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এ কাদিয়ানীরা মুসলমান নামধারী মোনাফেকদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থায়ী আসন গেড়েছে।

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নিম্নোক্ত দাবীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

১. সত্যি খোদা তিনিই যিনি কাদিয়ানে তার রাসূল পাঠিয়েছেন। (দাফেউল বালা, পৃঃ ১১, ৩য় সংস্করণ ১৯৪৬)

২. আমি রাসূল এবং নবী। অর্থাৎ পূর্ণ ছায়ারূপে। আমি ঐ আয়না যাতে মুহাম্মদী আকৃতি এবং মুহাম্মদী নবুওয়তের পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে। (নযুলে মসীহ, পৃঃ ৩, ১ম সংস্করণ ১৯০৯)

www.pathagar.com

৩. আমি ঐ খোদার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আমার নাম 'নবী' রেখেছেন। (ততিম্ম হাক্বীকাতুল ওহী, পৃঃ ৬৮, ১৯৩৪)

৪. আমি যখন এ সময় পর্যন্ত দেড় শ'য়ের কাছাকাছি ভবিষ্যৎবাণী খোদার নিকট থেকে লাভ করে নিজে প্রত্যক্ষ করেছি যে, এগুলো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে তখন আমি নিজ সম্পর্কে নবী বা রাসূল হওয়া কিভাবে অস্বীকার করতে পারি? আর যখন স্বয়ং খোদা তা'আলা আমার নাম রেখেছেন নবী তখন আমি কি করে তা প্রত্যাখ্যান করব এবং তাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবো? (এক গলতী কা এযালাহ্, পৃঃ ৮, ১৯০১ সাল)

৫. আল্লাহ তায়ালার মাঝে সকল নবীকে প্রকাশ করেছেন এবং সকল নবীর নাম আমার দিকেই সম্পর্কিত করেছেন। আমিই আদম, আমিই শীছ, আমিই নূহ, আমিই ইব্রাহীম, আমিই ইসহাক, আমিই ইসমাঈল, আমিই ইয়াকুব, আমিই ইউসুফ, আমিই ঈসা, আমিই মূসা, আমিই দাউদ, আর মুহাম্মদ (সাঃ) এর নামের পূর্ণ প্রকাশ অর্থাৎ ছায়ারূপে আমি মুহাম্মদ ও আহমদ। (হাক্বীকাতুল ওহী, টীকা, পৃঃ ৭২, প্রকাশ ১৯৩৪)

৬. ক'দিন হলো আমার এক অনুসারীকে বিপক্ষ দলের এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো যে, তোমরা যার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছ সে নিজেকে নবী এবং রাসূল বলে দাবী করে। এর জবাব নেতিবাচক শব্দের দ্বারা প্রদান করা হয়েছে (অর্থাৎ আমার অনুসারী তার জবাবে না বলেছে)। অথচ এ উত্তর মোটেই ঠিক নয়। সত্য কথা তো এই যে, খোদা তাআলার পবিত্র ওহী যা আমার নিকট নাজিল করা হয়েছে তার মাঝে রাসূল, মুরসাল ও নবী এই ধরনের শব্দ রয়েছে। একবার, দু'বার নয় বরং শত শত বার। তাহলে এ (নেতিবাচক) উত্তর কি করে শুদ্ধ ও সঠিক হতে পারে? (এক গলতী কা এযালাহ্, পৃঃ ১, প্রকাশ ১৯০২ ও ১৯৩৪)

৭. আমার দাবী হচ্ছে এই যে, আমি রাসূল এবং নবী। (এহাকী কাতুন নবুওয়ত মির্জা বসীর উদ্দীন মাহমুদ প্রণীত ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭২)

৮. নবী যদিও অনেক এসেছেন, কিন্তু আমি মারেফতে কারো চাইতে কম নই। (নুযুলে মসীহ, পৃঃ ৯৭, ১ম মুদ্রণ, প্রকাশ ১৯০৯)

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উপরোক্ত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রচারিত ধর্মমত সম্পূর্ণ অনৈসলামিক এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তারা গোলাম আহমদের প্রতিটি শিক্ষা ও হুকুমকে 'অবশ্য পালনীয়' হিসাবে মেনে চলে, তা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তের বিপরীত ও বিরোধী হলেও। যেমন, মীর্জা গোলাম আহমদ 'আরবাঈন' নামক পুস্তকের ৪র্থ খন্ডের ১৪ পৃষ্ঠায় টীকাতে লিখছে "জিহাদ অর্থাৎ ধর্মীয় লড়াইয়ের তীব্রতা ক্রমে ক্রমেই খোদা তাআলা কমিয়ে এনেছেন। মূসা (আঃ) এর যুগে জিহাদের তীব্রতা এতোই ছিলো যে, ঈমান আনা নিহত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারতো

www.pathagar.com

না। দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও হত্যা করা হতো। পরবর্তীতে আমাদের নবী (সাঃ) এর যুগে শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের হত্যা করা হারাম করে দেয়া হয়েছে। আর কোন কোন জাতির জন্যে ঈমানের পরিবর্তে শুধু জিযয়া প্রদান করে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার ব্যবস্থা মেনে নেয়া হয়েছে। এখন মসীহ্ মাওউদ-এর সময় সম্পূর্ণভাবে জিহাদের হুকুম স্থগিত করে দেয়া হয়েছে।" (আরবাঈন ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৫, প্রথম প্রকাশ ১৯১০)।

অথচ নবী করীম (সাঃ) এর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য ঘোষণা রয়েছে যে, "জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে" আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীরা নবী করীম (সাঃ) এর এই সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য আদেশকে বর্জন করে গোলাম আহমদের আদেশের অনুসরণ করে। (তথ্য সূত্র ঃ মাসিক মদীনা, ফেব্রুয়ারী '৯৪)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে যেভাবে ইচ্ছা ডাকতে পারে বা পূজা অর্চনা অথবা ধর্মীয় কাজ করতে পারে। কিন্তু মুসলমান ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী কোন এবাদত বন্দেগী বা আচার-আচরণ করতে পারে না।

এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ওফাতের পর বহু ভন্ড প্রতারক নবুয়তের দাবী করেছিল। খোলাফায়ে রাশেদীন এসব ভন্ড প্রতারক নবুয়ত দাবীদারকে কঠোর হস্তে দমন করেছেন। বর্তমানেও এই ভন্ড

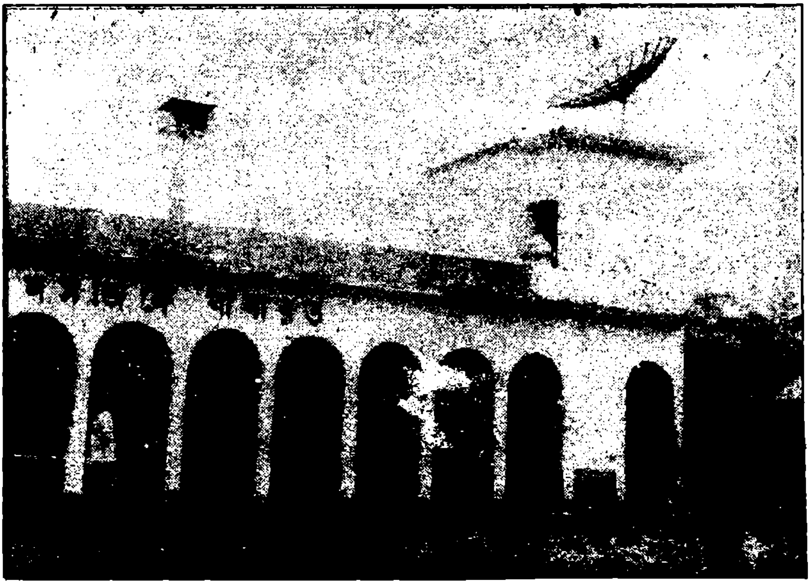

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঃ ভন্ড নবীর ঘৃণ্য দাবীদার কাদিয়ানী ফেরকাবাজদের সবকিছুতেই ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র। হালে পবিত্র এবাদতগাহ মসজিদকেও কাদিয়ানীরা আমোদ-প্রমোদের আস্তানা বা লীলাকেন্দ্র রূপে রূপান্তরের কাজে লিপ্ত হয়েছে। ওপরের ছবিতে তারুয়ার 'মসজিদে বাশারত'-এ কাদিয়ানীদের স্থাপিত ডিশ এন্টিনা

www.pathagar.com

প্রতারক ও নবুয়ত দাবীদারদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা মুসলমান শাসকদের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের এদেশে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দাবী সত্ত্বেও কোনো সরকার আজ পর্যন্ত এ কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম হিসাবে ঘোষণা করেননি।

এখানে উল্লেখ্য, বৃটিশ সৃষ্ট ভন্ড নবুয়তের দাবীদার মীর্জা গোলাম কাদিয়ানীর চরম পরিণতি হয়। তিনি পায়খানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

রূপকথায় রাক্ষস-খোক্কস ও দৈত্য দানবের গল্প রয়েছে। এই দৈত্যদের জান দেহে থাকে না। থাকে অনেক দূরে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। দৈত্য দানবকে সরাসরি লড়াই করে বধ করা যায় না। রূপকথার গল্পে তাদের প্রাণ বধ করার বর্ণনা দেয়া হতো এভাবে–

বহু দূরে এক কালা পাহাড় আছে। কালা পাহাড়ের মধ্যে একটি পুকুর আছে। ঐ পুকুরের মাঝখানে একটি লাল গোলাপ আছে। সেই লাল গোলাপের নিচে অনেক গভীরে একটি সুড়ঙ্গ রয়েছে। সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে একটি বাক্স রয়েছে। এই বাক্সের মধ্যে একটি ছোট কোঠরা আছে। এই কোঠরায় একটি কালো ভ্রমর রয়েছে। সেই ভ্রমরার হাত ভাঙ্গলে দৈত্যেরও হাত ভাঙ্গবে। ভ্রমরার পা ভাঙ্গলে দৈত্যেরও পা ভাঙ্গবে। ভ্রমরার প্রাণ বধ করলে দৈত্যেরও প্রাণ বধ হবে। নচেত নয়। সেই ভ্রমরাকে বধ করতে অসীম সাহসী রাজপুত্র ছাড়া সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি এদেশের কাদিয়ানীদেরকেও উৎখাত করা সহজ কাজ নয়। এরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে। এসব কাদিয়ানীদের এদেশ থেকে উৎখাত করতে হলে একজন সাহসী সৎ রাজপুত্রের প্রয়োজন। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে হঠাৎ কিছু সভা-সমাবেশ করে উৎখাত করা যাবে না। এদের শিকড় অনেক দূরে।

বর্তমানে কাদিয়ানী ধর্মমত অনুসারী ফেরকার প্রধানের নাম মীর্জা গোলামের পৌত্র মির্জা তাহের। সে এখন বৃটিশ সরকারের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইংল্যান্ডে বসবাস করে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচার করছে। সুতরাং শুধুমাত্র প্রতিবাদ ও সভা-সমাবেশ করে কাদিয়ানীদেরকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বসে যারা বৃটিশের মদদে কাদিয়ানীদেরকে মদদ দিচ্ছে, পৃষ্ঠপোষকতা করছে তাদেরকে চিহ্নিত করা। প্রশাসনে ঘাপটি মেরে বসে থাকা এইসব চিহ্নিত শত্রুদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে ইস্পাত কঠিন আন্দোলন গড়ে তোলা।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
সভ্যতা

কতিপয় বুদ্ধিজীবী বলে থাকেন এই উপমহাদেশে যদি ইউরোপীয়ানদের আগমন না ঘটতো তাহলে এ দেশের জনগণ এতো তাড়াতাড়ি আধুনিক যুগে প্রবেশ বা আধুনিকতার ছোঁয়া পেতো না। এই ইউরোপীয়ানরা মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষে আধুনিকতার ছোঁয়া এনে আমাদেরকে সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এদের বিরাট অবদান রয়েছে। এ ছাড়া এরা সভা-সমাবেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বলে থাকেন সভ্যতা, আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার ধারক ও বাহক ইউরোপীয়ানরা। ইসলামের আইন, রীতি-নীতি ও পদ্ধতি সেকেলে। এদের ভাষায় মৌলবাদী মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক ও বর্বর। এরা চলমান সভ্যতা, আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে প্রধান অন্তরায়। এদের বক্তৃতা-বিবৃতি শুনলে মনে হয় ইংরেজ আগমনের আগে এদেশে সভ্যতা-ভৈব্যতা বলতে কিছুই ছিলো না। এভাবেই অসত্য বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে এ দেশের জনগনকে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে মুসলমানদের গৌরবজনক ইতিহাস-ঐতিহ্য, শৌর্য-বীর্যের কাহিনী ভুলিয়ে মগজ ধোলাইয়ের কাজটি ভালোভাবেই করে যাচ্ছে।

এসব বুদ্ধিজীবীরা সভ্যতা, আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতা বলতে যদি শুধুমাত্র যান্ত্রিক সভ্যতাকে বোঝায় অথবা মদ্যপান, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি, কারণে-অকারণে মানুষ হত্যা, আগ্রাসন এবং বিভিন্ন বাহানায় মানুষকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করাকে বুঝায় তাহলে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু সভ্যতা, আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতা বলতে শিষ্টতা, ভদ্রতা, সমাজ বা জীবনযাত্রার উৎকর্ষ, আচার-ব্যবহার, চলাফেরা, কথাবার্তা, কাজকর্ম ইত্যাদিতে রুচিশীল ও মার্জিত স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত জীবন প্রণালীর প্রয়োজনীয় উপকরণাদি করায়ত্ব করে একটি আদর্শ মানের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকে বুঝায় তাহলে এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে।

আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই পৃথিবীর আদিকাল থেকেই মানব জাতিকে সভ্যতা শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে তাঁর মনোনীত অসংখ্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী ও আদর্শ মহামানবকে বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষের দ্বারে দ্বারে সভ্যতার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন। পৃথিবীর আদিপুরুষ আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সভ্যতার কাহিনী পবিত্র কোরআন এবং ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

হযরত আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। আল্লাহপাক তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন ফেরেস্তারাও তা জানতেন না। আল্লাহপাক যখন আদম (আঃ)কে বিভিন্ন বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তিনি ইশারায় জবাব দেননি। নিশ্চয়ই একটি ভাষায় কথাবার্তা হয়েছে। কাজেই সৃষ্টির আদিতে ভাষাও

www.pathagar.com

বিদ্যমান ছিলো। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মতে তাঁদের জীবন সম্পর্কে যেসব তথ্য রয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁরা ছিলেন সভ্য মানুষ। তাঁদের আচার ব্যবহার ও কাজকর্ম ছিলো মার্জিত ও রুচিশীল।

ইতিহাসে আদি যুগে মানুষের জীবনযাত্রার যে সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, তারা উলঙ্গ থাকতো, কাঁচা গোস্ত, মাছ খেতো, গুহায় বসবাস করতো ইত্যাদি। তাঁদের মধ্যে কেউ উলঙ্গ থাকতো, কিংবা কাঁচা মাছ-গোস্ত খেতেন। উদ্দেশ্যহীনভাবে জংলী জীবন যাপন করতেন। এর জবাবে বলা যায় বর্তমানেও পৃথিবীর বহু স্থানে এখনো উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ এবং পশুপাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করছে। সুতরাং আমরা সঙ্গত কারণেই বলতে পারি যে, আদি যুগে সভ্য ও অসভ্য দু'ধরনেরই মানুষ বিদ্যমান ছিলো। যেমন আজও আছে। হযরত আদম (আঃ) থেকেই মানুষের বংশ বৃদ্ধি এবং পৃথিবীর আবাদ কার্য শুরু হয়েছে। তিনি নয়শ' বছর বেঁচে ছিলেন। সে সময় বিবাহ প্রথাও প্রচলিত ছিলো। হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত নবী হযরত ইদ্রিস (আঃ) এর সময়ে জ্যোতির্বিদ্যা, অক্ষর ও লেখাপড়ার প্রবর্তন, অস্ত্র নির্মাণ ও বস্ত্র বয়ন শিল্পের প্রচলন হয়েছিল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আবদুল ওহাহহাব নাজ্জার-এর মতে হযরত শীস (আঃ) থেকে হযরত ইদ্রিস (আঃ) পর্যন্ত সময় পর্বে মানব সভ্যতা সর্বাপেক্ষা বেশি যে অঞ্চলটিতে বিকশিত হয়েছিল, সেটি পরবর্তীতে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এরপর খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে দুনিয়ার কোথাও আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার প্রচলন ছিলো বলে ইতিহাসে সাক্ষ্য নেই। সিন্ধুর মহেঞ্জোদারোতে, পাঞ্জাবের তক্ষশীলায় বা দুনিয়ার অন্যান্য প্রাচীন জনপদে বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত যে সব খবর পাওয়া যায়, সেগুলো ছিলো বিশেষ কোন এক বা একাধিক পন্ডিত বা সাধক ব্যক্তির শিক্ষাগার।

আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে হযরত মুসা (আঃ) এর যুগে মিশরীয় সভ্যতার কথা আমরা জানি। এর ধারক ও বাহক ছিলেন হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ। সে যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এতো উন্নত ছিলো যে, তা বর্তমান যুগের চরম উন্নতি ও উৎকর্ষকেও ম্লান করে দেয়। সে যুগের একটি মাত্র কীর্তি পিরামিডের কথাই যদি বলি তা ছিলো ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের এক আশ্চর্যজনক কীর্তি এবং সভ্যতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। যার নির্মাণ কৌশল আজও বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যজনক। মিশরের পিরামিড পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের মধ্যেই শুধু নয় বরং বর্তমান যুগের আশ্চর্য বস্তুসমূহের মধ্যের অন্যতম আশ্চর্য বস্তু। বৃহৎ পিরামিডটি পাঁচ লাখ বর্গফুটের বেশি জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এর উচ্চতা ৪৫১ ফুট। এটি ১০ ফুট হিসেবে ৪৫ তলা ভবনের সমান। এটি তেইশ লাখ পাথর খন্ড দিয়ে তৈরী যার প্রতিটির ওজন দেড়শত টন। এক লাখ লোক বিশ বছর ধরে কাজ করে এই বিশাল পিরামিডটি তৈরী করেছিল বলে প্রকাশ। তখন সিমেন্ট ছিলো না। পাথরগুলোকে মসৃণ করে কেটে বিশেষ কায়দায় একটির পর একটি গেঁথে এই বিশাল কর্মটি সমাপন করা হয়।

আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে হযরত নূহ (আঃ)-এর অনুসারীগণ

www.pathagar.com

হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) হিজরত পর্যন্ত নবীগণের জন্ম তারিখ। মুসলিম ঐতিহাসিক তবরী এবনে খলদুন হতে গৃহীত ও তওরাত দ্বারা সমর্থিত।

হবুতি সন ঃ হযরত আদমের (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণের বছরকে হবুতি সন বলা হয়॥

১.	হযরত আদমের পৃথিবীতে অবতরণ	হবুতি ১ সন
২.	হযরত শীশের (আঃ) জন্ম	হবুতি ১৩০ সন
৩.	হযরত নূহ (আঃ) জন্ম	হবুতি ১০৫৬ সন
৪.	হযরত শাম (আঃ) জন্ম	হবুতি ১৫৫৬ সন
	তাঁর নাম হতে শাম (সিরিয়া) রাজ্যের নামকরণ হয়েছে।	
৫.	হযরত ইব্রাহিম (আঃ) জন্ম	হবুতি ১৯৮৭ সন
৬.	হযরত ইছহাক (আঃ) জন্ম	হবুতি ২০৮৭ সন
৭.	হযরত ইয়াকুব (আঃ) জন্ম	হবুতি ২১৪৭ সন
	তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ।	
৮.	হযরত মুসা (আঃ) জন্ম	হবুতি ২৪১২ সন
৯.	হযরত দাউদ (আঃ) জন্ম	হবুতি ৩১০৯ সন
১০.	হযরত সোলায়মান (আঃ) জন্ম	হবুতি ৩১৪৯ সন
১১.	হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম	হবুতি ৪০০৪ সন

হিব্রু বাইবেল অনুসারে হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) হিজরত পর্যন্ত ৫৯৯২ বছর গণনা করা হয় ও পারসিকদের মতে ৪১৮০ বছর গণনা করা হয়।

নবীগণের আয়ু

হযরত আদম (আঃ) ৯৩০ বছর

হযরত শীশ (আঃ) ৯১২ বছর

হযরত নূহ (আঃ) ১৪০০ বছর

হযরত হুদ (আঃ) ৪৬৪ বছর

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ১৩৫ বছর

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ১৪৭ বছর

হযরত ইউসুফ (আঃ) ১০০ বছর।

হযরত আইয়ুব (আঃ) ১৪০০ বছর

হযরত মুসা (আঃ) ১২০০ বছর

হযরত ইউসা (আঃ) ১১০ বছর

হযরত দাউদ (আঃ) ৭০ বছর

হযরত ঈসা (আঃ) ৩৩ বছর

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ৬৩ বছর

[নেয়ামুল কুরআন, মোহাম্মদ শামসুল হুদা]

অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব জাতির একটি আনুমানিক কাল নির্ণিত হলো এবং বলাবাহুল্য, এই তালিকা মেনে নিলে মানব জাতির একত্ব ও আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্ব (নবুবিয়ত) মেনে নিতে বাধা থাকে না। আল-কুরআনেও পাই–

"হে মানব জাতি, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক প্রভু এক, আর নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা এক। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত যে সকলের চেয়ে ধর্মপরায়ণ।" (আল হাদীস, বিদায় হজ্বের বাণী)।

www.pathagar.com

মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে বিরাট জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন এর দৈর্ঘ্য ছিলো ৩০০ হাত বা ৪৫০ ফুট, প্রস্থ ৫০ হাত বা ৭৫ ফুট এবং উচ্চতা ২০ হাত বা ৩০ ফুট। এটি সে যুগের অন্যতম সভ্যতার নিদর্শন। হযরত দাউদ (আঃ) একাধারে নবী, বাদশাহ এবং একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি লোহা বিগলিত করে লৌহকর্ম এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরী করার কৌশল উদ্ভাবন করেন।

হযরত সুলায়মান (আঃ) সর্বপ্রথম আকাশ পথে ভ্রমণ করেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে "সুলায়মান (আঃ) এর অধীনে বায়ু বশীভূত ছিলো। তিনি হস্তীদন্ত ও ধাতু নির্মিত অভিনব সিংহাসনে আরোহণ করে অল্প সময়ের মধ্যে আকাশ পথে প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ পরিভ্রমণ করতে পারতেন।" (সূরা সাবা আয়াত ১১)। এটি আধুনিক কালের বিমানের চেয়েও অধিক দ্রুতগামী আকাশযান ছিলো। তাঁর সময়ে শিল্প বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তৎকালে উন্নত নগরী সাবার রাণী বিলকিসকে নিমন্ত্রণ করে এনে কাঁচ নির্মিত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে বললে, রাণী প্রাসাদের সামনে অতি কৌশলে নির্মিত মসৃণ চত্বরকে জলাধার মনে করে উভয় পদাবরণী উন্মুক্ত করে ফেলেন। তখন তাঁকে বলা হয় এটি তো কাঁচ নির্মিত কৃত্রিম সরোবর ব্যতিত অন্যকিছু নয়। আপনি অনায়াসে এর উপর দিয়ে যেতে পারেন। এতেও প্রমাণিত হয় সে যুগে বিজ্ঞানের কি পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক মায়ার্সের মতে, খৃস্ট জন্মের তিন হাজার বছর আগে ব্যাবিলনীয়রা 'কুইনিফরম' নামে এক ধরনের মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। ব্যাবিলীয়দের পরবর্তী সভ্যযুগ ভারতীয় আর্য সভ্যতা। এরপর খৃষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে গ্রীস সভ্যতা।

হযরত ইদ্রিস (আঃ) সর্বপ্রথম জ্যোতিবিদ্যার প্রবর্তন করেন। তিনি তৎকালীন প্রচলিত ৭২টি ভাষা জানতেন। প্রায় ২০০টি নগর তিনি পত্তন করেছিলেন।

এমনিভাবে যুগে যুগে আল্লাহর নবী রাসূলগণ পৃথিবীর মানুষকে উন্নত সভ্যতার শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর যখনই তারা আল্লাহর নাফরমানী করেছে তখনই আল্লাহর গযবে ঐ সব জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে। যার নিদর্শন আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে– "নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অত্যাচার করেন না, মানুষ নিজের প্রতি অত্যাচারী" (সূরা ইউনুছ, ৪৪)। "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং মিথ্যাবাদিদের করুণ পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর।" (সূরা আল ইমরান আয়াত ১৩৬, সূরা আনয়াম, আয়াত ১০)।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মাটি খুড়ে লাখ লাখ বছরের পুরনো জনপদের ধ্বংসস্তূপ ও ফসিল আবিষ্কার করেছেন। কোথাও কোথাও আবার উন্নত সভ্যতারও অস্তিত্ব ছিলো বলে অনুমান করা হচ্ছে। আমাদের পূর্বেও যে বহু প্রাচীন সভ্যতা ছিলো সেগুলো হয়তো তারই প্রমাণ বহন করে। সে সব সভ্যতাও হয়তো এক সময় বর্বর যুগ হতে যাত্রা শুরু করে আধা সভ্যতার যুগ পার হয়ে সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছে অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। অতি সভ্যতার অহংকারে যখন মানুষ ব্যাভিচার ও বিশৃঙ্খল আচরণে

www.pathagar.com

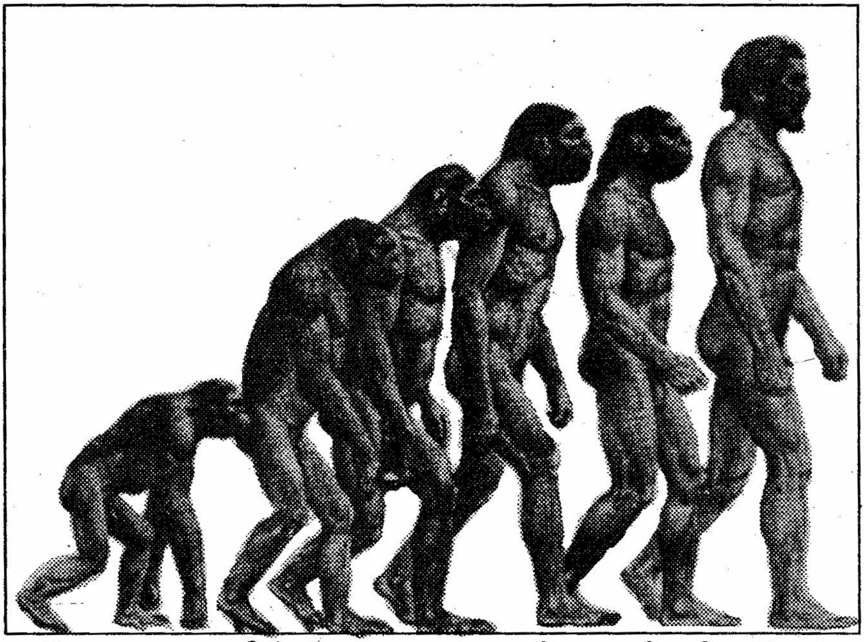

ডারউইন-এর মতবাদ অনুযায়ী বিবর্তনের ধারায় বানর থেকে নাকি মানব জাতির সৃষ্টি। যা ইসলাম ধর্মের ঈমান আকিদার পরিপন্থী। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ এই মুসলিম দেশে শিশু একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত একটি গ্রন্থে এই ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় বিশ্বের অসুমলিম বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকেরা যখন হযরত মুহম্মদ (সাঃ)কে এক নম্বর ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তখন আমাদের দেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীরা একই বইয়ে তাঁকে তিন নম্বর ক্রমিকে স্থান দিয়েছে

মমিকৃত ফেরাউনের মৃতদেহ। ছবিটি খুবই দুষ্প্রাপ্য। বর্তমানে এটি কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত

www.pathagar.com

বর্বরতার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল তখনই তারা আল্লাহর আক্রোশে পতিত হয়েছিল। পাহাড় পর্বত দ্বারা চেপে ধরে আল্লাহ তাদের উপর গযব নাযিল করেছিল। আজ হয়তো তাদেরই ফসিল ভূগহ্বর হতে আবিষ্কৃত হচ্ছে।

সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর যুগে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তিনি তাঁর নবুয়তের মাত্র তেইশ বছরের স্বল্পকালীন সময়ে সভ্যতার যে উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা অনাগত ভবিষ্যত মানব গোষ্ঠীর জন্য চিরস্মরণীয় ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

পৃথিবীতে সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তিনিই প্রথম বৈষয়িক শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষার সংযোগ সাধন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মসজিদ সংলগ্ন সুফফা নির্মাণ করে তাতে নিয়মিত লেখাপড়ার প্রচলন করেন। এরপর অন্যান্য মসজিদেও লেখাপড়া শিক্ষাদানের প্রচলন হয়। লেখাপড়া শিক্ষাদান, ভাষা জ্ঞান, কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, চিকিৎসাবিদ্যা ছিলো নিয়মিত পাঠসূচীর অন্তর্ভূক্ত।

সমাজের প্রতিটি সদস্য যাতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সে সম্পর্কে তার গঠিত সমাজ ব্যবস্থা ছিলো চমৎকার। পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী থেকে আন্তর্জাতিক বিষয়ে ছিলো সুস্পষ্ট গঠনমূলক দিক-নির্দেশনা। পৃথিবীতে প্রথম লিখিত সংবিধান তিনিই প্রবর্তন করেন যা মদীনা সনদ নামে খ্যাত। মহানবীর বিদায় হজ্বের ভাষণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় কিভাবে বিশ্ব সভ্যতা গঠন করে একটি সুন্দর ও শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলা যায় এর সঠিক দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তিনি নিজে এবং তাঁর সাহাবাদের জীবনে তা বাস্তবায়িত করে দুনিয়াবাসীর জন্য সভ্য সমাজ গঠনের একটি মডেল স্থাপন করে গেছেন।

বর্তমানে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা বিশ্ববাসীর উপকার করছেন, তাঁদের চেয়ে ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিকের অবদান কোন অংশে কম নয়। এঁদের আবিষ্কারের সূত্র ধরেই আজকে বিজ্ঞানের চরম উন্মেষ ঘটেছে। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বনবীর বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের অবদানের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন মহানবী মেরাজ গমন বৈজ্ঞানিকদের মহাকাশ গমনের উৎস বলা চলে। মহানবীর মেরাজ গমনের পূর্বে মানুষ মহাকাশ ভ্রমণের কল্পনাও করতে পারেনি। তাঁর এই ভ্রমণ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এর সূত্র ধরে আজ নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

মহানবীর কাছে যে ওহী আসতো এর সূত্র ধরে মানুষ বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। মহানবীই সর্বপ্রথম জানালেন যে, প্রতিটি মানুষের কাঁধে কেরামুন কাতেবীন নামক দু'জন ফেরেস্তা মানুষের যাবতীয় কার্যক্রম অদৃশ্যভাবে রেকর্ড করে যাচ্ছেন। এরই সূত্র ধরে মানুষ টেপরেকর্ড আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে।

মহানবী (সাঃ) প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে কোরআনের ভাষায় জানিয়েছিলেন, "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো বা মন্দ কাজ করবে সে কিয়ামত দিবসে তা প্রত্যক্ষ করবে"। (সূরা যিলযাল) মানুষের যাবতীয় গোপনীয় কার্য সেদিন প্রকাশ হয়ে যাবে। এই আয়াতের সূত্র ধরেই মানুষ আজ টেলিভিশন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খেলাফতকালে অধিকাংশ সময় তাঁদের আত্মরক্ষার তাগিদে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা ও গবেষণায় তাঁদের অবদান কম ছিলো না। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন মহাপন্ডিত ব্যক্তি। হযরত আলী (রাঃ) থেকেই আরব সভ্যতায় বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত হয়। তাঁর একটি বাণী থেকেই এর প্রমাণ মিলে। তিনি বলেছেন, "পারদ ও অভ্র একত্র করে বিদ্যুৎ ও বজ্রসদৃশ কোন বস্তুর সঙ্গে সংমিশ্রণ করতে পার, তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিশ্বর হতে পারবে।" সংখ্যা বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য তিনি মদীনার মসজিদকে কেন্দ্র করে মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। আব্বাসীয় খলিফা

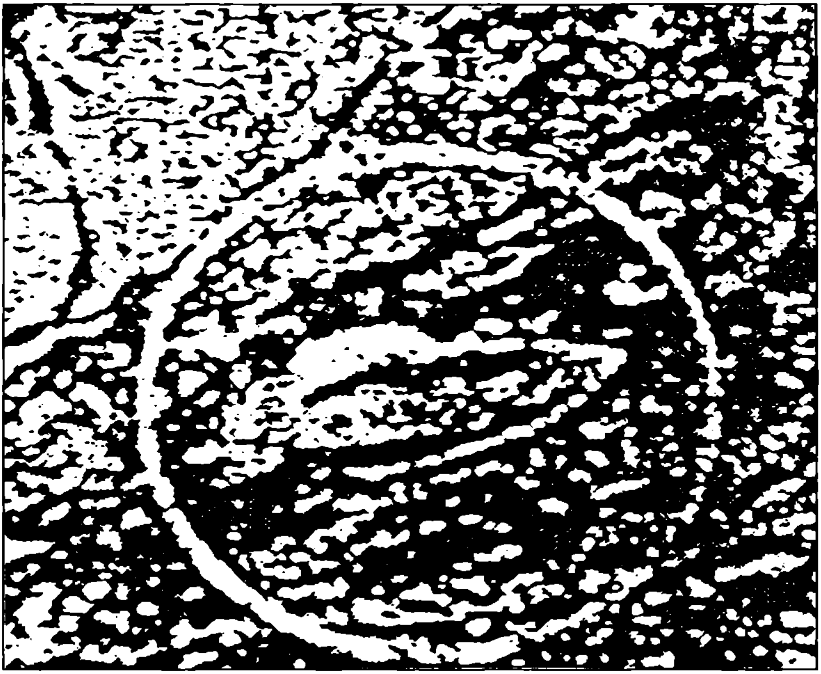

ভেনড্যাল জোনস্ জুদি পর্বতশৃঙ্গের উপরই নূহের নৌকাকে আবিষ্কার করেন। এর পূর্বে ১৯৫০ সালে আমেরিকার নাসা (ইওই) উপগ্রহ কেন্দ্র আকাশ হতে কয়েকটি অবিশ্বাস্য ফটো প্রেরণ করে তার রিপোর্ট ছিলো নিম্নরূপ ঃ পূর্ব-তুরস্কের একটি পর্বতশৃঙ্গ যার উচ্চতা ৭ হাজার ফুট তার উপর বিরাট চোখাকৃতি একটি বস্তুর ফটো উপগ্রহটি প্রেরণ করে। এ বস্তু নিয়ে নাসা গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না। ভেনড্যাল জোনস্ তাঁর আবিষ্কার দিয়ে কিছুকাল পূর্বে পৃথিবীকে চমকে দেন। নূহের নৌকার ম্যাপ যা তিনি এঁকেছেন তা নাসা উপগ্রহের প্রেরিত ফটোর সাথে অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে। আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে. নূহ নবীর নৌকা জুদি পর্বতের উপরই সমাহিত হয়েছে। আল কোররআনের এ ঐশ্বরিক বাণী পৃথিবীর মানুষের কাছে অবশেষে সত্য বলেই প্রমাণিত হলো।

www.pathagar.com

হারুনুর রশীদ মামুন-এর যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলা হয়। খলিফা মামুনের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত দু'জন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর একজন হলেন- মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারিজমী। তিনি ছিলেন আধুনিক বীজ গণিতের সৃষ্টিকর্তা তাঁকে মুসলিম নিউটন বলা হয়। তার লেখা 'এলমুল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' গ্রন্থটিকে ইউরোপীয়রা নাম দিয়েছে 'এ্যালজাবরা'।

এখানে উল্লেখ্য, পরবর্তীতে খৃষ্টানদের চক্রান্তে আল কিমিকে করা হয়েছে ক্যামিস্ট্রি, আল জেবেয়াল মুকাবেরাকে করা হয়েছে 'এ্যালজাবরা। দারিচ্ছালামকে করা হয়েছে জেরুজালেম। জাবালুত্তারিককে করা হয়েছে জিব্রাল্টার। ঈসা (আঃ)-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে যীশু। মুসা (আঃ)কে মোসেজ। ইব্রাহীম (আঃ)কে আবরাহাম। দাউদ (আঃ)কে ডেভিট। ইয়াকুব (আঃ)কে জেফব। ইউসুফ (আঃ)কে জোসেফ। সোলায়মান (আঃ)কে সলোমন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দিক-নির্দেশনায় তাঁর পরবর্তী থেকে ১২ শতাব্দী পর্যন্ত যে সব মুসলিম মনীষী কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন- গণিত, পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, জ্যোতিষী, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে জগৎবিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আলকিন্দি, আলখাওয়ারিজমী, আল বাত্তানী, আররাযী, আল ফারাবী, আলবেরুনী, আলী ইবনে সীনা, ইবনে হায়সাম, ওমর খৈয়াম, গাযালী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁদের গবেষণা ও আবিষ্কারের পরিপূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে অতি সংক্ষেপে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণার দিকগুলো উল্লেখ করা হলো। অংকশাস্ত্র, চিকিৎসা, পদার্থ, বায়ুবিজ্ঞানে আলকিন্দি। বীজগণিতে আল খাওয়ারিজমী। রসায়ন শাস্ত্রে জাবির ইবনে হাইয়্যান। জ্যোতির্বিজ্ঞানে- আল বাত্তানী। দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আর রাযী। ভাষাতত্ত্ব, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কারে আল ফারাবী। তিনি সত্তরটি ভাষা জানতেন। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, পুরাততত্ত্ব, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব বীজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আল বেরুনী। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে সীনা। দর্শন শাস্ত্রে গাযালী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও অসংখ্য মুসলিম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, সাহিত্যিক, কবি রয়েছেন।

হিজরতের পর মাত্র দশ বছরে প্রিয় নবী (সাঃ) কে ৮০টি যুদ্ধ করতে হয়েছে। তন্মধ্যে ২৭টি যুদ্ধে তিনি সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ৫৩টি যুদ্ধে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে প্রেরণ করেছেন। এই আশিটি যুদ্ধে মুসলমান সৈন্য কয়েদ হয়েছে ১১ জন, আহত হন ১২৭ জন, নিহত ৪৫৯ জন। অন্যদিকে শত্রুপক্ষের কয়েদ হয়েছে ৬৫৬৪ জন, নিহত ৪৫৯ জন। অর্থাৎ ৮০টি যুদ্ধে উভয়পক্ষের নিহত হয়েছে মাত্র ৯১৮ জন।

এরপর পৃথিবীতে বহু বিপ্লব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এই তথাকথিত সভ্যতার ধ্বজাধারীরা কোটি কোটি লোককে হত্যা করেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে কয়েকটি যুদ্ধ

www.pathagar.com

ও বিপ্লবের হতাহতের সংখ্যা উদ্ধৃত করছি।

ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব নাম বিখ্যাত। গণতন্ত্রের জন্যে সংগঠিত এই বিপ্লবকে সফল করা হয় ৬৬ লাখ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে। এমনিভাবে সোভিয়েত রাশিয়াতে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে তাতে এক কোটিরও অধিক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) মাত্র ৪ বছরের যুদ্ধে নিহত লোকদের হিসেব পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এভাবে পেশ করা হয়। রাশিয়া ১৭ লাখ, ইতালি ৪ লাখ ৬০ হাজার, তুরস্ক ২ লাখ ৫০ হাজার, রোমান ১ লাখ, জার্মানী ১৬ লাখ, অষ্ট্রিয়া ৮ লাখ, বেলজিয়াম ১ লাখ ২ হাজার, ফ্রান্স ১৩ লাখ ৭০ হাজার, বৃটেন ৭ লাখ ৬ হাজার, বুলগেরিয়া ১ লাখ,আমেরিকা ৫০ হাজার, অন্যান্য ১ লাখ। মোট ৭৩ লাখ ৩৮ হাজার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫) ৯ বছরে প্রাণ দিয়েছে রাশিয়া ৭ লাখ ৫০ হাজার, আমেরিকা ৩ লাখ, বৃটেন ৫ লাখ ৫০ হাজার, ফ্রান্স ২ লাখ, জার্মান ২৮ লাখ ৫০ হাজার, ইটালি ৩ লাখ, চীন ২২ লাখ, জাপান ১৫ লাখ। মোট ১ কোটি ৬ লাখ ৫০ হাজার মানুষ প্রাণ হরায়। এক কোটি মানুষ গৃহহারা হয়। (এনসাইক্লোপেডিয়া, ২৩ খন্ড, পৃঃ ৭৭৫, ৭৯৩)

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার লক্ষ্য যদি মানব জাতির কল্যাণ, পৃথিবীর সংরক্ষণ না হয়ে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে হয় তবে তাকে আমরা সভ্যতা বলতে পারি না। প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান যুগের সর্বাপ্রেক্ষা ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র এ্যাটম বোমাটি ফেলার যে নীতিমালা তৈরী হয়েছিল তা শুনলে যে কোন সভ্য মানুষের শরীর শিউরে উঠে। দৈনিক ইত্তেফাক ১৪ আগস্ট ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আমেরিকা ম্যালহার্টন

বিশ্বের প্রাচীনতম নৌকা

এই নৌকাটি চার হাজার ছয় শত বছরের পুরানো। মিসরের পিরামিডের পাদদেশের কাছাকাছি এই নৌকাটি ১৯৫৪ সালে গহবর থেকে এই নৌকাটি আবিষ্কৃত হয়। নৌকাটির দৈর্ঘ্য ১২০ ফুট, ৮ ফুট প্রশস্ত ও এগার ফুট গভীর। এই রাজকীয় নৌকা তৈরী করতে খন্ড কাঠ আনা হয়েছিলো সুদূর লেবানন থেকে। খৃষ্টপূর্ব ২৬০০ বছর পূর্বের এই নৌকাটির নির্মাণ কৌশল ও নিদর্শন দেখে মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও বিবি হাওয়া আলাইহাম সালাম থেকেই যে সূচনা এ প্রমাণিত নয় কি? দুনিয়ার সভ্যতার ইতিহাস মানব সৃষ্টি হতেই শুরু– এ পরম সত্যকে ইতিহাস গবেষণার টালবাহানার পন্ডিত্বে নানা তত্ত্ব-তথ্য পরিবেশনে বিভ্রান্ত হচ্ছে ইতিহাসের পাঠক মাত্রই।

www.pathagar.com

প্রজেক্টের বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ, বিস্ফোরক বিজ্ঞানী, আবহাওয়াবিদ প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা নিম্নরূপ।

আণবিক বোমার সর্বাপ্রেক্ষা বড় আঘাত আসবে প্রাথমিক বিস্ফোরণের মুহূর্তেই। তারপর জ্বলে অকল্পনীয় দাবানল। কাজেই বোমা নিক্ষেপ করতে হবে এমন জায়গায় যেখানে অনেক ঘরবাড়ী বসতি আছে। বোমা বিস্ফোরণের এক মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতএব সর্বাপেক্ষা চমৎকার লক্ষ্যস্থল হতে হবে ঘন বসতিপূর্ণ স্থান। এমন স্থানে বোমা ফেলা দরকার যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি আছে। এমন শহরে বোমা নিক্ষিপ্ত হতে হবে যেখানে ইতিপূর্বে বোমা বর্ষণে খুব একটা ক্ষতি হয়নি। তাহলে বোমাটি কতখানি কার্যকর এবং কতখানি বিধ্বংসী তা পরীক্ষা করা যাবে।" অথচ সমগ্র বিশ্বে এরাই আজকে মানবতা সভ্যতার দাবীদার।

রাশিয়া কম্যুনিস্টদের দখলের পর ভিন্নমতাবলম্বী নারী-পুরুষকে পাইকারী হারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৩৪ সালের ৫ ও ৬ জুন তারিখের করাচীর ডেইলি গেজেটে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী নিম্নোক্ত সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়।

ক.	জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও আইনজীবী	৩৪,৫৮৫ জন
খ.	ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি	৬৫,৮৯০ জন
গ.	সামরিক অফিসার	৫৪,৩৪০ জন
ঘ.	শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ	১,৯৬,০০০ জন
ঙ.	সাধারণ সৈন্য ও মাঝি-মাল্লা	২,৬৮,০০০ জন
চ.	কৃষক	২,৯০,০০০ জন

এছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যে মসজিদ ও গীর্জার সমস্ত আসবাবপত্র হস্তগত করা হয়। ধর্মানুসারীদের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং আইন করে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্যে নাস্তিকবাদী আন্দোলন পরিচালনাকারী ৭০ হাজার শাখা গঠন করা হয়।

ইংরেজদেরকে আধুনিক বিশ্বে সভ্যতার চূড়ামণি বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজার এদের সম্বন্ধে তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন ঃ দেশটি পাহাড়ী বলে জঙ্গলে ভরা। তরিতরকারী ও কিছু গম উৎপাদন ছাড়া এদের তেমন কোন ফসল নেই। তিনি বৃটনদের (বৃটেন) বলেন– Barbarian বা বর্বর।

বৃটেনে রোমান শাসনের সময় সেপ্টে সিনাস সেভেরাস নামক একজন উত্তর আফ্রিকান রোমান সম্রাট হিসেবে ১৯২ খৃঃ হতে ২১১ খৃঃ পর্যন্ত শাসন করেন। বৃটেনদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, দাস হিসেবে তারা একেবারে বাজে। তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি তেমন একটা নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

দুই হাজার করে পূর্বে রোমানদের দাসত্ব স্বীকার করার পর থেকে বৃটেনরা বহু জাতির পরাধীনতা স্বীকার করেছে আর এর ফলে তাদের রক্তের সাথে বহু জাতের মানুষের রক্তের মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে এক সংকর জাতি। মোঘল আমলে যখন ইংরেজরা

www.pathagar.com

প্রথম ভারতবর্ষে আসেন তখন এই দেশটি ছিলো তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যশালী। শিক্ষা, চিত্রকলায়, বিজ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত, সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটিয়েছিল মোঘল শাসকেরা।

মহাকবি মিলটনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মোঘলদের নাম উঠলেই তিনি The Great Mughal শব্দটি ব্যবহার করেন কেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, ভারতের শাসকরা মহান তাদের দেশে যখন বয়স্কদের প্রতি সম্মান, সমবয়সীদের শুভেচ্ছা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তখন আমাদের জগতে গির্জায় গির্জায় যুদ্ধ চলছে এবং বয়স্ক রমণীদের ডাইনী বলে অভিযুক্ত করে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে।

১৬০০ খৃঃ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের সুরাট নামক একটি ছোট বন্দরে ৫০০ টন ওজনের হেক্টর নামীয় এক জাহাজ নোঙর করে। জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম ছিলো উইলিয়াম হওকিন্স। তিনি যতটা না ছিলেন আবিষ্কারক তার চাইতে বেশি ছিলেন জলদস্যু। এই জলদস্যু যখন এদেশে আসেন তখন বৃটিশ রাণী এলিজাবেথ ছিলেন এক ক্ষুদ্র গ্রাম্য শাসকের সমান। তাঁর প্রতিনিধি হওকিন্স আগ্রার সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে হাজির হন এবং রাণী এলিজাবেথের সনদ পেশ করে ভারতবর্ষের সাথে ব্যবসা করার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করেন।

পরবর্তী এই জলদস্যু ইংরেজরা এদেশের শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করে। অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে দেশীয় শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দেয়। লুট করে অগাধ সম্পদ। এই বাংলাদেশের ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। এরা আমাদেরকে আলু, নীল, চীনা বাদাম, টমেটো, তামাক প্রভৃতির চাষ শিখায়। চা পানে অভ্যস্থ করে। প্যান্ট সার্ট পরিয়ে সাহেব বানায়। তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে রেল লাইন চালু করে। এই জলদস্যুরাই আজকে সভ্য জাতি হিসাবে বিশ্বে পরিচিত। এরা আজকে আমাদের বানিয়েছে তৃতীয় বিশ্বের জনগণ। পরবর্তীতে তাদের সেবাদাস সৃষ্টির লক্ষ্যে এ দেশে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এই সেবাদাসরাই আজকে বলছে ইউরোপীয়ানরা আমাদেরকে আধুনিকতা শিখিয়েছে। এই আধুনিকতার অর্থ যদি বর্বরতা, অশ্লীলতা, হত্যা, ধর্ষণ, নৈতিকতা এবং মানুষের আজাদী হরণ করে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করাকে বুঝায় তাহলে প্রকৃত ঈমানদার মুসলমানেরা এই তথাকথিত আধুনিকতা সমর্থন করতে পারে না। চরিত্রহীন আদর্শ বিবর্জিত মানুষ শুধু উন্নত জীবন প্রণালী কিংবা উন্নত বেশ-ভূষায় কখনও সভ্য হতে পারে না। যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত, মানুষের মান-সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত, জানমালের নিরাপত্তা উপেক্ষিত, নৈতিক ভয় অবক্ষয়ের দেউলিয়াপনায় জাতি নিমজ্জিত, সেখানকার অধিবাসীরা কি সত্যিই সভ্য? অকপটে বলতে গেলে উত্তর একটাই আসবে 'না'। সুতরাং মানুষের আত্মার উন্নতি ব্যতীত মানব সভ্যতা অসার। জনৈক দার্শনিক বলেছেন, "আত্মার প্রতিনিধি মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া আসল শক্তি। মানসশক্তির কৃত উন্নত প্রক্রিয়ার নামই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কোন প্রকার বস্তুর প্রতিক্রিয়া নয়, মানস শক্তির প্রতিক্রিয়ার নাম বিজ্ঞান। মানুষ বিজ্ঞান তৈরী করে, বিজ্ঞান মানুষ তৈরীর ক্ষমতাই রাখে না। কাজেই প্রাধান্য থাকতে হবে মানুষের। বিজ্ঞানের নয়।

www.pathagar.com

সুতরাং বিজ্ঞানকে কল্যাণময় ও ফলপ্রসূ করতে হলে মানস সংগঠন অপরিহার্য। অর্থাৎ আগে মানুষ গঠন করে পরে বিশ্ব গঠন করাই হবে মৌলিক বিশ্বকল্যাণ। মানুষ গঠন করতে গেলেই আত্মাকে প্রাধান্য দিতে হয়।" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বপ্রথম সভ্য মানুষ গঠন করেই সভ্যতার গোড়া পত্তন করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় এসেছে যান্ত্রিক সভ্যতা। আধুনিকতার অর্থ পিছনের দিকে ফিরে যাওয়া নয়। সভ্যতা-আধুনিকতা হলো সামনের দিকে এগুনো। সুতরাং ইসলাম ১৪০০ বছর আগে মুসলমানদেরকে পিছনের দিকে যাবার শিক্ষা দেয়নি। সামনে এগোবার শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং একমাত্র ইসলাম ধর্মই প্রকৃত আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা ও সভ্যতার স্রষ্টা।

বাংলা ভাষা সংস্কার ঃ ইসলাম বিরোধী উপাখ্যান

মুসলমান শাসন ও মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে বাংলা ভাষার উৎকর্ষতা, শ্রীবৃদ্ধি ও সংস্কার সাধিত হয়েছিলো। এ কথা বর্তমান মুসলমান নামধারী ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীরা আড়াল করার চেষ্টা করলেও সৎসাহসী অনেক মহৎপ্রাণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী তা অপকটে স্বীকার করে গেছেন। আজ থেকে প্রায় ৬৯ বছর আগে অবিভক্ত ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন সওগাত পত্রিকায় 'বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে নানাভাবে, নানা আঙ্গিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব কতোটুকু। তিনি প্রবন্ধে একস্থানে লিখেছেন ঃ

"বাংলা ভাষা মুসলমান প্রভাবের পূর্ব্বে অতীব অনাদর ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে কথঞ্চিৎ আত্মঃপ্রকাশ করিতেছিল। পন্ডিতেরা নস্যাধান হইতে নস্য গ্রহণ করিয়া শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিতেছিলেন। "তৈলাধার পাত্র" কিম্বা "পাত্রাধার তৈল" এই লইয়া ঘোর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহার হর্ষচরিত হইতে "হারং দেহি যে হরিণী" প্রভৃতি অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছিলেন এবং কাদম্বরী, দশকুমারচিত প্রভৃতি পদ্ম-রসাত্মক গদ্যের অপূর্ব সমাস-বদ্ধ পদের গৌরবে আত্মহারা হইয়াছিলেন। রাজসভায় নর্তকী ও মন্দিরে দেবদাসীরা তখন হস্তের অদ্ভূত ভঙ্গী করিয়া এবং কঙ্কন ঝংকারে অলি গুঞ্জনের ভ্রম জন্মাইয়া "প্রিয়ে, মুঞ্চময়ি মানমনিদানং" কিম্বা "মুখরমধীরম, ত্যাজ মঞ্জীরম্" প্রভৃতি জয়দেবের গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেছিল। সেখানে বঙ্গ ভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গ ভাষাকে পন্ডিতমন্ডলী 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের অপাংক্তেয় ছিল– তেমনই ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিলো।

কিন্তু হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্ত লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোন শুভাদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মুসলমান বিজয় বাঙলা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। গৌড়দেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া গেল। তাঁহারা ইরান তুরান যে দেশ হইতেই

www.pathagar.com

আসুন না কেন, বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া বাঙালী সাজিলেন। আজ হিন্দুর নিকট বাঙ্গলাদেশ যেমন মাতৃভূমি সেদিন হইতে মুসলমানের নিকট বাঙ্গলাদেশ তেমনই মাতৃভূমি হইল। তাঁহারা বাণিজ্যের অছিলায় এদেশ হইতে রত্নাহরণ করিতে আসেন নাই, তাঁহারা এ দেশে আসিয়া দস্তুর মতো এদেশবাসী হইয়া পড়িলেন। হিন্দুর নিকট উহা তদপেক্ষা বেশি আপনার হইয়া পড়িল। চারিদিকে হিন্দু প্রজা-চারিদিকে শঙ্খ ঘন্টার রোল, আরতির পঞ্চ প্রদীপ, ধূপ ধূনা, অগুরুর ধোঁয়া-চারিদিকে রামায়ণ মহাভারতের কথা এবং ঐ সকল বিষয়ক গান। প্রজাবৎসল মুসলমান সম্রাট স্বভাবতই জানিতে চাহিলেন, 'এগুলি কি?' পন্ডিত ডাকিলেন, তিনি তিলক পরিয়ে, শিখা দোলাইয়া নামাবলী গায়ে দিয়া হুজুরে হাজির হইয়া বলিলেন, 'এগুলি কি জানিতে চাহিলে আমাদের ধর্মশাস্ত্র জানা চাই। দ্বাদশ বর্ষাকাল ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার হইতে পারে।' বাদশা ক্রুদ্ধ হইলেন, "আমি ব্যাকরণ বুঝি না, রাজ-কাজ ফেলিয়া আমি ব্যাকরণ শিখিতে যাইব, তাহাও বামুন আমাকে পড়াইবে! না, ও সকল হইবে না! দেশী ভাষায় এই রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত রচনা কর।" গৌড়েশ্বর দেশী ভাষা শিখিয়াছিলেন, না হইলে প্রজা শাসন করিবেন কিরূপে। তিনি পুরো দস্তুর বাঙালী সাজিয়াছিলেন। দেশী ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনা করিতে হইবে, এই আদেশ শুনিয়া পন্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেলো- ইতরের ভাষায় পবিত্র দেব-ভাষা রচনা করিতে হইবে, চন্ডালকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দিতে হইবে! কিন্তু শত শত কল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, শত শত স্মৃতি লিখিয়া শত শত বৎসরের যাহা না করিতে পারেন, শাহানশাহ বাদশাহের এক দিনের হুকুমে তাহা হয়- রাজশক্তি এমনই অনিবার্য্য। অগত্যা প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মণক তাহাই করিতে হইল।... কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ রচিত এই প্রবাদ বাক্য- "কৃত্তিবেশে কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁষে এবং এই তিন সর্বনেশে" (কৃত্তিবাস কাশীদাস এবং যাহারা বামুনদের সঙ্গে ঘেষিয়া সমান হইতে চায়- এই তিন সর্ব্বনেশে) এখনও স্মরণীয় হইয়া আছে। এহেন প্রতিকূল ব্রাহ্মণ সমাজ কি হিন্দু রাজত্ব থাকিলে বাঙ্গলা ভাষাকে রাজ সভায় সদর দরজায় ঢুকিতে দিতেন? সুতরাং এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে, যে মুসলমান সম্রাটেরা বাঙলা ভাষাকে রাজদরবারে স্থান দিয়া ইহাকে ভদ্র সাহিত্যের উপযোগী করিয়া নতুনভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষা অবশ্য বহু পূর্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, বুদ্ধদেবের সময়ও ইহা ছিল, আমরা ললিত বিস্তারে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। (সওগাত, চৈত্র ১৩৩৫)।

মুসলমান শাসকদের আন্তরিক প্রয়াস, অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিখাঁদ ভাষা প্রীতির কারণেই এককালের পক্ষী ভাষা বলে কথিত বাংলা ভাষা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটে। এ সম্পর্কে ভারতের ভাষা বিশেষজ্ঞ শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলার বিভিন্নকালের রূপ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। এই গবেষণায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় কবিতা 'সোনার তরী'র পরিচিত দু'টি পংক্তি ব্যবহার করেছেন। কাজের সুবিধার জন্যে তরী শব্দের বদলে তিনি দেশী 'নাও' শব্দ ব্যবহার করেছেন। পংক্তি দু'টি হলো ঃ

www.pathagar.com

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে–
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।"

ডঃ সুনীতি কুমার এই দু'টি পংক্তির বিভিন্নকালের রূপ চিত্রিত করেছেন এভাবে–

কথিত বৈদিকের রূপ-ভেদ (আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ পূঃ)

গানং গাথিয়িত্বা নাব্রং রাহয়িত্বা ককঃ (=কঃ) আব্রিশতি পারধি
(পারে)– দৃক্ষিত্বা (=দৃষ্টা) যাদৃশং মনোধি মেনসি)
ভ্রবৃতি, চিহ্নতে অমুষ্য
(+ করধি, করে, কৃত্যে)॥

প্রাচ্য প্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০ খ্রীঃ পূঃ)

গানং গাথেত্বা নারং ব্রাহেত্বা ককে (কে)
আব্রিশতি পালধি (পালে)–
দেক্‌খিত্বা যাদিশনং (যাদিশং) মনধি (মনশি)
হোতি (ভোতি,) চিন্‌হিয়তি
অমুশশ কলাধি ফেলে কতে॥

মাগধী প্রাকৃত (আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ অবঃ)

গানং গাধিয়া (গাধিত্তা) নাব্রং বাহিঅ (বাধিত্তা)
কেগে (কত্র, কে) আব্রিশদি পারধি (পালধি)–
দেক্‌খিঅ (দেক্‌খিত্তা) যাদিশন মনধি
ভোদি (হোদি), চিন্‌হিঅদি
অম্‌শশকলধি (অমুশ শকদে)।।

মাগধী অপভ্রংশ (আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ অঃ)

গার্ণ গাহিঅ নাব্র বাহিঅ কই (কি)
আব্রিশই পারহি (পালহি)–
দেকখিঅ জইহর্ণ (জইশর্ণ) মনহি হোই চিন্‌হিঅই
ওহঅলহি (ওহঅরহিং ওহকহি)॥

মধ্যযুগের বাংলা (আনুমানিক) ১১০০ খ্রীঃ অঃ)

গান গাহিআ নাব্র বাহিয়া কে আইশই
(আরিশই) পারহি পালহি)=
দেখিআ জৈহণ মনে (মনহি) হোই
চিন্‌হিঅই ওয়ারহি (ওয়াকহি)॥

www.pathagar.com

মধ্যযুগের বাংলা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ অঃ)

গান গায়্যা (গাইহ্যা) নাও বায়্যা (বাইহ্যা)
কে আশ্যে (আইশে) পারে–
দেখ্যা (দেইখ্যা) জেন্.অ (জেন্হ, জেহেন)
মনে হোত্র, চিনী
(চিন্হীয়ে) ও আরে (ওহারে, ওহাকে)॥

আধুনিক বাংলা (১৮৯২–সাম্প্রতিক)

গান গেয়ে না বেয়ে কে আসে (=আশে) পারে–
দেখে যেন (=জ্যানো) মনে হয়, চিনি ওকে (=ওরে)॥
(বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গে শ্রী সুনীতি কুমার চট্টপাধ্যায়)

উল্লেখিত চিত্রটি একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে মুসলমান শাসনামল থেকে বাংলা ভাষার উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর আগ্রাসী ইংরেজ শাসকেরা হাত দেয় বাংলা ভাষার উপর। ইংরেজ অফিসার আর ইংরেজ পাদ্রী একযোগে এ কাজে তৎকালীন সরকারকে সাহায্য করেন। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন ঃ

.... ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালপেড এবং পরবর্তী হেনরী পিট্স ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরে নিয়ে আরবী-ফারসীর অনুধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলন্ডীয় পন্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হয়ে উঠে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী, ফারসী নিসুদন যজ্ঞের সূত্রপাত হয় এবং ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী-ফারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক; আরবী-ফারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধপদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হয়েছিলো। সাহেবরা সুবিধা পেলেই আরবী-ফার্সীর বিরোধীতা করে বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ/পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে স্বয়ং হালহেড ও বাংলার ক্যাক্স্টন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ভগ্বদগীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ সংগ্রহে মনোনিবেশ করে সংস্কৃত রীতিতে বাংলা শব্দকোষ সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করছিলেন।

সিপাহী বিপ্লবের পর স্বয়ং বড়লাট সিমলায় তার বাসভবনে হিন্দু পন্ডিতদের ডাকেন এবং ভাষা হতে মুসলিম প্রভাবিত তামুদ্দিক শব্দ বিতাড়িত করে সংস্কৃত ও ইংরেজী শব্দ গ্রহণ করতে জনগণকে উৎসাহ দেন। ফলে মুসলমানদের জীবন সমুদ্রে দেখা দেয় দ্রুত ভাটার টান। আর হিন্দুর জীবন সমুদ্রে শুরু হয় নতুন জাতীয়তার জোয়ার। এই নতুন পরিবেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে রচনা নীতির প্রবর্তন করেন, তা ইসলামের নাম-গন্ধ

www.pathagar.com

বিবর্জিত সম্পূর্ণ সংস্কৃতায়িত পৌত্তলিকতাপূর্ণ শব্দে ভরপুর। অথচ একদিন এই মুসলমানেরাই বাংলা ভাষা আর সাহিত্যকে এ দেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এ সম্পর্কে ডঃ ইব্রাহীম খাঁ বাতায়নে মন্তব্য করেন– "বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, হেমচন্দ্র– এঁদের রচনা পড়ে বুঝবার জো থাকে না যে, তৎকালে এ দেশে হিন্দু ছাড়া আর কোনো জাতের কোনো জীব ছিলো কিনা। হিন্দু প্রতিবেশীদের দেহ হতে আস্তে আস্তে আচকান, চাপকান, পাগড়ি খসে পড়লো; ভাষা হতে মুসলমানের আমদানি চিরপরিচিত শব্দগুলো পর্যন্ত বিদায় নিতে লাগলো; তাদের স্থানে আসতে লাগলো নতুন নতুন সংস্কৃত ঘেষা শব্দ। (ইব্রাহীম খাঁ রচনাবলী, পৃঃ ১৩৩)।

ঊনিশ শতকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত পন্ডিতরা পন্ডিতি ভাষা চালু করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষা থেকে মুসলিম শব্দগুলো বাদ দেয়। এর স্থলে নতুন নতুন সংস্কৃত ঘেষা শব্দ বাংলা ভাষায় জুড়ে দেয়। যেমন আদালত হয় বিচারালয়, ওয়ারিশ হয় উত্তরাধিকারী, হরফ হয় অক্ষর, হাকিম হয় বিচারক, কালি হয় মসী, কলম হয় লিখনী, জামিন হয় প্রতিভূ, কেতাব হয় গ্রন্থ, গোশত হয় মাংস, দস্তখত হয় স্বাক্ষর, ইজ্জত হয় সম্ভ্রব, খান্দান হয় বংশ, আশরাফ হয় অভিজাত, বাদশা হয় রাজা, বেগম হয় মহিষী, শাহজাদা হয় রাজপুত্র, ঈমান হয় বিশ্বাস, দৌলত হয় সম্পদ, আসমান হয় আকাশ, জমিন হয় ভূমি, কতোয়াল হয় রক্ষী, মিনার হয় স্তম্ভ, মুনাজাত হয় প্রার্থনা, বন্দেগী হয় আরাধনা, কোরবানী হয় বলিদান, ইসাদী হয় সাক্ষী, শাদি হয় নিকাহ বা বিবাহ, মহব্বত হয় প্রণয়, জেওর হয় অংলকার, লেবাস হয় আবরণ, গিলাফ হয় আচ্ছাদনী, খবর হয় সংবাদ, কলিজা হয় হৃদপিন্ড, দিল হয় যকৃত, ইনসান হয় মনুষ্য, ফেরেশতা হয় দেবদূত, জুলুম হয় অত্যাচার, আওরত হয় মেয়েলোক, দুনিয়া হয় বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড। এরকম অসংখ্য সংস্কৃত ঘেষা পৌত্তলিক শব্দ বাংলা ভাষায় সুকৌশলে অনুপ্রবেশ ঘটায়। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি স্থান ও জায়গার নাম পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর ঘটায়। যেমন আশেকপুর হয়ে যায় অশোকপুর, মোমেনশাহী হয়ে যায় ময়মনসিংহ, ছলমপুর হয়ে যায় শ্রীরামপুর, হাবিগঞ্জ হয়ে যায় হবিগঞ্জ, মোগলকোট হয়ে যায় মঙ্গলকোট, শওকত আলী হয়ে যায় সৈকত আলী, মুখলেছুর রহমান হয়ে যায় মুকলেশ্বর রহমান, গওছ মিয়া হয়ে যায় গজ মিয়া প্রভৃতি।

পরবর্তীতে বাংলা শব্দের এই ব্যাপক পরিবর্তনে অনেক হিন্দু বুদ্ধিজীবী এবং পত্রিকা পর্যন্ত তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানায়। এখানে সবার উদ্ধৃতি উল্লেখ করা সম্ভব নয়। শুধু প্রমথ এবং 'বসুমতি' পত্রিকার বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সী শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতামত জানতে চেয়েছিলেন বুলবুল পত্রিকার সম্পাদক। উত্তরে প্রমথ চৌধুরী অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন ঃ

"ফার্সী ও আরবী শব্দ ছেঁটে দিলে বাংলা ভাষা বলে কোনো ভাষাই থাকে না। এই দেখুন না কেনো, বাংলায় জমাজমির প্রতি কথাটি ফার্সী; সুতরাং সেসব কথা বাংলা ভাষা থেকে বহিষ্কৃত করলে আমাদের মুখের কথাও বন্ধ হয়, লেখাও বন্ধ হয়। ... আইন

www.pathagar.com

আদালতের প্রায় সব ফার্সী কথা। অবশ্য আজকাল আইন আদালতের অনেক ইংরেজী কথাও আমাদের ভাষায় ঢুকেছে। আর ফার্সীর সঙ্গে তাহার সমান হয়ে যাচ্ছে; যেমন ডিক্রীজারী। সুতরাং এ স্থলে কোনো সমস্যাই নেই। অতএব এই সমস্যা তুললে শুধু গোলযোগের সৃষ্টি হবে। (প্রমথ চৌধুরী, 'বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ' বুলবুল, তৃতীয় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ২য় সংখ্যা ১৩৪৩)।

'বসুমতী' পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লিখেছেন ঃ "বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্বাচন কমিটি যেভাবে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করিতেছেন, তাহাতে নানাদিকে নানাজন আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন।- কোনো গ্রন্থে "বন্ধুকের আওয়াজ" কথা ছিলো বলিয়া গ্রন্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে অন্যায় বিচার করা হইয়াছে। মুসলমান শাসনকালে বহু, আরবী ও ফার্সী কথা বাঙলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। যথা, কাগজ, কলম, দোয়াত, আদালত, জবানবন্দী, আরজী, হাকিম, হুকুম, নাজির, উজির, মেজাজ, বহাল তবিয়ত ইত্যাদি। 'আওয়াজ' কথাটিও এই প্রকৃতির। এ সব কথা যদি এখন বাঙলা ভাষা হইতে বিদায় করিতে হয় তাহা হইলে বাঙলা যে অনেকাংশে নিরাভরণা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আমাদের বাঙলা ভাষা-ভাষী মুসলমান ভ্রাতৃবর্গ ইহাতে নিশ্চিতই আপত্তি উত্থাপন করিবেন। সুতরাং এ সকল কথা ভাষায় ব্যবহার করিলে নির্ব্বাচন কমিটি পুস্তক নামমঞ্জুর করেন কেনো?" (বসুমতি, ১১ ভাদ্র ১৩৩১)।

উল্লিখিত বক্তব্যের পর আর কোনো বক্তব্য উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

এভাবেই বৃটিশ আমল থেকে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ও ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী পৌত্তলিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভাষা নিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং তা বিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত আছে।

সম্ভবতঃ ১৯৭৭ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বঙ্গভবনে একটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি আঃ মালেক উকিলকে দাওয়াত করেছিলেন। দাওয়াতপত্রে 'নিমন্ত্রণ' ও 'অতিথি' না লিখে 'দাওয়াত' ও 'মেহমান' শব্দ লিখার অপরাধে মালেক উকিল সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে এর জবাবে প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব অলি আহাদ পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেছিলেন- 'দাওয়াত' ও 'মেহমান' লিখা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পিতা যে তার জন্য আঃ মালেক নাম রেখেছেন সেটাও একটি অপরাধ। এই অপরাধের জন্য তাঁর পিতার কবরের মধ্যে লাঠি দিয়ে আঘাত করে জিজ্ঞাসা করা উচিত কেনো ভগবান দাস না রেখে আব্দুল মালেক নাম রাখা হয়েছে। (উদ্ধৃতি অবিকল পত্রিকার ভাষায় নয়। ভাবার্থ আমার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করছি। তথ্যগত কোনো ভুল হলে ক্ষমা করবেন।) আগেই বলেছি ১৭৫৭ সালের পর ইংরেজ এবং হিন্দুরা আরবী ফার্সী শব্দ বিতাড়িত করে মুসলমানদের জন্য আপত্তিকর ও ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী অনেক পৌত্তলিক শব্দ জুড়ে দিয়েছিল। 'দাওয়াত- মেহমান' প্রভৃতি মুসলমান শব্দ নিয়ে তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের

www.pathagar.com

আপত্তি থাকলেও পৌত্তলিক শব্দগুলো নিয়ে তাদের কখনো মাথা ব্যথা নেই। বরং তারা এগুলোকে মনে করে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ। এই শব্দগুলো কতোটুকু ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিচয় বহন করে কিছু দৃষ্টান্ত দিলেই অনেকের কাছে স্পষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।

'স্নাতক' এবং 'স্নাতকোত্তর' শব্দ দুটো বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত। গ্র্যাজুয়েটদের 'স্নাতক' এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েটদের 'স্নাতকোত্তর' বলে আমরা সম্বোধন করছি। 'স্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'স্নান করেছে এমন'। আর্যযুগে ছাত্ররা গুরুর আশ্রমে থেকেই লেখাপড়া করতো এবং শিক্ষা শেষ হলে গুরু শিষ্যটিকে ব্রহ্মচর্যা সমাপ্তিসূচক স্নান করিয়ে গলায় পৈতা পরিয়ে শিক্ষা সমাপনের স্বীকৃতি দিতেন। শিক্ষা শেষে স্নান ও পৈতা পর্বটি অনুষ্ঠিত হতো বলে এর নামকরণ করা হয়েছিল 'স্নাতকোত্তর'।

একজন মৃত ব্যক্তিকে ইন্তেকাল (রূপান্তর) না বলে বলা হচ্ছে প্রয়াত (প্রস্থান করা, চলে যাওয়া) অথচ আমরা বিশ্বাস করি মানুষ একেবারে চলে যায় না। রূপান্তরিত হয় অন্য একটি জগতের বাসিন্দা হয়ে। এভাবে দুনিয়াকে কেউ কেউ বলে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। মুসলমানেরাও কি বিশ্বাস করে এই দুনিয়াটা ব্রহ্মের অন্ড? আজকে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদকেও এই জঘণ্য শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। ইসলামী জলসা, ওয়াজ নসিয়তেও এই শব্দটি অপব্যবহার হয়ে আসছে অবাধে।

আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, ফেরেস্তাকে-দূত, দোয়াকে- প্রার্থনা, পানিকে- জল, সভাপতিকে- পৌরহিত্য, এবাদতকে উপাসনা বা আরাধনা, রোজাকে উপবাস প্রভৃতি শব্দে রূপান্তর করার চেষ্টা অতীতেও হয়েছে; বর্তমানেও হচ্ছে। কিন্তু কতিপয় মুসলমান নামধারী বুদ্ধিজীবী ছাড়া এই শব্দগুলো সাধারণ জনগণের মধ্যে কখনো গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কিন্তু গোস্তকে মাংস (মায়ের অংশ মাংস, গরুকে হিন্দুরা মা জ্ঞান করে) ঘোড়াকে অশ্ব, গোসলকে স্নান, দাওয়াতকে নিমন্ত্রণ জাতীয় শব্দ সম্ভার মুসলিম বিশেষত্বকে কাদা পানির মিশ্রনের মতো একাকার করে ফেলা হয়েছে।

বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য একজন মুসলমানকে বলা হচ্ছে- 'সূর্য সন্তান' অথচ 'সূর্য সন্তান'-এর ঐতিহাসিক পটভূমিকা হলো-

"মহামুনি দেবব্যাস রচনা করছিলেন 'মহাভারত'। সেই মহাভারতের একটি চরিত্র হচ্ছে রাজা 'পান্ডু'। ঋষির অভিশাপে রাজা পান্ডু সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে যান। তখন তিনি স্বীয় সুন্দরী স্ত্রী কুন্তী দেবীকে দেবরাজ ইন্দ্র ও পবনদেবের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করানোর জন্য অনুমতি প্রদান করেন। কুন্তী দেবীর গর্ভে জন্মায় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব নামে পাঁচ পুত্র সন্তান। যারা 'পান্ডু'র পুত্র হিসেবেই পঞ্চপান্ডব নামে মহাভারতে খ্যাত হয়। এই পাঁচ পুত্র ছাড়াও কুন্তী দেবীর কুমারী অবস্থায় সূর্যদেবের সঙ্গে মিলনের ফলে আরো একটি পুত্র সন্তান জন্মায়, যাকে তিনি সমাজ ভয়ে জন্মলগ্নেই পরিত্যাগ করেন। পরে এই পুত্র এক ছুতারের ঘরে মানুষ হয়েও স্বীয় প্রতিভাবলে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং মহাবীর কর্ণ হিসেবে মহাভারতে খ্যাতি লাভ করে। কুমারী মাতার সন্তান কর্ণ সূর্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে মহাবীর হয়েছিলেন

www.pathagar.com

বলে কর্ণের বীরত্ব গাঁথা বর্ণনা করে বীর যোদ্ধাদের 'সূর্য সন্তান' বলে আখ্যায়িত করে। আমরা মুসলমানরা কোনো প্রকার বাছ-বিচার না করে কূপমন্ডুকতায় নির্বিচারে আমাদের বীর সন্তানদের 'সূর্য সন্তান' খেতাব দিয়ে চলেছি।

এই শব্দ বিকৃতির কবল থেকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নামটিও রেহাই পায়নি। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী অর্থাৎ মুসলমানদের ব্যঙ্গ করে দাদা-বাবুরা শব্দ তৈরী করেছিলো 'মামদো ভূত' অর্থাৎ মোহাম্মদী ভূত। ভারত হতে প্রকাশিত চলন্তিকা অভিধানে এর ব্যাখ্যা দেয়া আছে। অথচ এই শব্দটি নিয়ে কয়েক বছর আগে বিটিভিতে প্রচারিত 'নতুন কুড়ি' অনুষ্ঠানে 'আমি মামদো ভূতের ছানা' ছড়া গানটি পরিবেশন করার ধৃষ্টতা দেখিয়ে এ দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলো।

আমাদের সপ্তাহের দিনগুলোর নামকরণেও রয়েছে ইসলামের আকিদা ও বিশ্বাসের পরিপন্থী হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিভাষা। যেমন– শনি ঃ সূর্য পুত্র, অশুভ গ্রহ বিশেষ (শনির প্রবেশ) শত্রু, সর্বনাশকারী, শনির দশা, শনিগ্রহের ভোগকাল ইত্যাদি। রবি ঃ সূর্য, ভাস্কর, দিবাকর। সূর্যের কিরণ, সূর্যের দীপ্তি বা শোভা, সূর্যের পুত্র ইত্যাদি। সোম– সোমলতার রস, প্রভাস–তীর্থ, শ্রীকৃষ্ণের অন্ত– লীলাক্ষেত্র, নন্দন, চন্দ্রপুত্র, সোমেশ্বর শিব। যজ্ঞে সোমরস পানকারী ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। মঙ্গল– শুভ, হিত, কল্যাণ (মঙ্গল হউক, মঙ্গলা সংবাদ) (জ্যোতি) কুজগ্রহঃভৌমগ্রহ, লৌকিক দেবতাদের কাহিনী ও মহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য বিশেষ (মনসামঙ্গল, চন্ডী মঙ্গল) ইত্যাদি। বুধ– গ্রহবিশেষ, চন্দ্রের পুত্র, জ্ঞানী বা প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ইত্যাদি। বৃহস্পতি– দেবগুরু, মহামন্ডিত, (জ্যোতিষ) গ্রহ বিশেষ। শুক্র– গ্রহবিশেষ, শুকতারা, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য, রেত; বীর্য। শুকাচার্য এই দিনের অধিদেবতা। (ভারত হতে প্রকাশিত সাংসদ বাঙ্গালা অভিধান হতে উদ্ধৃত)।

শুক্রবারে-এর নামকরণ সম্বন্ধে আরেকটি তথ্যে জানা যায়, শুক্র গ্রহ হতে এ দিনের নাম হয়েছে শুক্রবার। কিন্তু শুক্রগ্রহের নামকরণ এলো কোথা হতে? হিন্দু মাইথোলজী হতে প্রাচীনকালে হিন্দু দেবতাদের (রতি দেবী) ভাগ্য গণনার মাধ্যম হিসাবে শুক্র গ্রহের নামকরণ করা হয়। শুক্র অর্থ পুংকীট। রতি ক্রিয়ায় পুংকীট এর জন্মকাল ও ভাগ্য উক্ত গ্রহের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো বলে তারা বিশ্বাস করতো, তাই সে গ্রহের নাম শুক্র গ্রহ রাখা হয়। অতীতকাল হতেই শুক্রগ্রহ তথা শুক্রবার শব্দদ্বয় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর আলোকে মুসলমানদের এ দিনকে শুক্রবার বলে ডাকার কোনো যুক্তি নেই। এ দিনের নাম হতে পারে জুম্মাবার।

পশ্চিম বাংলায় তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যালেন্সর ও ভাইস চ্যালেন্সরকে আচার্য, উপাচার্য বলে থাকে। তাদের অনুসরণে আমরাও তাই বলে থাকি যা আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। আচার্য শব্দের অর্থ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র, বেদাধ্যাপক, শিক্ষাগুরু। বৈদিক যুগে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রভিত্তিক শিক্ষালয়ের শিক্ষকগণকে আচার্য বলা হতো। তারা বৈদিক ধর্মশিক্ষা দিতেন। হিন্দুদের শিক্ষাগুরুর পদ বা আসনের নামই আচার্যের আসন। যিনি শিষ্যকে বা শিষ্যদের বেদ পড়াবেন, তিনি

www.pathagar.com

আচার্য হিসাবে পরিচিত হতেন। হিন্দুদের পূজা-পার্বনের মূল আসনে বসে যিনি পূজা পার্বন সম্পন্ন করেন, তিনিও আচার্য। তার স্ত্রী আচার্য বা আচর্যাবলী।

'আপামর' শব্দটিও মুসলিম সংস্কৃতির পরিপন্থী। আ+পামর অর্থাৎ পামর পর্যন্ত উচ্চ নীচু অভেদে সকলে। পামর অর্থ হচ্ছে পাপিষ্ঠ, নরাধম, মুর্খ নীচ। বর্তমানে জনসাধারণকে বোঝাবার জন্য আপামর শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। আর্যদের জাতিভেদে শূদ্ররাই পামর। মুসলমানেরা ব্রাহ্মণদের কাছে অস্পৃশ্য ছিলো এবং এখনও এক শ্রেণী তা মনে করে। মুসলমানের ছায়া পড়লে তারা সহ্য করতে পারে না। ভরা কলসীর উপর ছায়া পড়লে কলসী ভেঙ্গে ফেলা হয়। পিতলের কলসীর উপর মুসলমানের ছায়া পড়লে তা গঙ্গা জলে সাতবার ধৌত করে পবিত্র করা হয়। এ কারণে তারা মুসলমানদেরকেও পামর বলে।

আলিঙ্গন হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ। আ+লিন্‌গ+অন। মূল ধাতু লিন্‌গ। আলিঙ্গনের বাংলা প্রতিশব্দ কোলাকুলি, বুকে জড়িয়ে ধরা, আশ্লেস। আলিঙ্গন মানে লিঙ্গ পর্যন্ত। কোলাকুলি বা জড়িয়ে ধরার সীমানা আলিঙ্গন শব্দের মধ্যেই নিহিত।

এমন হাজারো বিজাতীয় শব্দমালা আমাদের মাঝে সযত্নে লালিত হয়ে আসছে, যা আমরা ব্যবহার করছি। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের ঈমান আকিদার যে ক্ষতিসাধন হচ্ছে তা বোঝার বা উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের হচ্ছে না। এই সকল অজ্ঞতা, অন্ধতা, চোরা কাটার মতো আমাদের জীবন ধারায় লুকিয়ে থেকে প্রতিনিয়তই জাতির স্বকীয়তাকে শুধু আহত ও বিপন্ন করে তুলেছে।

১৯৪৭ সালে কতিপয় নেতাগোছের লোক ছিলো উর্দু প্রেমিক। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিলো বাংলা ভাষী। তাদের কাছে এই মাতৃভাষা ছিলো প্রাণের চেয়েও প্রিয়। কিন্তু সুযোগ সন্ধানী বর্ণচোরারা এই সুযোগটি গ্রহণ করে। তারা ভাষাকে টার্গেট করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। শুধু তাই নয় ভাষার সাথে ধর্মের বিরোধ সৃষ্টি করে এবং তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে সুকৌশলে আঘাত হানার জন্য হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষা থেকে বেছে বেছে শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটায় যা ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী। আমরা বলছি না হিন্দু সংস্কৃতি হতে যে সব শব্দ আমদানি করা হয়েছে সবই খারাপ। ইংরেজী, হিন্দি, ফার্সী, পর্তুগীজ, আরবী, উর্দু ও সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে বাংলা ভাষা। আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর যেসব শব্দ আঘাত হানছে, ঐ শব্দগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ঈমান, আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে এখনি পরিবর্তন করা অপরিহার্য।

মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা শব্দগুলো বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে মূলতঃ হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে। হিন্দুরা তাদের অনুভূতিতে আঘাত হানে না এরকম মুসলমানী শব্দও যথাসম্ভব এড়িয়ে যান। একবার কবি নজরুল রক্তের পরিবর্তে 'খুন' লেখার অপরাধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অথচ হাজার হাজার পৌত্তলিক শব্দ আমাদের মুসলমান লেখক-সাহিত্যিকরা অহরহ ব্যবহার করছেন। এদেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যারা শিকড়ের

www.pathagar.com

সন্ধানের নামে শিকড় ধ্বংস করতে ব্যস্ত তারাই এই সমস্ত শব্দগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লালন করছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই এই শ্রেণীর তাত্ত্বিকেরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই সমস্ত শব্দগুলোর প্রতি ওকালতি শুরু করে। তাদের সাহিত্যকর্মে এই সমস্ত আপত্তিজনক শব্দগুলো ব্যবহার করে সর্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

বিভাগ পূর্ব ভারতে পাঠ্যপুস্তকে 'ঈশ্বর' শব্দের ব্যবহার নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিলো। বর্তমানেও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের পাঠ্যপুস্তকে 'ঈশ্বর' বা 'ভগবান' শব্দ লিখা হচ্ছে। তা মুসলমান ছাত্রদেরকেও পড়তে হচ্ছে। ঠিক একই তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করছি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন সার্বভৌম এই বাংলাদেশে। তবে 'ঈশ্বর' বা 'ভগবান' শব্দ ব্যবহারের দুঃসাহস আমাদের বুদ্ধিজীবী গংরা না দেখালেও পাঠ্যপুস্তকে 'আল্লাহ'র পরিবর্তে 'সৃষ্টিকর্তা' লেখার অপপ্রয়াস তারা চালিয়েছিলেন। ভারতের পাঠ্যপুস্তকে 'ভগবান' বা 'ঈশ্বর' লেখার কারণে যদি তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার স্পিরিট ক্ষুণ্ন না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে 'আল্লাহ' লিখলে ধর্মনিরপেক্ষতার স্পিরিট ক্ষুণ্ন হবে কেনো?

আমরা জানি আল্লাহের ৯৯টি গুণবাচক নামের মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দটি অন্যতম। পবিত্র কোরআনেও বহু জায়গায় আল্লাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'খোদা' শব্দটি কোথাও ব্যবহার হয়নি। 'খোদা' একটি ফার্সী শব্দ। ফার্সী ভাষী অগ্নিপূজক সম্প্রদায় 'খোদা' ব্যবহার করে। এ ছাড়া 'খোদা' পুংলিঙ্গ এবং খুদী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। কাজেই এটি আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে শেরেকী শব্দ। অথচ তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলে 'আল্লাহ হাফেজ' বলার কারণে তা বাদ দিয়ে বর্তমানে 'খোদা হাফেজ' বলা হচ্ছে। এটা যে রাজনৈতিক বিদ্বেষপ্রসূত তা বলাই বাহুল্য।

বর্তমানে বন্যার শ্রোতের ন্যায় বাংলা ভাষায় আমাদের ঈমান আকিদার পরিপন্থী হিন্দি, সংস্কৃত ও ইংরেজী শব্দের অনুপ্রবেশ করছে। এই নিয়েও আমাদের তাত্ত্বিকদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। অথচ 'আল্লাহ, বিসমিল্লাহ, জিন্দাবাদ, আল্লাহ হাফেজ, প্রভৃতি শব্দ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে পরিবর্তনে এরা মহাব্যস্ত।

ধর্ম নিয়ে ব্যবসা

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজ প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে জাতির সামনে দেখা দিয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে– "রাজনীতিতে ধর্মের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা থাকা উচিত নাকি অনুচিত?"

অনেকের অভিমত হচ্ছে– "রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবসার পণ্যের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনকে মুক্ত করা দরকার।" ধর্মকে যদি কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল ব্যবসার পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে নিঃসন্দেহে তা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু রাজনীতিতে কল্যাণ, সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়; বরং জনকল্যাণের লক্ষ্যে ধর্ম ব্যবহার হতে পারে কিনা, ধর্ম বিদ্বেষী মহল

www.pathagar.com

সে ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা দেয় না।

আমরা জানি ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম একটি আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্ম নয়। একজন মানুষের জীবন দৈনন্দিন তথা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, সুস্পষ্ট ধর্মীয় নিয়ম-নীতি দিক নির্দেশনা রয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়েও পাওয়া যায় সুস্পষ্ট ধর্মীয় নিয়ম-নীতি ও দিক নির্দেশনা। যার মাধ্যমে একজন মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভালো-মন্দ, সাফল্য-ব্যর্থতার পথ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সমাজের সিংহভাগ মানুষ যে ধর্মের অনুশাসনকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সে সমাজে সে দেশে মানুষের বিশ্বাস মূল্যবোধে জীবন বিধানকে পাশ কাটিয়ে জাতীয় বিশ্বাস, সংহতি ও চেতনা গড়ে উঠতে পারে না এবং এমন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মভীরু মানুষের দেশে ধর্মহীন ন্যায়-নীতি, সাম্য ও সমৃদ্ধি অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে, এ দেশের রাজনীতির দার্শনিক ভিত্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম এবং ব্যবসার পণ্য হিসাবে নয়; বরং জীবন বিধানের পরিপূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে গ্রহণ করা সকল দলের জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া মহান ইসলাম ধর্মকে যথাযথভাবে অনুসরণ করলে ধর্ম চর্চার সাথে সাংস্কৃতিক চর্চা আসবে। সাংস্কৃতিক চর্চার সাথে সামাজিক চর্চা আসবে। সামাজিক চর্চা আসলে রাজনৈতিক চর্চা আসবেই।

মহাকবি ডঃ ইকবাল যথার্থই বলেছেন, ধর্ম ও রাজনীতি অভিন্ন। ধর্মের জন্যেই রাজনীতির আশ্রয় নিতে হয়। তাই, ধর্মই পরিচালিত করবে রাজনীতিকে। ধর্মের প্রকৃত অনুসরণই হবে মুসলিম রাজনীতির প্রকৃতি। ধর্মই নিয়ন্ত্রণ করবে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি। তিনি যবর-একলীম গ্রন্থে বলেন ঃ

"রাজনীতি থেকে ছুটে যায় যদি ধর্মনীতি
তবে থেবে যাবে শুধু চেংগিসের নীতি।"

অর্থাৎ ধর্ম রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সেখানে চেঙ্গিস খানের অভ্যুদয় ঘটবেই। হত্যা, লুণ্ঠন, অরাজকতাই হবে সেখানে নিয়ম।

মুসলমানেরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতেহা পাঠ করে থাকে। আল্লাহর কাছে ইহকালের ও পরকালের সঠিক দিক-নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা জানায়। যেমন "…. আমাদিগকে সঠিক দৃঢ় পথ প্রদর্শন কর ঐ সব লোকের পথ, যাদিগকে তুমি পুরষ্কৃত করেছ, যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয়।" এ প্রার্থনা মানবজাতিকে আল্লাহরই শিখিয়ে দেয়া। আবার মহান রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন সূরা বাকারার মাধ্যমে। "ইহা আল্লাহতায়ালার কিতাব এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। ইহা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা, সেই মুত্তাকীদের জন্য।"

আমরা একদিকে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সঠিক জীবন ব্যবস্থার দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা করছি অন্যদিকে নামাজ শেষ করেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে মানব রচিত জীবন বিধান সমাজ ও

www.pathagar.com

বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতির কিছু খন্ড চিত্র

বিরোধী দলে থাকাকালীন মওদুদী-নিজামীরা ছিলেন জায়েজ; এখন হয়েছে নাজায়েজ

ক্ষমতাসীন থাকাকালীন খালেদা জিয়ার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট নেতারা ছিলো নাজায়েজ; এখন হয়েছে জায়েজ

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় জীবনে গ্রহণ করছি। শুধু তাই নয়, মুসলমানরা খ্রীষ্টিয় ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবধারার নিয়ম, আদর্শ, আচরণ ও বিধি-বিধানের আইনগত সাংস্কৃতিক প্রভাবে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। তাই কবি নজরুল যথার্থই বলেছেনঃ

"খালেদ! খালেদ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্থানী,
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি।
সকলের শেষে হামাগুড়ি দিই, না, না, ব'সে শুধু
মুনাজাত করি, চোখের সুমুখে নিরাশা সাহারা ধূ ধূ!
দাঁড়ায়ে নামাজ প'ড়িতে পারি না, কোমর গিয়াছে টুটি,
সিজদা করিতে 'বাবাগো' বলিয়া ধূলিতলে পড়ি লুটি!
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল-মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লা ভুলিয়া বলি, 'প্রভু মোর তুমি ছাড়া কেউ নাই।"

এভাবেই নিজের অজান্তেই মুসলিম সম্প্রদায় প্রতিনিয়ত আল্লাহপাকের কাছে তাঁর নৈকট্য লাভের প্রার্থনা করছে বটে; কিন্তু বাস্তবতার বৈরী প্রভাব ও ধাক্কায় ইহকাল-পরকাল দুই-ই হারাচ্ছে।

আল্লাহর সৃষ্টি অত্যন্ত নিখুঁত, নিপুণ ও নির্ভুল। সৃষ্টি জগতের দিকে লক্ষ্য করলে এর প্রমাণ মিলে। সৃষ্টির সব কিছুই নিয়মতান্ত্রিক; ব্যতিক্রম শুধু মানবসৃষ্ট পদ্ধতি। সভ্য মানুষই অসভ্য আচরণের ফলে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজি নিজ নিজ কক্ষপথে সনাতন নিয়মেই পরিভ্রমণ করছে। ঋতুর পরিবর্তনও ঘটছে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতির মাধ্যমে। জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাকৃতিক নিয়মে আলো-বাতাস আর পানির পরিমিত যোগান ঘটছে বিস্ময়করভাবে। প্রকৃতি যার নিয়ম মেনে সঠিক সুন্দর ও নির্ভুলভাবে চলছে সেই মহান আল্লাহপাকের বিধি-বিধান, যা মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে সুন্দর নির্ভুলভাবে পরিচালনায় সক্ষম, তা আমরা অবহেলা আর উপেক্ষা করে এড়িয়ে যাচ্ছি। জীবনকে পরিপূর্ণ সুখী, সুন্দর, সমৃদ্ধ ও সার্থক করতে হলে আল্লাহর বিধি-বিধান ও নিয়মনীতিকে অবজ্ঞা করার কোন অবকাশ নেই। এই সত্য যতো শীঘ্র আমরা হৃদয়ঙ্গম ও অনুধাবন করতে পারবো ততই আমাদের জন্য তা হবে সার্বিকভাবে কল্যাণকর ও মঙ্গলময়।

জীব-জন্তুর জীবন ব্যবস্থায় বিপর্যয় না ঘটলেও মানুষ দুনিয়াব্যাপী বিপর্যস্ত হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, জীবজন্তুর জীবন ব্যবস্থায় যে বিপর্যয় ঘটছে তা মানুষেরই সৃষ্ট। জীবজন্তু না খেয়ে খুব কমই মারা যায়। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ জীবন বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ প্রতিবছর দুর্ভিক্ষের কারণে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। এর পেছনেও রয়েছে ঐ বিশেষ একটি দর্শন। মানুষ আত্মজ্ঞানের গরিমায় স্রষ্টার নীতি-নিয়ম ও পথকে উপেক্ষা করে নিজেদের কল্পিত পথ ও পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করছে। মুসলমানেরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাও করে না, গবেষণাও করে না। তাই মুসলমানরা বিশ্বের সেরা জাতি হয়েও জানতে পারছে না বা জানতে চেষ্টা করছে না আল্লাহ কতো মহান স্রষ্টা, প্রভু ও অভিভাবক।

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে এক বিশেষ মুহূর্তে বিএনপি'র সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম মনি

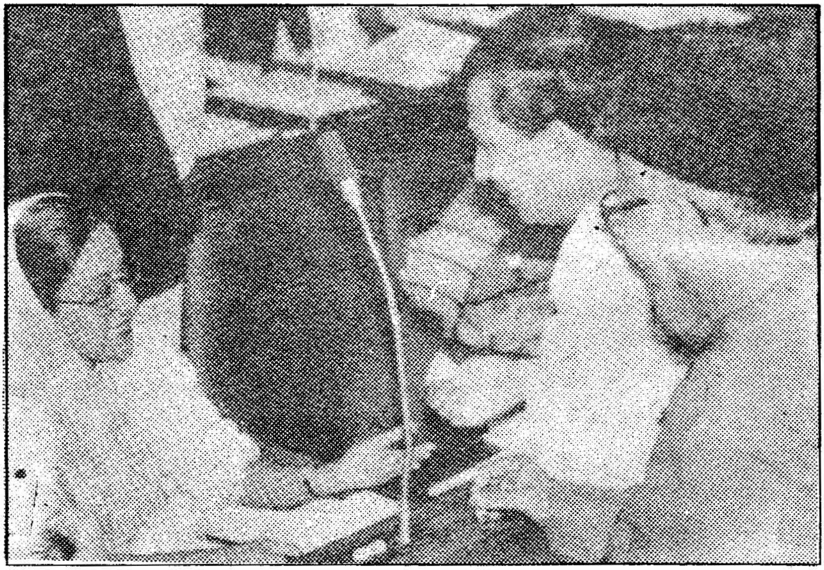

জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী ও এনডিপি নেতা সালাউদ্দিন কাদেরের সাথে শেখ হাসিনা-একটি বিশেষ মুহূর্ত

www.pathagar.com

প্রতিটি দেশে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য বিধি-বিধান তথা রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সংবিধান যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ও অনুকরণে প্রনীত তথাপি তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থাশীল হওয়া নাগরিক জীবনের প্রধান শর্ত এবং এই সংবিধান মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়। এই বিধানের কোন ধারা বা উপধারা লঙ্ঘনকারীকে দেশদ্রোহী অপরাধী হিসাবে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। পবিত্র কোরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহর দেয়া সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্বক্ষণিক সংবিধান। এ পবিত্র সংবিধানে মুসলমানসহ প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রতিটি প্রাণীর অধিকার সংরক্ষিত। তা স্বাধীনভাবে ভোগ করার সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা রয়েছে। পৃথিবীতে মানবজাতির জীবন ব্যবস্থা কিভাবে নির্বাহ হবে তার সঠিক ও সুনিপুণ ব্যবস্থা ও দিক-নির্দেশনা কোরআন শরীফে দেয়া আছে। জীবনের জন্যে কল্যাণকর, অকল্যাণকর, গ্রহণযোগ্য-বর্জনীয়, প্রতিটি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে সূক্ষ্ম সীমারেখার বিভাজন। এই দৃষ্টিতে মানব রচিত সংবিধানকে গ্রহণ করার ব্যাপারে অন্তত মুসলমানদের জন্য রয়েছে ঈমান, আকিদা রক্ষার সুগভীর বিবেচনার বিষয়। তেমনি পবিত্র কোরআনকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করারও কোন অবকাশ কোন দিক দিয়ে থাকতে পারে না। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন, "তোমরা কি এই কিতাবের কোন অংশকে বিশ্বাস এবং কোন অংশকে অবিশ্বাস কর? যারা ঐরূপ কর তাদের কি শাস্তি হতে পারে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন ভীষণ শাস্তি ব্যতীত।" (সূরা বাকারা আয়াত-৮৫)। কিন্তু মুসলমানেরা পবিত্র কোরআনের আংশিক বিধি-বিধানকে পরকালের নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করছে। আর ইহকালের বিধি-বিধানকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করছে। এই বিধি-বিধান উপেক্ষার ফলে সৃষ্ট বিশৃংখলাই মানবজাতিকে একটি অশান্ত, নৈরাজ্যময়, হানাহানি ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অনেকের ভাষায় পবিত্র ধর্মকে নোংরা রাজনীতির সাথে একাকার করা উচিত নয়। রাজনীতির লক্ষ্যই দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করা। এ কাজ অপবিত্র নয় বরং পবিত্র কাজ। কিন্তু এ রাজনীতিকে অনেকে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে নোংরা করেছে। এদের নোংরামির রাজনীতির কারণেই দেশ ও জাতির আজ এই দুরাবস্থা। মানব কল্যাণ ইসলাম ধর্মেরই একটি বিধান। কিন্তু এরা কিছুতেই বুঝতে চায় না, ইসলাম শুধু নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতের পারলৌকিক আনুষ্ঠানিকতাই শুধু নয়, বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বাত্মক ভূমিকা পালনের একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন এবং জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম এবং রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে আলাদা কোন চর্চা বা আনুষ্ঠানিকতা নয় রাজনীতিকে নৈতিক ভিত্তি দেয়ার জন্যেই আজ ইসলামের উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তা বড় গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। জাতির সেবা ও কল্যাণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হিসাবে রাজনীতি একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইসলামের সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা বাদ দিয়ে ধর্ম বিদ্বেষী মহল কি চায় তা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। ধর্মকে পাশ কাটিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশে গত ৫৩ বছরে বৃটিশের মোনাফেকী মার্কা গণতন্ত্র, জনসেবা ও দেশ গড়ার নামে যে লুটপাট আর অরাজকতা জনগণ প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

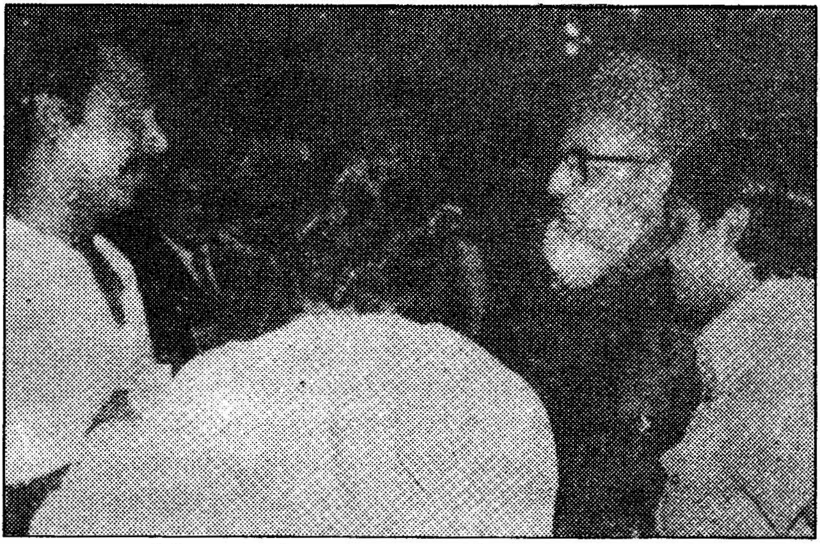

ডাকসু'র প্রাক্তন ভিপি, ভাষা সৈনিক ও জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে এক কূটনৈতিক ভোজসভায় আলাপরত জাসদ নেতা আ. স. ম আব্দুর রব (২৩/৯/৮১)

অধ্যাপক গোলাম আযম এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস এম মোস্তাফিজুর রহমান এবং সেক্রেটারী জেনারেল ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী সালাম তালুকদার (৫/৪/৯১)

www.pathagar.com

করেছে তা নিঃসন্দেহে ধর্মহীন রাজনীতির ফলেই সম্ভব হয়েছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বরাবরই জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

বিশ্বের অনেক অমুসলিম বুদ্ধিজীবী, ধর্মপ্রচারক ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য রেখেছেন। এই স্বল্প পরিসরে সবার উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে ২/৩টি উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি।

আচার্য প্রফুল্ল রায় বলেন, "জগতের বুকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্রমূলক ধর্ম। প্রশান্ত মহাসাগর হতে আরম্ভ করে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সমস্ত মানবমন্ডলীকে উদারনীতির এক সূত্রে আবদ্ধ করে ইসলাম পার্থিব উন্নতির চরম উৎকৃষ্টতা লাভ করেছে।"

গুরু নানক বলেন, "বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে। এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ। মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং নরকে যায় তার একমাত্রও কারণ এই যে, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই।"

স্যার উইলিয়াম মুর বলেন, "সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অধীনে সিরিয়াবাসী খৃস্টানগণ যেভাবে বাস করেছিলেন আরব মুসলমানদের অধীনে তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করতে ছিলেন।"

ইসলামের পক্ষে বক্তব্য প্রদানকারী সেই সকল মনীষীরা কি মূর্খ ছিলেন? নাকি তাঁদের ঘুষ খাইয়ে ইসলামের পক্ষে কথা বলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল? আসলে আত্মোপলব্ধির কষ্টি পাথরে যাচাই করে দুনিয়ার অনেক নামী-দামী খ্যাতিমান বিধর্মী ইসলামের শাশ্বত কল্যাণ ও সৌন্দর্যের অপরিসীম উপকরণ দেখে মন থেকে এর গুণাগুণ করতে তাগিদ পেয়েছেন। ইসলামকে যারা মধ্যযুগীয় দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করছেন তারাই আধুনিকতার নামে মানুষকে বর্বরতার যুগে ফিরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামই আধুনিক। অন্যান্য সব মতবাদই মানুষের সংকীর্ণ ও স্বার্থান্ধ চিন্তার ফসল। যা কোনভাবেই মানব সমাজ কিংবা জাতির স্থায়ী সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। ইসলামকে বাদ দিয়ে যারা সৃষ্টিকুলের কল্যাণ প্রত্যাশা করে এরাই প্রতিক্রিয়াশীল। ইসলাম কোন অলৌকিক বা মানুষের মনগড়া কোন ধর্ম নয়। ইসলাম জাগতিক, মানবিক যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। পবিত্র কোরআন এবং রাসূলের হাদীস পাঠ করলে মনে হয় ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার তাগিদ দিচ্ছে। হয়তো এই বিষয়টিকে অনুধাবন করতে না পারার জন্যেই দুনিয়াব্যাপী মুসলমানেরা মার খাচ্ছে। মুসলমানদের প্রতি অমুসলিমদের সমকালীন ঘটনাগুলো এর জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এই ঘটনাগুলো যেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হুমকি স্বরূপ। একটি বিষয় পরিষ্কার ভাষায় ও দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে আদিকাল থেকে বিধর্মীয় অপশক্তির ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ছিলো, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু এর পরেও আল্লাহর সৃষ্ট ও নির্দেশিত ধর্ম ইসলাম সকল চক্রান্ত মোকাবেলা করে আপন মহিমায় টিকে ছিল, টিকে আছে, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধী শক্তির শতাব্দীর পর শতাব্দী আঘাত হানাই প্রমাণ করে প্রকৃতপক্ষে

www.pathagar.com

ইসলাম কতটা সঠিক ও শক্তিশালী মতবাদ। অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদের বিরুদ্ধে এরূপ চতুর্মুখী চক্রান্ত হলে অনেক আগেই দুনিয়া থেকে সে সব ধর্ম বা মতবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বিশ্ব প্রকৃতি যেমন স্রষ্টার আইনের ব্যতিক্রম না করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে টিকে আছে, নিঃসন্দেহে ও নিঃসঙ্কোচে দুনিয়ার তাবদ দার্শনিকেরা একটি বিষয়ে একমত হতে বাধ্য যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন যা স্বয়ং আল্লাহর বিধান। এই বিধানকে উপেক্ষা করে এড়িয়ে গিয়ে কোন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা জাতি কল্যাণের কক্ষপথে টিকে থাকতে পারেনি এবং কোনদিন পারবেও না।

অতএব, রাজনীতিতে ধর্ম, ব্যবসার পণ্য নয়; বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা মানবজাতির নৈতিক ও বৈষয়িক প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ ও মঙ্গল ধর্মের মাঝেই নিহিত। এই সত্যকে মেনে নিয়েই আমাদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনের রাজনীতির ধারা পরিচালিত হওয়া দরকার।

ধর্ম মানেই কল্যাণ। অধর্ম মানেই অকল্যাণ। ধর্ম এসেছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। ধর্ম এসেছে জীবনের জন্য। ধর্ম এসেছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন কল্যাণের

ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অফিস সুগন্ধায় বাদ মাগরিব আয়োজিত এক মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।

www.pathagar.com

জন্য। বলা হয়, ধর্ম পবিত্র জিনিস। ধর্মকে কোন রাজনীতির সাথে জড়ানো যাবে না। তবে কি রাজনীতি অপবিত্র? যদি রাজনীতি অপবিত্র হয়, তবে রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করার দাবী তোলা উচিত। রাজনীতি যদি মানুষের অগ্রগতির জন্য হয়, রাজনীতি যদি অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য হয়, তবে তো ধর্মের সাথে রাজনীতিকে একাকার করে দিতেই হয়, তানা হলে অকল্যাণ তো হবেই। দুর্নীতি আর স্বৈরাচার তো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবেই। যুগে যুগে বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী পাঠিয়েছেন, রসূল পাঠিয়েছেন। সবাই এসেছেন ধর্ম নিয়ে। অধর্ম নিয়ে নয়। বরং অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই তাঁরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন আল্লাহর জমিনে। বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষ (গুটিকয়েক নাস্তিক মুরতাদ ছাড়া) তা সে মুসলমানই হোক আর হিন্দুই হোক, তাদের জীবন-যাপন ধর্মের ভিত্তিতে। যে মানুষের সারাটা জীবন আবর্তিত হয় ধর্মের ভিত্তিতে, সেই মানুষের জীবনের জন্য যে রাজনীতি

গুলশানের ইরানী দূতাবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক গোলাম আযমের সঙ্গে সহাস্যে করমর্দন করতে দেখা যায় আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও সাবেক বাকশাল সভাপতি মহিউদ্দিন আহমদে (বর্তমানে মরহুম)। করমর্দন শেষে জনাব মহিউদ্দিনের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী। মহিউদ্দিনের বাম পাশে আরেকজন আওয়ামী লীগ নেতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জনাব গোলাম আযমের সাথে করমর্দনের জন্য

www.pathagar.com

সেটা কোন্ যুক্তিতে ধর্মকে বাদ দিতে হবে? সুতরাং ধর্মের রাজনীতি নয়; বরং অধর্মের রাজনীতিই তো নিষিদ্ধ করা উচিত বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য, জীবনের সকল ক্ষেত্রে শৃংখলার জন্য, প্রগতির জন্য, উন্নয়নের জন্য। দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করলে যেমন পরিণতি মৃত্যু, তেমনি রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করলে সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

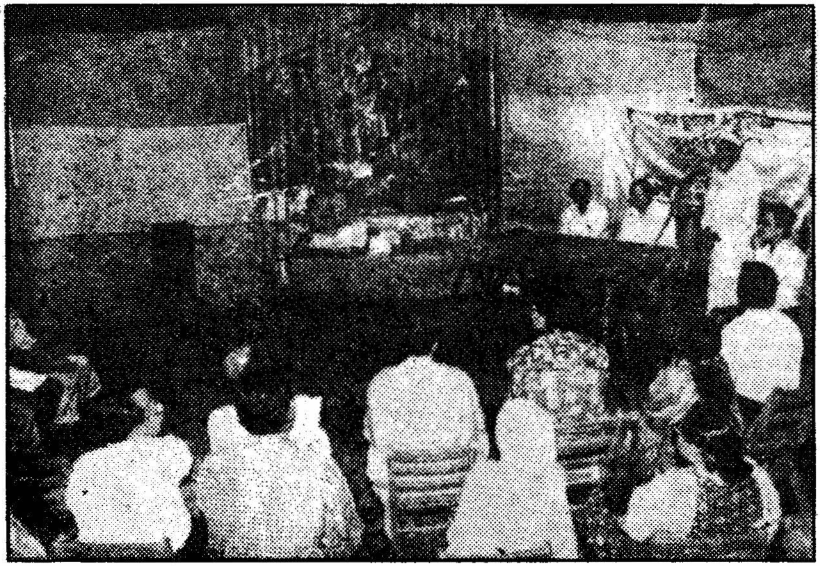

ঢাকা মহানগরীর ঐতিহাসিক শাহবাজ মসজিদের খাদেম জনাব আবদুল আলী শরীয়তের পূর্ণ লেবাসে হিন্দুদের দুর্গা ও কালী পূজার আনন্দ উৎসবে ওয়াজরত(?)। ২০০০ সালের ২৭ অক্টোবরের এ উৎসবের উদ্যোক্তাদের অন্যতম হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি সি. আর. দত্তসহ অনেক হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। পূজার এ অনুষ্ঠানে জনাব আলী কি বক্তব্য রেখেছিলেন তা অবশ্য রিপোর্টে উল্লেখিত হয়নি।

গত ২৭/৩/২০০১ তারিখে রমনা কালী মন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচন উপলক্ষে সুধাংশু শেখর হালদার ফতোয়ার বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করে বলেন, ফতোয়াবাজদের আমরা সাগরে চুবিয়ে মারবই মারব। যতদিন আমরা ফতোয়াবাজদের না মারতে পারব, সমূলে নিশ্চিহ্ন না করবো ততদিন এ দেশে আর আমাদের 'মা কালী' জাগবে না।

তিনি বলেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের রমনা কালীমন্দির ও ইন্দিরা মঞ্চ যারা ভেঙ্গেছে তারাই ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছে এবং আগামী ১ এপ্রিল লাঙ্গলবন্দ স্নানের দিন হরতাল ডেকেছে। এরা একই চক্র। এই ফতোয়াবাজ সাম্প্রদায়িক অপশক্তিটিকে যতদিন রাজনীতি ও এদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে না পারবো ততদিন আমাদের মুক্তি নেই, ধর্ম-কর্মও সব বৃথা। তিনি বলেন, ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীকে রমনা মন্দিরের কালী মায়ের পদতলেই আত্মসমর্পণ করানো হয়। তাই স্বাধীনতা বিরোধীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই মন্দির অপসারণ করেছে। আবার এরাই গত বছর মুসলমানদের নাম থেকে 'আলহাজ্ব মোহাম্মদ' বাদ দেয়ার দাবি জানায় এবং দক্ষিণাঞ্চলে হিন্দু রাজ্য বানাবার দেশদ্রোহী বক্তব্য দিয়েও বহাল তবিয়তে তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে পাড় পেয়ে যাচ্ছে। অথচ জাতীয় সঙ্গীতের প্যারোডি নিয়ে কি তুলকালাম কান্ডটাই না হলো।

www.pathagar.com

ওআইসি, না Oh! I See

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-কে অনেকে উপহাস করে বলে থাকে 'বাৎসরিক মিলনমেলা'। আবার কেউ কেউ এই সংস্থাকে ব্যঙ্গ করে বলে থাকে Oh! I See.

এই সংস্থা সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহদের মধ্যে এরূপ বিরূপ ধারণা পোষণ করার সঙ্গত কারণও রয়েছে। আমরা যদি এই সংস্থা গঠনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে দেখতে পাবো ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইহুদীরা মসজিদুল আকসায় অগ্নি সংযোগ করলে গোটা মুসলিম বিশ্ব প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর ফলে এ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে মরক্কোর বাদশাহ হাসান রাবাতে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের আমন্ত্রণ জানায়। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ২৫টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। সে সাথে মুসলমানদের উপর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মুসলমানদের একটি দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম মুসলিম দেশের সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মূল কাঠামো গড়ে উঠলেও ১৯৭০ সালে জেদ্দায় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন এই সংস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এরপর থেকে ওআইসি মুসলিম দেশগুলোর বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ হিসাবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রথম দিকে যে স্পিরিট নিয়ে এই সংস্থাটি গঠন করা হয়েছিল পরবর্তীতে তা মুসলমানদের চিরশত্রু ইহুদী-খ্রীস্টানদের পকেট সংস্থায় পরিণত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দুঃখজনক হলেও সত্য অধিকাংশ মুসলিম দেশ প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ১৩০ কোটি মুসলমানের স্বার্থ-সংরক্ষণের দাবীদার এই প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।

গত ৩১ বছর যাবত ওআইসি তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সর্বক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর ন্যূনতম প্রত্যাশাও পূরণ করতে পারেননি। তাই অনেকে এই সংস্থাকে কিতাবী সংস্থা হিসাবেও আখ্যায়িত করে থাকে। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠাকালে যেসব মৌলিক ঘোষণা ব্যক্ত করা হয়েছিল এর মধ্যে অন্যতম ছিলো ঔপনিবেশিকতার মূলোৎপাটন। মর্যাদা, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, জাতীয় অধিকার আদায়ের জন্য পরিচালিত মুসলমানদের সংগ্রামকে জোরদার করার কথা বলা হয়েছিল। অথচ কাশ্মীরের মুসলমানেরা দীর্ঘদিন যাবত স্বাধীনতার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালাচ্ছেন। ভারতে মুসলিম নিধন যজ্ঞ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তাদের সমর্থনে কার্যকর কোনো প্রচেষ্টা ওআইসি কর্তৃক আজো গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু ওআইসি'র অনেক সদস্য রাষ্ট্র ভারতের সাথে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আরো জোরদার করেছে। চীন ও শ্রীলংকায় চলছে মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন। এ সম্পর্কেও ওআইসি'র কোনো সুস্পষ্ট প্রতিবাদী বক্তব্য নেই। স্বাধীন বসনিয়ার ক্ষেত্রেও এই সংস্থাটির ভূমিকা মুসলমানদের চরমভাবে হতাশ করেছিল। নিষ্ঠুর সার্বদের নারকীয় নির্যাতনে বসনিয়ার মুসলমানেরা যখন দিশেহারা তখন বিশ্ববাসীর অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং বিবেক কাঁদলেও ওআইসি'র বিবেক কাঁদেনি। বসনিয়ার মুসলমানেরা অস্ত্র বা অর্থ সাহায্য নয়; নৈতিক সমর্থনের আকুল আবেদন জানিয়েও সে সমর্থনটুকুও তারা আদায় করতে পারেনি। সার্বরা যখন

www.pathagar.com

পশ্চিমা দেশগুলোর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদে ও সমর্থনে বিভিন্ন কৌশলে মুসলমানদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও পাইকারী হারে গণহত্যা চালিয়ে যায় তখন ওআইসি শুধু মাত্র দুঃখ প্রকাশ এবং এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ইত্যাদি প্রস্তাব রেখে তাদের কর্তব্য শেষ করে। পরবর্তীতে ইরান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ কয়েকটি দেশ যখন অস্ত্র প্রেরণের কথা বলে তখন ওআইসি এই দেশগুলোর দাবীর প্রতি জোড়ালো সমর্থন করেনি। আলজেরিয়ায় ইসলামী দল ১৯৯২ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু মার্কিনীদের ষড়যন্ত্রে ইসলামী দল ক্ষমতায় যেতে পারেননি। সেখানে চলছে সেনাবাহিনীর চরম নির্যাতন। আলজেরিয়ায় আজ ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ের ফলে রক্তের বন্যা বইছে। রক্ত নিয়ে হোলিখেলা চলছে। চেচনিয়ার ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখেছি সেখানেও ওআইসি নীরবে তা অবলোকন করেছে। আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন যাবত ভ্রাতৃঘাতী লড়াই বন্ধে শুধু প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমেই ওআইসি তার তৎপরতা সীমাবদ্ধ রেখেছে। সকল বিবাদমান পক্ষকে আলোচনার টেবিলে একত্রিত করে যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে তাদেরকে দেখা যায়নি। ওআইসি অনুচ্ছেদে মুসলিম পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের সমন্বিত প্রয়াসের কথা উল্লেখ আছে। আজও বায়তুল মোকাদ্দাস ইহুদীদের দখলে। ভারতে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে, কাশ্মীরে হযরতবাল মসজিদ ও মাজার ধ্বংস করা হয়েছে। অথচ ভারতের এই ঘৃণ্য তৎপরতার বিরুদ্ধে সামান্য বিবৃতি প্রদান ছাড়া আর কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এই সংস্থাটি।

ওআইসি'র আচরণ বিধিতে আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ওআইসি'র সদস্য রাষ্ট্রগুলো তা চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে আসছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল করা হয়েছিল। মিসর জোর করে সুদানের একটি সীমান্ত এলাকা দখলের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল কিন্তু ওআইসি শান্তিমূলক ব্যবস্থায় এগিয়ে আসেনি। অমুসলিম পরাশক্তি আজ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অথচ সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা মুসলিম রাষ্ট্রকে নিরস্ত্র করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ইরাককে নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে আমেরিকা জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে সাদ্দামের প্রাসাদেও তল্লাশি চালিয়েছে। তা মুসলিম উম্মাহের জন্যও অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও অমর্যাদাকর। অথচ এই প্রসঙ্গেও ওআইসি'র টু শব্দটি নেই।

মুসলমান দেশগুলোতে আজ মতপার্থক্য থাকার কারণে ইহুদী, খৃস্টান, ব্রাহ্মণ্যবাদীসহ অন্যান্য বিধর্মীরা বিভিন্ন কৌশল ও বিভিন্ন প্রলোভনে মুসলমানদের ব্যবহার করছে এবং মুসলমানেরা বিভিন্ন আগ্রাসনের শিকার হয়ে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়েছে এবং হতে যাচ্ছে। বিজাতীয় সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে মুসলমানদেরকে আজ পরগাছা জাতিতে পরিণত করেছে। অথচ আজ পর্যন্ত ওআইসি নামক একটি সংগঠন এসব আগ্রাসন রুখতে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা বা ইলেকট্রোনিক্স মিডিয়া গঠন করতে পারেনি। ওআইসি'র উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে ৭টি সংস্থা রয়েছে তার মধ্যে ইসলামী সংবাদ সংস্থা একটি। ঠিক একই অবস্থা ইসলামী

www.pathagar.com

শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। ওআইসি'র উদ্যোগে এখনও কোনো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেনি। মুসলমানদের সবচেয়ে গৌরবজনক ও স্বর্ণযুগ ছিলো খেলাফত শাসন। এই খেলাফত শাসনের মূলধারা থেকে মুসলিম সমাজ বিচ্যুৎ হবার কারণেই আজ বিধর্মীয় দ্বারা চরমভাবে মার খাচ্ছে। আজকে কথায় কথায় সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অবাধ্য মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করছে। অথচ বিশ্বের ১৩০ কোটি মুসলমানের ৫৫টি রাষ্ট্র যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করতো তাহলে মুসলিম উম্মাহে'র তাবৎ সমস্যা ৭ দিনের মধ্যে সমাধা করা সম্ভব হতো।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে উন্নয়নের নামে মুসলমানদের সীমাহীন শোষণ করছে। অথচ অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র সম্পদশালী হয়েও বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সমপর্যায়ে এখনো যেতে সক্ষম হননি।

সুতরাং ওআইসিকে যদি কাঙ্ক্ষিত মুসলমানদের প্লাটফর্ম হিসাবে মনে করা হয় তাহলে মুসলিম জাহানকে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিবাদ ভুলে মুসলমানদের সম্মানজনক অবস্থান তৈরীর লক্ষ্যে জাতিসংঘের বিকল্প একটি বিশ্ব সংস্থা হিসাবে ওআইসিকে গড়ে তুলতে হবে। মুসলিম উম্মাহের ঐক্যবদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের মোকাবেলা করা এবং তাদের খপ্পর হতে বের হয়ে আসার কোনো বিকল্প বা সংক্ষিপ্ত পথ নেই।

আমেরিকান পীসকোর

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে নিয়ে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের যেসব চতুর্মুখী চক্রান্ত চলছে মার্কিন পীসকোরের কর্মকান্ড শুরুর অনুমোদন আরেকটি সংযোজন। উল্লেখ্য, বর্তমান মন্ত্রিসভা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ১৯৭৮ সালে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে বাংলাদেশ মার্কিন পীসকোরের কর্মকান্ড পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব অনুমোদন করে। অর্থাৎ বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার এক বছর তিন মাসের মাথায় ২২/৯/১৯৯৭ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিসভা কক্ষে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই অনুমোদন দেয়া হয়।

এই মার্কিন পীসকোরের কর্মকান্ড দেশে-বিদেশে বরাবরই বিতর্কিত। পিছনের দিকে দৃষ্টি ফেরালে তাদের ঘৃন্য কর্মকান্ডের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। পীসকোর প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক তাৎপর্য হলো– আমেরিকা দ্বিতীয় পর্যায়ে ভিয়েতনাম আক্রমণ এবং দৃষ্টিকটু অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং সময়ের ব্যবধানে তা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সমালোচকরা ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য প্রধানত আমেরিকাকে দায়ী করছিলো। এসব সমালোচনা আমেরিকার তরুণ সমাজে সরকার বিরোধী মানসিকতার সৃষ্টি করে। ফলে সেখানকার তরুণদের মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী চেতনা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি কয়েকটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন যার একটি হলো 'পীসকোর' বা শান্তি বাহিনী।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য আমেরিকার ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নিজ দেশের যুদ্ধ বিরোধী সচেতন বেকার যুবকদের ব্রেইন ওয়াশ করে ভিন দেশে পাঠিয়ে আমেরিকার নীতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। তাই তিনি হাজার হাজার নওজোয়ানদের বিশেষ করে যারা স্কুল-কলেজ ছেড়ে (অনেকে ড্রপ আউট) বেকার অবস্থায় ছিলো তাদেরকে নিয়ে এই 'পীসকোর' গঠন করেন সরকারি ব্যয়ে, আমেরিকার অর্থে পুষ্ট ও নির্দেশে পরিচালিত দেশগুলোতে প্রেরণের জন্য জনাব কেনেডী গর্বের সাথে এদেরকে শান্তির দূত হিসাবে আখ্যায়িত করে বলতেন, পীসকোরের সদস্যরা বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নশীল কাজে সহযোগিতা করার পাশাপাশি যে দেশগুলোর মানুষ সম্পদ, দুঃখ-দরিদ্র ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি লাভ করবে। তখন পর্যন্ত এই পীসকোর পরিকল্পনার পিছনে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে গুপ্তচর প্রেরণের কোনো ইচ্ছে ছিলো বলে কেউ স্পষ্ট করে বলেনি। তাই সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস সরকারগুলো 'পীসকোর'কে স্বাগত জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো।

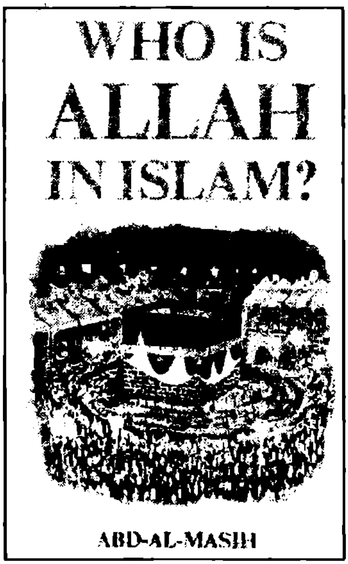

ইসলামে আল্লাহ ও খ্রীষ্টধর্মে গডের পার্থক্য নিয়ে লেখা একটি বিভ্রান্তিকর বই

ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান আমেরিকার হাত ধরে ক্ষমতায় এসেছিলেন। অথচ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট থাকাকালে দুই ভিন্ন ধারার দেশের সঙ্গে সমানভাবে বন্ধুত্ব রেখে চলতে চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে সে সময় গোটা বিশ্ব প্রায় অবাক বনে গিয়েছিলো। আমেরিকার সাথে চীনের সম্পর্ক মোটেও সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিলো না। অথচ পাকিস্তান তখন ঐ দু'দেশের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলো। এই নিয়ে ১৯৬৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা দৈনিকের ভেতরের পাতায় একটি বিরাট আকারের কার্টুন প্রকাশ করে। কার্টুনটির বিষয়বস্তু ছিলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসন এবং চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর চিত্র এঁকে তাঁদের দু'জনের ঘাড়ে আইয়ুব খান তাঁর দু'পা রেখে বীরের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। ক্যাপশনে মন্তব্য ছিলোঃ 'দি গ্রেট ম্যাজিশিয়ান'।

উপমহাদেশের রাজনীতির উপর দুই পরাশক্তির প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করতে দেখা যায়। আমেরিকা যদি পাকিস্তানের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রাখার চেষ্টা করে, ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন পাল্টা জল্পনা-কল্পনা ও কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয়। চীনের সাথে বন্ধুত্বও আবার ভারতের নিকট ঈর্ষণীয়।

১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর চীন-ভারত যুদ্ধ বেঁধে গেলে ২৮ অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডী চিঠির মাধ্যমে যুদ্ধে ভারতকে সাহায্য করার জন্য আইয়ুব

www.pathagar.com

খানকে অনুরোধ জানান। তিনি তাতে পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে ভারতের সাথে এক শান্তি চুক্তিতে আসতে বলেন যা সামরিক চুক্তিরই নামান্তর। কিন্তু বিষয়টি ছিলো জনমত পরিপন্থী। আইয়ুব খান তাই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে মার্কিন প্রশাসন আইয়ুব বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব একদিন আমেরিকানদের হাত ধরে ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু তাদের নির্দেশ অমান্য করার অল্পদিনের মাঝেই বন্ধু চিরশত্রুতে পরিণত হন।

মার্কিন প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয় আইয়ুব খানকে তাদের নির্দেশ অমান্য করার খেশারত দিতে হবে। তাকে ক্ষমতা থেকে 'যেতে হবে'। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইয়ুব উৎখাত পরিকল্পনা গ্রহণ করে সিআইএ। পাকিস্তান ভাঙ্গার পরিকল্পনা তৎকালে মার্কিন সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইয়ুব উৎখাতে ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরীতে নেমে পড়ে সিআইএ। একটি সামরিক, অপরটি রাজনৈতিক। সামরিক চাপ ব্যর্থ হলে শুরু হবে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধই হচ্ছে সেই সামরিক চাপ। এ ছাড়া ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ করে ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার আগে ১৯৬৫ সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ভারত-পাকিস্তান তাসখন্দ বৈঠকে যোগদানের পূর্বে চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই পাকিস্তান সফরে আসেন পরিস্থিতি ও বন্ধুত্ব মূল্যায়নের জন্য। পাকিস্তান একটি ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দেশের প্রধানমন্ত্রী চৌ কর্তৃক পাকিস্তান সফর তখন গোটা বিশ্বে কৌতুহলের সৃষ্টি করে। চীনের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান সফরে আসায় সে সময়কার পরিস্থিতিতে আমেরিকার নিকটও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকা মনে করে পাকিস্তান তাদের বন্ধুরাষ্ট্র, কিন্তু চীনের সাথে দহরম-মহরম আমেরিকার নিকট অসহনীয়। অপর পক্ষে ভারত দারুণভাবে উদ্বিগ্ন যে, চীন আবার পাকিস্তানে কেনো। এই পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে গিয়ে মর্নিং নিউজ পত্রিকায় একটি কার্টুন প্রকাশিত হয়। এতে দেখানো হয় রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই রাওয়ালপিন্ডিতে ডোগড়ন পরামর্শরত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসন দরজার ফুটোতে চোখ রেখে ভিতরের হাবভাব লক্ষ্য করছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ভয় কাতর অবস্থায় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পা ঝাপটিয়ে ধরে শুয়ে পড়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে আমেরিকানদের কূটনীতি ও রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে ইসলাম ধর্মকে মোকাবেলা করা। মৌলবাদের নামে ইসলাম বিদ্বেষী জনমত গড়ে তোলা। তাদের রাজনীতি ও কূটনীতি সবই খ্রীষ্টীয় ধর্মকে ঘিরে। সেবা ও উন্নয়নের নামে এই মার্কিনীরা পরোক্ষভাবে খ্রীষ্টান ধর্মের পক্ষেই সারা বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের মতো কাজ করে যাচ্ছে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকঢোল পিটিয়ে ১৯৬৩ সালে 'পীসকোর'-এর সদস্যরা আসে। এই সদস্য দলের একজনের নাম ছিলো রবার্ট ক্রুক। তিনি মুসলিম এর

www.pathagar.com

ছদ্মাবরণে নূরুল ইসলাম নাম ধারণ করে এদেশে আসেন। এ সম্পর্কে মরহুম মাওলানা ভাসানীর বক্তব্য লক্ষ্যণীয়। তিনি ষাট এর দশকের মাঝামাঝি সময় মতিঝিলের অফিসে বসে দলের নেতা-কর্মী আর ক'জন সাংবাদিকের সাথে ঘরোয়া আলোচনার সময় বলেছিলেন- "মার্কিনীরা এখন কাগমারী পর্যন্ত সাংবাদিক পাঠাচ্ছে। একজন মুসলমান মার্কিন তোমরা আর কি জান, সে তো এদেশের সব খবরই জানে।"

সে লক্ষ্যে জন এফ কেনেডী তৎকালীন পাকিস্তানে এই 'পীসকোর' পাঠানোর প্রস্তাব পাঠায়। ফলে আইয়ুব খানও 'পীসকোর' প্রেরণের মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পীসকোর রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা, জাতীয় চেতনা, ঐতিহ্য, ধর্ম উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স দেয়া হয়। তাদেরকে বাংলা

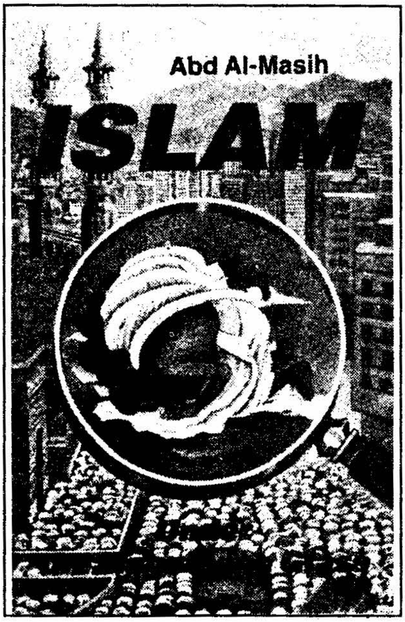

এই বইটিতে ইসলাম ধর্মকে অসার, মানবতাবিরোধী ও মৌলবাদী দর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে

ফিলিসতনী প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত তিউনিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের একটি পোস্টার দেখান। পোস্টারে মহানবী (সাঃ)কে শূকরছানা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

শেখানোর জন্য ঢাকা থেকে একজন প্রাক্তন সাংবাদিক নিয়ে যাওয়া হয়। পিটার্সবার্গের নিকটবর্তী পাটনী নামক স্থানে এই ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালিত হয়েছিল। আইয়ুবের আমেরিকান 'পীসকোর' আসার ছাড়পত্র প্রদান দেশে বেশ সমালোচিত হয়। তরুণ আমেরিকানদের এদেশে অবাধে চলাফেরার সুযোগ দিলে আমাদের নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি যে দূষিত হবে না, সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সর্বোপরী একথা বলা হয় যে, এদের ছদ্মবেশে অন্যান্য চরিত্রের মানুষের যে আগমন ঘটবে না তাইবা কি করে বলা যায়।

এই পীসকোর-এর কার্যক্রম সম্পর্কে মরহুম মাওলানা ভাসানী যতটুকু সচেতন ছিলেন তৎকালীন শাসক আইয়ুব ছিলেন এর চেয়ে বেশি অসচেতন। উর্দিপরা আইয়ুব খান এসব ব্যাপারে কোনো খবরই রাখতেন না। স্থানীয় আমেরিকান অফিসের প্রধানই ছিলেন পীসকোরের মূল পরিচালক। তার পরিচালনায় ও নির্দেশে তারা এ অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে মিশে যেতে থাকে। এদেরকে স্বাগত জানাতেও একশ্রেণীর মানসিক দাস পাওয়া যায়। তারা নিজেদেরকে ধন্য করার জন্য পীসকোর সদস্যদেরকে প্রাণঢালা সহযোগিতা দান করতে থাকে। আর সে সুযোগে মেয়েরা শাড়ি পরে এবং ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবি পড়ে স্বাধীনভাবে বেড়াতে থাকে দেশের অলি-গলি ও অরণ্য জনপদে। এমনকি সামান্য সময়ের ব্যবধানে তাদের অনেকে নতুন উৎসাহী বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে সন্ধ্যা কাটাতেও শুরু করে। আর সে সুযোগে তারা দেশের মাঝে আমেরিকা ও ভারতের অনুকূলে এবং আইয়ুব ও ইসলাম বিরোধী জনমত গড়ে তোলে বলে অভিযোগ উঠে। নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে আরো গুরুতর। নূরুল ইসলাম 'পীসকোর'-এর সদস্যের সাথে একত্রে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করলেও তিনি তাদের সাথে থাকতেন না এবং সে ব্যাপারে কারো কোনো অভিযোগও ছিলো না। তার বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো রাজনৈতিক অঙ্গনে, ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী মহলে। সাংবাদিক পরিচয়ে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, মাওলানা ভাসানীসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাথে কথা বলতেন। ভাসানীর সাথে কথা বলার জন্য তিনি কাগমারী পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আর সে কথাই তিনি তাঁর অফিসে বসে লোকজনকে বলেছিলেন।

নূরুল ইসলামকে মনে হতো একজন বাঙালী বংশোদ্ভুত আমেরিকান। মুসলমানী নাম, বাংলা বলার যোগ্যতা আর শুভ্র চামড়ার কারণে রবার্ট ক্রুকের গ্রহণযোগ্যতা সমাজে একটু বেশিই ছিলো। বিভিন্ন পরিবার, ছাত্র-যুবকের সভা-সমিতি থেকে পল্টন ময়দান পর্যন্ত ছিলো তার অবাধ বিচরণ। পরবর্তীতে তার কার্যক্রম, গতিবিধি ও নতুন পরিচয়ের কাহিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। 'পূর্বদেশ' বিরাট হেডলাইনের পাশে সংগৃহীত আলোকচিত্রে চিহ্নিত করে প্রকাশ করে যে, প্রকৃত রবার্ট ক্রুকই ঢাকায় নূরুল ইসলাম ছদ্মনামে অতিথির সেবা পাচ্ছেন।' এই রিপোর্ট ছাপার তিন সপ্তাহ পরে নূরুল ইসলাম রবার্ট ক্রুক নামে দেশত্যাগ করেন। কিন্তু তার আগমনের সময় ঢাক-ঢোল পিটিনো হলেও তার প্রস্থান কেউ জানতে পারেনি। অতঃপর পীসকোর-এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে পীসকোর বন্ধ করে দেয়ার অপরাধে মার্কিন সিদ্ধান্ত মোতাবেক

www.pathagar.com

আইয়ুব উৎখাতে ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরীতে নেমে পড়ে সিআইএ। রাজনৈতিক ও সামরিক যুগপৎ চাপে আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে অসহায়ভাবে বিদায় নিতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৭ সালে নতুন করে এই পীসকোর তৎকালীন সরকার কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উভয় সরকারের মধ্যে এ বিষয়ে একটি চুক্তিও বাস্তবায়িত হয়েছিলো। কিন্তু জনগণের বিরোধীতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

হ্যাগাই এলামনাই এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
অতীত থেকে বর্তমান (১৯৭৮-১৯৯৪)

খ্রীষ্টীয় নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে হ্যাগাই ইনষ্টিটিউট বর্তমানে বিশ্বে প্রভূত সুখ্যাতি অর্জন করেছে। ডাঃ জন হ্যাগাই এর অন্তরে যে দর্শন ছিল, বর্তমান হ্যাগাই ইনষ্টিটিউট তারই সফলতার নিদর্শন। কোন বস্তুই একদিনে সফলতা অর্জন করে না, যেমন ঘটেছিল যোষেফের জীবনে। বহু বাধা বিঘ্ন, অত্যাচার, নিপিড়ন অতিক্রম করে যোষেফ একদিন রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যে দর্শনের বীজ ১৯৬৯ সালে রোপিত হয়েছিল, ১৯৯৪ সালে তা ফুলে, ফলে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

খ্রীষ্টীয় নেতৃত্ব প্রশিক্ষণে দেশের বাইরে সিঙ্গাপুর ও আমেরিকায় (হাওয়াই) যাবার সুযোগ হয়েছে অনেকের। বাংলাদেশ থেকে এপর্যন্ত প্রায় ১০০ জনের মত পুরুষ ও মহিলা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের পক্ষে ছোট বড় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই প্রশিক্ষণ যারাই নিয়েছেন, তারা সকলেই নিজ দেশে ফিরে এসে অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষে ১৯৭৮ সালে ঢাকা এইচ, আই, এলামনাই এসোসিয়েশন নামে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমাদের এই প্রচেষ্টাকে প্রয়াত ডঃ ঢালী রে স্বাগত জানান। সম্ভবতঃ এইচ, আই, এলামনাই এসোসিয়েশন হিসাবে আমরাই ছিলাম অগ্রদূত। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের এলামনাইগণ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পর- আমরা বেশ কয়েকটি সেমিনারের ব্যবস্থা করি- তার মধ্যে ইমানুয়েল ব্যাপটিষ্ট চার্চ, মেথোডিস্ট এ, বি, চার্চ, সেবেনিমানী ব্যাপটিষ্ট চার্চ, সিয়োন ফ্রি ব্যাপটিষ্ট চার্চের সেমিনারগুলি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে যারা কমিটিতে থেকে প্রভূত অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে প্রয়াত যোষেফ ইলিয়াস, মিঃ যাকোব চৌধুরী, মিঃ জন বি, অধিকারী, মিঃ সুধীর দেও নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও অনেকে কমিটির ভিতরে ও বাইরে থেকে প্রভূত পরিমাণে সহযোগিতা করেছেন, যাদের কাছে আজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে থাকা যায় না। আমাদের বর্তমান সভাপতির জন্য মিঃ ক্লিন মজুমদারের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিগত দিনগুলিতে আমরা অর্থনৈতিক ভাবে খুবই দুর্বল ছিলাম। আমাদের সেমিনারগুলি পরিচালনার জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ; সি, এস, এস, সুইডিশ ফ্রি মিশন, প্রেসবিটারিয়ান ফেলোশিপ আমাদের সাহায্য করেছেন। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত দান ও মণ্ডলীগণের সহযোগীতা আমাদের সামনে চলার পথ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমরা এলামনাইগণ বিভিন্ন মণ্ডলীতে পূর্ণকাল বসবাস করেও আমাদের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা বিতরণ করতে চেষ্টা করেছি।

পরবর্তীতে যখন এইচ, আই, এলামনাইদের সংখ্যা বাড়তে থাকে তখন ঢাকার বাইরের সদস্যগণ অভিযোগ করলেন, কেন ঢাকা এইচ, আই, এলামনাই এসোসিয়েশন? এটা কেন বাংলাদেশ এইচ, আই, এলামনাই এসোসিয়েশন হতে পারে না। এই প্রকার সমালোচনার ভিত্তিতে, ঢাকা শব্দের পরিবর্তে বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং বাংলাদেশের সকল এইচ, আই এলামনাইদের এই সংগঠনের সদস্য-সদস্যা হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থানে যেমন বিরিশিরি, ভোলা, ঘোড়াঘাট, চট্টগ্রাম, পার্বতীপুর, রাজশাহী, খুলনা, জামালপুর, ঢাকা সিটির বিভিন্ন এলাকায় একদিন অথবা দুইদিন করে সেমিনার করতে সমর্থ হয়েছি, এ ছাড়াও প্রতি বৎসর একটি করে আবাসিক সেমিনার করতে সমর্থ হয়েছি, যেখানে সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল এবং ৬ থেকে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এলামনাইদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আবাসিক সেমিনারে সব সময় অন্ততঃপক্ষে দুইজন বিদেশী শিক্ষক আমাদের মধ্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

উল্লেখ করবার নেই যে, অনেক প্রচেষ্টার পর বিগত বৎসর ১৯৯৩ তে আমরা একটি কনষ্টিটিউশন অনুমোদন করতে পেরেছি। সব কিছুরই আবার কিছু দিক থাকে। আমাদেরও যে তা নাই, তা নয়। অতীব দুঃখের সাথে এ কথা বলতে হয় যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ এলামনাইগণ সক্রিয় সহযোগিতা করেন না। ফলে যেভাবে আমাদের অনেক হওয়া উচিত, সেভাবে আমাদের অগ্রগতি হয়নি। তথাপি স্থানীয়ভাবে যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন (প্রায় ৫০০) তাদের অনেকেই নিয়মিত সহযোগিতা করে আমাদের হাতকে সবল রেখেছেন।

বিগত বৎসর ভারত (কলকাতা) তাদের সেমিনারে বাংলাদেশ থেকে দুইজনকে শিক্ষক হিসাবে দুইটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিতে আহ্বান জানান। এ বৎসরও সেখানে শিক্ষক হিসাবে কয়েকজনের যাওয়ার নিমন্ত্রণ রয়েছে।

গত বৎসর হ্যাগাই ইনষ্টিটিউট এর কোয়ার্টারলী রিপোর্টে বাংলাদেশের কর্মকাণ্ডের উপর বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়।

আমাদের কর্মকাণ্ডকে আরো প্রসারিত করতে চাই। হ্যাগাই ইনষ্টিটিউট আটলান্টা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২ হাজার সাল নাগাদ ১০ হাজার নেতাদের প্রশিক্ষণ দিবে। আমরাও এ সিদ্ধান্তের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরাও অসংখ্য পুরুষ ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিতে ইচ্ছুক, এর জন্য প্রয়োজন আপনার সহযোগীতা ও অর্থনৈতিক অনুদান। আপনি যে বিষয়ে দক্ষ, সেই বিষয়ে অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে আসুন, আমাদের এই এসোসিয়েশনটি শক্ত করতে আপনার হাতকে বাড়িয়ে দিন।

সিলভার জুবিলী উপলক্ষে এ বৎসর আমরা একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। এ ছাড়াও প্রতি বৎসর আমাদের কর্মকাণ্ডের উপর একটি বুলেটিন ছাপানো হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক বিষয়ে আমরা বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ভিশন, আমেরিকার হেড অফিসের কাছে কৃতজ্ঞ, যারা প্রতি বৎসর আবাসিক সেমিনারের জন্য সামান্য হলেও কিছু না কিছু অর্থ দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশের সকল এলামনাইদের সাথে আমরা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। এ উদ্দেশ্যে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আমরা চিঠি-পত্র, কার্ডসের অভেচ্ছা দিয়ে সকলকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করে থাকি। কেউই সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। তাই আমাদেরও ভুল-ত্রুটি আছে। এর পরও যারা নেতৃত্বে আসবেন, তাদেরও ভুল-ত্রুটি থাকবে। আসুন আমরা ধ্বংসাত্মক সমালোচনা না করে বরং গঠনমূলক আলোচনা করি এবং সম্মিলিতভাবে এসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ডকে শক্তিশালী করি। ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

ইতি-

তারিখ- ২৩-৪-১৯৯৪ইং

সাইমন এম, নাথ
সভাপতি,
হ্যাগাই এলামনাই এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
পোষ্ট বক্স -২৬০১, ঢাকা- ১০০০

২৩ এপ্রিল '৯৪ হ্যাগাই এলামনাই এসোসিয়েশন বাংলাদেশ-এর রজত-জয়ন্তী উৎসবে সাইমন এম, নাথ এর পঠিত প্রতিবেদন

www.pathagar.com

সম্প্রতি পীসকোরের একটি বিরাট দল বাংলাদেশে এসেছে। ইতোমধ্যেই দেশের সচেতন জনগণ বুদ্ধিজীবী মহলে এ বিষয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং এই উদ্যোগের চরম বিরোধিতা করেছেন। বর্তমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে সচেতন জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষুব্ধ হওয়ার ও বিরোধিতা করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

সম্ভবত ১৪০৪ অথবা ১৪০৫-এর ১ ফাল্গুনে বসন্ত বরণ উৎসবে উলুধ্বনি, রাখি পরিধান এবং শোভাযাত্রার নামে দুর্গাপূজার বাজনা, উদ্দাম ও অশ্লীল নৃত্যের মধ্য দিয়ে কথিত 'বসন্ত উৎসব' পালিত হয়। পবিত্র জুম্মাবারে বেলা ১২টার দিকে শোভাযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে দিয়ে শহীদ মিনারে যায়। এতে দুর্গাপূজার বাজনা বাজিয়ে কিছুসংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীর অশ্লীল ভঙ্গিতে ঢলাঢলি, পরস্পরের প্রতি খোলামেলা আচরণ, ঢোল-তবলা-মন্দিরার তালে তালে নৃত্য-গীত পথচারীদের বিস্মিত করে। এর আগে সকালে সাড়ে ৯টায় কবি শামসুর রহমান বকুলতলার মঞ্চে আসেন। তার নেতৃত্বে উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসব। অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ২/৩ শ' নর-নারীর মধ্যে বেশির ভাগই কয়েকটি এনজিও'র কর্মী হিসাবে পরিচিত, কয়েকজন খ্রীষ্টান যাজক (পাদ্রী) প্রকৃতির ব্যক্তিকেও অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। শামসুর রাহমানের নেতৃত্বে উলুধ্বনি দেয়ার সময় নর-নারীদের সঙ্গে আসা শিশু-কিশোরদের উলুধ্বনি দিতে অনুপ্রাণিত করতে দেখা যায়।

উলুধ্বনি পর্বের পর তরুণ-তরুণীরা পরস্পর-পরস্পরকে হাতে রাখি পরিয়ে দেয়। অনেকে কপালে মঙ্গল তিলক কেটে, হাতে-মুখে রঙ মাখিয়ে সং সেজে মজা করে। পুলিশ প্রহরায় শ'পাঁচেক তরুণ-তরুণী, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী এবং ধুতি শাঁখা-সিঁদুর পরিহিত নর-নারীরা এই আনন্দ র‍্যালিটি ভার্সিটির বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে আবার চারুকলা ইনস্টিটিউটে ফিরে যায়। 'ওহে গৃহবাসী খোল খোল দ্বার' সঙ্গীতের সাথে তরুণ-তরুণীরা কীর্তন সুরে আনন্দ শ্লোগান তোলে ঃ

'আজি আনন্দ– ধরে না,
শান্তি চুক্তি হয়ে গেছে,
আনন্দ ধরে না।
গঙ্গায় জল বেড়ে গেছে
আনন্দ ধরে না ইত্যাদি।'

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে উলুধ্বনি, রাখি বন্ধন, পূজার বাজনা, আবির তিলক, শাঁখা-সিঁদুর কোন্ ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে? আর যে সব খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এই আনন্দ মিছিলে যোগদান করেছেন তাদের আসল উদ্দেশ্য কি? আর শান্তি গঙ্গার চুক্তির সাথে 'বসন্ত বরণ' উৎসবের সম্পর্ক কি? এর জবাব একটাই। মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চাইতে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির সাহায্যে খুবই সহজ। তাই বাঙালীত্বের নামে ইহুদী-খ্রীস্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র এবং এদেশীয় সেবাদাসদের সহযোগিতায় বিভিন্ন উৎসবে বেছে নিয়েছে বিজাতীয় সংস্কৃতি।

এই বিজাতীয় সংস্কৃতিসেবীরাই মিডিয়াগুলোতে বলে থাকে গত একুশ বছর যাবত

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী সরকারগুলো চাকমাদের উপর সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়ন এবং অবিচার চালিয়েছে। এইসব নির্যাতন-নিপীড়ন এবং বঞ্চনার শিকার হয়ে নাকি দলে দলে উপজাতীয়রা ভারতের ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তাদেরকে সংঘাত-সংঘর্ষে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য শুনলে মনে হয় ভিন দেশী বুদ্ধিজীবীরা টিভিতে বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে তাদের এই ধরনের বক্তব্যের অসারতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

গত একুশ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। বহু ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এর কতো অংশ বাঙালী আর কতো অংশ উপজাতীয় এই হিসাব নিশ্চয়ই সরকারের কাছে রয়েছে। গত একুশ বছরে যেসব উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এর মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশে কতো টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আর পার্বত্য চট্টগ্রামের এক-দশমাংশ অংশের উন্নয়নের জন্য কতো অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে এর হিসাবও নিশ্চয়ই সরকারের কাছে রয়েছে। এ ছাড়া গত একুশ বছরে বাঙালী জনগোষ্ঠীর চেয়ে অধিক সুযোগ-সুবিধা উপজাতীয়দের দেয়া হয়েছে। যা বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রে উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন। এরপরও যখন কেউ কেউ তৎকালীন শাসকদেরকে আগ্রাসী, অত্যাচারী হিসাবে বিবেচিত করে তখন বুঝতে কষ্ট হয় না এরা কাদের এজেন্ট। তাইতো এদের আনন্দ ও শান্তি মিছিল বিজাতীয়দেরও দেখা যায়।

খ্রীষ্টান লাইফ বাংলাদেশ (সি. এল. বি)

প্রার্থনা করুন

বিষুবরেখার উত্তরে ১০-৪০ ডিগ্রী পর্যন্ত অবস্থিত অঞ্চলগুলি-যা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আড়াআড়ি এবং এশিয়া মহাদেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বৃহৎ অঞ্চল মুসলিম ব্লক, হিন্দু ব্লক এবং বৌদ্ধ নামে পরিচিত। এই অঞ্চলগুলি "আন্তর্জাতিক প্রার্থনা খ্রীষ্টাব্দ ২০০০ আন্দোলন" দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রার্থনার ইংরেজী নামকরণ করা হয়েছে, প্রেয়িং থ্রু দ্যা উয়িনডো। (Praying Through The Window)

আপনার এই প্রার্থনা অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ উক্ত প্রতিবন্ধী এলাকাগুলো সুসমাচারের জন্য মুক্ত হয়ে যাবে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

ধন্যবাদান্তে-

ষ্টিফেন সরকার

যোগাযোগ ঠিকানা:
জি.পি.ও বক্স ২২৮১
ঢাকা-১০০০
টেলিফোন: ৮১৩৩০৭, ৮১০৫৪৫

www.pathagar.com

বিজাতীয় শ্লোগান শোনা যায়।

শান্তি কে না চায়। দেশের উচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই শান্তি চায়। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে 'শান্তি' শব্দটি প্রচলিত তা এই জাতির জন্য খুব একটা সুখকর নয়। ১৯৭১ সালে এ দেশের মানুষ শান্তি কমিটির ভয়াবহতা দেখেছে। শান্তি বাহিনীর 'শান্তি'র মহড়াও গত বিশ বছর যাবত এদেশের বাঙালীরা দেখেছে। কয়েক হাজার শান্তি বাহিনীর শান্তির মহড়ায় বার কোটি লোক ছিলো জিম্মি ও অসহায়। এখন আবার হরতালে দেশে শুরু হয়েছে 'শান্তি মিছিল'। অন্যদিকে আমেরিকান পীসকোর অর্থাৎ শান্তি বাহিনীরা আসছে। না জানি এই শান্তি বাহিনী জাতির জন্য কি শান্তির বার্তা বয়ে আনছে! তাই 'শান্তি' শব্দটি শুনলে স্বাভাবিকভাবেই ভয় হয়।

আমাদের দেশে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ দেখলেও আন্তর্জাতিক মুরুব্বীরা অভিনন্দন জানায়; আবার ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড দেখলেও অভিনন্দন ও বাহবা দেয়। কাজেই কোনটা যে খাঁটি আর কোনটা যে নকল অভিনন্দন বার্তা আইয়ুব খানের মতো জাঁদরেল ধুরন্ধর শাসকও বুঝতে পারেননি। মার্কিনীরা আইয়ুবকে সাত ঘাটের পানি খাইয়েছে আর আমাদের দেশের রাজনীতিকরা তো এই আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের কাছে নস্যি। তাই আন্তর্জাতিক চক্রের অভিনন্দন বার্তা পেলেই আমাদের শাসকেরা খুশীতে ডগমগ।

বিড়াল যেমন শিকারকে আটকিয়ে রেখে খেলা করে এবং শিকার যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন ধীরে ধীরে তার প্রাণ সংহার করে, ঠিক তেমনিভাবে এই অশুভ শক্তি বিড়ালের মতোই আমাদের শিকার বানিয়ে বিভিন্ন রংয়ের খেলা খেলছে। আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি, জাতি হিসাবে আমরা নির্জীব হয়ে যাচ্ছি। খেলার কোনো এক পর্যায়ে আমাদের দুর্বল মুহূর্তে জাতি সত্তার উপরে হয়তো চূড়ান্তভাবে আঘাত হানাও অস্বাভাবিক নয়।

ভারত এমনি এমনি চাকমাদেরকে খাইয়ে-পরিয়ে লালন-পালন এবং অস্ত্র ও ট্রেনিং দিয়ে সাহায্য করেনি। সময়ই বলে দিবে কি উদ্দেশ্যে এরা সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছে। এছাড়া অভিজ্ঞ মহলের মতে আমেরিকাও নাকি চায় এই দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের আধিপত্য আরো মজবুত এবং প্রসারিত করতে। এ লক্ষ্যে তারা চায় এই অঞ্চলে ইসরাইলের স্টাইলে একটি খ্রীষ্টান রাষ্ট্র বানাতে। আর এ জন্য তারা বেছে নিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আসাম রাজ্যকে। এনজিও খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ঐসব অঞ্চলে খুবই তৎপর। শোনা যায়, অত্র অঞ্চলের উপজাতীয়রা দলে দলে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির পর ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা নাকি খুবই খুশী। এ জন্যে তারা নাকি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করতেও রাজী। লোকের মুখে শোনা এইসব তথ্য পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক অবস্থা দেখলে মনে হয় তা সত্য। এই পীসকোরের আগমন এই চক্রান্তের অংশ কিনা কে জানে। কিন্তু ভারত কি তার বারা ভাতে ছাই দিতে দিবে?

অন্যদিকে চীনের নাকের ডগায় বসে আমেরিকানরা ষড়যন্ত্রের গুটি চালাবে আর চীন বসে বসে আঙ্গুল চুষবে এটাও কি আশা করা যায়? সুতরাং এই তিন পরাশক্তির চক্করে পড়ে বাংলাদেশ কোন্ মরণ খেলায় জড়িয়ে যাচ্ছে কে জানে।

www.pathagar.com

উপসংহার

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন- "ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না। যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বলো, আল্লাহর পথ নির্দেশই প্রকৃত পথ নির্দেশ। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কেউ সাহায্যও করবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ১২০)

মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন যে, নিশ্চয়ই এমন এক সময় আসবে যখন দুনিয়ার তাবৎ অমুসলিম জাতিগুলো মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন ভোজ অনুষ্ঠানে একে অপরকে ডাকাডাকি করে মিলিত হয়ে আহার করা হয়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এই দশা হবে কেন, আমরা কি তখন সংখ্যায় একেবারে নগণ্য হবো? উত্তরে মহানবী (সাঃ) বললেন, না, তোমরা অধিকই হবে। তবে সেদিন তোমরা বন্যায় ভাসানো আবর্জনার মতো একেবারে লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হবে। শত্রুদের অন্তরে তোমাদের প্রতি কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। কারণ তখন তোমরা দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ এবং বস্তুবাদী মন-মানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে। আখেরাতের প্রতি তোমাদের কোন আগ্রহ ও আসক্তি থাকবে না। তাই তোমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করবে। (আবু দাউদ)।

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, যখন মুসলমানগণ ইসলামী শিক্ষা, আদর্শ ও ভাবধারা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং আখেরাতকে ভুলে গিয়ে বস্তুবাদী চিন্তাধারায় আক্রান্ত হয়ে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যাবে তখন তারা লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও পদদলিত হবে, কাফির-মুশরিকদের দ্বারা পীড়ন ও নির্যাতন ভোগ করবে। বস্তুতঃ আজ বাস্তবে তাই হচ্ছে। আজ মুসলমানগণ ইসলামী সভ্যতা ও জীবনধারা উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন ধারায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতাকে প্রগতির অন্তরায় বলে মনে করছেন। মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধান ও হর্তা-কর্তাগণ পাশ্চাত্যের ইহুদী-নাছারাবাদেরকে তাদের মুরুব্বী ও ভাগ্য বিধাতা সাব্যস্ত করে নিয়েছেন এবং তাদের হাতের পুতুল সেজেছেন। পাশ্চাত্যের মুরুব্বীগণ ইসলামের বিনাশ সাধন ও মুসলমানদের উৎখাতকল্পে যেসব কর্মসূচী ও পরিকল্পনা দেন, তা তারা জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি হিসাবে বাস্তবায়িত করেন। এরূপে নিজেরাই নিজেদের সমাধি রচনা করছেন। আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে আগে মুসলমান পরে মান, এটাই হলো ইসলামের দৃপ্ত ঘোষণা, কোরআনের বাণী, ইতিহাসের সাক্ষ্য। আরবরা মুসলমান হয়েই মান পেয়েছিল, মান পেয়ে মুসলমান হয়নি। যারা মনে করেন মান পেলে মুসলমানদের উন্নতি হবে তাদের ধারণা ভুল। মুসলমান এবং মান পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অবিচ্ছেদ্য। ইসলামের কষ্টি পাথরে যদি মানুষ নিজেকে পূর্ণাঙ্গ এবং খাঁটি বলে প্রমাণ করতে পারে, তবে দুনিয়ার কোন শক্তিই মুসলমানদের অপমান করতে পারবে না। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে মান না দিয়ে থাকতে পারবে না। আর যখন সে এই কষ্টি

www.pathagar.com

পাথরে হতমান ও ভেজাল বলে প্রতীয়মান হয়ে যায় তখন অন্যের কাছে মান লাভ তো দূরের কথা, লব্ধ মানকেও সে বজায় রাখতে পারে না। কোরআন মজীদের এক স্থানে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন– "আল্লাহ কখনো মুমিনদের ওপর কাফেরদেরকে সুযোগ দিবেন না।" অর্থাৎ যদি মুসলমানগণ আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতার অকৃত্রিম প্রেরণা নিয়ে এবং আল্লাহর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ খাঁটি মুমিন সাজতে পারে তবে দুনিয়ার কোন তাগুতি শক্তি, কুফুরী শক্তি তার উপর প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, তাঁকে জুলুম-নিপীড়নের পাত্রে পরিণত করতে পারবে না।

বলাবাহুল্য যে, আজ মুসলমানগণ তাদের জাতীয় জীবনে আত্মহত্যার পথে চলছে। নিজেই ভ্রান্ত পথ, ভ্রান্ত মত ও ভ্রান্ত নীতির অনুসরণ করে জাতীয় জীবনে অধঃপতন ডেকে এনেছে। মুসলমানরাই স্বয়ং স্বহস্তে কলুষিত করেছে নিজের জাতীয় ইতিহাসকে। তাদের পতন, দুর্গতি ও শোচনীয়ভাবে ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী স্বয়ং নিজেরাই। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা এ নিষ্ঠুর সত্যকে অনুভব করতে না পেরেছে যে, তাদের এ দুর্গতি, এহেন দুর্দশা ও অবনতি নিজেদেরই পাপের পরিণতি, অপরাধের শাস্তি এবং ভ্রান্তি ও উদাসীনতার ফলশ্রুতি এবং যতদিন পর্যন্ত সংশোধন করতে প্রয়াস না পাবে গোড়ার এ গলদ দূর করতে না পারবে অবনতির কারণ ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে এ নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, দিনে দিনে বেড়ে চলবে তাদের মরণ জ্বালা। মোট কথা মুসলমান হিসাবে, মানুষ হিসাবে, উন্নতি, সুখ-শান্তি ও মান-মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে হলে আমাদেরকে একমাত্র সেই অকৃত্রিম ইসলাম তথা প্রিয়নবী (সাঃ) ও সাহাবাবৃন্দের অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শ ও নিখুঁত জীবনধারার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। নতুবা আমরা যতই বিলাপ করি না কেন, আমাদের দুর্গতির বিলোপ হবে না, যতই আর্তনাদ করি না কেন আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। তাই মহা কবি ইকবালের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ লেখার ইতি টানছি। তিনি বলেছেন–

"কুরআনের নকশা যখন আসল জগতের বুকে
পোপ ও গণকদের বাতিল নকশা হলো তিরোহিত।
খোলে বলছি শোনো অন্তরের সুপ্ত একটি কথা
এটি গ্রন্থ নয়, আসলে অন্য কিছু।
যখন প্রাণে প্রবেশ করে, লাভ করে নতুন প্রাণ।
প্রাণ যখন ভিন্ন হয় তখন জগতও হয় ভিন্নতর।
তুমি যদি চাও মুসলমান হয়ে বাঁচতে
কুরআন ছাড়া বেঁচে থাকার বিকল্প উপায় নাই।"

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

'দি স্যাটানিক ভার্সেস' ঃ সহস্র বৎসরের চক্রান্ত

সৈয়দ আশরাফ আলী

কুখ্যাত সালমান রুশদী রচিত 'দি স্যাটানিক ভার্সেস' ইতিহাসের আদৌ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা আকস্মিক, পাপ-পঙ্কিল অপপ্রয়াস নয়। এটি সহস্র বৎসরের সুপরিকল্পিত, ইসলাম বিরোধী, হীনমন্য চক্রান্তেরই এক অংশ বিশেষ। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই খৃস্টান, ইহুদী ও পৌত্তলিকেরা সংঘবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করে। ইসলামের নবী (সাঃ)-এর পূত-পবিত্র চরিত্র কলঙ্কিত ও কলুষিত করে তোলার জন্য শুধুমাত্র তারা জঘন্য ও ঘৃন্য চক্রান্তই করেনি, একই সঙ্গে ইতিহাস বিকৃত করে, পবিত্র কুরআন, ইসলামের নবী (সাঃ), তাঁর সতী-সাধ্বী সহধর্মিনী ও সাহাবায়ে কারামদেরও অন্যায় ও অযৌক্তিক দোষ-ত্রুটিতে ভারাক্রান্ত করেছে।

সম্পূর্ণরূপে অমুসলিম নিয়ন্ত্রিত এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মতো সর্বজন নন্দিত ও গ্রাহ্য বিশ্বকোষেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে যে ঃ

"Few great men have been so maliged as Muhammad. Christian scholars of mediaeval Europe painted him as an impostor, a techer and a man of blood. A corruption of his name, Mahound, even came to signfy the devil. The picture of Muhammad and his religion still retains some influence. The English author Thomas Carlyle in 1840 was the first notable European to insist publicly that Muhammad must have been sincere, because it was rideculous to suppose an impostor would have been the founder of a great religion."

ইসলাম বিরোধী চক্রান্তকারীদের মুখোশ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করে দিয়ে ১৮৪০ খৃস্টাব্দে এডিনবার্গে 'হিরোওয়ারিশপ, হিরো অ্যাজ এ প্রফেট' শীর্ষক বক্তৃতামালায় বক্তব্য প্রদানকালে মনীষী টমাস কার্লাইল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে 'হিরো প্রফেট' হিসাবে চিহ্নিত করে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, ইসলামের নবী (সাঃ)কে অবমাননা করলে বস্তুতঃ চক্রান্তকারীরা নিজেরাই অপমানিত হবে। তাঁর অনন্য ভাষায় ঃ

"Our hypothesis about Mahomet, that he was a scheming imposter, a falsehood incarnate, that his religion was a mere mass of quackery and fatuity, begins really to be untenable to anyone. The lies, which well-meaning zeal has heaped around this man, are disgraceful to ourselves only."

কিন্তু টমাস কার্লাইল, জর্জ বার্নার্ড শ', গ্যেটে, জন উইলিয়াম ড্রেপার, এমারসন, ওয়াশিংটন আরভিং, স্ট্যানলি লেনপুল, বসওয়ার্থ স্মিথ প্রমুখ মনীষী কর্তৃক ইসলামের নবী (সাঃ)-এর মহান আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে চিহ্নিত করার আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ সত্ত্বেও, ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত আদৌ স্তিমিত, নিষ্ক্রিয় বা নিষ্প্রভ হয়নি। ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে, কল্পিত কাহিনী ভিত্তিহীন তথ্য ও যুক্তিহীন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা ইসলামকে এবং ইসলামের নবীকে কলঙ্কিত ও কলুষিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। মনুষ্যরূপী শয়তান ও পাপিষ্ঠ সালমান রুশদীর সাম্প্রতিক ধৃষ্টতা, সহস্রাধিক বছরের উক্ত ঘৃণিত ও সুপরিকল্পিত চক্রান্তেরই সুনির্দিষ্ট অংশ বিশেষ।

পবিত্র কুরআনের নিষ্কলুষতা কালিমালিপ্ত করার লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধী শক্তি খৃষ্টজন্মের নবম শতাব্দীতে 'স্যাটানিক ভার্স' প্রতিষ্ঠায় প্রথম ষড়যন্ত্র করে। আল ওয়াকিদী নামে পরিচিত জনৈক ঐতিহাসিককে দিয়েই এর যাত্রা শুরু। তার পুরো নাম ছিলো আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমর আল-ওয়াকিদী। ১৩০ হিজরীতে মদীনায় তার জন্ম হয় এবং ২০৭ হিজরীতে মৃত্যু ঘটে। স্যার উইলিয়াম

www.pathagar.com

ম্যুরের ভাষ্য অনুযায়ী ইসলাম জগতের এই 'কুইসিলিং' প্রথম দাবী তোলে যে, ওহী নাযিলের পঞ্চম বছরে পবিত্র মক্কায় সূরা আন-নাজম নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আকস্মিকভাবে শয়তান কর্তৃক প্রভাবান্বিত হন (নাউযুবিল্লাহ)।

পবিত্র কুরআনের মর্মানুযায়ী নাযিলকৃত সূরা আন-নাজমের আয়াত নং ১৯ থেকে ২১ হচ্ছে ঃ

"তুমি কি লাত এবং উজ্জা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিয়াছো (১৯নং আয়াত) এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ) মানাত সম্পর্কে? (২০ নং আয়াত) তোমরা ভাব, পুত্র তোমাদের, কন্যা আল্লাহর'?" (২১ নং আয়াত)

লাত, উজ্জা এবং মানাত-এরা তিনজন আরব পৌত্তলিকদের দেবী ছিলো। আরবেরা এদের আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহ) হিসাবে বিবেচনা করতো। মৌলভী ইউসুফ আলীর মতে, "লাত মানব-অবয়ব বিশিষ্ট, উজ্জার উদ্ভব একটি পবিত্র বৃক্ষ থেকে এবং মানাতের উদ্ভব শ্বেত প্রস্তরে। তারা ছিলো সবাই নারী আকৃতিধারিণী।" অবশ্য, আরব পৌত্তলিকরা তাদের নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানের চেয়ে, পুত্র সন্তানকেই প্রাধান্য দিতো। উপাসনার প্রতীক, আল্লাহর তিন কন্যা হিসাবে মিথ্যা দাবীটিকে ২১ নং আয়াতে এ কারণেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। স্যার উইলিয়াম মূরের মতানুযায়ী. ওয়াকিদী দাবী রাখে যে, পবিত্র সূরা আন-নাজমের উপরোক্ত ২১ নং আয়াত নাযিলকরণের সময়ে শয়তান ইসলামের মহানবী (সাঃ)-এর জিহ্বাভাগে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি আয়াত তুলে দেয়। ফলশ্রুতিতে সূত্রোক্ত ২১ নং আয়াতের পরিবর্তে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শয়তানের কু-প্রভাবে নিম্নোক্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করেন (নাউযুবিল্লাহ)ঃ" এরা অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা, যাঁদের সুপারিশ (আল্লাহর আশীর্বাদের জন্য) একান্তভাবে কাম্য।" এই ভিত্তিহীন, উদ্ভট ভাব-কল্পনা ইতিহাসে কখনই কোনো খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞজন কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী এই মিথ্যা কল্প-কাহিনী যথাযথভাবেই মুসলমান ও অমুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত ছিলো। কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ আদৌ নিষ্ক্রিয় ছিলো না, বরং তারা এটি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বদাই অতীব তৎপর ছিলো।

প্রায় এক শতাব্দীকাল পর 'স্যাটানিক ভার্স'-এর মিথ্যা কাহিনী আল-তাবারী কর্তৃক পুনরায় উত্থাপিত হয়। সে ছিলো একজন পারস্য দেশীয় ঐতিহাসিক। তার পূর্ণ নাম ছিলো মুহাম্মদ ইবনে যাবের আল-তাবারী। সে ৯২৩ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে ইন্তেকাল করে। তাবারী নতুন করে দাবি রাখে যে, শয়তান পবিত্র কুরআনে আয়াতটি অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে চাতুর্যময় কৌশলে আবদ্ধ করে। এতে আরবদের তিনটি আষ্য দেবী– লাত, উজ্জা ও মানাতকে আল্লাহের কন্যা হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হয় (নাউযুবিল্লাহ)। এই ভিত্তিহীন দাবীর অনুকরণ, মক্কা বিজয় ও উক্ত নগরীতে মুসলিম শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন এবং আল্লাহতা'আলা প্রেরিত ওহী থেকে শয়তান প্রভাবিত উপরোক্ত শব্দাবলী বাদ দিয়ে দেন। এই কাল্পনিক কাহিনীটি স্যার উইলিয়াম ম্যুর সর্বপ্রথম ইউরোপের ইংরেজী ভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার করেন। ওয়াকিদী এবং তাবারী কর্তৃক বিধৃত বিবরণই (যা খৃষ্টান লেখকগণ 'মুহাম্মদের বিচ্যুতি' বা 'পৌত্তলিকতার সঙ্গে সমঝোতা' নামে আখ্যায়িত করেন) ছিলো একমাত্র ভিত্তিহীন তথ্য, যাকে অবলম্বন করে স্যার উইলিয়াম ম্যুর ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেন। যদিও ইতিহাস সমর্থন করে যে, ইসলামের নবী তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রবল সংগ্রাম চালিয়েছেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। তাঁর জীবনের প্রায় প্রতিটি ঘটনাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৌত্তলিকতার অসারতার সাক্ষ্য বহন করে।

ম্যুর দাবী করে যে, "পরবর্তীকালে ধর্মভীরু মুসলমানরা পৌত্তলিকতার সঙ্গে মুহম্মদের এই আশ্চর্যজনক সমঝোতায় ভীত হয়ে এটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে কাল্পনিক কাহিনী বলে চিহ্নিত করে।" কিন্তু ম্যুরের এই দাবি আসলে বাস্তব ভিত্তিক বা যথার্থ নয়। কারণ প্রথমতঃ ম্যুর ইসলামের ইতিহাসে প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানদের এই 'স্যাটানিক ভার্স' সম্পর্কিত কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেনি। দ্বিতীয়তঃ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইতিহাস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানেরা এবং ইসলামের নবীর জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর শতাধিক বছর পরবর্তীকালের মুসলমানেরা– সকলেই এই তথাকথিত ও ভিত্তিহীন 'স্যাটানিক ভার্স' সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিলেন। যেহেতু তাঁরা বিন্দুমাত্র এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, কল্পনাপ্রসূত 'স্যাটানিক ভার্স'-এর জন্ম ঘটে নিঃসন্দেহে এর

www.pathagar.com

বহুকাল পরে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোনো সাহাবাই 'স্যাটানিক ভার্স' সম্পর্কে কোনো কিছু মন্তব্য করেননি। এমন কি, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে ইসলামের শত্রুদের নিকটও তা সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিলো। ইসলাম বিদ্বেষী মহলও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় এ বিষয়ে কোনো মৌখিক বা লিখিত মন্তব্য রাখেননি। শুধুমাত্র আরবেই নয়– মিসর, সিরিয়া, পারস্যের মতো প্রতিবেশী দেশসমূহে এমনকি সুদূর চীনেও (যেসব দেশের সঙ্গে তদানীন্তন আরবের নিয়মিত ও নিবিড় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক ও যোগযোগ ছিলো) এই কল্পিত 'স্যাটানিক ভার্স' সম্পর্কে কোনো উক্তি, বক্তব্য বা নথির সন্ধান মেলে না। বস্তুতঃ মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় আরব কিংবা আরবের বহির্ভাগে কোনো দেশের ইতিহাস বা কোনো সাহিত্যকর্মেই 'স্যাটানিক ভার্স' সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিলো না।

বিশ্ববিখ্যাত 'সিরাত রসূল আল্লাহ' গ্রন্থের রচয়িতা ইবনে ইসহাক (যিনি ইসলামের মহানবী (সাঃ)র জীবনী লেখক হিসাবে সর্বপ্রথম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিবেচিত হন) 'স্যাটানিক ভার্স' সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপিত হলে, ওয়াকিদী নিজেই একে 'জীন্দিক'দের আবিষ্কৃত অলীক কল্পনা বলে অভিহিত করে।

মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত এবং বিশ্ববিখ্যাত ইমাম বুখারী ছিলেন ওয়াকিদীর সমসাময়িক মনীষী। অথচ বুখারীর বিশ্বনন্দিত হাদীসের সংকলনেও ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী 'স্যাটানিক ভার্স' সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। আল ওয়াকিদীর বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গবেষকবৃন্দ ও ইতিহাসবেত্তাগণ সাধারণতঃ অতি নিম্ন ধারণাই পোষণ করেন। হাদীসবেত্তাদের জীবন ও চরিত্র বিষয়ে সংকলিত 'মিজানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে ওয়াকিদী বিরচিত বিভিন্ন বিবরণী অবিশ্বাস্যকর হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি তাকে 'তথ্যের বিকৃতকারী' বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩১০ হিজরীতে আল-তাবারী মৃত্যুবরণ করে। বলা বাহুল্য মূল সূত্র ও তথ্যাবলী বিষয়ে ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশাম অপেক্ষা তাবারী নিঃসন্দেহে কালের হিসাবে অধিকতর দূরে অবস্থান করেছিলো। 'স্যাটানিক ভার্স' সম্পৃক্ত তথ্যাদি হয় সম্পূর্ণভাবে তার নিজের মনগড়া, না হয় সে এসব অত্যন্ত অবিশ্বাস্য কোনো সূত্র অবলম্বনে রচনা করে।

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, এই ষড়যন্ত্রের দোসর উইলিয়াম ম্যুর নিজেও তাবারীকে বিশৃঙ্খল ও উদ্ভট তথ্য গ্রহণের অপরাধে অভিযুক্ত করে। শুধু তাই নয়, 'রুহুল মানী'তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'এই মিথ্যা ও উদ্ভট কল্পনার দু'জন মাত্র সমর্থকের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করে অগণিত যেসব বিশাল ব্যক্তিত্ব বক্তব্য রেখেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিদ্বান, বিদগ্ধ সমালোচক ও মনীষী।'

সিহান সিত্তাহ নামে পরিচিত বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মা'জা, নাসায়ী কর্তৃক প্রণীত সংকলনসমূহের কোনোটিতেই কাল্পনিক 'স্যাটানিক ভার্স'-এর বিন্দুমাত্র সন্ধান মেলে না। এগুলোতে বরং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চারিত বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যই বিধৃত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ ও তাঁর অসীম করুণায় ৬১০ খৃস্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে প্রথম ওহী নাযিল করেন। হিরা পর্বত গুহায় নাযিলকৃত সেই প্রথম ওহীর পর ৬৩২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বছর সময়কালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মারফত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়। হিরা পর্বতগুহায় নাযিলকৃত পাঁচটি আয়াত ব্যতীত কুরআন শরীফের অন্যান্য সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময় মহানবী সর্বদাই এক বা একাধিক সাহাবা পরিবেষ্টিত থাকতেন। ওহী নাযিল হলে ইসলামের নবী (সাঃ) তা আবৃত্তি করতেন এবং সাহাবাগণ তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত ওহীর প্রতিটি অক্ষর সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। অধিকন্তু মহানবী (সাঃ)-এর সময়কালে বহু মুসলমান (বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবাসহ) নাযিলকৃত আয়াতগুলো তাৎক্ষণিকভাবে মুখস্ত করেও নিতেন।

মহানবী (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর পরামর্শক্রমে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে কুরআন শরীফের আয়াতসমূহের লিখিত প্রতিলিপিসমূহ সংগ্রহ করেন। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর সমসাময়িক নিকটজন ও বিজ্ঞজনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত উক্ত প্রতিলিপিসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা

www.pathagar.com

করে দেখেন। রাসূল আল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে যে সকল সাহাবায়ে কিরাম কুরআনে হাফিজ ছিলেন তাঁদের মধ্যে জীবিত অসংখ্য ব্যক্তির 'কিরাত'-এর সঙ্গে তিনি সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো মিলিয়ে নেন। এরপর সর্বজনস্বীকৃত প্রতিলিপিসমূহ তিনি রাসূল আল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশিত ক্রমানুবৃত্তিক ক্রমেই সযতে সাজিয়ে নিজের হিফাজতে রেখে দেন। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে প্রতিলিপিসমূহ সংরক্ষিত হয়। হযরত উমর (রাঃ) ইন্তেকাল করলে এটি তাঁর কন্যা বিবি হাফসা (রাঃ)-এর সংরক্ষণে চলে যায়। বিবি হাফসা (রাঃ) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অন্যতমা সহধর্মিণী। পরবর্তীকালে ইসলামে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) গ্রন্থাকারে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণে এবং সার্বজনীনভাবে ব্যবহারে উপযোগী পবিত্র কুরআনের ব্যাপক ভিত্তিক অনুলিপিকরণের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বিবি হাফসা (রাঃ)-এর কাছ থেকে তিনি উপরোক্ত সংকলনটি চেয়ে পাঠান।

সংকলনের ভিত্তিতেই পবিত্র কুরআন প্রথমবারের মতো গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত হয় এবং এর বেশ কিছু সংখ্যক অনুলিপি প্রণয়ন করা হয়। হযরত উসমান কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত কুরআনের অন্ততঃপক্ষে দু'টি অনুলিপি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে একটি রয়েছে রাশিয়ার তাসখন্দে এবং অপরটি তুরস্কে।

স্যার উইলিয়াম ম্যুরের মতো ঘোর ইসলাম-বিদ্বেষী ঐতিহাসিকও তাঁর "Life of Mahomet" গ্রন্থে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে যে, "গত বারোশত বছরের ইতিহাসে কোনো গ্রন্থ কুরআনের মতো এতো অবিকৃত থাকেনি।" তিনি একথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করে যে, "প্রাপ্ত সংরক্ষণের কোনো শব্দ বাক্য বা বাক্যাংশ সংকলকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে মর্মে কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি। যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটতো, তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের নিবিড় ও সূক্ষ্মতম ঘটনাবলী বিধিবদ্ধকারিগণ সে কথা অবশ্যই প্রগাঢ় যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে যেতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কথিত 'স্যাটানিক ভার্স'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো উক্তি বা ইঙ্গিত নেই। পৌত্তলিকতা বিরোধী অজস্র উক্তি, নির্দেশ ও মন্তব্য সম্বলিত মহাগ্রন্থ আল কুরআন যে পৌত্তলিকতার সঙ্গেই আপোসকারী একটি আয়াতবাহী গ্রন্থে রূপান্তরিত হবে, তা নিশ্চিতভাবেই কল্পনাতীত।

বিশেষ করে যে সূরা আন-নাজম অবলম্বন করে 'স্যাটানিক ভার্স'-এর কল্পকাহিনী গড়ে উঠেছে, সেই সূরা আন-নাজম এর ২৩ নং আয়াতেই সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

"তারা (লাত, উজ্জা এবং মানাত) শুধুমাত্র (তিনটি) নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে নামকরণ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছো, আল্লাহ তাদের (কাউকে) কোনো প্রকারের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রদান করেননি।"

পরিশেষে, একই সূরা নাজম-এর ২ থেকে ৪ নং আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম করুণায় ঘোষণা করেছেন ঃ

"তোমার সঙ্গী [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] ভুল করেন না, বিভ্রান্তও হন না। মনগড়া কথাও বলেন না। এটি তাঁর প্রতি প্রত্যাদিষ্ট, এটি ওহী ব্যতীত কিছু নয়।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) শয়তানের কুপ্রভাবে কখনই কোনো ভুল করতে পারেন না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোনো শক্তি কোনোদিনও তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যা কিছু তাঁর কাছে ওহী হিসাবে নাযিল হয় তা সবই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকেই প্রাপ্ত। অন্য কোনো উৎস, অন্য কোনো ব্যক্তি বা সৃষ্টি, অন্য কোনো শক্তি বা কোনো 'স্যাটানিক ভার্স' মহানবী (সাঃ)কে কোনোদিনও বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত বা বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়নি।

ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক ও সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—২

বাংলাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারী তৎপরতা নব্য খ্রিষ্ট রাজ্যের নীল নকশা

মোহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম

বার কোটি জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ, ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ। দারিদ্র্য, অশিক্ষা প্রভৃতি দেশটাকে খ্রিষ্টান মিশনারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। উন্নতি এবং প্রগতির খোলস পরে শত শত এনজিও এবং বিভিন্ন মিশনারী সংস্থা জনগণকে বিভিন্ন কৌশলে ধর্মান্তরিত করছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই তৎপরতা অব্যাহত থাকলে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই বাংলাদেশ লেবাননের রূপ পরিগ্রহ করবে। উপনিবেশ আমলে বৃটিশরা মুসলমানদের ইসলামী মূল্যবোধকে ধ্বংস করার সব ধরনের ষড়যন্ত্র হাতে নেয়, আর এভাবে তারা এমন একটা দল সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয় যারা বৃটিশদেরকে 'বুদ্ধিজীবী পিতা' (Intellectual Father) হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। ইংরেজরা এমন এক অভিজাত সম্প্রদায় তৈরী করতে সক্ষম হয় যারা মনে করেন- স্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, জনসেবা প্রভৃতি খ্রিষ্টান মিশনারী সংস্থাগুলো দ্বারাই সবচেয়ে ভালোভাবে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।

পাশ্চাত্যের এজেন্ট হিসাবে এসব মিশনারী সংস্থাগুলোর ঘৃন্য তৎপরতা এবং সীমা লংঘন আজ সর্বত্র পরিদৃষ্ট। তাদের কার্যক্রমকে নতুন রূপে আগ্রাসন (Revived form of imperialism) এবং নব্য উপবিনেশ (Neo-colonialism) রূপে চিত্রিত। পুরো দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিশেষ করে ৮৬% মুসলমানের ধর্মের জন্য এটা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে খ্রিষ্টান মিশনারীদের ঘৃন্য তৎপরতাকে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মিশনারী দল ও সংস্থা

মিশনারী দল ও সংস্থার মধ্যে দেশী-বিদেশী উভয়েই আছে। এই উপমহাদেশে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রথম কখন আসে সেটা ঠিকভাবে বলা মুশকিল। তৃতীয় শতাব্দীর খ্রিষ্টীয় দলিলপত্র থেকে জানা যায়, হামাস নামে এক খ্রিষ্টীয় দূতকে প্রথম ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ভারতের কেরালায় তার কার্যক্রম শুরু করেন এবং বহু লোককে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শাহাদৎ বরণ করেন। (Neely 1995 : 38-40)।

অবশ্য ঐতিহাসিকরা এ সত্যকে গ্রহণ করেনি। মধ্য যুগের শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারী তৎপরতা মাত্র ২ শতাব্দী আগে সক্রিয়ভাবে শুরু হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের সাথে (প্রথমে ব্যবসায়ী পরে সেনাবাহিনী) বাংলার মুসলিম শাসক নবাব সিরাজদ্দৌল্লাহর যুদ্ধ বাঁধে এবং তাতে ইংরেজরা বিজয়ী হয়। স্বাধীনতা হারিয়ে আবদ্ধ হতে হয় ইংরেজ মিশনারি তৎপরতা। ১৭৯৩ সালে প্রখ্যাত ব্রিটিশ মিশনারী উইলিয়াম কেরি উপস্থিত হন কলকাতায়। শুরু হয় বাইবেলের বাংলায় অনুবাদ প্রক্রিয়া। আরবী ও ফারসী শব্দ বাংলা ভাষা থেকে বাদ দিয়ে বাংলাকে বিশুদ্ধকরণ(?) খ্রিষ্টান সাহিত্য প্রস্তুতকরণ এবং সারা বাংলায় মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টা সম্পন্ন হয়। (Nuruzzaman 1994 : 8-10)। বাংলার প্রতিটি অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে মিশনারী তৎপরতা। দিনাজপুরে ১৭৯৫ সালে, যশোরে ১৮০৫ সালে, ঢাকায় ১৮১৬ সালে, বরিশালে ১৮২৮ সালে, খুলনায় ১৮৬০ সালে, চট্টগ্রামে ১৮৮১ সালে এবং রংপুরে ১৮৯১ সালে মিশনারী কার্যক্রম শুরু হয়। (Abdul Karim Khan 1981 : 4)। ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যেও ব্যাপক খ্রিষ্টান মিশনারী তৎপরতা চলে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মিশনারী তৎপরতা চরম আকার ধারণ করে। কারণ মুক্তিযুদ্ধে তাদের ইতিবাচক ভূমিকা তাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট এনে দেয়। তৎকালীন

www.pathagar.com

সরকারও তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ (A Hussain 1981)। চাচ মিশনারী ও অন্যান্য খ্রিষ্টান সংস্থা মুজিব আমলের এ সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগায়। এর পর থেকে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশে কর্মরত মিশনারীদের খতিয়ান সংক্ষেপে নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

ক. চার্চ বা গীর্জা ঃ

বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিকের চেয়ে প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশে বর্তমানে অসংখ্য চার্চ গড়ে উঠেছে, এর মধ্যে–

All one in christ, The Assemblies of God, The Associaton of Baptists for world Evangelism, Bangladesh Baptist Union (BBU), Bangladesh Northern Evangelical Church, The Baptist Union of Bangladesh, The Church of Bangladesh (COB), Church of God (COD), The Garo Baptist Union (GBU), The Evangelical Christian Church (ECC), The New life Center, Seventh Day Adventists (SDA), The World Missionary Evangelism. খ্রিষ্ট ধর্মসভা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (Abdul Karim Khan 1981 : 5-8)

খ. রোমান ক্যাথলিক ঃ

বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং দিনাজপুর এ চারটা বিশেষ এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ক্যাথলিক চার্চ। ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী এই চারটি কেন্দ্র দ্বারা চালিত চার্চের সংখ্যা ছিলো পাঁচ শ'র উপরে। বর্তমানে সংখ্যা ২০০০-এর উপরে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ২ বছর পর ১৯৭৩ সালে মিশনারী কার্যক্রমের লক্ষ্যে ৪টি রোমান ক্যাথলিকের বিশাল দল বাংলাদেশে হাজির হয় ঃ

১. Congregation of Holy Cross (আমেরিকা থেকে)
২. Congregation of Holy Cross (কানাডা থেকে)
৩. Pontifical Institute for Foreign Missions
৪. St. Francis Xavier. (Abdul Karim Khaln 1981 : 8)।

গ. এজেন্সী ঃ

প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক মিশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশে বহু এজেন্সী কাজ করে যাচ্ছে। এরা সরাসরি মিশনারী কাজকর্ম করে না, তবে এদের কাজ হলো– অনুদান দ্বারা ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা চালানো অথবা মিশনারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া। উদাহরণ স্বরূপ প্রোটেষ্ট্যান্ট গোত্রের Young Christian Workers এবং Every Home Contact প্রভৃতির কথা বলা যায়। প্রোটেষ্ট্যান্টদের সাহায্য বা অনুদান প্রদানের জন্য সবচেয়ে বড় যে এজেন্সী রয়েছে তার নাম হলো– Christian Commission for Development in Bangladdesh (CCDB)। রোমান ক্যাথলিকের জন্য ঐ ধরনের এজেন্সী হলো– CARITAS. এটি খুব সুসংগঠিত এবং চার্চের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। (Abdul Karim Khan 1981 : 8)

ঢাকায় অবস্থিত YMCA (Young men's Christian Association)-এর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে তাদের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। তাদের ভাষায়– 'বাংলাদেশের সামাজিক অবকাঠামোর পরিবর্তনে খ্রিষ্টান মিশনারীদেরকে অদম্য এবং সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরোর মতে, ৫২টি এনজিও সরাসরি মিশনারী কার্যক্রমে জড়িত। মিশনারী কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এসব মিশনারী এনজিও'র সাথে অন্যান্য সেক্যুলার এনজিও'র মধ্যে উদ্দেশ্যগত কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য কেবল কাঠামোগত দিক দিয়ে। (Nuruzzaman 1994 : 10)।

মিশনারীদের টার্গেট গ্রুপ ঃ

বাংলাদেশের নারী, শিশু, দরিদ্র, অক্ষম, অশিক্ষিত এবং অসহায় লোকেরাই খ্রিষ্টান মিশনারীদের আসল টার্গেট। বাংলাদেশের হিন্দু, উপজাতি এবং মুসলিম এ তিনটি দলই তাদের লক্ষ্যবস্তু।

www.pathagar.com

ক. হিন্দু ঃ হিন্দুদের সংখ্যা বাংলাদেশে ১০ ভাগের মতো। হিন্দুদের মধ্যকার বর্ণপ্রথা খ্রিষ্টান মিশনারীদের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে কাজ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র- এ চার শ্রেণীর মধ্যে তথাকথিত নিম্নজাত অস্পর্শ শূদ্রই হলো মিশনারীদের প্রধান টার্গেট। হিন্দুদের মধ্যে ৩.১ ভাগ ইতোমধ্যে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। হিন্দুদের এই ধর্মান্তরিত হওয়ার ব্যাপারটি অনেকে স্বাভাবিক হিসাবেই নিয়ে থাকে, কিন্তু মিশনারীদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের বিষয়টা বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে এটা উদ্বেগের কারণ হবে। প্রথমতঃ মিশনারীদের উদ্দেশ্য সমাজের অধঃপতিত এবং অসহায়দেরকে ধর্মান্তরিত করা এবং এ দিক দিয়ে সমাজ বঞ্চিত শূদ্ররা তাদের মূল টার্গেট। দ্বিতীয়তঃ উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে অস্পৃশ মনে করে। এ কারণে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা সামাজিক পদ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। মিশনারীরা এ সুযোগকে ভালোভাবে কাজে লাগায়। সামাজিক মর্যাদাবোধের তাগিদেই অনেক শূদ্র খ্রিষ্টান হয়। মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো- হিন্দুদের মধ্যে খ্রিষ্টান সংখ্যা যতোই বৃদ্ধি পাবে, ততোই বাংলাদেশ একটি খ্রিষ্টান দেশ হওয়ার দিকে অগ্রসর হবে এবং প্রত্যেক খ্রিষ্টানই অন্যদেরকে তার নিজের ধর্মের দিকে ডাকবে। এভাবে স্থানীয় খ্রিষ্টানদের দ্বারাই বাংলাদেশে জন্ম নেবে মুসলমান বিরোধী নব্য শক্তি, যেটা তৈরী করাই মিশনারীদের মূল টার্গেট। (Abdul Karim Khan 1981 : 8)।

খ. উপজাতি ঃ উপজাতিদের বলা যায় খ্রিষ্টান মিশনারীদের আসল টার্গেট। উপজাতিদের অধিকাংশই মূর্তিপূজক। বাংলাদেশের তিনটা বিশেষ এলাকায় এদের বসবাস। উত্তরে- দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর এবং বগুড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তর-পূর্বে ময়মনসিংহ এবং সিলেট জেলায় উপজাতিরা বাস করে। মিশনারীরা যেসব উপজাতিদের মধ্যে কাজ করছে তারা হলো ঃ কুকি, লুশাই, পানখো, বাওম, মুরু, কায়াং, কুমি, টিপেরা, রিয়াং, তানচাঙা, মগ, চাকমা, খাসি, মামবুরি, হাজং, গারো, হাদি, ডালু, সান্তাল, মাহিল ওরায়ন, মুন্ডা ইত্যাদি (প্রাগুক্ত)

মিশনারিদের জন্য সবচে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ এলাকার উপজাতি সম্পর্কে MC Nee লিখেছেন ঃ

"পার্বত্য চট্টগ্রামকে খ্রিষ্টান ভূখন্ডে পরিণত করাই হলো আমাদের প্রথম কাজ। ওখানে বসবাসকারী উপজাতিরা নানান দিক দিয়ে চাপে আছে। ষাটের দশকে যে বাঁধ নির্মাণ করা হয় তাতে অনেক উপজাতি, বিশেষ করে টিপেরা উপজাতির অনেকেই স্থানচ্যুত ও ছন্নছাড়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাও একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। ভারতের সাথে বর্ডার রক্ষার্থে বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে সৈন্য মোতায়েন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সৈন্যদের সব সময় উপস্থিতি উপজাতিদের মনে তাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয়ের জন্ম দিয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। ওদের মধ্যে ৫ ভাগ ইতোমধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামই এখন আমাদের প্রথম টার্গেট। (MC Nee 1976 : 83)।

উপজাতিদের মধ্যে মিশনারী তৎপরতা সবচেয়ে ব্যাপক। উপজাতিদের ৩১ ভাগকে ইতোমধ্যে ধর্মান্তরিত করতে মিশনারীরা সক্ষম হয়েছে।

গ. মুসলমান ঃ জনসংখ্যার ৮৬ ভাগ মুসলমান। অধিকাংশের বাস গ্রামাঞ্চলে। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যে কোনো প্রভাব এবং শক্তির কাছে অসহায়। মিশনারী তৎপরতা সে জন্য গ্রামে বেশ প্রকট। শহরে মিশনারীদের প্রচেষ্টা খুব উচ্চ রঙে সাজানো। তারা তাদের স্বীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রথমে মুসলমানদেরকে ইসলাম বিরোধী এবং ধর্ম নিরপেক্ষ করে তোলে। এরপর শুরু হয় ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া।

মুসলমানদের মধ্যে কোনো বর্ণ প্রথা নেই। এ জন্য মিশনারীরা মুসলমানদের দারিদ্র এবং অসহায়ত্বকে ধর্মান্তরিতকরণের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। এ রিপোর্টে বলা হয়, বার্মা সরকারের আক্রমণের শিকার হয়ে অনেক মুসলমান অসহায় অবস্থায় জীবন বাঁচানোর তাগিদে বাংলাদেশে পালিয়ে এলে মিশনারীরা কৌশলে তাদের অধিকাংশকে খ্রিষ্টান বানিয়ে পাঠিয়ে দেয়। অন্য ক্ষেত্রে, তারা দরিদ্রক্লিষ্ট জনগণকে অনুদান, সাহায্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দিয়ে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাবু করে ফেলে এবং শেষে ধর্মান্তরিত করে ফেলে। (Abdul Karim Khan 1981 : 12-13)। ১৯০ বছরের উপনিবেশ আমলে বেঙ্গল প্রদেশে খ্রিষ্টান হয় ১.১১,৪২৬ জন এর মধ্যে বাংলাদেশের ছিলো ৫০ হাজারের মতো (R.

www.pathagar.com

Amin 1983)। ১৯৪৭ সালের ৫০ হাজার খ্রিষ্টান সংখ্যা ১৯৭১ সালে ৪০০% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২ লাখে (Nuruzzaman 1994 : 10)। এরপর ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ২০ বছরে বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ লাখে (Nur Hussain Majidi 1994 : 21)। খ্রিষ্টানরা সব সময়ই তাদের সংখ্যাকে কম করে দেখায়। আগামী ২০ বছরের মধ্যে মিশনারীদের টার্গেট হলো– খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ১০-১২ মিলিয়নে উন্নীত করা। (Nuruzzaman 1994 : 10)।

মিশনারীদের ধর্মীয় বার্তা ঃ

সব নবী রসূলের ধর্মীয় বার্তা একই হলেও বর্তমান বিশ্বে শুধুমাত্র শেষ নবী (সাঃ) এর ধর্মীয় বার্তাই বিশুদ্ধ ও অক্ষত অবস্থায় আছে। বর্তমানে খ্রিষ্টানরা যে ধর্মীয় বার্তা (বাইবেল) প্রচার করছে, তা বিকৃত এবং সত্য থেকে অনেক দূরে। ইঞ্জিল (বাইবেল) হচ্ছে ঈসা (আঃ)-এর ইলহামী ভাষণ ও বাণী সমষ্টি, যা তিনি নিজের জীবনের শেষ আড়াই-তিন বছরে নবী হিসাবে প্রচার করেন। এ পবিত্র বাণীসমূহ তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত, সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছিলো কিনা সে সম্পর্কে জানার কোনো উপায় নেই। হতে পারে কিছু লোক সেগুলো নোট করে নিয়েছিলো, আবার এমনও হতে পারে, শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ সেগুলো কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলো। যা হোক দীর্ঘকাল পরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত বিভিন পুস্তিকা রচনাকালে তাতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে সাথে ঐ পুস্তিকাগুলোর রচয়িতাদের কাছে মৌখিক বাণী ও লিখিত স্মৃতি কথা আকারে হযরত ঈসা (আঃ) যে সব বাণী ও ভাষণ পৌছেছিলো ওগুলোও বিভিন্ন স্থানে জায়গামতো সংযোজিত হয়েছিলো। বর্তমানে মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত যে সব পুস্তককে ইঞ্জিল বলা হয় সেগুলো আসলে ইঞ্জিল নয় (মওদুদী ১৯৯২ ঃ ৮)। উপরন্তু ওটাকে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংকোচন করা হয়েছে বহু বার। নিউ টেস্টামেন্টে বলা হয়, যীশু হলেন খোদা এবং সব মানুষই খোদার দিকে আবর্তিত। কাজেই মিশনারীদের প্রধান বার্তা হলো যীশুকে খোদা হিসাবে স্বীকার করে নেয়া (Rudvin 1982 : 19)। যীশুকে আল্লাহর পুত্র হিসাবে মনে করে খ্রিষ্টানরা একেশ্বরবাদ (monotheism) থেকে অংশীদারীর (Poly Theism) দিকে চলে গেছে এবং নিঃসন্দেহে তারা ভুল পথে নিক্ষিপ্ত হয়েছে (দ্রষ্টব্য : কুরআন ৪ঃ১৭১; ৫ঃ১৭, ৭২, ৭৫; ৪৩ঃ৫৯, ৬৩, ৬৪; ৯ঃ৩০ ইত্যাদি)।

খ্রিষ্টান মিশনারীরা যেটাকে যীশুর বাণী হিসাবে প্রচার করে ওটা আসলে যীশুর বাণী নয়। এটা এক ধরনের ভাওতাবাজী। মিশনারীদের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ওরা পাশ্চাত্যের এজেন্ট, ওদের আসল উদ্দেশ্য হলো– খ্রিষ্টান ধর্ম বিস্তারের মধ্য দিয়ে সে দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে জনগণকে শাসন করা (Rasjidi 1992 : 69)। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশদের উপনিবেশিক আগ্রাসন এবং মিশনারীর ব্যাপারটি সম্পর্কে স্থানীয় লোকের ভাষ্য ঃ "When British first came, They held Bible and we owned The land, but now we held The Bible and British owned our land." মিশনারী তৎপরতা একইভাবে বাংলাদেশেও শুরু হয়েছিলো। তারা প্রচার করে একমাত্র যীশুই হলো ত্রাণকর্তা। "Church of Bangladesh" এদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে দারুণ হুমকি সৃষ্টি করছে। ধর্মান্তরিতকরণে তাদের পলিসি বড়ই ন্যাক্কারজনক। ১৯৬৫ সালে কক্সবাজার জেলায় মালুমঘাটে মিশনারীরা খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল স্থাপন করে। সে সময়কার সরকার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মিশনারী কাজে অংশ না নেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রধান Dr. Vigo B. Alsen এ কথায় কর্ণপাত না করে মিশনারী কাজ চালাতে থাকে। স্বাধীনতার যুদ্ধের পর তাদের কার্যক্রম আরো বাড়িয়ে দেয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকার এক রিপোর্টে বলা হয়, এই হাসপাতাল ১০ হাজার যুবককে (শিশু ও পোষ্যসহ মোট ৪০ হাজার) তারা খ্রিষ্টান বানায়। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব নব্য খ্রিষ্টানদেরকে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপন করা হয় (দৈনিক ইনকিলাব, মার্চ ১৩, ১৯৯৩)। স্থানীয় লোকদের বাধা ও সমালোচনা এড়ানোর জন্য নব্য খ্রিষ্টানদেরকে এভাবে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মালুমঘাট হাসপাতালে যে জঘন্য উপায়ে অসহায় জনগণকে খ্রিষ্টান বানানো হয় তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. প্রথমে রোগীকে খুব নিম্নমানের ওষুধ দিয়ে মুহাম্মদের নাম নিয়ে খেতে বলা হয় (হিন্দুদের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের নামে)। এতে রোগ যখন নিরাময় না হয় তখন উচ্চ মানের ঔষধ দিয়ে মূর্খ

www.pathagar.com

রোগীদেরকে যীশুর নামে ঔষধ খেতে বলা হয়। সঠিক ঔষধ সেবনের ফলে রোগ যখন ভালো হয়ে যায় তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেয় যীশুই তাকে রোগ মুক্তি দান করেছেন।

২. যীশু যেহেতু রোগ মুক্তি দান করেছে, সেহেতু তিনিই তোমাদেরকে বেহেশত দিতে সক্ষম, কাজেই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক তার ধর্মকেও গ্রহণ করো।

৩. মুহাম্মদ (সাঃ) খুব দুর্ভাগা এবং তার অনুসারীরাও খুব গরীব। ধনী হতে চাইলে খ্রিষ্টান হও, যীশু তোমাকে ধনী বানিয়ে দিবে।

৪. 'মরণে নেহি ভয়' বইয়ে বলা হয়েছে– বাইবেলের তুলনায় কুরআন নিকৃষ্ট। মুহাম্মদের শিক্ষায় জীবনের জন্য কিছুই নেই। তার অনুসারীরা চোর চাট্টা বদমায়েশ.... ইত্যাদি।

৫. তারা নার্স, বাগান পরিচর্যাকারী, ছুতোর... প্রভৃতি লোকদেরকে খ্রিষ্টান হওয়ার ব্যাপারে চাপ দেয়। অনিচ্ছুক লোকদেরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

৬. নগদ টাকা, ফ্রি ঔষুধ, চাকরি প্রভৃতি দ্বারা তারা খ্রিষ্টান বানায়।

ধর্মান্তরিতকরণের হাতিয়ার ও উপায়সমূহ ঃ

বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে ৩.৫টা বিদেশী এনজিও রয়েছে। এসব এনজিও'র যথারীতি কাজ ও হাতিয়ার হলো ঃ দুর্নীতি, প্রলোভন এবং শেষে ধর্মান্তরিতকরণ। ওদের টার্গেট হলো ইসলামের প্রতি জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং ধর্মান্তরিত লোকদেরকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করা। যে বিশাল উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে তা হলো– এমন এক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রভাবশালী নব্য খ্রিষ্টান গোত্র তৈরী করা, যারা আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মতো এদেশের ক্ষমতার মৌলিক সেক্টরসমূহ– শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক পলিসি, আমলা ও সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। (Nuruzzaman 1981 : 10)। মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণের দীর্ঘ মেয়াদী হাতিয়ার ও উপায়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. গণআন্দোলন (Pepole's Movement) :

এরা পাঞ্জাবের উপজাতি আন্দোলনের মতো কাজ করে (Pickett 1969)। কোনো বিশেষ উপজাতি বা হিন্দু গোত্রে এরা গণহারে ধর্মান্তরিতকরণে গণআন্দোলন গড়ে তোলে। দেখা গেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোত্রের প্রভাবশালী লোকদের চাপে স্বীয় গোত্রে বা পার্শ্ববর্তী অন্য গোত্রে চক্রবৃদ্ধি হারে খ্রিষ্টান হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯২১ সালে গারো উপজাতির মধ্যে খ্রিষ্টান হয় ৪,১২৩ জন এবং ১৯৭৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪০,২৬৮ জন। (Abdul Karim Khan 1981 : 13-14)।

২. শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

মিশনারী স্কুলগুলো খ্রিষ্টান বানানোর প্রধান কারখানা বলা যায়। মিশনারীদের এ সংক্রান্ত পলিসির বিষয়টি উল্লেখ করে Mc Nee বলেন ঃ

ক. বোর্ডিং বা ছাত্রাবাসে অবস্থানকারীদের মধ্যে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা মিশনারীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

খ. উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্কুলগুলোকে দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা পিতা-মাতার ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই অক্সফোর্ড মিশন বরিশালে স্কুল স্থাপন করে, যার কর্মক্ষেত্র ছিলো ৪০ মাইল দূরে। (Mc Nee 1976 : 137)।

বাংলাদেশের প্রায় সব শহরেই নামকরা স্কুলগুলো মিশনারী দ্বারা পরিচালিত। ঢাকার নটরডেম কলেজ, খুলনার সেন্ট জোসেফ স্কুল মিশনারীরা পরিচালনা করেন। বর্তমানে ব্র্যাক (BRAC) প্রায় সব গ্রামেই তাদের স্কুল স্থাপন করেছে।

৩. মহিলাদের ধর্মান্তরিকরণ ঃ

মহিলারা মিশনারীদের অন্যতম টার্গেট। শুরু থেকেই মিশনারীদের ৪৩১ জন মহিলা ১৭টি ভাগে ভাগ হয়ে ৪৭টি অস্পৃশ্য লোকদের মধ্যে খুব সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রেও তারা বেশ তৎপর। তারা 'নারীমুক্তি' নামে মহিলাদেরকে বিপথগামী করছে। ইসলামের জিঞ্জির(?) ভেঙে মুক্ত-স্বাধীন হয়ে ভিন্ন ধরনের বা ইসলাম বিরোধী জীবন যাত্রায় ফিরে আসতে মহিলাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে মহিলাদেরকে খ্রিস্টান বানানো হয় এবং তাদের মাধ্যমে স্ব-স্ব পরিবারে খ্রিস্টান ধর্মের বীজ বপন করা হয়। (Abdul Karim Khan 1981 : 15)।

৪. খ্রিষ্টান ধর্মীয় সাহিত্য ঃ

জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে ধর্মীয় সাহিত্য বিতরণ, সাহিত্য রচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সর্বস্তরে খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় বার্তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য মিশনারীরা সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছে। ১৯৮১ সালের হিসাব অনুসারে এ ক্ষেত্রে তাদের ৫টি শক্তিশালী সংস্থা ছিলো ঃ

ক. Christian Literature Center.

খ. National Council of Churches.

গ. Bangladesh Bible Society

ঘ. Association of Baptist for World Evangelism.

ঙ. Bangladesh Mission.

বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কাছেও ইঞ্জিলের বঙ্গানুবাদ ও অন্যান্য সাহিত্য ব্যাপক হারে বিতরণ চলছে। ১৯৭১ সালে বিতরণ করা হয় ৫১ হাজার ইঞ্জিল এবং মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই বিতরণ প্রক্রিয়া সংখ্যা তীব্র ও আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ লাখ ২৪ হাজারে। ১৯৭২ সালে United Bible Society'র রিপোর্টে বলা হয়, তারা ঐ বছরে ৩,২৪,৭৭০টি সাহিত্য বিতরণ করে যার মধ্যে ৪,৮২৫টি বাইবেল, ২,১৩৭টি ছিলো নিউ টেস্টামেন্ট ২,৩৮,৩৬০টি বিভিন্ন ধর্মীয় উপদেশাবলী (Gospels) এবং ৭৯,৪৪৮টি ছিলো অন্যান্য খ্রিষ্টান সাহিত্য। বিতরণের সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে। (Bangladesh : Status of Christian Country Profile 1974 : 4)

৫. বাইবেলের বার্তাবাহক স্কুল ও শ্রেণীকক্ষ ঃ

বাইবেলের বার্তা বাহক স্কুল ও শ্রেণীকক্ষ জনগণকে খ্রিষ্টান বানানোর আরেক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এসব স্কুল ও শ্রেণীকক্ষকে পরিচালনা ও দিক নির্দেশনার জন্য নিম্নোক্ত সংস্থাগুলো কাজ করে থাকে ঃ

ক. Seventh Day Adventist Mission

খ. International Christian Fellowship (শুরু হয় ১৯৬০ সালে)

গ. The British Brethren (১৯৬৩)

ঘ. Assembles of God (১৯৭২)

ঙ. Every home contact. (Abdul Karim Khan 1981 : 16)।

৬. চিকিৎসা ঃ

চিকিৎসা হলো মিশনারীদের খুব কার্যকরী একটি হাতিয়ার। মিশনারীদের বাংলাদেশের আনাচে কানাচে, শহর এবং শহরতলীতে রয়েছে অসংখ্য হাসপাতাল, ঔষধের দোকান, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর Dr. VB. Olsen কর্তৃক চালিত হাসপাতাল-ক্লিনিক জনগণকে বেশ চিকিৎসার মাধ্যমে সেবা উপহার দেয় এবং সে কারণে মুজিব সরকার কর্তৃক তাদের কার্যকলাপ বেশ প্রশংসিত হয়। মিশনারীরা এ সুযোগকে ভালোভাবে কাজে লাগায় এবং তাদের অনুকূলের অনেক শর্ত সরকারের নিকট থেকে পাস করিয়ে নেয়। (Olsen 1974 : 350)।

৭. এতিমখানা ঃ

মিশনারী কর্তৃক চালিত এসব এতিমখানায় অবুঝ এতিম শিশুদের ভর্তি করা হয় এবং খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। এতিমদের প্রায় একশ' ভাগই খ্রিষ্টান বানানো সম্ভব হয়। রোমান ক্যাথলিক বাংলাদেশের অসংখ্য এতিমখানা খুলেছে এবং সেখানে এতিমদেরকে খাদ্য, বস্ত্র এবং শিক্ষা দেয়া হয়। এতিমখানাগুলো ধর্মান্তরিতকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। (CARITAS Bangladesh Annual Report 1978 : 60)।

৮. বাইবেল পাঠক দল ঃ

ধর্মান্তরিতকরণের এ পন্থাটা খুবই ফলপ্রসূ। সন্ধ্যার পর পরিবারের যখন কাজকর্ম শেষ হয় তখন

www.pathagar.com

মিশনারীরা পুরো পরিবার নিয়ে একত্রে বসে এবং বাইবেলের কিছু অংশ পড়তে দেয়া হয়। খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি লোকের কেমন আগ্রহ আছে সেটা পরীক্ষা করার জন্য এ কৌশল নেয়া হয়। এরপর তাদের আগ্রহের মাত্রাকে একটি বিশেষ স্কেলে ক্রমানুসারে বিভক্ত করা হয়। যেমন ঃ

– খ্রিষ্টান ধর্ম সম্পর্কে ব্যবহারিক কোনো জ্ঞান নেই (৯)
– খ্রিষ্টান ধর্মে আগ্রহ আছে (৮)
– গ্রামে খ্রিষ্টান ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে (৭)
– ধর্মোপদেশের মূলতত্ত্ব অনুধাবন করতে পারে (৫)
– ধর্মোপদেশ অনুসারে কাজ করার চেষ্টা করে (৪)
– যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে (৩)
– বিশ্বাস পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়ার কাছাকাছি (২)
– খ্রিষ্টান গোত্রের সাথে একাত্মতা ঘোষণা (১)

খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ থেকে কে কতোটুকু দূরে আছে তা নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেকের শেষে এভাবে নম্বর দিয়ে বুঝানো হয় এবং সে অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। (Abdul Karim Khan, 1981)

৯. রিলিফ এবং গৃহসংস্থান ঃ

মিশনারীরা সংকটময় মুহূর্তে রিলিফ এবং অনুদান নিয়ে দৌড়ে আসে এবং এ সুযোগকে তারা ধর্মান্তরিতকরণের উপযুক্ত মুহূর্ত হিসাবে কাজে লাগায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মান্তরিতকরণই রিলিফ প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে প্রতিভাত হয়। ১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে তারা বেশ সাহায্য-সহযোগিতা করে জনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা এবং সুনাম অর্জন করে। এতে করে জনগণও তাদের কথাবার্তা শুনতে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে।

The Seventh Day Adventists নামের মিশনারী সংস্থাটি কেবল হাসপাতাল চালায় না, বরং পোশাক, খাদ্য এবং ঔষধ সরবরাহ করে থাকে। ১৯৭৩ সালে এই সংস্থা ৪৯,৭১৬; ১৯৭৩ সালে ৬৯,৬৯০; ১৯৭৫ সালে ১০৯,৯৬১ এবং ১৯৭৮ সালে ১৩৩,১৩৮ ডলার মিশনারী কাজকে অগ্রগামী করার জন্য অনুদান হিসাবে প্রদান করে। বাংলাদেশে কর্মরত মিশনারীদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য বিদেশে বিশাল অর্থশালী সংস্থা এবং এজেন্সী রয়েছে। এ সংস্থাগুলোর সংখ্যা এতো বেশি যে এখানে বর্ণনা করা অসম্ভব। (Abdul Karim Khan, 1981 : 20-21)।

১৯৯১ সালে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ একটি এনজিও অফিসে রিলিফ নিতে গেলে বলা হয়– "তোমরা ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রিষ্টান হলে তোমাদেরকে রিলিফ দেয়া হবে।" এ নিয়ে চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় এনজিও'র এ অপকর্মকে তীব্র নিন্দা জানিয়ে মিছিল বের করা হয় Church of Bangladesh জবাব দেয় যে, "রিলিফের মাল যেহেতু খ্রিষ্টান দেশ থেকে এসেছে, কাজেই আমাদের দাবীও ঐ ধরনের।" (Nuruzzaman 1994 : 10-11)।

মিশনারীদের সাফল্যের খতিয়ান ঃ

বাংলাদেশে অস্বাভাবিক হারে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধিতে এটা পরিষ্কার যে মিশনারীরা তাদের কাজে বেশ ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে। উপনিবেশের শুরুতে ডঃ ক্যারী খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের সর্বোত্তম হাতিয়ার হিসাবে মিশনারী স্কুল চালু করে। এতে জনগণকে খ্রিষ্টান বানাতে তেমন সফলকাম না হলেও তাদেরকে ইসলাম বিরোধী বানাতে ভালোভাবে সক্ষম হয়। লর্ড ম্যাকলে কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মিশনারীদের উদ্দেশ্যের অভিন্নতা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। নতুন প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ম্যাকলে বলেন ঃ "আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এমন এক দল সৃষ্টি করতে হবে, যারা রক্ত ও বর্ণে ভারতীয় হবেন ঠিকই, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ এবং বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ। (Md. Saidul Islam 1987)।

ব্রিটিশরা দেশ ছাড়লেও মিশনারীরা বহাল তবিয়তে দৃঢ় উদ্যোমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০ বছরে মিশনারীরা যে কাজ করেছে ২৫ বছরের পাকিস্তান শাসনামলে তার থেকে বেশি কাজ করেছে তারা (R.

www.pathagar.com

Amin 1983)। তাদের কাজে কখনো ধস নামেনি, বরঞ্চ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। নিচের টেবিলদ্বয় তার উপযুক্ত প্রমাণ ঃ

টেবিল–১

(বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টান জনসংখ্যা)

বছর	ক্যাথলিক	প্রটেস্ট্যান্ট	মোট
১৯৩৯	২০,০০০	৩০,০০০	৫০,০০০
১৯৭০	১,২০,০০০	৮০,০০০	২,০০,০০০
১৯৮০	১,৭০,০০০	১,৩০,০০০	৩,০০,০০০
১৯৯০			৪,৮০,০০০
১৯৯২	-	-	৫,০০,০০০

টেবিল–২

১. ১৮৮১ – একজন খ্রিষ্টান প্রতি ৬০০০ জনে।

২. ১৯০১ – একজন খ্রিষ্টান প্রতি ১০০০ জনে।

৩. ১৯৮২ – একজন খ্রিষ্টান প্রতি ৩২৬ জনে।

৪. ১৯৯০ – একজন খ্রিষ্টান প্রতি ২৯ জনে।

(উৎস : A Study on the role of NGO in abnormal growth of Christian Population in Bangladesh, Dhaka, 1993).

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ঃ

মুসলমানদের চোখের সামনে খ্রিষ্টান মিশনারীরা চরম তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ এ সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া খুবই ক্ষীণ। ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া মিশনারীদের নতুন উৎসাহ যোগাচ্ছে। প্রতিক্রিয়া সামান্য থাকলেও সেটা নানান কারণে ফলপ্রসূ হচ্ছে না। নিম্নে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হলো ঃ

১. সরকারী প্রতিক্রিয়া ঃ

এনজিও এবং মিশনারীরা বাংলাদেশে কেনো এতো ক্ষমতাধর তা সহজেই অনুমেয়। তারা বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং সরকারি বিধি-নিষেধ তোয়াক্কা না করে এক অপ্রত্যক্ষ সরকারের ভূমিকায় (The role of invisible government) অবতীর্ণ আছে, (দৈনিক ইনকিলাব, সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯৯২)। তারা সরকারের পাশাপাশি সরকারের সমকক্ষ নতুন সরকার গঠন করে তা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা ইচ্ছে করলেই বাংলাদেশ সরকারের যে কোনো আদেশ বা নিয়ম অমান্য করতে পারে (দৈনিক মিল্লাত, আগস্ট ২৬, ১৯৯২)।

সরকারের অবস্থা এখন অনেকটা অসহায়। জাতীয় স্বার্থ এবং স্বাধীনতার উপর চরম হুমকি স্বরূপ এই এনজিও এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের সৃষ্ট নাজুক অবস্থাকে একদিকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থাও নিতে পারছে না। এনজিও'রা বাংলাদেশ সরকারকে বিভিন্নভাবে অপমানিত করেছে। কয়েক বছর আগের কথা- ADAB (Association of Development Agencies of Bangladesh) এবং SEBA (Society for Economic and Basic Administation) বড় অংকের টাকা চুরি করে এবং সরকারের অনুমতি এমনকি কোনো রকম খবর প্রদান ছাড়াই একটি বিদেশী দূতাবাস থেকে অর্থ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো জানতে পেরে এই এনজিওদ্বয়ের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে। এর ফলে বাংলাদেশ সরকারকে চরম থ্রেট হজম করতে হয়। সরকারকে ৩ ঘন্টার মধ্যে এ সিদ্ধান্ত তুলে নিতে বাধ্য করা হয় (প্রাগুক্ত)। এ ধরনের অপমানকর ঘটনা ঘটার ফলে এনজিওদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো রকম ব্যবস্থা নিতে বিরত থাকে, তারা দুর্নীতি,

www.pathagar.com

রাজনীতি এবং সরকার বিরোধী যাই করুক না কেনো অনবগতির কারণে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না, বিষয়টি এমন নয়, বরঞ্চ বিষয়টি হলো– সবকিছু জেনেও কেনো রকম ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হওয়া। এ সময়ে সরকারের অসহায়ত্বের বিষয় উল্লেখ করে বাংলাদেশের অনেক জাতীয় দৈনিকের হেড লাইনে এসেছে ঃ

ক. অসৎ এনজিও দুষ্ট চক্রের নিকট সরকারের নতি স্বীকার

খ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কৌশলে দেশ দখলের ষড়যন্ত্র

গ. সরকার এনজিওগুলোকে সামাল দিতে পারছে না (আগস্ট '৯২-এর প্রায় সকল জাতীয় দৈনিক)

একটি বড় এনজিও শুধুমাত্র খ্রিষ্টান শিক্ষকদেরকে তাদের স্কুলে শিক্ষকতার সুযোগ দেয় এবং সেখানকার ছাত্রদের হোস্টেলে সীট পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো খ্রিষ্টান হওয়া। বাংলাদেশে সব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বীয় ধর্ম অধ্যয়ন করে থাকে, কিন্তু মিশনারী স্কুলগুলোতে সবার জন্য বাইবেল পড়া বাধ্যতামূলক। এটা বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালার পরিপন্থী। এ ব্যাপার নিয়ে এক জেলা শিক্ষা অফিসার মিশনারী স্কুলে অভিযোগ করলে অফিসারকে বলা হয়– "আমরা আপনাদের সরকারের টাকা-পয়সায় চলি না, কাজেই এ সরকারের কাছে জবাবদিহি করতেও আমরা বাধ্য নই।" (Nuruzzaman 1994)। রাজনীতিতেও এনজিওদের অংশগ্রহণ সুস্পষ্ট। নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহায়তা দান, কোনো বিশেষ দলের মিছিল মিটিং-এ অর্থ প্রদান প্রভৃতিতে এনজিওরা বেশ সচেষ্ট এবং অগ্রগামী। '৯৬ এর সংসদ নির্বাচনে এনজিওদের প্রখর ভূমিকা ছিলো। বিশেষ করে ফেমা (FEMA) নামক সংস্থাটি পর্যবেক্ষণের নামে সুপরিকল্পিতভাবে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিলো। কয়েকটি পশ্চিমা দেশের অর্থে পরিচালিত এই সংস্থাটি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনে যাতে ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হতে না পারে সে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বাস্তবায়ন করেছে। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬ এর পর্যালোচনা, জা.ই.বা.)।

২. জনগণের প্রতিক্রিয়া ঃ

বাংলাদেশের জনগণ এনজিও'র বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এক্ষেত্রে উলামার ভূমিকা ছিলো বেশ। '৯৪ সালের দিকে বাংলাদেশে শহর নগরে এনজিওদের বিরুদ্ধে ব্যাপক মিছিল মিটিং হয়। জনগণের দাবী ছিলো দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের ইসলামী পরিচয় হারানোর আগে সরকার যেন অবশ্যই এনজিওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। এই প্রতিরোধের মূল কারণ ছিলো– অধিকাংশ এনজিও মিশনারী কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। (Syed Serajul Islam 1998 : 94)। ইসলামপন্থী দলগুলো প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং তুলছে। তবে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো এনজিওদেরকে তাদের নিজেদের সহকারী হিসাবে মনে করে। কারণ এনজিওদের কাজ হলো সমাজের ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসপূর্বক বামপন্থী চিন্তাধারার বিস্তার ঘটানো। এনজিও এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্যের অভিন্নতা তাদেরকে এক কাতারে এনে দিয়েছে।

৩. দেশের বাইরে প্রতিক্রিয়া ঃ

বাংলাদেশের এই নাজুক অবস্থায় দুনিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশ এবং ওআইসি'র তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। বাংলাদেশেও যে লেবানন এবং সুদানের মতো খ্রিষ্টান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে– এটা নিয়ে মুসলিম বিশ্বের কোনো উদ্বেগ নেই। ঢাকায় অবস্থিত মুসলিম বিশ্বের দূতাবাসসমূহ এ ব্যাপারে কখনো কোনো উদ্বেগ বা আশংকা ব্যক্ত করেছে কিনা জানা যায়নি, ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা। এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এনজিও এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের ঘৃণ্য তৎপরতা নিয়ে মুসলিম বিশ্ব বিংবা ওআইসি ওয়াকিফহাল এবং সজাগ নয়।

শেষ কথা ঃ

জন হেনরী বরোস (John Henry Borrows) বলেন ঃ "আমি মুসলিম ভূখন্ডে খ্রিষ্টান আন্দোলনের ভবিতব্য নকশা এঁকে দিচ্ছি। ক্রুশের দীপ্তি ইতোমধ্যেই লেবানন এবং পারস্য পাহাড় পেরিয়ে অনেক দূর পৌঁছেছে এবং অবশ্যই তা একদিন কায়রো, দামেস্ক এবং তেহরানকে যীশুর সেবকে পরিণত করতে অগ্রদূত হিসাবে কাজ করবে। এরপর আরব নির্জনতা খতম হবে এবং যীশুর শিষ্যরা কাবায় প্রবেশ করবে।"

www.pathagar.com

বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের যে জোর তৎপরতা চলছে তা তাদের সেই দীর্ঘদিনের লালিত 'খ্রিষ্ট রাজ্য' প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্নেরই অংশ বিশেষ। বাংলাদেশকেও তারা লেবানন বা দক্ষিণ সুদানের মতো বানাতে চায়। তাদের এই দীর্ঘ পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্রকে নির্মূল করার একটাই উপায়– মুসলমানদেরকেও দাওয়াতী কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। বাংলাদেশকে খ্রিষ্টান চক্রের এই বিশাল ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচানোর জন্য মুসলিম উম্মাহর অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। লেবাননের মতো অবস্থা সৃষ্টির আগেই যদি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে অতি সত্বর মুসলমানদেরকে এর জন্য চড়া দাম দিতে হবে।

(মোহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া)

তথ্য ঃ

১. *A. Hussain (1981). Birth of Bangladesh Political Role of Missions. London : Islamic Foundation.*

২. *Abdul Karim Khan (1981). Christian Missions in Bangladesh. A Survey. London : Islamic Foundation.*

৩. *Alan Neely (1995). Christian Missions : A Case study Approach. New York : Orbit Books.*

৪. *Arne Rudvin (1982). "The Concept and Practice of Christian Mission" In Christian Mission and Islamic Dawah. London : Islamic Foundation.*

৫. *L. W. Pickett (1969). Christian Mass Movements in India.Delhi : Lukhnow Publishing House.*

৬. *Mahammad Rasjidi (1982). "Christian Missions in the Muslim World" in Christian Mission and Islamic Dawah. London : Islamic Foundation.*

৭. *Nuruzzaman (1994). NGO : The Web of New Colonialism. Aid Merchant Buying up Sonar Bangla. Impact International. London.*

৮. *P. Mc Nee (1976). Crucial Issues in Bangladesh (A : William Carey library).*

৯. *Prof. R. Amin (1983). Christian Missionary Activities in Bangladesh. Dhaka : Dhaka University Press.*

১০. *Syed Serajul Islam (1998). "Impact of Technology and NGO on Social Development : A Case Study of Bangladesh in Journal of South Asian and Middle Eastern Studies. Vol xxi. No-2.*

১১. *V. Olsen (1974). Diplomat in Bangladesh. Chicago : Moody Press.*

১২. *A Study on the Roleon NGO's in Abnormal Growth of Christian Population in Bangladesh, Dhaka, 1993.*

১৩. *Bangladesh : Status of Christian Profile (MARC. Motovia. 1974)*

১৪. *CHARITAS Bangladesh Report. 1978.*

১৫. *Service Programs and list of Supplementary Projects for 1976. Geneva : WCC.*

১৬. *মোঃ সাইদুল ইসলাম, "আমাদের শিক্ষাঙ্গন : কিছু ভাবনা", সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৯৭।*

১৭. *নূর হোসেন মজিদি (১৯৯৪), "বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্র" আল ফুরকান, ঢাকা, খণ্ড ১০, নং-৮।*

১৮. *দৈনিক ইনকিলাব (ঢাকা), আগস্ট ২৫, ১৯৯২; ফেব্রুয়ারি ১২, মার্চ ১৩, সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯৯৩।*

১৯. *দৈনিক মিল্লাত (ঢাকা), আগস্ট ২৬, ১৯৯২।*

২০. *সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহিমুল কোরআন, ১ম খন্ড, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫।*

২১. *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬-এর পর্যালোচনা।*

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—৩

এক আল্লাহ ছিলো আদি মানবের উপাস্য

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

অষ্ট্রেলিয়া ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য গোত্রসমূহ এবং মিসরের প্রাচীনতম নিদর্শনের আধুনিক গবেষণা

অষ্ট্রেলিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলোর অসভ্য গোত্রগুলো এক অজানা প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে তাদের প্রাথমিক অপরিণত বুদ্ধিভিত্তিক জীবন যাপন করছিলো। জীবন ও জীবিকার যেসব উন্নত ব্যবস্থা সাধারণত মানুষের বুদ্ধির উন্নয়নের সঙ্গে জন্ম নেয়, তা এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবর্তমান ছিলো। প্রাথমিক যুগের মানব গোত্রের সব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য তাদের পারিবারিক জীবনে দেখা যেতে পারে। তাদের চিন্তাধারা এতোই সীমাবদ্ধ ছিলো যে, চিন্তা বা সংস্কার কোনো কিছুর ভিতরেই তাদের ধারাবাহিক উন্নতির কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তবুও তাদের ধর্মবিশ্বাসের একটি ধারণা সুস্পষ্ট দেখা যায়। তাহলো এক অদৃশ্য শক্তির অর্চনা। সে শক্তিই তাদের পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। তাদের জনম ও মরণ তাঁর মুঠায় রয়েছে। আট হাজার বছর আগেকার মিসরবাসীদের আওয়াজ আজ আমাদের কানে ভেসে আসছে। প্রাচীন মিসরীয় ধ্যান-ধারণা একের পর এক করে স্তরে স্তরে আমাদের সামনে এসেছে। আমরা সেখানে দেখি এক আল্লাহর চিন্তা সেখানে শেষ স্তরে দেখা দেয়নি, বরং একেবারে গোড়ার স্তরে দেখা দিয়েছে। মিসরের যেসব উপাস্য প্রভুর চিত্র অংকিত করে বিশ্ববিখ্যাত 'হায়কল' উপাসনালয় ও এর মিনারগুলো সাজিয়ে দেয়া হয়েছে, তারাও সেই প্রাচীনতম যুগে ছিলো না। তখন 'উসায়রিয' নামক অদৃশ্য এক শ্রেষ্ঠতম অস্তিত্ব নীলনদ উপত্যকার সকল বাসিন্দার একক প্রভু ছিলেন।

দজলা ফোরাত আদিবাসীদের একত্ববাদী ধারণা

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইরাকের বিভিন্ন স্থানে মাটি খুঁড়বার যে নতুন অভিযান শুরু হয়েছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে যা স্থগিত হলো ও অসম্পূর্ণ হইলো, সেই অসম্পূর্ণ আবিষ্কৃত জিনিস নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আমরা এক নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছি। এখন আর এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ অবশিষ্ট নেই যে, নীল দরিয়ার মতো দজলা ফোরাতের উপকূলবর্তী আদিবাসীরা যখন সর্বপ্রথম আল্লাহকে ডেকেছিল, তখন তাঁর সাথে কাকেও অংশীদার ভাবেনি। একই অদেখা শক্তি হিসেবে তিনি তাদের কাছে ধরা দিয়েছিলেন। কালদিয়া, সুমেরী ও আক্কাদী গোত্র সেই মানব গোষ্ঠীর উত্তম পুরুষ হয়েছিল। তারা চন্দ্র-সূর্যের পূজা করতো না। বরং সেই একই চিরন্তন শক্তি অর্চনা করতো যিনি চন্দ্র, সূর্য ও উজ্জ্বল তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন।

মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় এক আল্লাহর অস্তিত্ব

পাক-ভারত উপমহাদেশের মহেঞ্জোদারো সভ্যতার নিদর্শন আমাদেরকে এ দেশে আর্যদের আগমনেরও অনেক আগের এক যুগে নিয়ে যায়। যদিও এর অধ্যয়ন পর্ব এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তথাপি এই সত্যটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই আদিতম বাসিন্দাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি তাওহীদ বা এক আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই ছিলো না। মূর্তি পূজা তাদের পেশা ছিলো না। তারা সেই একক স্রষ্টার নাম দিয়েছিলো 'আদম'। সংস্কৃত 'আন্দোয়ান' শব্দের সাথে এর মিল দেখা যায়। উক্ত আল্লাহর প্রভুত্ব সবকিছুর উপরেই ছড়িয়ে ছিলো। শক্তির যতো নিদর্শন দেখা যায়, সবই তাঁর অধীনে কাজ করতো। তাঁর অন্যতম গুণবাচক নাম হলো 'দীদাকুন' অর্থাৎ চির জাগ্রত সত্তা– 'লাতা' খুজুহু সিনাতুওয়ালা নাউম' অর্থাৎ তাঁর তন্দ্রা বা নিদ্রা কিছুই নেই।

অদৃশ্য এক আল্লাহ সম্পর্কিত প্রাচীন সিরীয় ধারণা

সিরীয় আদি গোত্রগুলো মূল উৎসভূমি আরব মরুর বিভিন্ন আবাদ এলাকা ছিলো। যখন সেই উৎসভূমিতে মানব সন্তানের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেতো, তখনই আশেপাশে ছড়িয়ে পড়তো। কয়েক শতাব্দী পরে সেসব এলাকার প্রভাবে তারা নতুন রূপ ও রঙে গড়ে উঠতো. নতুন নাম গ্রহণ করতো।

www.pathagar.com

সম্ভবত, মানব সন্তানের স্রোতধারা পৃথিবীর বুকে একই সময়ে দুই অঞ্চলে প্রবাহিত হচ্ছিল। এভাবে পরবর্তীকালের বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতায় তারা ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। গোবী মরুভূমির উৎস ধারা হতে যে মানব স্রোত প্রবাহিত হয়, তরা হিন্দী, ইউরোপী, ইন্দো-ইউরোপিয়ান ও আর্য নামে অভিহিত হয়েছে। আরব মরুর উৎস ধারা হতে যে মানব স্রোত প্রবাহিত হয়, তারা প্রথম নাম পেলো শামী। তারপর বিভিন্ন এলাকায় যেয়ে তারা অসংখ্য নাম ধারণ করলো। আমাদের জানা ইতিহাস এর চেয়ে বেশি কোনো খবর দিচ্ছে না।

আরব গোত্রের এই শাখাটি ধীরে পশ্চিম এশিয়া ও নিকটবর্তী আফ্রিকা মহাদেশের দূর-দুরান্তের সকল অংশে ছড়িয়ে পড়লো। ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিসর, লিবিয়া, ইরাক ও পারস্য উপসাগর উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে তারা বসতি স্থাপন করলো। আদ, সামুদ, আমালেকা, হেকসুস, মাওয়াবী, আশুরী, আক্কাদী, সুমেরী, ইলামী, আরামী ও ইব্রানী ইত্যাদি গোত্র বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে গেছে। কিন্তু তারা একই আরব গোত্রের শাখা-প্রশাখা ছিলো মাত্র।

নতুন এক সিরীয় নিদর্শন অধ্যয়ন করার পরে একটি সত্য নতুন করে ধরা দিয়েছে। তা হলো এই- সেসব গোত্র অদৃশ্য এক আল্লাহে বিশ্বাস করতো। আর সেই আল্লাহর নাম দিয়েছিল তারা আল-ইলাহ বা আল্লাহ। এই ইলাহই কোথাও 'ঈল' কোথাও 'উলুহ' এবং কোথাও বা 'এলাহিয়া'রূপে দেখা দিলো।

গত মহাযুদ্ধের পরে হিজাজ সীমান্তের আকাবা প্রান্তর ও সিরিয়ার রা'ছে' শুমার এলাকায় যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে উক্ত সত্যটি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ধরা দিয়েছে। তবে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার স্থান এটি নয়।

যা হোক বিংশ শতকের জ্ঞান-অনুসন্ধানের কার্য আমাদেরকে মানুষের যে আদিমতম ধর্মবিশ্বাসের ধারণা দিতেছে তা মূর্তিপূজার নয় বরং এক আল্লাহর অর্চনার। এ ক্ষেত্রে এটি থেকে প্রাচীন কোনো ধারণা আজ মিলছে না। আদিমতম আদম সন্তানেরা মানব জীবনের সে শৈশবকালে যখনই জ্ঞানের চক্ষু খুললো তখনই তারা সেখানে এক আল্লাহর অস্তিত্ব দেখতে পেলো। তারপর ধীরে ধীরে পেছনে হাঁটতে লাগলো। বাইরের প্রকৃতি তাদের নতুন নতুন পরিবেশ ও পরিকল্পনা দিতে লাগল। ফলে একাধিক অপ্রাকৃত শক্তির চিন্তা তাদের ভিতরে ঠাঁই নিয়ে চললো। প্রকৃতির অসংখ্য নিদর্শন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলো। এমনকি এতে পূজা-অর্চনার এরূপ সব আসন সৃষ্টি হতে লাগলো যেখানে তারা প্রণতি জানাবার জন্য মাথা ঠুকে চলতো। পরন্তু এরূপ সব কল্পনার শিকার হতে লাগল যে, তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের কাছে তারা মাথা নত করে চললো। মোটকথা, এমনভাবে প্রকৃতি তাদের পথ ঘিরে রইলো যে এরূপ না করে বাঁচাও তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিলো।

যদি বর্তমান অবস্থাকে বিভ্রান্তি বলা হয়, তা হলে মানতে হবে মানুষ গড়ায় বিভ্রান্ত ছিলো না। তারা আলোকে চোখ খুলেছিল। ধীরে ধীরে তাদের চোখে আঁধারের কালো ছায়া নেমে এসেছে।

কুরআনের ঘোষণা

বর্তমান যুগের জ্ঞান-অনুসন্ধান কাজের এই অগ্রগতি ধর্ম জগতের পবিত্র গ্রন্থাবলীর অনুকূল হয়ে দেখা দিয়েছে। মিসর, গ্রীক, কালদিয়া, ভারত, চীন, ইরান, সব দেশের ধর্মীয় বর্ণনাগুলো আদি মানুষের যে পরিচয় দান করে, তাতেও দেখা যায় সেই মানুষগুলো বিভ্রান্তির সাথে তখনও পরিচিত হয়েছিলো না এবং তারা প্রকৃতিগত সোজা পথ অনুসরণ করে চলতো। প্লেটো 'ক্রিতিয়াস' গ্রন্থে বিশ্বের আদি আবাদীর যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাতেও এই ধারণার পূর্ণ সমর্থন। তিমাউস নামক এক মিসরীয় উপাসকের বর্ণনায় প্রাচীন মিসরের ঠিক এই অবস্থারই চিত্র পাওয়া যায়। তাওরাতের জন্মখন্ডে আদম-হাওয়ার কিস্সা এই সত্যই প্রকাশ করে যে, মানুষের প্রথম জীবন সত্যানুসারী ছিলো, পরে ভ্রান্তি এসে তাদেরকে স্বর্গীয় সুখ হতে বঞ্চিত করেছে। কুরআন তো সাফ সাফ ঘোষণা করছে।

"শুরুতে সব মানুষের একই দল ছিলো। পরে তারা দলীয় কোন্দলে শতধা বিভক্ত হয়েছে।

"শুরুতে সব মানুষ ছিলো একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (স্বাভাবিক ধর্মের অনুসারী। তারপর বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে)। সুতরাং আল্লাহতা'আলা একের পর এক নবী পাঠাতে লাগলেন। তাঁরা মঙ্গলের পথের সন্ধান দিতেন এবং বিপদে গমনের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করতেন। তাঁদের সাথে গ্রন্থও অবতীর্ণ করতেন যেন তার সাহায্যে মানুষ বিভেদের বিষয়গুলো মীমাংসা করে নেয়। (২ঃ১২৩)

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। তরজমায়ে কুরআন মজীদ, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০
২। তাফহীমূল কোরআন (১ম ও ২য় খন্ড) মাওলানা আবুল আলা মওদুদী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
৩। কোরআন সূত্র, মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।
৪। হাদীসে রসূল, অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী অনূদিত ও সংকলিত, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা।
৫। বাংলা বোখারী শরীফ, সম্পাদনা হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল জলিল, বাংলাদেশ লাইব্রেরী, ঢাকা। ১৯৯৩।
৬। সুন্নাত ও বিদয়াত, মাওলানা আবদুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্কার, ১৯৯৪।
৭। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ, আরিফুল হক, দেশজ প্রকাশন, জুলাই ২০০০।
৮। কোম্পানী আমলে ঢাকা, 'জেমস টেলর' অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।
৯। খবরের খবর, জহুরী, আলহেরা প্রকাশনী, ১৯৯০।
১০। ইতিহাসের পাতা থেকে, সৈয়দ আশরাফুল আলী, ১৯৯৭।
১১। উজ্জীবন, সৈয়দ আশরাফ আলী, ১৯৮৮।
১২। ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, মুহাম্মদ কুতুব, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪।
১৩। বাংলা ও বাঙালীর কথা, আবুল মোমেন, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২।
১৪। বজ্রকণ্ঠ, গোলাম আহমাদ মোর্তজা, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলিকাতা, পশ্চিম বঙ্গ, ১৯৯৬।
১৫। সাহাবা চরিত, ১ম খন্ড, আল্লামা সোলায়মান আহমাদ নদভী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৭।
১৬। ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত, সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৮
১৭। রাহুর কবলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, ১৯৯৪।
১৮। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের পোস্টমর্টেম (১ম ও ২য় খন্ড), বদরুল ইসলাম মুনীর, চেতনা প্রকাশনী, ঢাকা।
১৯। হারামনি, মুহম্মদ মুনসুর উদ্দীন, পঞ্চম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।
২০। ইব্রাহীম খাঁ রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সম্পাদনা আঃ মজিদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
২১। বাংলার মুসলমানের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৪।
২২। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, ১৯৮৫।
২৩। জাহানারার আত্মকাহিনী, শ্রী মাখন লাল চৌধুরী, কলিকাতা ১৩৫৭।
২৪। সওয়াল জওয়াব, খন্দকার আবুল খায়ের, জামেয়া প্রকাশনী ১৯৯৩।
২৫। লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ, আব্দুল হাফিজ, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।
২৬। ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনায় আবদুল ওয়াহিদ, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ১৯৯৬
২৭। জ্ঞানের কথা (সম্পাদনা গ্রন্থ) প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১৯৮৩।
২৮। সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ৫ম বর্ষ, সংখ্যা ১৮, ৯-১৫ আগস্ট ১৯৯৫।
২৯। সম্প্রীতি, সম্পাদক ঃ নজমুল চৌধুরী, ত্রৈমাসিক সাহিত্য সাময়িকী, ৬ষ্ঠ বর্ষ (৪র্থ সংখ্যা), জেদ্দা, সৌদি আরব।
৩০। বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান, খন্দকার আবুল খায়ের, খন্দকার প্রকাশনী, ১৯৯৪।
৩১। ইসলামিক নলেজ এন্ড ডায়েরী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, আশবাড়ী মাহিন পার, ১৯৯৪।
৩২। স্মৃতির পাতা থেকে, জি. এ নাজির, নতুন সফর প্রকাশনী, ১৯৯৩।
৩৩। ইতিহাস কথা কয়, মুহাম্মদ আবু তালিব, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৮।
৩৪। বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান, খন্দকার আবুল খায়ের, খন্দকার প্রকাশনী, ১৯৯৪।
৩৫। বাংলার পীর সাহিত্যের কথা, ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাশ, শেহিদ লাইব্রেরী, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম বাংলা, ভারত ১৯৭৬।
৩৬। মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম (দঃ), মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৭।
৩৭। আখলাকুন্নবী (সঃ), হাফিজ আবু শায়খ-আল ইসকাহানী (রঃ)।
৩৮। নারী নির্যাতনের রকমফের, সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০১।
৩৯। মাসিক সফরের বিভিন্ন সংখ্যা।
৪০। সাপ্তাহিক বিক্রমের বিভিন্ন সংখ্যা।
৪১। সাপ্তাহিক কলমের (কোলকাতা) বিভিন্ন সংখ্যা।
৪২। মাসিক মদীনার বিভিন্ন সংখ্যা।
৪৩। সাপ্তাহিক বিচিত্রার বিভিন্ন সংখ্যা।
৪৪। নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট, বিভিন্ন সংখ্যা।
৪৫। মাসিক জিজ্ঞাসা, আগস্ট সংখ্যা ১৯৯৮।
৪৬। মুসলিম জাহান, আগস্ট সংখ্যা ১৯৯৫।
৪৭। দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক প্রথম আলোসহ দেশী ও বিদেশী দৈনিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৪৮ সালের ১১ অক্টোবর তৎকালীন ঢাকা জেলা বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত গজারিয়া থানায় অবস্থিত আড়ালিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নদী ভাঙ্গনের ফলে ১৯৬৪ সালে তাঁর পিতা বসতি স্থাপন করেন দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম তোতা মিয়া সরকার। পারিবারিক অর্থনৈতিক দীনতার কারণে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি বটে; কিন্তু নিজ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভাবলে দেশের সর্ববৃহৎ ঐতিহ্যবাহী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বুক প্রমোশন প্রেস এবং জাতীয় দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে ২৬ বছর যাবত অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ থেকে '৯৮ পর্যন্ত তিন বছর উক্ত পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক মিল্লাত ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় স্বনামে এবং "ইবনে কাশিম," ও "রাজহংস" ছদ্মনামে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি জাতিসত্ত্বা পরিষদের আহবায়ক এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। বর্তমানে তিনি লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন।

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

- রাহুর কবলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)
- ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত
- নারী নির্যাতনের রকমফের
- হাসির মজলিশ

প্রকাশের অপেক্ষায়

- রাহুর কবলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি (২য় খণ্ড)
- সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা : সেকাল-একাল
- ইতিহাস বিকৃতির ইতিবৃত্ত
- শাসন-শোষণ ও আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল দর্শন
- বাংলাদেশের ইতিহাস অভিধান
- বিবিধ সংলাপ (নির্বাচিত কলাম)
- ছহি বড় বুদ্ধিজীবী জঙ্গনামা